ধূসর মস্কো

সেরিনা জাহান

একুশশতক
১৫ শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট
কলকাতা-৭০০ ০৭৩

ধূসর মস্কো ॥ সেরিনা জাহান

প্রথম সংস্করণ
বইমেলা। জানুয়ারি ১৯৯৬
দ্বিতীয় সংস্করণ : ২০১০
তৃতীয় সংস্করণ : ২০১৪

প্রকাশক
একুশ শতক
১৫ শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট
কলকাতা-৭০০ ০৭৩

মুদ্রক
গীতা প্রিন্টার্স
৫১এ ঝামাপুকুর লেন
কলকাতা-৭০০ ০০৯

প্রচ্ছদ ভাবনা ঃ কল্যাণ বিশ্বাস
অঙ্কন ঃ অসীম দত্ত

মস্কোর ৬ বছর। দিনগুলো—
গ্রীষ্মের নীল আকাশ
বার্চ গাছগুলো আর
মহামতি লেনিনকে—

অনেকদিন পরে বিশ্বের সামনে মস্কোর নাম ইতিবাচক একটা কারণে উঠে এল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে সোভিয়েত লাল ফৌজের কাছে নাৎসি জার্মানির পরাজয়ের ষাট বছর পূর্তিতে মস্কোয় বিরাট উৎসব। ২০০৫-এর 'বিজয় দিবস' ৯মে পৃথিবীর ষাটটি দেশের শীর্ষ নেতারা এই উৎসবে যোগ দিলেন। সকলকে সাক্ষী রেখে রুশ রাষ্ট্রপতি পুতিন সেই বিজয়ী বীর প্রজন্মকে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করলেন, যাঁরা নিজ পিতৃভূমি রক্ষার পাশাপাশি ইউরোপের আরও এগারোটি দেশকে নাৎসি অধীনতা থেকে মুক্ত করেছিলেন। সোভিয়েত জমানার কোনো ঐতিহাসিক ঘটনাকে কুর্নিশ জানাচ্ছেন রুশ রাষ্ট্রপতি—অধুনা অভিনব, সন্দেহ নেই। রাশিয়ার আজকের যুবক যুবতিরা তাঁদের পূর্বসূরিদের প্রশংসনীয় কীর্তির কথা স্মরণ করে উৎসবে মাতছেন, এমন নজিরও আজ বিরলই বলা চলে। এই বিজয় উৎসব আরও একটা কারণে তাৎপর্যবাহী। আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে আবার হারানো কর্তৃত্ব, কিছুটা হলেও, ফিরে পেতে রাশিয়া তৎপর। গত দেড় দশক ব্যাপী দুনিয়াজুড়ে তীব্র একমেরুকরণ যেভাবে প্রকট থেকে প্রকটতর হচ্ছে, তাতে রাশিয়ার এই ইচ্ছাকে বাস্তবায়িত করার পথে সঙ্গীর অভাব হবে না বলেই বোধ হয়।

মস্কোর বিজয় উৎসবের অন্য একটি গুরুত্বের কথা বলা দরকার। গত বারো-চোদ্দো বছরে রাশিয়ার খবর মানেই কোনো দুঃসংবাদ— সন্ত্রাস, দুর্ঘটনা, অগ্নিকাণ্ড। চেচেন উগ্রপন্থীদের পণবন্দী কখনও থিয়েটারের দর্শক, কখনও স্কুলের নিষ্পাপ শিশুরা। কখনও মস্কোর ফ্রেন্ডশিপ ইউনিভার্সিটির হস্টেল-এ অগ্নিকাণ্ড। বিমান বা রেল দুর্ঘটনা—যথাযথ তদারকি বা যত্নের অভাবে। দিল্লিতে পুলিসি হামলায় একদল দেহব্যবসায়ী ধরা পড়ার পর দেখা গেল অধিকাংশ মেয়ে আজারবাইজানের বাসিন্দা। যাদের সকলের জন্ম সোভিয়েত জমানায়, সকলেই স্কুলে পড়ার সময়ে কম্‌সামোল সদস্য ছিল। আমাদের টিভি-তে কয়েক বছর আগেও একটা রুশ চ্যানেল দেখা যেত। সেখানে এত আপত্তিকর ও কুরুচিকর সব অনুষ্ঠান দেখানো হত যে ভারতীয় প্রচারমন্ত্রক চ্যানেলটি বন্ধ করার নির্দেশ

জারি করতে বাধ্য হন। কলকাতা চলচ্চিত্র উৎসবে রুশ ছবি 'টরাস' নিয়ে তুমুল বিতর্কের সূত্রপাত। সব বিতর্ককে পাশ কাটিয়ে একটা প্রশ্ন সকলকে ভাবিয়ে তুলল—লেনিন যে বৃষরাশির জাতক, যে কারণে ছবির নাম 'টরাস', সেটা এতদিন কারোর মাথায় আসেনি কেন? কলকাতায় বহু বছর পরে রাশিয়ান সার্কাস এল। বিপুল উৎসাহে সবাই মানুষ আর সিলমাছের খেলা দেখলেন। আর দেখলেন খেলা শুরুর আগে সার্কাসদলের এক রুশ যুবক নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামের ভেতরে ঘুরে ঘুরে গ্যালারির দর্শকদের বাইনোকুলার বেচছেন। দর্শকরা যাতে ভালো করে খেলা দেখতে পান সে কথা ভেবে সার্কাস কোম্পানির এত মাথাব্যথা! মানতে মন চায় না। গোটা ব্যাপারটায় স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল একটা দৈন্যভাব—মহান রাশিয়ার ভাবমূর্তির সঙ্গে যার যোজনখানেক ফারাক।

অশান্ত-অস্থির-ছন্নছাড়া এক রাশিয়া আর তার দিশেহারা বাসিন্দারা, দুর্ঘটনা আর দুঃসংবাদের ঘেরাটোপে ক্রমনিমজ্জমান মস্কো—এমনটাতেই আমরা ইদানীং অভ্যস্ত হয়ে পড়েছিলাম। হঠাৎ এই বিজয় উৎসবের আয়োজন, খবরের কাগজের প্রথম পাতায় চার কলাম জুড়ে সামরিক পোশাক পরিহিত নৃত্যরত এক রুশ বৃদ্ধার ছবি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সেনানী এই বৃদ্ধার গা-ভর্তি মেডেল—মহান সেই জয়ের স্মারকচিহ্ন। ঐতিহ্যকে নস্যাৎ করে শেকড়বিহীন কোনও জাতির টিকে থাকার নজির ইতিহাসে খুঁজে না পেয়ে রাশিয়া কি তাহলে অন্যভাবে ভাবতে শুরু করেছে?

১৯০৫ সালে স্বৈরাচারী জারতন্ত্রের বিরুদ্ধে রাশিয়ায় প্রথম বিপ্লব হয়। বলা হয়, ১৯১৭-র বিপ্লবের বীজ বপন করা হয়েছিল ওই প্রথম বিপ্লবের সময়েই। অত্যাচার প্রতিরোধে সাধারণ মানুষের জোটবন্ধ হওয়ার বিষয়টি স্মরণ করে, সেই প্রথম রুশ বিপ্লবের শতবর্ষ পূরণের কথা ভেবে 'ধূসর মস্কো'-র দ্বিতীয় সংস্করণটি প্রকাশিত হল।

১১।৫।২০০৫ — সেরিনা জাহান

কলকাতা

প্রথম সংস্করণের ভূমিকা

আমি এমনই এক দুর্ভাগা।
একটা ইতিহাস ভাঙতে দেখলাম। সব চুরমার হয়ে গেল।
খানখান হয়ে গেল। দেখলাম।
অনেক পড়েছি একটা যুগসন্ধিক্ষণের কাহিনি।
কেমন করে নতুন দিন এল। নতুন মানুষ। নতুন সমাজ। নতুন লেখা। নতুন গান। নতুন দুনিয়া। নতুন গল্প।
সেই গল্পই ভাঙল। ভেঙে গেল। আমারই সামনে।
দেখলাম।
সৃষ্টি-মুহূর্তে আমি ছিলাম না। ধ্বংস-মুহূর্তে সাক্ষী রইলাম।
কেন ? কেন দেখতে হল ? ৬ বছর ধরে একটু একটু করে দেখলাম।
এমনই আমার শোক।
তাই-ই আমি সন্তর্পণে নিবেদন করলাম।
কোনো তর্ক-বিতর্ক, কূটনৈতিক আলাপচারিতায়
আমার মন নেই। আস্থাও নেই। শুধু আমার একটা দুঃখ...
আমি জানালাম।

সেরিনা জাহান

পাম এভিনিউ
কলকাতা-১৯
১৯৯৫

প্রস্তাবনা

১৯৫৯ সাল। সরকারি সফরে যাওয়ার জন্য আমেরিকা থেকে আমন্ত্রণ পেলেন নিকিতা খ্রুশ্চেভ। সোভিয়েত প্রধান হিসেবে তিনিই প্রথম এই আমন্ত্রণ পেলেন। আইজেনহাওয়ার তখন মার্কিন প্রেসিডেন্ট। নিরস্ত্রীকরণ নিয়ে আলোচনার ফল যাই হোক না কেন, খ্রুশ্চেভ খুশি হলেন অন্য কারণে—আন্তর্জাতিক স্তরের গুরুত্বপূর্ণ সমস্যাগুলি নিয়ে আলোচনার জন্য আমেরিকা তাহলে এতদিনে সোভিয়েত ইউনিয়নকে শরিক হিসেবে মেনে নিল! এইসব সমস্যা সমাধানের জন্যও সোভিয়েত ইউনিয়নকে 'সমশক্তি' হিসেবে স্বীকার করল আমেরিকা। খ্রুশ্চেভসহ সোভিয়েত নেতৃবৃন্দ আনন্দে আত্মহারা হলেন—এতদিনে সোভিয়েত ইউনিয়ন সুপার পাওয়ার হল!

১৯৯১ সাল। মিখাইল গর্বাচভ তখন সোভিয়েত-প্রধান। আন্তর্জাতিক সমস্যা নিয়ে দুই সুপার পাওয়ারের মাথাব্যথার ৩১ বছর পূর্ণ হল। ঘনিয়ে এসেছে তখন উপসাগরীয় যুদ্ধ। স্পষ্টতই মাথাব্যথার কারণে আমেরিকা, যুদ্ধ ছাড়া গতি নেই—এ সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছে। বাজারময় ঘুরে বেড়াচ্ছে (মস্কোতেও) একটা চাঞ্চল্যকর তথ্য(?)—সাদ্দাম হুসেন নাকি স্তালিনের দূরসম্পর্কীয় আত্মীয়! দুজনের ছবি পাশাপাশি রেখে কপাল, গাল, নাক, গোঁফ, ঠোঁট—এসবের মধ্যে দারুণ মিলও খুঁজে পাচ্ছিলেন অনেকে। সেইরকম সময়েই, সম্ভবত ১৪ বা ১৫ জানুয়ারির রাতে মার্কিন প্রেসিডেন্ট বুশকে ফোন করলেন চিন্তিত গর্বাচভ—শান্তিপূর্ণ আলোচনার মাধ্যমে এই সংকট কাটিয়ে ওঠার চেষ্টা করুন। যুদ্ধ ঘোষণা করবেন না। অবশ্যই সেটা ছিল গর্বাচভের 'বিশেষ অনুরোধ'। এক সুপার পাওয়ারের অনুরোধ আর এক সুপার পাওয়ার রাখবে, এমন ধারণা গর্বাচভের বদ্ধমূলই ছিল। তা হল না। ইরাককে 'শিক্ষা' দিতে শুরু হল স্কাডের সঙ্গে পেট্রিয়টের লড়াই।

আমি তখন মস্কোর প্যাট্রিস লুমুম্বা গণমৈত্রী বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক সাংবাদিকতা বিভাগের পঞ্চম বর্ষের ছাত্রী। আমাদের এক শিক্ষিকা আনা ইভগেনিয়েভনা বাজানোভা ক্লাসে এসে বললেন, "এই যুদ্ধে কার কী ক্ষতি হল জানি না, কিন্তু সারা পৃথিবীর সামনে একটা সত্য পরিষ্কার হয়ে গেল—সোভিয়েত ইউনিয়নকে আর সুপার পাওয়ার হিসেবে গণ্য করে না আমেরিকা।"

এক মার্কিন প্রেসিডেন্টের কাছ থেকে সরকারি সফরে আমন্ত্রণ পাওয়ার পর 'সুপার পাওয়ার' হিসেবে উন্নীত সোভিয়েত ইউনিয়নের 'সুপার পাওয়ার' পরিচয় ঘুচে গেল আর এক মার্কিন প্রেসিডেন্টের অনীহা ও সচেতন প্রচেষ্টায়। ১৯৫৯ সালে সোভিয়েতের সুপার

পাওয়ার হিসেবে উত্তরণ যে মার্কিনিদের বদান্যতায়ই সম্ভব হয়েছিল তা এক সোভিয়েত নাগরিক, সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টির উপরতলার একজন প্রভাবশালী সদস্য এবং সোভিয়েত বিদেশ মন্ত্রকের তৎকালীন এক উচ্চপদস্থ কর্মী আর্কাদি নিকোলায়েভিচ শেভচেঙ্কো তাঁর 'ব্রেকিং উইথ মস্কো' নামক একটি আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থে মেনে নিয়েছেন। আবার মার্কিনিদের অনীহাতেই যে সোভিয়েতের এই 'বৃহৎ' পরিচয় আর থাকল না তা-ও একজন কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য, সাংবাদিক এবং শিক্ষিকা বিশ্বাস করলেন। এবং এক ক্লাস ভরতি বিদেশি ছাত্রছাত্রীর কাছে তা নির্দ্বিধায় ঘোষণাও করলেন।

শুধু এই দুজনই নন, আমি প্রতিনিধি চরিত্র হিসেবে এই দুজনকে বেছে নিলেও আরো দুটি মন্তব্য এখানে তুলে দিলাম। ১৯৬২ সালের ১৩ ডিসেম্বর সুপ্রিম সোভিয়েতে বক্তৃতা দেওয়ার সময় আন্দ্রেই গ্রোমিকো বলেছিলেন, "সোভিয়েত-মার্কিন বন্ধুত্বই যৌথভাবে দুনিয়ার সব সমস্যার সমাধান করবে, দুনিয়ার ভাগ্য নির্ধারণ করবে।" দ্বিতীয় মন্তব্যটি মস্কো থেকে ১৯৬৫ সালে প্রকাশিত 'মোটিভ ফোর্স অব ইউ এস ফরেন পলিসি' থেকে উদ্ধৃত—"সোভিয়েত-মার্কিন সম্পর্ক হচ্ছে দুনিয়ার দুটি সর্ববৃহৎ শক্তির মধ্যেকার সম্পর্ক। এটা হচ্ছে দুনিয়ার রাজনীতির মূল কেন্দ্র, আন্তর্জাতিক শান্তির মূল ভিত্তি... দুনিয়ার এবং মানবজাতির ভাগ্য নির্ধারণ করার ব্যাপারে বিশেষ দায়িত্ব রয়েছে এই দুটি বৃহৎ শক্তির।"

লেনিনের নেতৃত্বে জারের রাশিয়া থেকে পৃথিবীর প্রথম সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র সোভিয়েত ইউনিয়নে উত্তরণের জন্য হাজার লাখো মানুষ লড়াই করেছিলেন যেন আমেরিকার সার্টিফিকেট আদায় বা দৃষ্টি আকর্ষণের জন্যই! দুই সোভিয়েত নাগরিকের 'দৃষ্টি'তে এই 'সুপার পাওয়ার' হয়ে ওঠা এবং না থাকার মধ্যের সময়টুকুতেই লুকিয়ে রয়েছ সামগ্রিকভাবে গোটা পূর্ব ইওরোপে কমিউনিজমের শোচনীয় পরিণতির কারণগুলি। একা স্তালিনকে দোষী সাব্যস্ত করা কাজের কথা নয়। ৬ বছর (১৯৮৭-৯৩) মস্কোতে থেকে দিনের পর দিন ওই সময়টুকুকে নানা অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে জেনেছি, বোঝার চেষ্টা করেছি। এই প্রতিবেদনে আমার সেই জানাবোঝার অভিজ্ঞতাই অভিব্যক্ত হয়েছে।

অধ্যায়ক্রম

নতুন কয়েকটি শব্দ

রুশ শব্দ 'গোলাস'-এর ইংরেজি অর্থ করলে দাঁড়ায় 'ভয়েস'। বাংলায় 'গলার আওয়াজ' বা 'স্বর'। 'গোলাস' থেকেই এসেছে 'গ্লাসনস্ত' শব্দটি। আক্ষরিক অনুবাদে এর বাংলা প্রতিশব্দ হতে পারে—'গলাবাদ'। এ ধরনের কোনো 'বাদ-'এর অস্তিত্ব এখনও পর্যন্ত অবশ্য চোখে পড়েনি। রুশিরা সাধারণভাবে 'গ্লাসনস্ত' বলতে বোঝেন 'বাক স্বাধীনতা'। যদিও রুশ-বাংলা অভিধানে (সোভিয়েত এনসাইক্লোপেদিয়া কর্তৃক প্রকাশিত) 'গ্লাসনস্ত' শব্দটির অর্থ দেওয়া আছে—'প্রকাশ বা প্রচার করা'।

পড়াশোনার সূত্রে ১৯৮৭ সালের আগস্ট মাসে যখন মস্কো গেলাম, তখন এই শব্দটি এবং এরই সঙ্গে আর একটি রুশ শব্দ 'পেরিস্ত্রোইকা' ঘুরে বেড়াচ্ছে সেখানকার লোকের মুখে মুখে। দ্বিতীয় শব্দটির আভিধানিক অর্থ 'পুনর্গঠন' বা 'পুনর্নির্মাণ'। শুধু মস্কোতেই নয়, গোটা পৃথিবীতেই তখন আলোড়ন তুলেছে ওই শব্দ দুটি।

প্রকৃতপক্ষে আমি মস্কো পৌঁছে তিনটি শব্দের বহুলচর্চা লক্ষ করলাম। তার মধ্যে প্রথম দুটি শব্দই ছিল আমার কাছে একেবারে আনকোরা নতুন। তৃতীয় শব্দটি শুনলাম নতুন শব্দ দুটির পরিপ্রেক্ষিতে। তৃতীয় এই শব্দটি আমার জানাই ছিল, তা হল—'স্তালিনিজম'।

লেডি ব্রেবোর্ণ কলেজে আমি তখন রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্রী। সালটা ১৯৮৫। গোর্কি সদনের লাইব্রেরির মেম্বার ছিলাম আমি। তখন লাইব্রেরিয়ান ছিলেন এক বাঙালি ভদ্রলোক। স্তালিন প্রসঙ্গে ক্লাসে একদিন কী একটা আলোচনা হয়েছিল। সেই পরিপ্রেক্ষিতেই গোর্কি সদনে ওই বিষয়ের উপর স্তালিনের লেখা বইপত্র কিছু আছে কিনা, তা খোঁজ করছিলাম। লাইব্রেরিয়ান ভদ্রলোককে বলতেই তিনি আঁতকে উঠলেন। ভয় পাওয়া গলায় বললেন, "আস্তে, আস্তে! স্তালিনের নাম এখানে বলবেন না। ওসব এখানে পাবেন না। রাখা হয় না।"

প্রেক্ষাপটটা এখানেই তৈরি হয়েছিল। গোর্কির মস্কোতে পৌঁছে তা আরো জোরালোভাবে টের পেলাম। তার আগের বছরেই ৮৬-তে সি পি এস ইউয়ের ২৭তম কংগ্রেসে 'স্ট্র্যাটেজিক্যাল কোর্স' হিসেবে পেরিস্ত্রোইকা এবং গ্লাসনস্ত—এই দুই নতুন নীতি খসড়া আকারে গৃহীত হয়। তা সি পি এস ইউয়ের সেন্ট্রাল কমিটির পরবর্তী প্লেনাম এবং সারা সোভিয়েতের কমিউনিস্ট পার্টির ১৯তম সম্মেলনে সমর্থিত হয়ে চূড়ান্ত আকারে গৃহীত হয়।

মস্কোয়, ৮৭-র সেপ্টেম্বর থেকে ইউনিভার্সিটিতে ক্লাস করতে শুরু করলাম। নতুন করে, রীতিমতো ঘোষণা করে গর্বাচভ কেন বাকস্বাধীনতার কথা বললেন এবং নতুন করে কী-ই বা আবার নির্মাণের প্রয়োজনে হল, তা মানুষকে জানাতে ও বোঝাতে বিভিন্ন মাপের, বিভিন্ন দামের পুস্তক-পুস্তিকা, পত্রপত্রিকা তখন মস্কোর বইয়ের দোকানগুলিতে

ভিড় করেছে। রাস্তাঘাটে মেট্রো স্টেশনে, বিশ্ববিদ্যালয়ের ভেতরে বাইরে—সর্বত্রই তখন মস্কোর সাধারণ মানুষ এই নতুন শব্দ দুটির অর্থ ও তাৎপর্য ব্যাখ্যা করে চলেছেন। বাজারে, দোকানের লাইনে (যা মস্কোর দৈনন্দিন জীবন থেকে তখন আলাদা করা যেত না) একই দৃশ্য।

কলকাতার পরিমণ্ডলে বেড়ে উঠতে উঠতে অবশ্যম্ভাবীভাবেই লেনিনের নাম এবং তাঁর কর্মকাণ্ড সম্পর্কে একটা ভাসা ভাসা ধারণা গড়ে ওঠে। রাষ্ট্রবিজ্ঞান নিয়ে পড়তে গিয়ে লেনিনকে পাই পাঠক্রমের বিষয় হিসেবে। সঙ্গে থাকে সোভিয়েত সংবিধানও। শুধুমাত্র জানার আগ্রহেই নয়, ভালো নম্বর পেয়ে ভালো রেজাল্ট করার জন্যও 'রাষ্ট্র ও বিপ্লব', 'কমিউনিস্ট পার্টির ইস্তাহার', 'কী করিতে হইবে', 'পরিবার, রাষ্ট্র ও ব্যক্তিগত মালিকানা'—এই সমস্ত লাল মলাটের মার্কসীয় সাহিত্য তখন আমার রোজকার নাড়াচাড়ার বিষয়।

বেশ মনে পড়ে, আমি আর আমার এক বন্ধু লাইব্রেরিতে এইসব বই পড়তে পড়তে কতদিন নিজেদের মধ্যে আলোচনা করেছি, আমাদের দেশেও কবে একজন লেনিন জন্মাবেন! সোভিয়েত পত্রপত্রিকাগুলি উলটেপালটে দেখতাম তেল চকচকে, ঝকঝকে পাতায় শুধুই হাস্যোজ্জ্বল মানুষের মুখ। দেখতাম পাতাজোড়া রঙিন ছবি—সমৃদ্ধির ছবি—সুখী, নিশ্চিন্ত জীবনের ছবি—সব মানুষের সমানাধিকারের ছবি। আমার বন্ধু ফিসফিস করে বলত—"মস্কো যাবি?"

মস্কো-রাশিয়া-বরফ ঢাকা সাইবেরিয়া—লেনিনগ্রাদ-লেনিনের সমাধি—ওই হাসিখুশি মানুষগুলির দেশ সোভিয়েত ইউনিয়ন আমায় হাতছানি দিত। গোগোল, পুশকিন, চেখভ, গোর্কির দেশকে হাত দিয়ে ছুঁতে বড়ো সাধ যেত।

মস্কো আমার কাছে ছিল থোকা থোকা লাল গোলাপের মতো। তার নীল আকাশে টকটকে লাল পতাকা হাওয়ায় কেঁপে কেঁপে ক্রেমলিনের মাথায় উড়ছে আর ক্রেমলিনের আকাশ-ছোঁয়া চুড়োর মাথায় বিরাট সেই লাল তারাটা গর্বে জ্বলজ্বল করছে। ম্যাগাজিনের পাতায় পাতায়, পিকচার পোস্টকার্ডে এ ছবি দিনের পর দিন দেখেছি।

মস্কো আমার কাছে ছিল 'দুনিয়া কাঁপানো দশ দিন'-এর সেই গায়ে কাঁটা তোলা শীত প্রাসাদে পৌঁছানোর রাস্তা, সেই শক্ত সবল হাতে ধরা লাল পতাকা, হাতুড়ি কাস্তে নিয়ে পুরুষ মহিলাদের মিছিল, ঋষিতুল্য তলস্তয়ের খামারবাড়ির উঠোনে পৌঁছানোর উপায় আর চারিদিকে লালে লাল।

কলকাতায়, আমি মস্কো যাওয়ার ঠিক আগে, বলশয় ব্যালে আর রাশিয়ান সার্কাসের আসর বসেছিল। তখনও জানি না যে আর কয়েকদিন পরেই মস্কো যেতে পারব। পালকের মতো ভেসে বেড়ানো ব্যালেরিনার দল আর চাইকোভস্কির 'সোয়ান লেক'-এর সেই অপূর্ব সাংগীতিক মূর্ছনা আমার 'মস্কো-ভালোবাসা'-কে আরো উসকে দিল। অবশেষে সুযোগ ঘটল।

ক্লাস শুরু হল। আমি আমার স্বপ্নের মস্কোতে। সে মস্কো রবীন্দ্রনাথের 'রাশিয়ার চিঠি'-র মস্কো। সে মস্কো একটা আস্ত, জলজ্যান্ত বিপ্লবের মস্কো। সে মস্কো আইজেনস্টাইনের,

নিকোলাই অস্ত্রোভস্কির, পাভেল আর তার মায়ের। সে মস্কো রুশদেশের রূপকথার—মাশা আর সেই গোলরুটির। সে মস্কো ডাক্তার জিভাগোর, সেই উভচর মানুষের, দুই হুজুরের গপ্পোর দেশ। ছেলেবেলায় বইয়ের পাতায় দেখা ছবির সেই শীতের দেশ—পাতা ঝরে যাওয়া বার্চ গাছের ডালে পুরু হয়ে জমে থাকা বরফের শহর। এক ঝাঁক উজ্জ্বল, উচ্ছল মানুষের শহর।

আমি প্রচণ্ড একটা ধাক্কা খেলাম। না জেনে বিদ্যুৎবাহী কোনো তারে হাত দিয়ে দুম করে ছিটকে গেছি ছোটোবেলায় অনেকবার। আবার সেই অনুভূতি হল। ৮৭ সালের ৩০ আগস্ট সকালে দিল্লি থেকে উড়ে আসা এরোফ্লোতের সেই বিরাট বিমানটি মস্কোর আকাশে কয়েক চক্কর মেরে যখন বিমানবন্দরের রানওয়ে ধরে ছুটছিল থামার জন্য, তখনও জানতাম না এমন একটা ধাক্কা খাব। রুশ ভাষা একবর্ণও না জেনেই মস্কো এসেছি। বিমান থেকে নেমে লাউঞ্জের দিকে এগোলাম। আমার সঙ্গে ওই বিমানেই এসেছে ভারতের নানা রাজ্য থেকে আরো প্রায় শ-দুয়েক ছাত্রছাত্রী।

লাউঞ্জে বসে আছি, ইউনিভার্সিটির লোকজন আমাদের হস্টেলে নিয়ে যাবে বলে। আনন্দে, উত্তেজনায় আমার শরীর শিরশির করছিল। বিমানবন্দরের এই ঘেরাটোপ থেকে বাইরে বেরোলেই মস্কো—আর তর সইছিল না আমার।

সেদিন ছিল রবিবার। বসে আছি, কেউ নিতে আর আসছেন না। বসে বসে দেখছি মস্কোর মানুষদের (বিমানবন্দরের কর্মীদের)। আঁটোসাঁটো পোশাক—পুরুষদের নেভি ব্লু কোর্ট প্যান্ট, আকাশনীল শার্ট, টাই আর টুপির রং-ও নেভি ব্লু, কালো চকচকে জুতো। মেয়েরা পরে আছে নেভি ব্লু স্কার্ট আর আকাশনীল ব্লাউজ। হিল তোলা জুতোয় খট্‌খট্‌ আওয়াজ তুলে ব্যস্তসমস্ত হয়ে এধার-ওধার ঘোরাঘুরি করছে। কর্মীদের চলাফেরা দেখে মনে হচ্ছিল যেন চাবি দেওয়া পুতুলের দল। কেউ হাসে না, কেউ উজ্জ্বল নয়, কেউ উষ্ম নয়, সব যন্ত্রবৎ—প্রফেশনাল।

তখনো মনে হচ্ছিল আমার স্বপ্নের মানুষগুলো নিশ্চয় এই চৌহদ্দির বাইরে ওই আকাশটার নিচে আছে। বসে আছি—ঘণ্টাখানেক হল। কারো দেখা নেই। তেষ্টায় গলা শুকনো, জলের হদিস জানি না। কেউ ডেকে জিজ্ঞেসও করছে না—আমরা কারা, কোত্থেকে এসেছি, কোথায় যাব, কেনই বা এতক্ষণ বসে আছি। যেখানে বসে আছি, সেখানটা সেন্ট্রালি হিটেড এরিয়া। শীত করছিল না। কাচের দেওয়ালের বাইরে সামান্য কয়েকজন লোককে দেখা যাচ্ছিল। তারা মোটা জ্যাকেট পরেছিল। বাকিটা কেমন যেন কুয়াশামাখা, ঝিরঝিরে বৃষ্টি হচ্ছিল। হঠাৎ একদল লোক আমাদের সামনে দিয়ে হেঁটে চলে গেল, আমাদেরই কেউ একজন গলা নামিয়ে বলল, 'কে জি বি'। সত্যি কিনা জানি না, তবে অপার বিস্ময়ে আমি 'কে জি বি' দেখলাম—এরাই তাহলে সি আই এ-র প্রতিপক্ষ!

সেই লোকগুলোর পোশাকও বিমানবন্দর কর্মীদের মতোই। আমাদের মধ্যে থেকে আর কেউ একজন বলল, নিচু স্বরেই, 'এখানে সবাই কে জি বি'।

খিদেও পাচ্ছিল। সামনেই, কিছুটা দূরে একটা ছোট্ট কাফে ছিল। কয়েকজন মিলে সেদিকে গেলাম। প্লেনে যেসব অচেনা স্বাদ-গন্ধের রুশি খাবার দিয়েছিল, তা গলাধঃকরণ

করা যায়নি। কাফেতে গিয়ে দেখলাম কাচের শোকেসে সাজানো রয়েছে সেসব খাবারই। পাঁউরুটিগুলো কালো রঙের। আমার চোখ দুটো তন্নতন্ন করে তখন গোলরুটি খুঁজে বেড়াচ্ছে।

রুশ ভাষা জানে এমন কেউ আমাদের সঙ্গে নেই। আমরা সবাই মূকাভিনয় শুরু করলাম। আমার ধারণা নির্বাক ভাষাই পৃথিবীর একমাত্র ভাষা, যা প্রকৃত অর্থেই আন্তর্জাতিক। অঙ্গভঙ্গি করে বোঝানোর চেষ্টা করছিলাম, জল চাই। আমাদের কাছে রুবল নেই। দোকানে অনেক রঙের অনেক রকম পানীয় ছিল। হার্ড এবং সফ্‌ট্—দুইই। এগুলো ড্রিংকস। আমার তখন দরকার এক গ্লাস বিশুদ্ধ জল।

তারাও অঙ্গভঙ্গি করে, সেই আন্তর্জাতিক ভাষায় বোঝালো, জল পাওয়া যাবে না। বাকি পানীয় পেতে রুবল দিতে হবে। খানিকক্ষণ সেদিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। তারপর ফিরে এসে ফাইবার গ্লাসের চেয়ারে, সেই পুরোনো জায়গায় বসে পড়লাম।

আমরা কেউ দেশনেতা নই, নিদেনপক্ষে মাঝারি মাপের বুদ্ধিজীবীও নই, তাই আপ্যায়নে ত্রুটি তো থাকবেই। গোগোল আর পুশকিন পড়তে পড়তে কলকাতায় বসে ভাবতাম ওদেশের মানুষের আতিথেয়তার কথা। সেসব তখন নিছকই কতকগুলি ছাপার অক্ষর হয়ে গেছে আমার কাছে। কাচের বাইরে তাকিয়ে মনে হচ্ছিল, ওখানটায় আছে সেই অতিথিবৎসল সজ্জনরা।

কলকাতা থেকে যাওয়ার সময়েই 'গ্লাসনস্ত' আর 'পেরিস্ত্রোইকা'—এ দুটি শব্দ আর তা নিয়ে হইচই আমার মস্কো যাওয়ার আনন্দকে আরো একটু উসকে দিয়েছিল। কী যেন একটা হচ্ছে সেদেশে—এই ভাবতে ভাবতেই আমি মস্কো পৌঁছে গিয়েছিলাম। বসে আছি তা প্রায় ঘণ্টা তিনেক হয়ে গেল। কেউ নিতে না এলে বাইরে বেরনো বারণ। রুবল নেই তাই খাবার নেই। জল নেই তাই গলা শুকিয়ে কাঠ। ভাষা জানি না তাই কাউকে কিছু জিজ্ঞাসাও করতে পারছি না—তবে ঘণ্টা তিনেকের মধ্যে কেউ ডেকেও জিজ্ঞাসা করল না একবার ; আমার ভয় হচ্ছিল, এটাই আবার পেরিস্ত্রোইকা নয়তো!

কলকাতার পাম এভিনিউ, বাড়ির সামনের সেই রাস্তাটা, বাড়ি থেকে বেরিয়েই গেটের মুখের কাছে বসে থাকা সেই বুড়ি, মা—ছবির মতো ভেসে আসছিল। ছুটে বাড়ি চলে যেতে ইচ্ছে করছিল।

লাউঞ্জের এক কোনায় ছোট্ট একটা কাউন্টার দেখিয়ে আমাদের একজন বলে উঠল, "চল, ওখানে গিয়ে জিজ্ঞেস করি।"

কথা ছিল এয়ারপোর্টে আমাদের নিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের লোক থাকবে, তারা আমাদের নির্দিষ্ট হস্টেলে পৌঁছে দেবে। কলকাতার এক ছাত্র, একটু নাদুসনুদুস, প্রচুর ফুল নিয়ে গিয়েছিল। সত্যিকারের ফুল। দিল্লি থেকে কিনেছিল রুশি দিদিমণিদের দেবে বলে। ফুল নাকি রুশি মেয়েদের খুব পছন্দের, একথা সে শুনেছিল। ফুলগুলো এমন যত্ন করে বুকের কাছে ধরে রেখেছিল, যেন গভীর কোনো খাদের পাশ দিয়ে সন্তান কোলে কোনো এক মা চলেছেন। এতগুলো ঘণ্টা এয়ারপোর্টে কাটানোর পর স্বাভাবিকভাবেই ফুলগুলো শুকিয়ে যাচ্ছিল। সেদিকে তাকিয়ে আমি তাদের অন্তিম পরিণতির কথা ভাবছিলাম।

বেচারা ফুলগুলো!

কোণেই সেই কাউন্টারে বসেছিল গোবেচারা গোছের সদ্য গোঁফ ওঠা এক রুশ কিশোর। ভাঙা ভাঙা ইংরেজিতে নাম বলল, আন্দ্রেই। কাউন্টারের একপাশে ইংরেজিসহ আরো কয়েকটি ইউরোপীয় ভাষায় লেখা ছিল আমরা যেখানে পড়তে এসেছি সেই বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম—প্যাট্রিস লুমুম্বা পিপলস্ ফ্রেন্ডশিপ ইউনিভার্সিটি।

আমাদের দুর্দশার কথা আন্দ্রেইকে বললাম। কতটা বুঝল জানি না। এখানে আন্দ্রেইয়ের কথা একটু বলে রাখি (পরে জেনেছিলাম বিষয়টা)। ইউনিভার্সিটিতে ভরতির পরীক্ষায় পাশ করার পর, ক্লাস শুরুর আগে, মাঝের সময়টুকুতে সোভিয়েত ছেলেমেয়েদের দিয়ে রাষ্ট্র এ ধরনের বিভিন্ন কাজ করিয়ে নিত। এরা সবাই 'কমসামোল' সদস্য বা 'ইয়ং কমিউনিস্ট'। আন্দ্রেইও একজন ইয়ং কমিউনিস্ট। এদের কথা পরে বিস্তারিতভাবে বলব।

ভাঙা ভাঙা ইংরেজিতে আমাদের সঙ্গে কিছু কথা বলে ইউনিভার্সিটিতে ফোন করল আন্দ্রেই। তারপর আমাদের বলল, "আজ রোববার। ওখানে কেউ নেই। ইউনিভার্সিটির বাস পাওয়া যাবে না। কেউ নিতে আসবে কিনা বলতে পারছি না।"

কোথায় সেই চেখভের 'চেরির বাগান', কোথায় সেই চাইকোভস্কির 'সোয়ান লেক', কোথায় সেই পুশকিনের কবিতাগুলো, কোথায় সেই ব্যালেরিনারা—আমার কাছে তখন সবই 'কেরানির মৃত্যু'! খুব ইচ্ছে করছিল কলকাতায় ফিরে যেতে। বসে থাকার সময় প্রায় ছ-ঘণ্টা পেরলো। আমার মস্কো, স্বপ্নের মস্কো ক্রমেই এক কঠোর, কঠিন, শীতল, বাস্তব আদল নিতে শুরু করল।

আমি এবং আরো তিনজন শুধুমাত্র মস্কোর গণমৈত্রী বিশ্ববিদ্যালয়ের চিঠি পেয়েছিলাম। বাকিরা তখনও জানত না কে কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে, কোন প্রজাতন্ত্রে জায়গা পাবে। দুই রুশি ভদ্রলোক এসে, যেহেতু আমরা চারজন গণমৈত্রীতে যাব, তাই আমাদের রেখে, বাকিদের নিয়ে চলে গেলেন। শুনলাম কোনো একটা হোটেলে থাকবে ওরা আপাতত। আমি তখন হাল ছেড়েই দিয়েছি প্রায়। যা হওয়ার হবে। হাত-পা ছড়িয়ে বসেই রইলাম।

মনে পড়ছিল স্কুল কলেজের কথা, কলেজের সেই বন্ধুর কথা—যার সঙ্গে একসাথে মস্কো আসার স্বপ্ন দেখতাম। মনে মনে বোধহয় তাকে তখন বলেছিলাম, আসবি এখানে?

কলকাতার সঙ্গে মস্কোর সময়ের তফাত গ্রীষ্মে দেড়ঘণ্টা, শীতে আড়াই ঘণ্টা। ঋতু পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সূর্যের ডিউটি আওয়ারেরও হেরফের ঘটে, তাই বছরের দু-ভাগে সময়ের হিসেবও দু-রকম। প্রতি বছর ২৩ জুন ঘড়ির কাঁটা একঘণ্টা এগিয়ে নেন মস্কোর তাবৎ বাসিন্দারা। আবার প্রত্যেক ২৩ সেপ্টেম্বর ঘড়ির কাঁটা এক ঘণ্টা পিছিয়ে নিয়ে হিমেল শীতের আগমনের প্রস্তুতি নেন মস্কোর সকলে। ধরুন, জুলাই মাসে কলকাতায় যখন রাত দশটা, মস্কোতে তখন সাড়ে আটটা। আবার, অক্টোবর মাসে কলকাতার রাত দশটা মানে মস্কোর রাত সাড়ে সাতটা।

বিমানবন্দরে নেমে যখন ঘড়ির সময় মিলিয়ে নিলাম, তখন মস্কোতে সকাল ছটা। ঠিক বেলা দুটোর সময় ঘটল গল্পের বইয়ের মতো সেই 'প্রায় অলৌকিক' ঘটনাটি।

হঠাৎই, কোনো কাজ না থাকা সত্ত্বেও গণমৈত্রী বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনিয়র দুই ভারতীয় ছাত্র এসে হাজির বিমানবন্দরে। ছুটির দিনের দুপুরে হাতে কোনো কাজ ছিল না। হঠাৎ দুই বন্ধুর মনে হল, প্রত্যেক বছর আগস্টের শেষের দিকেই তো নতুন ছাত্রছাত্রী এসে পৌঁছায়। একবার এয়ারপোর্টে গিয়ে দেখি তো, আজ কেউ এল কি না! হস্টেল আর এয়ারপোর্টের দূরত্ব প্রায় ৭০ কিলোমিটার। দ্রুতগামী মেট্রোরেলেও প্রায় পৌনে দুঘণ্টা। 'অলৌকিক', 'অতিমানবীয়' বা নেহাৎ-ই কাকতলীয় যোগাযোগ? জানি না। তবে, সেই সুদূর বিদেশের শীতল, নিস্পৃহ লাউঞ্জে বসে অপেক্ষা করতে করতে আট ঘণ্টা পার করে দেওয়া, একবর্ণ ভাষা না জানা, শূন্য পকেটের অসহায় ক-টি ছাত্রছাত্রী স্বদেশি ওই সিনিয়রদের 'হঠাৎ খেয়ালের' দৌলতে তড়বড়িয়ে দু-পায়ে ভর দিয়ে খাড়া হলাম। ওরা বাসু আর রাজন—দুজনেই দক্ষিণ ভারতীয়। আমাদের চারজন ও সঙ্গের লটবহর, বাক্সপ্যাটরা সামলে পথ দেখিয়ে নিয়ে গেল ট্যাক্সি স্ট্যান্ডের দিকে। ট্যাক্সির ডিজাইনটা মারুতি ভ্যানের মতো, আকারে যদিও মারুতির তিনগুণ। সব মালপত্র আর আমরা মোট ছজন দিব্যি এঁটে গেলাম। ট্যাক্সির আকারের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ চওড়া কাঁধের বিশাল চেহারার তার চালক। কমলা রঙের প্রায় লেপের মতো দেখতে মোটকা জ্যাকেট আর কালো ক্যাপ পরা বিরাট লালরঙা মুখে সরল চওড়া হাসি। মস্কোর মাটিতে পা দেওয়ার পর এই প্রথম সহাস্য খুশি চোখে পড়ল। কলকাতায় বসে চকচকে সোভিয়েত পত্রপত্রিকায় দেখা ঝকঝকে হাসিওলা মুখগুলির হদিস হয়তো জানেন এই ট্যাক্সিচালক! একঘেয়ে ঝিরঝিরে বৃষ্টি আর ম্যাটম্যাটে কুয়াশা মেশানো মস্কোর ফাঁকা চওড়া রাস্তা ধরে ঊর্ধ্বগতিতে ট্যাক্সি ছুটতে শুরু করল। না বোঝা ভাষায় কী যেন জানতে চাইছেন চালকটি। বাসু আর রাজনও অং বং করে অদ্ভুত দ্রুতগতিতে কথাবার্তা চালিয়ে যাচ্ছে। মাত্র এক বছরের মধ্যে কী সুন্দর ভাষাটা আয়ত্ত করে ফেলেছ তোমরা, আমার এ কথা শুনে বাসু হেসে বললে, "তোমরাও শিখে যাবে। এক বছরও লাগবে না, ছ-মাসই যথেষ্ট। এদের ভাষা শেখানোর পদ্ধতিটা বড়ো সুন্দর। আর তাছাড়া রাস্তাঘাট, দোকানবাজার সর্বত্রই তো কানে পড়বে এই ভাষা।" বাসুর ভরসা শুনেও মনে মনে নিজের পারদর্শিতা সম্পর্কে একেবারে নিঃসন্দেহ হতে পারলাম না তক্ষুনি। রাজন আবার অনুবাদ করে জানাল, গরমের দেশ থেকে সদ্য আসা 'বেচারি' আমাদের শীত করছে কিনা জানতে চাইছেন ট্যাক্সি চালক। একটু একটু ঠান্ডা সত্যিই লাগছিল। সেকথা জানাতেই ট্যাক্সির মধ্যেকার হিটারটি চালিয়ে দিলেন তিনি। কিছুক্ষণের মধ্যে বেশ স্বস্তি বোধ করতে লাগলাম। চোখ ফেরালাম কাচের ওধারে।

আমার কল্পনার মস্কোর ঝলমলে রাস্তায় উজ্জ্বল, উচ্ছল মানুষের ভিড় খোঁজা রবিবারের এই মন্দা আবহাওয়ার দুপুরে একেবারেই বৃথা চেষ্টা, সেটা ততক্ষণে রাজন ও বাসুর টুকরো কিছু মন্তব্য থেকেই বুঝে গেছি। ওদের এক বছরের মস্কোবাসের অভিজ্ঞতার ঝুলি থেকে নানা খবরাখবর শুনতে শুনতে স্যাঁতস্যাঁতে ভেজা হাইওয়ে দিয়ে হস্টেলের উদ্দেশে এগিয়ে চলেছি আমরা। রাস্তার দুধারে দশ-বারো তলার বিরাট বিরাট বাড়ির সারি। কাচের জানলাগুলো সাঁটা বন্ধ। একেকটা ব্লকে পাশাপাশি একইরকম

দেখতে, একই রঙের, একই উচ্চতার পাঁচ-ছটা বাড়ি। অধিকাংশ বাড়িই ছাইরঙা। পাশুটে আকাশের নিচে ছাইরঙা বাড়ির বৈচিত্রহীন সারি। মাঝে মাঝে লম্বা লম্বা সাইনবোর্ডে বড়ো বড়ো অচেনা হরফে কী যেন সব লেখা, রাস্তাঘাটে লোকজন প্রায় নেই, শুধু মাঝেমধ্যে আশপাশ দিয়ে বিরাট জোরে হুশহাশ করে দু-চারটে গাড়ি ছুটে যাচ্ছে, কখনো কখনো বেশ কয়েক মিটার ধরে প্রায় হলুদ হয়ে আসা পাতা নিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে থাকা বার্চ গাছের নির্বাক সারি—আমার ধুলো-কালি-ছাই-জঞ্জাল মাখা, লোডশেডিংয়ের অতলে তলিয়ে থাকা, ভিড় গিজগিজে, ঠ্যালাঠেলি, ধাক্কাধাক্কি, আমার গেঁয়ো-মেঠো, আমার অতি নিজের, অতি চেনা কলকাতার জন্য বুকের ভেতরটা একেবারে হু-হু করে উঠল। এ কোন মৃত্যুপুরীতে এসে পড়লাম আমি? কোন স্বেচ্ছা নির্বাসনে? আচ্ছা, ফিরতি প্লেনে আবার দেশে চলে যাওয়া যায় না?

মনে মনে যখন এইসব মতলব আঁটছি তখন রাস্তার ওপাশ দিয়ে উলটোমুখে একটা হলুদ রঙা বেশ কাদাজল মাখা বাস গেল। খুব জোরে নয়। কাচের বড়ো বড়ো জানলা, দরজা সব বন্ধ। কিছু যাত্রী দাঁড়িয়ে আছে। এতক্ষণে একটা পরিচিত দৃশ্য দেখে কিছুটা যেন ফিরে পেলাম নিজেকে। যাক, এখানেও তাহলে বাসে দাঁড়িয়ে যাওয়া যায়, দরজার বাইরে ঝোলা নাই-বা গেল!

হঠাৎ রাস্তার বাঁপাশে একদিকে আঙুল তুলে বাসু বলল "দেখো, দেখো, দোকানে লাইন পড়েছে। মস্কোতে কিছুদিন থেকেছ, অথচ কখনো কোনো দোকানের লাইনে দাঁড়াও নি—এমনটি হলে গিনেস রেকর্ড বুক-এ অবধারিত ভাবে সেই ভাগ্যবানের নাম উঠবেই উঠবে। আর জানো তো, রুশিরা কোনো লাইন দেখলেই প্রথম প্রশ্ন কী করে? কে শেষে আছেন? তারপর ঝটপট নিজে দাঁড়িয়ে পড়ে কিছুটা ধাতস্থ হয়ে তবে দ্বিতীয় প্রশ্ন—আচ্ছা, কীসের লাইন এটা? আর রাস্তাঘাটে হঠাৎ কোথায় কী মিলে যায়, সেজন্য বাড়ি থেকে বেরনোর আগে প্রত্যেকে হাতব্যাগে বা অ্যাটাচিতে খান দুয়েক শক্তপোক্ত বাজারের থলি বা নিদেনপক্ষে কয়েকটা পলিথিনের প্যাকেটও ঢুকিয়ে নেয়।" মস্কোর রোজকার জীবনে লাইনের এমন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা সম্পর্কে বাসুর নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা শুনতে শুনতে মন দিয়ে পাশের লাইনটি খেয়াল করলাম। রেইনকোট গায়ে ছাতা মাথায় মহিলাদের ভিড়ই বেশি লাইনে। পুরুষ মাত্র জনাপাঁচেক হবে সেই প্রায় চল্লিশ জনের লাইনে। দুপুর দুটো থেকে তিনটে টিফিনের ছুটির জন্য দোকান বন্ধ। তিনটের সময় দোকান খোলার সঙ্গে সঙ্গে আগেভাগে ঢুকতে পারলে ইচ্ছেমতো সব ধরনের জিনিস পাওয়ার সম্ভাবনা প্রবল। পরে এলে রুটি হয়তো পাওয়া যাবে, কিন্তু চিজ বা সসেজ না-ও মিলতে পারে। পেলেও তা সরেস হয়তো হবে না। তাই ব্যাগ ভরে মনের মতো বাজার করার জন্য এই বিশ্রী আবহাওয়ায়, বৃষ্টিকে অগ্রাহ্য করে, দোকান খোলার আধঘণ্টা আগে থেকেই লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছেন বিশ্বের প্রথম সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের রাজধানীবাসীরা! কিন্তু লাইনে মহিলাদের সংখ্যা এত বেশি কেন? আজ তো ছুটির দিন। বাবাদেরও আজ বাড়ি থাকার কথা। রাজন হেসে বলল, "রুশি পুরুষরা অধিকাংশ বেশ অলস। ঘরকন্নার, কাজ বা দোকান বাজার করতে তাদের বড়ো অনীহা। উলটোদিকে মহিলারা দারুণ

পরিশ্রমী। প্রায় সকলেই তো চাকরি করেন আবার তার সঙ্গে সংসারের অধিকাংশ ঝক্কিও একা হাতেই সামলান। বাড়িতে কাজের লোকের চল তো আর এদেশে নেই।"

যাচ্ছি তো যাচ্ছিই। আর কতদূরে হস্টেল ? আমার চোখ তখন গাড়ির কাচের উপর স্থির। স্কুলের ম্যাপখাতার প্রত্যেকটা পাতার মাঝে যেমন একটা করে ট্রেসিং পেপার থাকত আর তার নিচে সাদা পাতার উপর ম্যাড়ম্যাড়ে মানচিত্র, আমার স্বপ্নে দেখা রঙিন মস্কো, জানলার ওদিকে ঠিক ওরকমই। কোথায় সেই নীল আকাশ, সবুজ গাছ আর লাল গোলাপ ? যেতে যেতে ভাবছিলাম, পথে কি ক্রেমলিনের সেই দুর্গ পড়বে ? হাওয়ায় ওড়া ওভারকোর্ট গায়ে সামনের দিকে হাত উঁচিয়ে থাকা লেনিন, মূর্তির নিচের দিকে—প্যানেলে সারি সারি শক্ত সবল শ্রমিক-কৃষক, নারী-পুরুষের যৌথ সমাবেশ—যা আমি 'সোভিয়েত দেশ' পত্রিকার পাতায় পাতায় দেখেছি, কোথায় তা ?

ট্যাক্সি ছুটে চলেছে দ্রুতগতিতে। দুর্বোধ্য ভাষায় ট্যাক্সি চালক সমানে বাসুদের সঙ্গে গল্প করে চলেছেন। রাস্তাটার যে কী নাম তা-ও জানা হল না। কলকাতায় ট্রামে বাসে চেপে কোথাও যেতে যেতে রাস্তার দুপাশে দোকানের সাইনবোর্ড পড়া, রাস্তার নাম দেখা, সেটা কলকাতা কত, তা জানা ছিল আমার একটা নেশা। এখানে এইসব ছাইরঙের মাঝে কিছুই সেসব পড়তে পারলাম না, জানতেও পারলাম না কোন রাস্তা দিয়ে চলেছি!

রাস্তাটা এবার হঠাৎ ডানদিকে বেঁকে গেল। গজ পঞ্চাশেক এগোতেই শুরু হল গণমৈত্রী বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি 'এল' আকৃতির চারতলা বিশাল বাড়ি, অনেকটা এলাকা জুড়ে। সেটা রাস্তার ডানদিকে এবং সেটাও ছাই রঙের। বাসু আমায় বলল, "এটা আর্টস ফ্যাকাল্টি, তুমি এখানেই পড়বে। সায়েন্স অন্য পাড়ায়।" 'এল' বাড়িটার মাঝখানে, সামনের ফাঁকা জায়গায় ছোট্ট চৌকো একটা অগভীর চৌবাচ্চা মতো। তার বাঁদিকে একটু এগিয়ে ইউনিভার্সিটির নাম লেখা (রুশ ভাষাতেই) বিশাল হোর্ডিং।

ইউনিভার্সিটি বিল্ডিংয়ের উলটোদিকে ডানদিকের রাস্তা জুড়ে হস্টেলের সারি। দুটো বাসস্টপ জুড়ে (বাসুই বলল আমাদের) মোট দশটা ব্লক নিয়ে ইউনিভার্সিটির হস্টেল। এর মধ্যে প্রথম আটটা ব্লক পাঁচতলা করে, একদম একই রকম দেখতে দুটো করে বাড়ি নিয়ে—অর্থাৎ ষোলোটা বাড়ি—একেকটা বাড়িতে একশোটা করে ঘর। নয় আর দশ নম্বর ব্লক ষোলোতলা করে দুটো বাড়ি নিয়ে। নয় নম্বরে শুধু মেয়েরা থাকত তখন। এগুলোও সব ছাই রঙের। আমরা যাব ছ-নম্বরে। নতুন ছাত্রছাত্রী এলে সাতদিন সেখানে রেখে মেডিকেল চেক আপ করানো হয়। এই সাতদিন আমি কোথাও যেতে পারব না, বাইরের কেউও আমার কাছে আসতে পারবে না।

ছ-নম্বর ব্লকের সামনে ট্যাক্সি দাঁড়াল। প্রত্যেকটা ব্লকের মাঝখানে একটা করে এক-গাড়ি চওড়া রাস্তা। ট্যাক্সি ভাড়া লাগল কুড়ি রুবল। বিমানবন্দর থেকে পৌঁছাতে সময় লাগল প্রায় পৌনে একঘণ্টা। ট্যাক্সি চলেছে ৮০-১০০ কিমি স্পিডে। শুনলাম এ জায়গাটার নাম মিকলুখা মাকলায়া—এক পর্যটকের নামে।

নতুন কেউ এলেই যে তাকে প্রথমে ছ-নম্বর ব্লকে থাকতে হবে, তা জেনেছি ট্যাক্সিতে আসতে আসতেই। বাসুরা বলছিল, ওরা স্টাইপেন্ড পায় মাসে ৮০ রুবল। তখনকার

সরকারি হিসেব অনুযায়ী ভারতীয় টাকায় দাঁড়াল ২,৪০০ টাকা। তার থেকে ২০ রুবল চলে গেল। আমরা নতুনরা একটু হায় হায় করছিলাম। দুই দক্ষিণী একসঙ্গে বলে উঠল, "এটুকুও না করতে পারলে কীসের এক দেশের লোক হলাম।"

ছ-নম্বর ব্লকের গেটের কাছে একদল বিশাল চেহারার আফ্রিকান ছাত্র দাঁড়িয়েছিল। ওরাও নতুন। গেট দিয়ে ভেতরে ঢুকতেই হাসপাতালের মতো অদ্ভুত একটা গন্ধ নাকে এসে ধাক্কা দিল। চোখ তুলতেই সামনে দেখলাম কালো পাথরের বেদির ওপর শ্বেতপাথরের তৈরি লেনিনের আবক্ষ মূর্তি। মস্কোয় আমার দেখা সেটাই প্রথম লেনিনের মূর্তি। তার পেছনে দেখলাম প্রথম লাল রং। বিশাল লাল রঙের একটা কাঠের বোর্ডের ওপর সাদা দিয়ে রুশ ভাষায় কী একটা লেখা। মনে হল, লেনিনের কোনো বাণী।

ভেতরে গিয়ে এক বৃদ্ধার মুখোমুখি হলাম আমরা। একটা ঘরে ভরতি সাদা বিছানার চাদর, বালিশ-কম্বলের ওয়াড় ইত্যাদি স্তূপ করে রাখা। হাসপাতাল হাসপাতাল গন্ধটা ভীষণ তীব্র। এক গোছা বিছানাপত্র আমার হাতে ধরিয়ে দিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে বলিরেখায় ভরামুখে হাসতে হাসতে বাসুকে কী যেন বললেন সেই বৃদ্ধা। বাসুও হাসল। অনুবাদ করে বলল, বুড়ি জানতে চাইছে, আমি ভারতীয় মেয়ে হয়েও টিপ পরিনি কেন, আর লম্বা বিনুনিই-বা কই? বিছানাপত্র নিয়ে সবাই মিলে দোতলায় উঠলাম। আমাদের সঙ্গে একগোছা চাবি দুলিয়ে চলেছেন মঙ্গোলীয় ধাঁচের শক্ত চেহারার ছ-নম্বর ব্লকের দারোয়ান। দোতলায় লম্বা করিডরের দুধারে সারসার ঘর। দরজায় ঘরের নম্বর লেখা ছোট্ট বোর্ড। দুশো এগারো নম্বর ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে দারোয়ান বাসুকে কী যেন বলে দরজা খুলে দিলেন। আমার হাতে একটা পেতলের চাবি ধরিয়ে দিয়ে বাসু বলল, আপাতত কয়েকদিন তুমি এই ঘরটাতে থাকবে। সুটকেশ, ব্যাগ নিয়ে ভেতরে ঢোকার পর সত্যিই মনে হল একটা হাসপাতালে এসে পড়েছি। ঠিক সেইরকম লোহার খাট। রোগী চলে যাওয়ার পর যেমন নোংরা পাতলা তোশকটা গোটানো থাকে, এখানেও সেরকম। বেশ বড়ো ফাঁকা ঘরটায় তিনটে খাট এই অবস্থায় পড়ে আছে। যে দরজা দিয়ে ঢুকলাম তার উলটোদিকের দেওয়ালে কাঁচবন্ধ বিরাট গ্রিলবিহীন জানলাটা বেআব্রু হয়ে পড়ে আছে। হাতের মালপত্র একটা খাটে রেখে জানলার দিকে এগিয়েছি, হঠাৎ সশব্দে দরজাটা বন্ধ হয়ে গেল। ওরা সবাই চলে গেল। ওদের জন্য তিনতলায় ঘর।

বিশাল ফাঁকা ঘরটায় আমি একা। একেবারে একা। জানলা দিয়ে বাইরেটা দেখলাম। হস্টেলের পেছনদিকে বাঁপাশে ঘন গাছের সারি। পাশ দিয়ে সরু রাস্তা। একটু দূরে নির্মীয়মাণ গুদামঘর জাতীয় একটা কিছু। দূরে আরো কয়েকটা হস্টেল পরপর দেখা যাচ্ছে। কেউ কোথাও নেই। মনে হল পৃথিবীটা এখানে এসে থেমে গেছে। দেওয়ালগুলো চারদিক থেকে যেন আমার দিকে ক্রমেই এগিয়ে আসছিল। মাথার উপর নেমে আসছিল ছাদটা। আমি দু-হাত ছড়িয়ে দু-দিকের দেওয়ালকে ঠেলে সরিয়ে দিতে চাইছিলাম। তখন আমার সামনের আর পেছনের দেওয়ালটা যেন এগিয়ে আসছিল। তাদের ঠেকাতে হাত বাড়াতেই পাশের দেওয়ালগুলো হা হা করে এগিয়ে এল যেন—আমি একবার এধার, একবার ওধার করে বেড়াচ্ছি—আমাদের পাম এভিনিউয়ের বাড়ি—ভাইয়ের বেড়ালগুলো—মা

বাবা-দিদির সঙ্গে গল্প—আমার বইয়ের আলমারির মাঝের তাকে রাখা পুতুলগুলো—আমার ছোট্ট ঘরের উষ্ণতা—সবকিছুর জন্য আমি ছটফট করছিলাম। হাত বাড়িয়ে ছুঁতে চাইছিলাম সবকিছু। চিৎকার করে মাকে ডাকতে ইচ্ছা করছিল।

ঘরের একপাশে, আলমারির পাশে দেওয়ালে ঝুলছিল সাদা রঙের ছোটো একটা স্পিকার। কোনো 'নব' নেই তাতে আর সেটা ছিল আমার নাগালের অনেক উপরে। অদ্ভুত একঘেয়েভাবে, আমার কাছে তখনও দুর্বোধ্য, রুশ ভাষায় ঘ্যানঘ্যান করছিল স্পিকারটা। সেই শব্দ কানে যেতেই মনে হচ্ছিল মাথার ভেতরে কেউ পেরেক পুঁতছে। সব মিলে দম বন্ধ করা একটা অসহ্য অবস্থা। খুব অস্থির লাগছিল।

একা একা থাকতে পারলাম না বেশিক্ষণ। সব জিনিসপত্র যেখানে যেমন ছিল সেই অবস্থাতেই ফেলে দরজায় চাবিটা কোনোরকমে ঘুরিয়ে ছুটে উঠে গেলাম তিনতলায়।

সেদিনই আরো দুটি মেয়ে আমার ঘরে এল, একজন দক্ষিণ আমেরিকার ভেনিজুয়েলার, অপরজন ওয়েস্ট ইন্ডিজের। সাতদিন তাদের সঙ্গে একই ঘরে কাটিয়ে দিলাম। এর মধ্যে ইউনিভার্সিটির বাসে চেপে সকলে মিলে কয়েকদিন গেলাম ইউনিভার্সিটির পলিক্লিনিকে। সেখানে নতুনদের পায়ের নখ থেকে মাথার চুল পর্যন্ত যাবতীয় অঙ্গপ্রত্যঙ্গ পরীক্ষানিরীক্ষা করে 'ফিট সার্টিফিকেট' দেওয়া হল।

'ফিট' হিসেবে স্বীকৃতি পাওয়ার পর আমার জায়গা হল নয় নম্বর ব্লকে, মেয়েদের হস্টেলে। এ কদিন 'গ্লাসনস্ত', 'পেরিস্ত্রোইকা' এসবের সঙ্গে আমার পরিচয় হয়নি।

সেপ্টেম্বরের সাত তারিখ থেকে ক্লাস করতে শুরু করলাম। ওদের শিক্ষাবর্ষ শুরু হয় সেপ্টেম্বর থেকে।

ক্লাসে গিয়ে আবার শুনলাম 'গ্লাসনস্ত', 'পেরিস্ত্রোইকা', 'স্তালিনিজম'।

নতুন দেশের নতুন ক্লাসে

"রাষ্ট্র তখনই শক্তিশালী, যখন তার নাগরিক রাষ্ট্রের যাবতীয় বিষয় সম্পর্কে অবহিত, যখন তারা প্রতিটি প্রশাসনিক পদক্ষেপ সম্পর্কে খোলাখুলি আলোচনা করতে পারে এবং তা বিচার করতে পারে, যখন তারা সব সিদ্ধান্ত সচেতনভাবে নেয়"—লেনিন রচনাবলি, খণ্ড ৩৫ পৃ. ২১।

আমাদের ইতিহাসের ক্লাসে শিক্ষক লেনিন রচনাবলি থেকে উপরের অংশটুকু পড়ে শোনালেন। আমাদের এক বছর প্রিপারেটরি কোর্স হিসেবে রুশ ভাষা শিখতে হবে। সবে ক্লাস শুরু হয়েছে। আমরা কেউ তখনও রুশ ভাষা জানি না বলে ইতিহাস পড়ানো হত ইংরেজিতে। প্রথম ছ-মাস আর কোনো বিষয় পড়তে হত না। ইতিহাস ক্লাসে শুধুমাত্র সোভিয়েত ইউনিয়নের ইতিহাস ছাড়া।

লেনিনকে উদ্ধৃত করে সেদিনের ক্লাস শুরু করলেন ইতিহাস শিক্ষক ভ্লাদিমির কাভালিয়োভ। এই উদ্ধৃতির পর তিনি বললেন, "তোমরা শুনেছ নিশ্চয়, তোমরা বিশ্বের ১১০টা দেশের ছেলেমেয়েরা এই ইউনিভার্সিটিতে পড়াশোনা করতে এসেছ। আমাদের দেশে এখন লেনিনের এই বাণীর সার্থক বাস্তবায়নের জন্য পেরিস্ত্রোইকা—এই নতুন নীতি গ্রহণ করা হয়েছে—"

আমি নড়েচড়ে বসলাম। একেবারে প্রথমদিনেই এই শব্দের ব্যাখ্যা শুনতে পাব এক রুশ শিক্ষকের কাছ থেকে, এতটা আশা করিনি। যতটা খারাপ লাগছিল আগের কয়েকটা দিন, ঠিক ততটাই যেন উত্তেজিত হয়ে শিরদাঁড়া সোজা করে বসলাম।

"পেরিস্ত্রোইকা সফলভাবে সম্পাদন করার অন্যতম প্রধান শর্ত গ্লাসনস্তের বাস্তবায়ন। গ্লাসনস্তের মাধ্যমে সোভিয়েত সমাজের নৈতিক উন্নয়ন, কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে সাধারণ সোভিয়েত নাগরিকের পারস্পরিক নৈকট্য গড়ে তোলা সম্ভব।"

এই পর্যন্ত বলে তিনি থামলেন। তারপর ইংরেজিতে বলতে শুরু করলেন, "আসলে এই দুই নীতি গ্রহণ করার প্রধান কারণ হল স্তালিনিজমকে সোভিয়েত সমাজ জীবন থেকে পুরোপুরি নির্মূল করা।"

সকাল নটায় আমাদের ক্লাস শুরু হয়েছিল। প্রথমদিন বলে ছাত্রছাত্রীর সঙ্গে পরিচিত হতে বেশ কিছুক্ষণ সময় চলে গিয়েছিল। আমাদের ক্লাসে ভারতীয় উপমহাদেশ, শ্রীলঙ্কা ও আফ্রিকার ইংরেজিভাষী দেশগুলির প্রায় ৬০ জন ছাত্রছাত্রী ছিল। সেদিন আর বিশেষ কিছু হল না। এক ঘণ্টা কুড়ি মিনিটের ক্লাস শেষ হল। যাওয়ার সময় ভ্লাদিমির বলে গেলেন, পরের দিন তিনি এর বিশদ ব্যাখ্যা দেবেন।

হস্টেলে আমার রুমমেট ছিল একটি জর্জিয়ান মেয়ে—এন্দি। স্তালিনের দেশের মেয়ে।

অপরজন হাথওাপয়ার এথি। আমি এন্দি এথি থাকতাম তেরোতলার একটা ঘরে।

আমাদের রুশ ভাষা শেখার ক্লাসও শুরু হল। আগেই বলেছি, বিশ্ববিদ্যালয় আর হস্টেল পাশাপাশি। ফলে বাইরের জগৎটা দেখতে রাস্তায় বেরোতে হত। পত্রপত্রিকার পাতায়, গল্পের বইয়ে, রঙিন পিকচার পোস্টকার্ডে কলকাতায় বসে যে মস্কোকে দেখতাম তাকে খুঁজতে এবার আমি রাস্তায় বেরলাম।

ইতিহাসের ক্লাসে 'স্তালিনিজম'-এর ব্যাখ্যা শুরু হল। আমি অবাক হচ্ছিলাম, সবে ক্লাস শুরু হয়েছে, বিদেশিদের কাছে এইসব ব্যাখ্যা দেওয়ার শিক্ষকদের এত আপ্রাণ, তড়িঘড়ি প্রচেষ্টা দেখে।

ভ্লাদিমির বলছিলেন, "স্তালিনের শাসনকালে তিনের দশকের মাঝামাঝি যে টোট্যালিটারিয়ান, ডেসপটিক অত্যাচারী শাসন পদ্ধতির প্রবর্তন হয়, তার প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল একধরনের পার্সোনালিটি কাল্ট-এর প্রচলন। এককথায় একেই স্তালিনিজম বলা যায়। অবশ্য ব্যাপক অর্থে স্তালিনিজম বলতে বোঝায়, তত্ত্বগত ও প্রয়োগগত ক্ষেত্রে এমন এক পরিবেশ গড়ে তোলা যা এক ধরনের 'ব্যারাক-লাইক সোস্যালিজম'-এর জন্ম দেয়। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে—" এখানে বলে রাখি ক্লাসের পড়ায় উপরের কথাগুলি ছিল বাধ্যতামূলক। কাজেই শিক্ষকের কথা হুবহু 'নোট' নিতে হয়েছিল—কারণ এভাবে না লিখলে পরীক্ষায় নম্বর কম পাওয়ার আশঙ্কা ছিল। সেই 'নোট'-ই আমি এখানে উদ্ধৃত করছি। পরীক্ষার উত্তরের জন্য তৈরি করা 'নোট' যে ব্যক্তিগত বিশ্বাস-অবিশ্বাসের, যাবতীয় প্রশ্নের বা ব্যাখ্যার বাইরের 'জিনিস' তা পৃথিবীর যে কোনো দেশে পড়াশোনা করতে গেলেই বোধহয় বোঝা যায়। 'গ্লাসনস্ত' 'পেরেস্ত্রোইকা', 'স্তালিনিজম'—এই তিনটি 'টার্ম'—আগেও বলেছি, বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লাস শুরুর দিন থেকেই শুনতে পেতাম। এ বিষয়ে আমারও আগ্রহ ছিল এবং বিষয়গুলি আমার পাঠক্রমেরও অন্তর্ভুক্ত ছিল। আমি ছিলাম আন্তর্জাতিক সাংবাদিকতা বিভাগের ছাত্রী। পাঠ্য বিষয়ের জন্য এই 'টার্ম'গুলি খুব জরুরি, তা বলাই বাহুল্য। এখানে এত কথা বলার দরকার হল এই কারণে যে, একটা বিষয় সম্পর্কে আমি পরিষ্কার থাকতে চাই—মার্কসবাদ, লেনিনবাদ, স্তালিনবাদ, গ্লাসনস্ত, পেরিস্ত্রোইকা, পূর্ব ইওরোপ তথা সোভিয়েত দেশে সমাজতন্ত্রে ভাঙন ইত্যাদি বিষয়ে কোনো ব্যাখ্যা দিতে বসিনি। গবেষক, বিশেষজ্ঞ বা সমাজতাত্ত্বিক নই আমি। সাংবাদিকতা বিভাগের একজন ছাত্রী হিসেবে এবং সাংবাদিকের স্বাভাবিক কৌতূহলী প্রবৃত্তির বশে ও সোভিয়েত ইউনিয়নের ইতিহাসে সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ পর্ব—১৯৮৭-৯৩ পর্যন্ত আমি খোদ মস্কোতে থাকার সুবাদে অনেক ঐতিহাসিক মুহূর্তের সাক্ষী থেকেছি, অনেক ঘটনা প্রত্যক্ষ করেছি। বিশ্ববিদ্যালয়ে, হোটেলে, হস্টেলে, রাস্তাঘাট, দোকান-বাজার, বাস-ট্রাম, মেট্রো-সিনেমা, ট্যাক্সিতে সেইসব ঐতিহাসিক মুহূর্ত সাধারণ সোভিয়েত নাগরিকের মনে কী প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছিল—সে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছি। কাজেই আমার এই মস্কো উপাখ্যান গোটাটাই সেসব জানাশোনার প্রত্যক্ষ বিবরণ এবং বলা বাহুল্য, তা খুবই সাব্‌জেক্টিভ। আবারও বলছি, এখানে ব্যাখ্যার কোনো জায়গা নেই। সম্পূর্ণ ফাঁকা মনে আমি যে অভিজ্ঞতা আহরণ করেছি, তা কোনো রাজনৈতিক মতাদর্শে জারিত না করেই লিপিবদ্ধ করলাম।

"অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে স্তালিনিজমের অর্থ হল—" ভ্লাদিমির বলছিলেন, "সাধারণের জীবনযাত্রার মান অতি নিম্নস্তরের, কৃষিক্ষেত্রকে বঞ্চিত করে উৎপাদন শক্তির ব্যাপক বিকাশের জন্য জোর ফলানো, ব্যক্তিগত সম্পত্তির জাতীয়করণ, হাইয়ারার্কিকাল অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ কম্যান্ডিং স্ট্রাকচার, এর ফলে এমন বিশেষ ধরনের উৎপাদন সম্পর্কের জন্ম হয় যখন রাষ্ট্রীয় সম্পত্তির মালিকানা চলে যায় আমলাতন্ত্রের হাতে। অর্থনীতির তুলনায় রাজনীতি এবং বিচার বিভাগীয় বিষয়কে অধিক গুরুত্ব প্রদান করে আমলাদের উপরেই আর্থিক বিকাশের নিয়মনীতি নির্ধারণের দায়িত্ব ছেড়ে দেওয়া হয়। এরপর আসে সমাজজীবনে স্তালিনিজমের বিষয়টি—" এই পর্যন্ত বলে ভ্লাদিমির থামলেন। মস্কোয় আসার আগে গোর্কি সদনের সেই লাইব্রেরিয়ানের কাছে স্তালিনের লেখা কোনো বই পাওয়া যাবে কিনা জানতে চাওয়াতে তিনি যতটা আঁতকে উঠেছিলেন, স্তালিন প্রসঙ্গো বলতে বলতে ভ্লাদিমিরের দৃষ্টিতে আমি ঠিক ততটাই ঘৃণা দেখলাম।

কিছুক্ষণ জানলার বাইরে তাকিয়ে থেকে আমাদের ইতিহাসের শিক্ষক আবার স্তালিন প্রসঙ্গো ফিরে এলেন। "সমাজজীবনে স্তালিনিজমের বিষয়টি যেভাবে প্রকট, তা হল—সমাজে বিশেষ এক সুবিধাভোগী গোষ্ঠীর জন্ম, যাদের হাতে সমস্ত অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত, শ্রমিক শ্রেণিকে ক্ষমতা বা সমাজজীবন নিয়ন্ত্রণ থেকে দূরে সরিয়ে কোণঠাসা করে ফেলা, গায়ের জোরে, বলা ভালো, কৃষকদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে যৌথ খামার প্রথা চাপিয়ে দেওয়া, গ্রামীণ অর্থনীতির মূল ভিত্তি কৃষিব্যবস্থাকেই ধ্বংস করে কেবলমাত্র দ্রুতগতিতে শিল্পায়নের বিস্তারের উপর জোর দেওয়া। সামগ্রিকভাবে এই অবিবেচক, বর্বর নীতি গোটা সোভিয়েত সমাজকে একেবারেই সমাজতন্ত্রের প্রকৃত সুফলগুলি দেয়নি।

এরই পাশাপশি বুদ্ধিজীবী শ্রেণির প্রতি বিরূপ মনোভাব স্তালিনিজমের আর একটি বৈশিষ্ট্য। উৎপাদন প্রক্রিয়ায় প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহণ না করার 'অপরাধে' এবং নৈরাজ্যবাদের প্রতি পক্ষপাতমূলক দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করার জন্য, ভাবাদর্শ ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে শত্রুদের সঙ্গো বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রাখার কারণেই এই বুদ্ধিজীবী শ্রেণি প্রশাসনের বিশেষ বিরাগভাজন ছিল। বলা হত, বুদ্ধিজীবীদের চিত্ত যথেষ্ট দৃঢ় না হওয়ার কারণেই এরা ভাবাদর্শগত ক্ষেত্রে শত্রুদের সঙ্গো প্রত্যক্ষ শত্রুতায় না জড়িয়ে বন্ধুত্বপূর্ণ একটা সম্পর্ক বজায় রাখছে।

শ্রমজীবী শ্রেণিকে সম্পত্তির মালিকানা থেকে বঞ্চিত করে ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দু থেকে দূরে সরিয়ে দেওয়ার ফলে এরা সমাজের নিচুতলার সদস্যে পরিণত হয় এবং উঁচুতলা থেকে অহরহ নিয়ন্ত্রিত হতে থাকে। এ সবই স্তালিনিজমের কুফল।

সমস্ত রাজনৈতিক ক্ষমতা অল্পসংখ্যক লোক অন্যায়ভাবে নিজেদের হস্তগত করে। কমিউনিস্ট পার্টি, রাষ্ট্র ও সমতুল্য সর্বত্র আমলাতন্ত্রের আবির্ভাব ঘটিয়ে রাষ্ট্রকে একটি 'পূজনীয় বস্তু'তে পরিণত করার চেষ্টা করেন স্তালিন। এজন্য প্রয়োজনে দৈহিক শক্তি প্রয়োগ করে, অকথ্য অত্যাচার চালিয়ে সমাজজীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে রাজনৈতিক প্রতিপত্তি বিস্তার করে জনসাধারণের মানবিক গুণাবলি বা ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্যগুলি ক্ষুণ্ণ করতে সক্ষম হয়েছিলেন স্তালিন। স্তালিনিজমের সবথেকে মারাত্মক এবং করুণ দিকটি হল গণহত্যা ও

গণসন্ত্রাস। যার শিকার হন হাজার হাজার কমিউনিস্ট এবং অ-কমিউনিস্ট।

এবার আমি এই সন্ত্রাসের একটি ভয়ংকর ছবি তোমাদের সামনে তুলে ধরছি।"

এরপরই সেদিন ক্লাসে ঘণ্টা পড়ে যায়। ফলে সেই ছবি শিক্ষকের বর্ণনায় সেদিন আর দেখা হয়নি। আমি হস্টেলে ফিরে এসে আমার জর্জিয়ান রুমমেট এন্দিকে বলি স্তালিনিজম সংক্রান্ত ভ্লাদিমিরের বিশাল লেকচারের কথা। একজন বিদেশির মুখে এসব কথা শুনতে শুনতে এন্দির হাসিখুশি মুখটা ধীরে ধীরে কেমন পালটে গেল দেখলাম। দেখলাম ওর চোয়াল শক্ত হয়ে উঠছে। চোখগুলো কেমন লাল লাল। তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়ায় হিস্‌হিস্ করে ও বলে উঠল, "রুশি জাতটাই নেমকহারাম!"

উত্তেজনায় গলা কাঁপছিল এন্দির। একটু দম নিয়ে বলল, "যাঁর শাসনকালে সোভিয়েত ইউনিয়ন উন্নতির শীর্ষবিন্দুটি ছুঁতে সক্ষম হয়েছিল, তাঁর প্রতি এতটুকু কৃতজ্ঞতাবোধ নেই এই মানুষগলোর! বিশ্বযুদ্ধের সেই ভয়াবহ দিনগুলিতে স্তালিন আমাদের মাথার উপর না থাকলে শুধু সোভিয়েত ইউনিয়নের নয়, গোটা ইউরোপের কী দশা হত চিন্তা করতে পারিস? আর যুদ্ধ শেষ হওয়ার পরের সেই দুঃস্বপ্নের মতো দিনগুলো?—" এতক্ষণ যেন একটা ঘোরের মধ্যে, নিজের মনেই কথা বলে যাচ্ছিল, 'কম্‌সামোল্'-এর (ইয়ং কমিউনিস্ট) সদস্য, সদ্য স্কুলপাশ ১৭ বছর বয়সী আমার জর্জিয়ান রুমমেট।

সেই সন্ধ্যাটার কথা আজও স্পষ্ট মনে আছে। অক্টোবরের কয়েকটা দিন সবে কেটেছে—এরই মধ্যে আসন্ন বরফ-জমানো লম্বা শীতকালের আগমনী বার্তা বয়ে নিয়ে আসছে হিমেল হাওয়া। হস্টেলের পেছনদিকের জঙ্গলের গাছের সারিগুলির সব পাতা ঝরে গিয়ে কেমন যেন অনাথ, নিঃস্ব একটা ছবি ফুটে উঠেছে। সাইবেরিয়ার ধু-ধু প্রান্তরকে কুপোকাত করে শীত যতই 'মস্কো জয়ের' জন্য এগিয়ে আসছে, সূয্যিমামাও ততই অলস হয়ে পড়ছেন। সকাল ছটা-সাড়ে ছটায় আড়মোড়া ভেঙে কোনোরকমে মুখটা দেখান তিনি। তারপর বেজারমুখে আট-নঘণ্টার ডিউটি সেরে সাড়ে তিনটে-চারটে বাজতে না বাজতেই তিনি ডুব দেন।

ককেশাস পর্বতশ্রেণির কোলে ছবির মতো ছোট্ট শহর ৎবিলিসি, জর্জিয়ার রাজধানী। সেখানেই এন্দির বাড়ি। কৃষ্ণসাগরের উষ্ণ ছোঁয়ায় শীত সেখানে মস্কোর মতো দাপটে রাজত্ব করতে পারে না। আমরা দুই গরম দেশের মেয়ে, শীতকাতুরে দু-জন ইউনিভার্সিটির ক্লাস শেষে অন্য কোথাও না গিয়ে বেশিরভাগ দিনই সোজা চলে আসতাম তাই হস্টেলের এই 'সেন্ট্রালি হিটেড' আরামদায়ক ঘরটাতে।

এন্দি আর আমার একঘরে থাকা প্রায় মাসখানেক হতে চলল। তবে সেই সন্ধ্যার আগে কোনোদিন এন্দির সঙ্গে এতক্ষণ কথা বলা হয়ে ওঠেনি। এর আগে প্রায় রোজই দেখতাম টেবিলে ঘাড় গুঁজে একমনে পড়াশোনা করে চলেছে ও। আমরা বিদেশি ছাত্রছাত্রীরা প্রিপারেটারি কোর্সে এক বছর ধরে যখন রুশ ভাষা শিখব, সোভিয়েত ছাত্রছাত্রীরা সেই সময়টাতে কোনো বিদেশি ভাষা শিখবে। ইউনিভার্সিটির মোট ছাত্রছাত্রীর এক তৃতীয়াংশ সোভিয়েত। সকলের জন্যই এই ব্যবস্থা। এন্দি শিখছে ফরাসি ভাষা। আমার মতো এন্দিও আন্তর্জাতিক সাংবাদিকতা বিভাগের ছাত্রী। সামনের বছর থেকে

আমরা একই সঙ্গে ক্লাস করব। এখনও রুশ ভাষা ভালো না জানার জন্য আমরা বিদেশিরা ইংরেজি, স্প্যানিশ, আরবি (যে দেশের ছেলেমেয়েরা যে ভাষাটা জানে) ভাষায় ইতিহাস পড়ছি। এ ব্যবস্থা ছ-মাসের জন্য। তারপর রুশ ভাষা মোটামুটি আয়ত্ত হয়ে গেলে সকলে একসঙ্গে ক্লাস করব। তখন শিক্ষক লেকচার দেবেন রুশ ভাষাতেই। এন্দিরা এখন ইতিহাস ক্লাস করে রুশ ভাষাতে। ওদের পড়ান অন্য শিক্ষক, ভ্লাদিমির নন। তাই, আমরা বিদেশিরা ইতিহাস ক্লাসে কী শিখছি, তা জানার আগ্রহ এন্দিরও যথেষ্ট ছিল।

প্রাথমিক উত্তেজনা কাটিয়ে উঠলেও তখনও পুরোপুরি শান্ত হতে পারেনি এন্দি। একমাথা কালো কুচকুচে অবাধ্য চুলগুলোকে আঙুল চালিয়ে কপালের উপর থেকে সরাতে সরাতে এন্দি আমাকে জিজ্ঞাসা করল, "দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ও তার পরবর্তী সময়টাকে কেন্দ্র করে যে অসংখ্য মুভি আমাদের দেশে তৈরি হয়েছে, তা কি তোদের ওখানে দেখানো হয়? তুই কি কিছু দেখেছিস?" আমি হ্যাঁ বলে ঘাড় দোলাতেই দ্বিগুণ উৎসাহে আবার বলতে শুরু করল এন্দি, "তাহলে তো তোর অজানা নয় বিষয়টা, ফ্যাসিস্তরা আমাদের দেশটার কতটা সর্বনাশ করেছিল! দেশকে শত্রুদের হাত থেকে বাঁচাতে হাজার হাজার সুস্থ-সবল-জোয়ান পুরুষ নির্দ্বিধায় প্রাণ দিয়েছে। যুদ্ধক্ষেত্রে হারিয়ে গিয়েছে পুরো একটা তাজা প্রজন্ম। আর কত শত লোক পঙ্গু হয়ে ফিরেছিল বল তো লড়াই শেষে? সেই ভয়াবহ দিনগুলিতে স্তালিন যদি শক্ত হাতে হাল না ধরতেন, তাহলে আজ এখানে বসে তোর সঙ্গে আমার কথা বলা সম্ভব হত কি? এখন তো বলতেই হবে স্তালিনই সোভিয়েত নাগরিকের মধ্যে দেশপ্রেম ব্যাপারটা জাগিয়ে তুলেছিলেন।"

এভাবে চলতে লাগল নতুন জায়গায় আমার নতুন সব বিষয় জানার পালা। ভ্লাদিমিরের চোখে স্তালিন একজন 'কুখ্যাত, জঘন্য অপরাধী'। এন্দির চোখে সেই তিনিই এক মহান দেশনেতা, জর্জিয়া তথা সোভিয়েত ইউনিয়নের কৃতী সন্তান।

আগের ক্লাসে সময়াভাবে ভ্লাদিমির যে ছবি ('স্তালিনীয় সন্ত্রাসের') আমাদের সামনে তুলে ধরতে পারেননি, তার বর্ণনা শুরু করেই পরদিনের ক্লাসের সূচনা হল। ভ্লাদিমির লেকচার শুরু করলেন। বেশ নাটকীয়ভাবে এবং একটা রহস্যঘন বাতাবরণ তৈরি করে—"তখন মাঝরাত। বিকট আওয়াজ করে ব্রেক কষে দাঁড়াল একটা জিপ, কোনো এক বাড়ির সামনে। পাঁচ-ছ জোড়া ভারী বুটের আওয়াজ জিপ থেকে সেই বাড়ির দরজার দিকে এগোল। দরজার উপর অস্থির আঘাত। ঘুম ভেঙে অবাক গৃহকর্তা দরজা খুলে কিছু প্রশ্ন করার আগেই মোটা ওভারকোট আর কালো টুপিতে ঢাকা ওই ভারী বুটের মালিকরা গমগমে গলায় গৃহকর্তাকে বললেন, "আপনাকে এক্ষুণি একবার আমাদের সঙ্গে যেতে হবে। না, না, পোশাক পালটানোর কোনো দরকার নেই। সামান্য কিছু কথা আছে। যেভাবে আছেন সেভাবেই চলুন। গৃহকর্তা সাদাসিধে রাতপোশাকেই চললেন এবং চিরকালের মতো নিখোঁজ হয়ে গেলেন। আকুল হয়ে স্ত্রী আর ছেলেমেয়ে কিছু বলার চেষ্টা করেও ঢোক গিলে থেমে গেলেন। জলভরা চোখে প্রিয়জনকে শেষবারের মতো একবার দেখে নিলেন। ভয়ার্ত প্রতিবেশীরা 'সেই গুপ্ত তালিকার' পরবর্তী নামগুলির অনুমানে

বিনিদ্র রাত কাটাতে লাগলেন। এইভাবে 'কিছু কথা আছে' এই ছুতোয় মাঝরাতে বাড়ি থেকে তুলে নিয়ে গিয়ে হাজার হাজার সোভিয়েত নাগরিককে একেবারে বেহদিশ করে দিয়েছেন স্তালিন ও তাঁর সাঙ্গোপাঙ্গারা।"

ক্লাস শুরু হওয়ার পর থেকে আমাদের ইতিহাস ক্লাসে এখনও পর্যন্ত স্তালিন-পর্বই চলছে। অবশ্য শুরু হয়েছিল 'গ্লাসনস্ত', 'পেরিস্ত্রোইকা'-র প্রেক্ষাপট হিসেবেই স্তালিন প্রসঙ্গ।

'ভয়ংকর রোমহর্ষক' মধ্যরাত্রের কাহিনি বলার পর ভ্লাদিমির ভাবাদর্শগত ক্ষেত্রে স্তালিনিজম কী, তা ব্যাখ্যা করা শুরু করলেন—"ব্যাপক অবমাননা ও মিথ্যাচার চলল মার্কসীয় ও লেনিনীয়-দর্শনের নাম। সমাজতান্ত্রিক ও প্রকৃত মার্কসীয় এবং লেনিনীয় নীতি ও আদর্শ থেকে দূরে সরে গিয়ে জনসাধারণকে ক্রমশ বিভ্রান্তির পথে ঠেলে দেওয়া হল। ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধির জন্য, নিজেকে 'মর্ত্যের ভগবান' বানিয়ে শ্রমজীবী সাধারণ মানুষ এবং সমাজতন্ত্রের স্বার্থকে পুরোপুরি অস্বীকার করলেন স্তালিন। সেন্সরের প্রচণ্ড কড়াকড়ির মাধ্যমে সাংস্কৃতিক জীবনের সর্বত্র বৈচিত্রহীন, একমুখী, ইতিহাসকে পরিবর্তন করে পছন্দমতো রচনা, প্রোপাগান্ডার ধরাবাঁধা বুলির সাহায্যে সত্যকে আড়াল করা—এক কথায় সমাজজীবনের সর্বত্র নিজের একটা 'নীতি' চাপিয়ে জনগণের রাজনৈতিক চেতনার অবলুপ্তি ঘটিয়ে একটা ডগমাটিজম-এর জন্ম দিলেন স্তালিন।

স্তালিনিজমের ফলে সমাজ তার মানবিক বৈশিষ্ট্য হারিয়ে ফেলল। সোভিয়েত নাগরিক তাদের গণতান্ত্রিক অধিকার ও স্বাধীনতা থেকে বঞ্চিত হলেন। ১৯৫৩ সালে স্তালিনের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই যে আপনা আপনিই স্তালিনিজমের যুগ শেষ হল, এমনটি ভাবা নিতান্তই ভুল। স্তালিন রাজনৈতিক বা সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে নানা ধরনের সন্ত্রাস এবং অত্যাচার চালিয়ে, নিজেকে 'মর্ত্যের ভগবান' বানিয়ে, তাঁর সব হুকুম জনগণকে মুখ বুজে মেনে চলতে বাধ্য করে যে ধ্বংসাত্মক 'জীবাণু'গুলি সোভিয়েত সমাজব্যবস্থায় ছড়িয়ে দিয়ে গেছেন, তা থেকে সমাজকে মুক্ত করতে হলে দরকার একটা জোরদার, সক্রিয় এবং সচেষ্ট প্রয়াস।"

আমাদের ইতিহাসের শিক্ষক ভ্লাদিমির কাভালিয়োভ নিছকই একজন সাদামাটা অধ্যাপক ছিলেন না। সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত ইউনিয়নের (তখনও পর্যন্ত) রাজনৈতিক ইতিহাস লিপিবদ্ধ করার দায়িত্বপ্রাপ্ত সংস্থা 'পলিত্‌ইজদাত্‌'-এর তালিকাভুক্ত শতাধিক গবেষকের একজন। এই সংস্থার গবেষণাপত্রগুলি প্রকাশিত হত স্কুল এবং ইউনিভার্সিটির পাঠ্যপুস্তক হিসেবেও। 'পলিত্‌ইজদাত্‌' প্রকাশিত দু-তিনটি বই আমাদেরও পাঠ্যপুস্তক হিসেবে চালু ছিল।

এহেন গুরুত্বপূর্ণ অধ্যাপক ভ্লাদিমির গ্লাসনস্ত এবং পেরিস্ত্রোইকার প্রেক্ষাপট হিসেবে স্তালিনিজমের স্বরূপ উন্মোচন করে আর যা যা বলেছিলেন, তা হল—"স্তালিনিজমের মূল বৈশিষ্ট্যগুলি হল অথরিটারিয়ান ও অগণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার প্রবর্তন এবং এমন একটি অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ-কম্যান্ডিং সিস্টেম গড়ে তোলা যা সমাজজীবনকে পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণ করে। একদিকে সমস্ত ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হয় আমলাতন্ত্রের হাতে এবং অন্যদিকে

ব্যক্তিসাধারণকে সম্পত্তির মালিকানা, ক্ষমতা ও শাসনাধিকার থেকে বঞ্চিত করা হয়। স্তালিনিজমের উপরোক্ত এই বৈশিষ্ট্যগুলি স্তালিনের মৃত্যুর পর পরই সোভিয়েত সমাজ থেকে অপসৃত হল না। তাছাড়া ১৯১৭ সালের মহান অক্টোবর বিপ্লব সাধারণ সোভিয়েত নাগরিকের মধ্যে যে স্বপ্নের নেশা ছড়িয়েছিল, তাদের উৎসাহ ও উদ্যমে যেভাবে ভরপুর করে তুলেছিল, তা কেমন হারিয়ে গেল। শাসনব্যবস্থার নানা গুরুত্বপূর্ণ পদে আসীন দায়িত্বশীল কর্মীদের রক্ষণশীল মনোভাব জনগণের সঙ্গে রাজনীতির দূরত্ব আরো বাড়িয়ে দিল। শ্রমজীবী মানুষের কাজের মান হল ক্রমেই নিম্নগামী। দুর্নীতির বিষ সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ল। শাসনব্যবস্থার সবথেকে উঁচুতলার নেতারাও এই দুর্নীতি ও নৈতিক অবনতির শিকার হলেন।

আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার বিকাশ যে পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছাল, সোভিয়েত ইউনিয়ন তার তুলনায় অনেক পিছিয়ে পড়ল। এর প্রত্যক্ষ ছাপ পড়ল দেশের অর্থনীতির উপর। জাতীয় অর্থনীতির এই বেহাল দশার ফলে সাধারণের জীবনযাত্রার মান হল অত্যন্ত নিচু।

স্তালিনিজমের এহেন দাপটের ফলে সোভিয়েত সমাজব্যবস্থার সর্বত্র যে ক্রাইসিস জন্ম নিল, আটের দশকের মাঝামাঝি তা চূড়ান্ত রূপধারণ করল—সোভিয়েত জনগণ ও কমিউনিস্ট পার্টি যেন এক অতল অন্ধকারে হারিয়ে যেতে বসল। সমাজকে এই ভয়াবহ পরিণতির হাত থেকে বাঁচিয়ে আধুনিক যুগের উপযোগী উন্নত এক সমাজব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য 'পেরিস্ত্রোইকা'-র নীতি গৃহীত হল। নিঃসন্দেহে এটি একটি ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত। এবং এ-ও বলা যায় যে, ১৯১৭ সালের মহান বিপ্লবের সঙ্গে তুলনাযোগ্য একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ এটি। অনেকে এমনকী 'পেরিস্ত্রোইকা'-কে সমাজতান্ত্রিক ধাঁচের দ্বিতীয় বিপ্লব বলে অভিহিত করেছেন। (বলাই বাহুল্য, প্রথম বিপ্লব বলতে ১৭ সালের অক্টোবর বিপ্লবের কথা বলা হচ্ছে।)"

কী কারণে সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টি 'পেরিস্ত্রোইকা'-র নীতি গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছে, তা ব্যাখ্যা করে একটু দম নিলেন ভ্লাদিমির। আমাদের সহপাঠী নাইজিরিয়ার সামসুন হঠাৎ প্রশ্ন করল ভ্লাদিমিরকে, "কিন্তু স্তালিনিজমের আবির্ভাবের কারণ কী?" ভ্লাদিমির বললেন, "খুব ভলো প্রশ্ন। আশাই করেছিলাম যে, তোমাদের কেউ এই প্রশ্ন তুলবে। আমি এখন সেই প্রসঙ্গেই আসছি।

বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে রাশিয়াতে স্তালিনিজম আবির্ভূত হওয়ার অনুকূল শর্তগুলি পাকাপোক্তভাবে তাদের শেকড় ছড়িয়ে দেওয়াতে মার্কস ও এঙ্গেলসের দর্শন বাস্তবায়িত হওয়ার পথে চূড়ান্ত বাধা পায়। মার্কসীয় দর্শনের অন্যতম মূল ভিত্তি—ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে একেবারে গোড়া থেকে বিনষ্ট করার নীতিটি অনুসৃত হয়নি। লেনিনকে উদ্ধৃত করে বলা যায় 'অনগ্রসর, প্রায় অসভ্য, লজ্জাজনকভাবে পিছিয়ে পড়া মধ্যযুগীয় একটি এশীয় রাষ্ট্রে পৃথিবীর ইতিহাসে প্রথম সমাজতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হল। কিন্তু এই শাসনব্যবস্থাকে সফল ও দৃষ্টান্তমূলক করে গড়ে তোলার জন্য দরকার ছিল কঠোর শৃঙ্খলাপরায়ণতা ও সুবিন্যস্ত কেন্দ্রীভূত রাজনৈতিক কাঠামো। বাস্তবে, রাশিয়ার গণতান্ত্রিক

ঐতিহ্যকে হটিয়ে জন্ম নিল অথরিটারিয়ানিজম। কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যের একটা বড়ো অংশ আদর্শহীন ও দুর্নীতিগ্রস্ত হয়ে পড়ল। সোভিয়েত জনগণ ও কমিউনিস্টদের একাংশ র‍্যাডিক্যাল বামপন্থা ও ইউটোপীয় সমাজতন্ত্র দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত হল। ঠিক এই পরিস্থিতিতে রাজনৈতিক মঞ্চে স্তালিনের মতো ব্যক্তিত্বের আবির্ভাব সোভিয়েত সমাজের দুদর্শাকে জটিলতম রূপ দিল।

উপরে উল্লিখিত রাশিয়ার নিজস্ব বৈশিষ্ট্যগুলি (যা একান্তভাবেই রুশদেশজ) জন্ম দিল স্তালিনের। স্তালিনিজম কিন্তু শুধু সোভিয়েত ইউনিয়নেই সীমাবদ্ধ রইল না। ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতা আমাদের এই সত্যের প্রমাণ দেয়। নানারূপে, নানাভাবে স্তালিনিজম ছড়িয়ে পড়ল সোভিয়েত ইউনিয়নসহ সমাজতান্ত্রিক মনোভাবাপন্ন বিভিন্ন রাষ্ট্রে, যেখানে আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক জীবন নিয়ন্ত্রিত হতে শুরু করল এই 'ইজম্' দ্বারা।

সি পি এস ইউ-য়ের ঐতিহাসিক ২০তম পার্টি অধিবেশন স্তালিনিজমের বিরুদ্ধে প্রথম আঘাতটি হানল। যদিও ছয় ও সাতের দশকে স্তালিনিজম-বিরোধী প্রক্রিয়াটির গতি ছিল ধীর, বিক্ষিপ্ত ও দুর্বল। আটের দশকের মাঝামাঝি সোভিয়েত সমাজ পেরিস্ত্রোইকার নীতি গ্রহণের মাধ্যমে প্রথম দৃঢ়তার সঙ্গে স্তালিনিজমকে পুরোপুরি বাতিল ঘোষণা করল।"

স্তালিনিজম প্রসঙ্গে বিস্তারিত 'লেকচার'-এর ইতি টানতে গিয়ে ভ্লাদিমির বললেন—"বৈপ্লবিক সিদ্ধান্তের মাধ্যমে সমাজকে পুনর্নির্মাণের শপথ একটা কথাই প্রমাণ করে—স্তালিন প্রবর্তিত সমাজতন্ত্রের কাঠামো গ্রহণ করতে সোভিয়েত জনগণ নারাজ। ভবিষ্যতের জন্য তাঁরা বেছে নিয়েছেন গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্র যা মানবিক সমাজের জন্ম দেবে এবং যেখানে প্রত্যেকটা মানুষের ব্যক্তিত্ব স্বাধীন ও এককভাবে বিকাশলাভ করবে। এইরকম সমাজ গড়ে তুলতে সার্থকভাবেই গ্লাসনস্ত এবং পেরিস্ত্রোইকার নীতি গৃহীত হয়েছে। এ পথেই আমরা স্তালিনিজমকে সম্পূর্ণ নির্মূল করতে পারব।"

ভ্লাদিমির জানালেন, পরবর্তী ক্লাসে তিনি এই পরিপ্রেক্ষিতে গ্লাসনস্ত ও পেরিস্ত্রোইকা নিয়ে আলোচনা করবেন।

সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির উপরতলার একজন সদস্য এবং একজন রুশি ভ্লাদিমিরের এই স্তালিন-ব্যাখ্যা খাতায় নোট করে আমি হস্টেলে ফিরে আসতাম সোভিয়েত ইউনিয়নের ইয়ং কমিউনিস্ট সংগঠনের সদস্য এবং একজন জর্জিয়ান, আমার রুমমেট এন্দির কাছে।

কলকাতা থেকে যখন মস্কো গেলাম, তখন আমার ধারণা ছিল না, স্তালিন সম্পর্কে খোদ সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্টরা এইরকম জঘন্য ধারণা পোষণ করেন। প্রতিদিন ক্লাসে শিক্ষকের লেকচার নোট নিতে নিতে, তাঁর কথা শুনতে শুনতে আমি এবং আমার মধ্যের আমি-টার সঙ্গে যে দ্বন্দ্ব চলত, তা প্রত্যক্ষ করতাম ভ্লাদিমির আর এন্দির পরস্পরবিরোধী বক্তব্যের দ্বন্দ্বে।

স্তালিন-পর্বের আলোচনায় ভ্লাদিমিরের পুরো 'লেকচার'টা প্রতিদিনই আমার কাছ থেকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে শুনত এন্দি। শেষদিনের 'লেকচার'-এ ভ্লাদিমির স্তালিনকে সাব্যস্ত করলেন 'জঘন্য গণহত্যার নায়ক' হিসেবে। এইদিন এন্দিকে দেখলাম একেবারে অন্য

চেহারায়। এতদিনে দুজনে একঘরে আছি, ওকে আগে এভাবে রেগে যেতে দেখিনি। প্রায় চিৎকার করেই বলে উঠল, "রুশিরা কী মনে করেছে? সোভিয়েত ইউনিয়নের বাকি প্রজাতন্ত্রগুলো কি মস্কোর কলোনি? শুধু স্তালিনকেই নয়, জর্জিয়ার কাউকেই ওরা সহ্য করতে পারে না। আসলে জর্জিয়ানরা রুশিদের তুলনায় আর্থিকভাবে বেশি সচ্ছল—এটাই ওদের হিংসের আসল কারণ। ওরা মনে করে, রাশিয়াই সোভিয়েত ইউনিয়ন। অন্য প্রজাতন্ত্রগুলির কোনো অস্তিত্বও নেই, প্রয়োজনও নেই। ওরাই একমাত্র বুদ্ধিমান, বাকিরা যেন সব মূর্খ! আমাদের জর্জিয়ানদের নিয়ে নানা ধরনের জোকস্ তৈরি করেছে ওরা। বাসে, ট্রামে, মেট্রোতে, পথেঘাটে ওরা আমাদের অপমান করে। একদিনের কথা বলি শোন। মায়ের সঙ্গে বাসে চেপে যাচ্ছিলাম, মস্কোর মধ্যেই। জর্জিয়ান ভাষাতেই মা-র সঙ্গে কথা বলছিলাম। হঠাৎ এক রুশি বুড়ি আমাদের উদ্দেশে চেঁচিয়ে উঠল, 'এরাই আমাদের সব সর্বনাশের মূলে। এদের দেশেরই (জর্জিয়া) এক মুচির ছেলে (স্তালিন) গোটা দেশটাকে নিয়ে কী খেলাটাই না খেলেছে। এদের সবকটাকে মস্কো থেকে তাড়াতে পারলেই আপনাআপনি আমাদের অর্ধেক সমস্যা কমে যাবে।' বুড়ির এই হঠাৎ আক্রমণে লজ্জায়, দুঃখে দিশেহারা মা আর আমি গন্তব্যে পৌঁছনোর অনেক আগেই, মাঝরাস্তাতেই নেমে পড়লাম। কোন অপরাধে রাস্তাঘাটে আমরা এভাবে অপমানিত হব, বলতে পারিস?"

স্বাভাবিকভাবেই সেদিন এ প্রশ্নের কোনো উত্তর আমি এন্দিকে দিতে পারিনি। ওর সঙ্গে কথা বলতে বলতে জানলাম, ওর এই বিশ্বাসের ভিত্তি তৈরি হয়েছে পারিবারিক সূত্রে।

এন্দির মা সাংবাদিক, বাবা এঞ্জিনিয়ার। গল্প করতে করতে এন্দি বলত, "মা বলেন, আর যাকেই বিয়ে করিস, কোনো রুশিকে বিয়ে করবি না।" জিজ্ঞেস করতাম, রুশিরা স্তালিনকে গালাগালি করে বলেই কি তোরা ওদের সহ্য করতে পারিস না? ও উত্তেজিত হয়ে বলত, "না, না, শুধু সেজন্য নয়। রুশিদের 'দাদাগিরি' আমরা জর্জিয়ানরা বরদাস্ত করতে পারি না। ওরা এমন একটা ভান করে যেন বিপ্লবটা করেছিল শুধু মস্কোর লোকেরাই। এ আমাদের আর সহ্য হয় না।"

এন্দির সঙ্গে কথা বলতে বলতে মাঝেমাঝে আমি যেন একটা ভাঙনের শব্দ শুনতে পেতাম। আমার ভয় হত। মনে মনে বলতাম, আমি যেন আস্ত সোভিয়েত ইউনিয়নটা রেখেই দেশে ফিরতে পারি।

পেরিস্ত্রোইকা, গ্লাসনস্ত

আগেই লিখেছি, বিশ্ববিদ্যালয়ে ক্লাস শুরুর সঙ্গে সঙ্গেই তখনও-নতুন এই শব্দ দুটি শুনতে পেতাম। সঙ্গে শুনতাম 'স্তালিনিজম' শব্দটাও। ভ্লাদিমির স্তালিনিজমের ব্যাখ্যা শেষ করে এবার পড়লেন 'পেরিস্ত্রোইকা' আর 'গ্লাসনস্ত' নিয়ে।

বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরের বাইরেও, পথে-ঘাটে, দোকান-বাজারে, মেট্রোতে ও অন্যত্র এই দুটি শব্দ নিয়ে মস্কোর লোকজন যা আলোচনা করত, যেভাবে শব্দ দুটির তাৎপর্য বিশ্লেষণ করত, ব্যাখ্যা দিত, চলার পথে তার যতটুকু আমার কানে এসেছে, ভ্লাদিমিরের লেকচারের পাশাপাশি তাও আমি এখানে লিপিবদ্ধ করব।

বলাই বাহুল্য, আমার ব্যাপক আগ্রহ থাকা সত্ত্বেও স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে এই শব্দগুলি নিয়ে কাউকে কিছু বলতে বলিনি আমি, যে তা শুনে পরে কোনোদিন এ বিষয়ে কিছু লিখব। শিক্ষক বলতেন পড়ানোর উদ্দেশ্যে, মস্কোর বাসিন্দারা রাস্তাঘাটে আলোচনা করতেন তাদের নিজের নিজের মনোভাব আরেকজনকে জানাতে। ভাষাটা জানার সুবাদে আমি সেসব শুনে ফেলেছি মাত্র।

ভ্লাদিমির লেকচার শুরু করলেন—"স্তালিনিজম আমাদের দেশকে যে জায়গায় নিয়ে গিয়েছিল, সেখান থেকে সোভিয়েত ইউনিয়নকে প্রকৃত গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্রে উন্নীত করার জন্যই সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং ভাবাদর্শগত ক্ষেত্রে পেরিস্ত্রোইকার নীতি গৃহীত হয়েছে। পৃথক পৃথক ভাবে এই ক্ষেত্রগুলিতে পেরিস্ত্রোইকা কীভাবে অর্থবহ হবে, সেটা এখন দেখা যাক।

অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে পেরিস্ত্রোইকা র‍্যাডিক্যাল ইকনমিক রিফর্ম। পূর্ববর্তী বন্ধ অবস্থাকে কাটিয়ে ওঠার জন্য গুরুত্বপূর্ণ ও দায়িত্বপূর্ণ সংস্কার পদ্ধতি। এক্সটেন্সিভ মেথডস অব ম্যানেজমেন্ট-এর পরিবর্তে ইনটেন্সিভ মেথডস অব ম্যানেজমেন্ট-এর প্রবর্তন। আর্থ-সামাজিক বিকাশকে ফলপ্রদ ও ত্বরান্বিত করার জন্য পেরিস্ত্রোইকার মতো বৈপ্লবিক পদ্ধতির সাহায্য অত্যাবশ্যক। এজন্য দরকার বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিগত ক্ষেত্রের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে পঞ্চবার্ষিকী বা সমতুল্য অর্থনৈতিক পরিকল্পনার সমন্বয়সাধন। অর্থনৈতিক হিসাব-নিকাশের মূল নীতিই হবে সেল্ফ রিপেমেন্ট অ্যান্ড সেল্ফ ফিনান্স।

রাজনৈতিক ক্ষেত্রে পেরিস্ত্রোইকা—গণতন্ত্রের সর্বমুখী বিকাশ, সোভিয়েত রাজনৈতিক ব্যবস্থার সংস্কার সাধন, সোভিয়েত অব পিপলস্ ডেপুটি-কে সম্পূর্ণ ক্ষমতা প্রদানপূর্বক পুনর্বহাল, গ্লাসনস্তের ব্যাপক প্রচলন, সমাজজীবনের সর্বক্ষেত্রে ও সর্বস্তরে গঠনমূলক সমালোচনাকে উৎসাহদান। একমাত্র গ্লাসনস্তের মাধ্যমেই সোভিয়েত সমাজের নৈতিক উন্নয়ন, কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে সাধারণ সোভিয়েত জনগণের পারস্পরিক নৈকট্য গড়ে

তোলা সম্ভব। সামাজিক জীবন সম্পর্কে যে কোনো প্রশ্নের পূর্ণাঙ্গ ও বিস্তারিত উত্তর বা যে কোনো তথ্য জানার অধিকার প্রত্যেক সোভিয়েত নাগরিকের আছে। অবশ্য স্টেট সিক্রেটকে আওতার বাইরে রাখা হচ্ছে। তাছাড়া, সামাজিক তাৎপর্যপূর্ণ যে কোনো প্রশ্ন বা বিষয় নিয়ে খোলাখুলি স্বাধীনভাবে পর্যালোচনা করার অধিকারী হবেন প্রত্যেক সোভিয়েত নাগরিক।

গ্লাসনস্তের পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়নের অর্থ হল, নানাত্ববাদকে (প্লুরালিজম) পুষ্ট করা অর্থাৎ কোনো বিষয় বা ব্যক্তি সমালোচনার উর্ধ্বে বলে গণ্য হবে না এবং সমাজজীবনের নানা সমস্যা নিয়ে প্রাণবন্ত, বিস্তৃত ও বিবিধ দৃষ্টিকোণ সম্বলিত আলোচনার আয়োজন করা। ক্ষমতা যাতে কোনো বিশেষ গোষ্ঠীর হাতে কেন্দ্রীভূত না হয় বা ওই গোষ্ঠীর মতামত বা ধ্যানধারণা যাতে সাধারণের উপর চাপিয়ে দেওয়া না হয়, তার জন্য সমাজের প্রতিটি ক্ষেত্রে মনোপলি-কে অস্বীকার করা হবে। শুধুমাত্র এই পথেই নানাত্ববাদকে (যা কিনা গ্লাসনস্তের অন্যতম মূল শর্ত) সামাজিক একটি বৈশিষ্ট্য হিসেবে গণ্য করা সম্ভব হবে। এই পথ ধরে এগোলে সোভিয়েত নাগরিকরা প্রকৃত গণতন্ত্রের সন্ধান পাবেন এবং ব্রেজনেভের শাসনকালে সোভিয়েত সমাজ যে বন্ধ অবস্থার মধ্যে ছিল, তা থেকেও মুক্তির রাস্তা খুঁজে পাওয়া যাবে।

'প্রশ্নহীন সমর্থন' বা 'মতৈক্য', 'সংকটহীনতা' বা 'সমস্যাবিহীন সমাজব্যবস্থা'-র সঙ্গে গ্লাসনস্তের একেবারে গোড়ায় বিরোধ। কিন্তু একইসঙ্গে মনে রাখা দরকার যে, সমাজতান্ত্রিক মূল্যবোধকে কিছুমাত্র ক্ষুণ্ণ করা চলবে না, কারণ গ্লাসনস্ত প্রবর্তনের মূল লক্ষ্যই হচ্ছে সমাজতন্ত্রকে সুদৃঢ় ও সুপ্রতিষ্ঠিত করা।

গ্লাসনস্তের মূল কার্যক্ষেত্র হচ্ছে প্রচার মাধ্যমগুলি। এ সবটাই রাজনৈতিক ক্ষেত্রের কাজ এবং রাজনৈতিক ক্ষেত্রে পেরিস্ত্রোইকার মাধ্যমেই একমাত্র একটি আদর্শ ও ন্যায়সম্মত রাষ্ট্রব্যবস্থা গড়ে তোলা সম্ভব। সোভিয়েত বিদেশনীতি প্রণয়নের ক্ষেত্রেও পেরিস্ত্রোইকা গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব বিস্তার করবে। 'নতুন রাজনৈতিক চিন্তাধারা'-র উপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত হবে এই নতুন বৈদেশিক নীতি।

সমাজজীবনে পেরিস্ত্রোইকা—প্রত্যেক সোভিয়েত নাগরিকের জীবনযাত্রার মান উন্নত করাই হচ্ছে এই ক্ষেত্রে মূল লক্ষ্যবিশেষ। এজন্য উৎপাদন ক্ষেত্রের বিকাশসাধন, ভালো শ্রমশর্ত (কন্ডিশনস অব ওয়ার্ক) গড়ে তোলা, দৈনন্দিন জীবনযাত্রার জন্য প্রয়োজনীয় সর্বধরনের সামগ্রীর সহজলভ্যতা, শ্রমজীবী মানুষের বিশ্রামের সুবন্দোবস্ত, শিক্ষা ও চিকিৎসাক্ষেত্রে উন্নয়নসাধন ইত্যাদি প্রতিটি বিষয়ের দিকে সতর্ক দৃষ্টি দিতে হবে। একমাত্র এর মাধ্যমেই 'সামাজিক ন্যায়' নীতিটির বাস্তবায়ন সম্ভব।

নৈতিক ক্ষেত্রে পেরিস্ত্রোইকা—যেসব সমাজতান্ত্রিক নীতি বা আদর্শ বিকৃত হয়ে পড়েছে, তা থেকে সোভিয়েত সমাজকে দৃঢ়তার সঙ্গে দ্রুত মুক্ত করতে হবে। এর সঙ্গে উন্নতমানের সৎশ্রমকে উৎসাহপ্রদান, বেতন নির্ধারণের ক্ষেত্রে সমতার নীতিকে গুরুত্ব না দিয়ে যোগ্যতানুসারে বেতনক্রম নির্ধারণ, প্রতিভা ও মানবিক বিভিন্ন গুণাবলির পূর্ণ বিকাশের জন্য সুস্থ প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করা, লেনিন প্রবর্তিত কালচারাল পলিটিক্স

ন্যাতাটির পুনঃপ্রবর্তন, অন্তর্দেশীয় ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সাধারণ মানুষের আত্মিক অভিজ্ঞতাকে একটা সামঞ্জস্যপূর্ণ রূপদান ইত্যাদি বিষয়গুলির উপর গুরুত্ব দেওয়া দরকার। এছাড়া আশু করণীয় দায়িত্বের মধ্যে আছে—সোভিয়েত জনগণের মধ্যে উচ্চ সাংস্কৃতিক ও আত্মিক অনুভূতি গঠন ও বিকাশে সহায়তা করা এবং সবধরনের আদর্শহীনতা, নিহিলিজম বা ব্যানালিটি-র সক্রিয় বিরোধিতা করা।"

আমরা, বিদেশি ছাত্রছাত্রীরা 'পেরিস্ত্রোইকা' ও 'গ্লাসনস্ত' বিষয়ে যাতে একটা স্বচ্ছ ধারণা গঠন করতে পারি, সেজন্য আমাদের ইতিহাস শিক্ষক ছিলেন বিশেষ যত্নশীল। তাঁর পড়ানোর পদ্ধতিটি ছিল এতই সুন্দর যে, পুনর্গঠনের এই নতুন নীতিটি বাস্তবায়নের জন্য সি পি এস ইউ কী কী করতে চায় এবং কেনই-বা এই নীতিটি প্রণয়নের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিল, সে বিষয়ে আমাদের একটা স্পষ্ট ধারণা ক্লাসের লেকচার শুনেই গড়ে উঠেছিল। বলাই বাহুল্য যে, আমরা সকলেই তাঁর সঙ্গে একমত ছিলাম না। এবং সুখের বিষয় যে, এই মতবিরোধের কথা ক্লাসে সরাসরি জানানোর সুযোগও আমাদের ছিল। বরং প্রশ্নহীন সমর্থনেই বিরক্ত হতেন ভ্লাদিমির। ফলে তাঁর ক্লাসগুলি হয়ে উঠত প্রাণবন্ত, ইন্টারেস্টিং। শুধু শিক্ষকের একতরফা লেকচার আর ছাত্রছাত্রীর ঘাড় গুঁজে যান্ত্রিক ক্লাসনোট লিখে যাওয়ার একঘেয়ে অভ্যাসের মধ্যে তা কোনোদিন বাধা পড়ত না। তাই হাজার তুষারঝড়, মাইনাস কুড়ি-পঁচিশ ডিগ্রি হিমেল তাপমাত্রা, ম্যাজম্যাজে আবহাওয়া সত্ত্বেও আমরা পৃথিবীর দক্ষিণভাগের বাসিন্দারা (*) উত্তরে মস্কোতে ভ্লাদিমিরে ক্লাস সচারাচর 'মিস্' করতাম না। (* আটের দশকের শেষ ভাগের পৃথিবীর মাঝবরাবর আমরা যদি একটা কাল্পনিক রেখা টানি তাহলে যে উত্তর ও দক্ষিণ গোলার্ধের সৃষ্টি হবে, তার উত্তরাংশে উন্নত দেশগুলি, দক্ষিণে উন্নয়নশীল রাষ্ট্রগুলি। ব্যতিক্রম নিশ্চয়ই ছিল, তবে আনুপাতিক হারে হিসেবটা এরকমই। গণমৈত্রী বিশ্ববিদ্যালয়ে যে ১১০টা দেশের ছাত্রছাত্রীরা পড়াশোনা করত, তাদের অধিকাংশই এশিয়া, আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকার উন্নয়নশীল রাষ্ট্রগুলির নাগরিক। 'পৃথিবীর দক্ষিণ ভাগের বাসিন্দা' বলতে আমি এদের কথাই বলেছি।)

ভ্লাদিমির তাঁর স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতে আবার বলতে শুরু করলেন। "এবার আমি 'ভাবাদর্শগত ক্ষেত্রে পেরিস্ত্রোইকা' বলতে কী বোঝায়, তা বলব তোমাদের। এক্ষেত্রে যে যে বিষয়ের উপর জোর দেওয়া হয়েছে, তা নিম্নরূপ—

সামাজিক বিকাশের জন্য প্রয়োজনীয় মার্কসীয় ও লেনিনীয় নীতিগুলির পুনঃপ্রতিষ্ঠা, সমাজতন্ত্রের সফল ভবিষ্যৎ বিকাশের জন্য প্রয়োজনীয়, গঠনমূলক, উদ্ভাবনী শক্তির পরিচয় বহনকারী নতুন নতুন চিন্তাভাবনা ও নীতিগ্রহণ, সবধরনের রক্ষণশীল ও অ্যাডভেঞ্চারধর্মী নীতি বা আদর্শকে নস্যাৎ করা ও সকল প্রকার ডগমাটিজম-কে অস্বীকার করা। এই পদক্ষেপগুলি সাফল্যের সঙ্গে গৃহীত হলে সমাজতান্ত্রিক ও মানবিক মূল্যবোধকে স্বমহিমায় পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করা সম্ভব হবে।

পেরিস্ত্রোইকা ও গ্লাসনস্ত যেমন সোভিয়েত সমাজব্যবস্থার অভ্যন্তরে বহু সুফলদায়ক পরিবর্তন আনতে সক্ষম হবে, তেমনই আন্তর্জাতিক রাজনীতি ক্ষেত্রেও স্থিতি বজায় রেখে শান্তিপূর্ণ পরিমণ্ডলের সৃষ্টি করবে। সোভিয়েত ইউনিয়নের আন্তর্জাতিক প্রতিপত্তি

পাকাপোক্ত হবে এবং বিশ্বশান্তি বাস্তবায়ন ও নিরস্ত্রীকরণের ক্ষেত্রে সোভিয়েত ইউনিয়ন পথপ্রদর্শনকারী ভূমিকা সাফল্যের সঙ্গে পালন করতে সক্ষম হবে।"

"কিন্তু অনেকে যে বলেছেন, পেরিস্ত্রোইকার সার্থক বাস্তবায়নের ফলে সোভিয়েত ইউনিয়ন তার সমাজতান্ত্রিক আদর্শ থেকে দূরে হটে যাবে—"শ্রীলঙ্কার কুমারকে কথা শেষ করতে না দিয়েই ভ্লাদিমির বললেন, "হ্যাঁ, বুর্জোয়া মনোভাবাপন্ন কিছু আদর্শবাদী বলতে চান যে, পেরিস্ত্রোইকার অর্থ হল সমাজতন্ত্রের মূল আদর্শ থেকে দূরে সরে যাওয়া, কিন্তু এ অভিযোগ মিথ্যা। পেরিস্ত্রোইকার মূল উদ্দেশ্য হল একই আর্থ-সামাজিক গঠনের (সমাজতান্ত্রিক) মধ্যেই গুণগত পরিবর্তন সাধন। পেরিস্ত্রোইকাকে 'বৈপ্লবিক' চরিত্রের অধিকারী বলার কারণ হচ্ছে, উন্নতমানের নতুন উৎপাদন-শক্তির সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা করে উৎপাদন-সম্পর্কের পরিবর্তন সাধন। গণতন্ত্রীকরণের অর্থ হল সমাজজীবনে নতুন ধরনের পারস্পরিক সম্পর্কের প্রবর্তন—ব্যক্তিস্বার্থের সঙ্গে গোষ্ঠীস্বার্থের সামঞ্জস্য সাধন, গোষ্ঠীস্বার্থের সঙ্গে রাষ্ট্রস্বার্থের সমন্বয়সাধন, সোভিয়েত ইউনিয়নের অন্তর্গত বিভিন্ন প্রজাতন্ত্র ও জাতি উপজাতির স্বার্থের সঙ্গে গোটা দেশের স্বার্থের সমন্বয়সাধন। অর্থাৎ সাধারণকে সমাজতান্ত্রিক স্বায়ত্তশাসনের অধিকার প্রদান, রাষ্ট্রশাসনে জনগণের সক্রিয় অংশগ্রহণ এবং সমাজজীবনের সব প্রশ্নে সকলের সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমেই প্রকৃত গণতন্ত্রীকরণ সম্ভব।

এবার পেরিস্ত্রোইকা বাস্তবায়নের পথে মূল যে প্রতিবন্ধকগুলির সম্মুখীন হতে হচ্ছে, তার কথা বলব। এই তালিকায় প্রথমেই আছে—রক্ষণশীলতা, অর্থাৎ অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ-কম্যান্ডিং মেথড-এর মাধ্যমে চালু শাসনব্যবস্থার অন্ধ সমর্থন, ডগমাটিজম-কে প্রশ্রয় দেওয়া ও নতুন কোনো পরিবর্তনকে ভয় পাওয়া। তাই পেরিস্ত্রোইকার অন্যতম প্রধান কাজ হচ্ছে সমাজকে সবধরনের অবাস্তব, হন্তারক বা ক্ষতিকারক চিন্তাভাবনা থেকে মুক্ত করা। এই ক্ষতিকারক বৈশিষ্ট্যগুলি পার্সোনালিটি কাল্ট-এর ফলে জন্ম নিয়েছিল এবং ব্রেজনেভের শাসনকালে উদ্ভূত 'বন্ধ অবস্থা'-য় আমলাতান্ত্রিক শাসনপদ্ধতি এই বৈশিষ্ট্যগুলিকে সমাজদেহের আরো গভীরে প্রোথিত করেছিল।"

পেরিস্ত্রোইকা ও গ্লাসনস্ত প্রসঙ্গে দীর্ঘ এই লেকচারের উপসংহারে ভ্লাদিমির বললেন, 'সি পি এস ইউয়ের এই নতুন নীতি আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রভাব আরো প্রতিষ্ঠিত করতে সাহায্য করবে। সোভিয়েতের সমস্যা বা দায়িত্ব সম্পর্কে বহির্বিশ্বের ধারণা আরো স্পষ্ট হবে। সোভিয়েত ইউনিয়ন যে বিশ্বশান্তির প্রধান সমর্থক, সে বিষয়েও সকলে নিঃসন্দেহ হয়েছেন। একমাত্র পেরিস্ত্রোইকার সফল প্রয়োগের মাধ্যমেই সমাজতন্ত্র সেই 'দৃষ্টান্তমূলক শক্তি'তে পরিণত হবে, যার কথা বলেছিলেন লেনিন।'

এতক্ষণ আমার ইতিহাসের 'নোট'খাতা উজাড় করে ভ্লাদিমিরের 'লেকচার' (স্তালিনিজম, পেরিস্ত্রোইকা ও গ্লাসনস্ত সংক্রান্ত) তুলে দিলাম।

এবার আসুন, ইউনিভার্সিটি চত্বরের বাইরে মস্কোয় এই শব্দগুলি জনজীবনে কী ধরনের আলোড়ন তুলেছিল, সেদিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করি।

শুরু করি আমার এক বন্ধুর কথা দিয়ে। তার নাম ভাদিম। খোদ মস্কোর বাসিন্দা। সেটা ৮৭-র শেষের দিকের কথা। ভাদিম ছিল মস্কো মিউনিসিপালিটির কর্মী। মস্কোর ঠিক মাঝখানে মন্ত্রী, আমলা, ভি আই পি-দের অধিকাংশেরই বাসস্থান যেখানটায়, তার নাম 'আকতিয়াবরস্কায়া'। মাটির নিচে নেমে গরম জলের পাইপ সারানোর কাজ করত ভাদিম। কাজটা হত রাতে।

একরাতে ভাদিম ও তার দুই সহকর্মী আন্ডারগ্রাউন্ডে নেমে সরু টানেল দিয়ে এগিয়ে যাচ্ছিল। হঠাৎ পেছনে পায়ের আওয়াজ পেয়ে তাকিয়ে দেখে রিভলবার উঁচিয়ে দুজন বিরাট চেহারার লোক ওদের অনুসরণ করছে। ভয় পেয়ে ভাদিমরা থমকে দাঁড়ায়। আধো-অন্ধকার থেকে অনুসরণকারীরা বলে ওঠে, ভয় নেই। তোমরা তোমাদের কাজ করো। আমরা আমাদের কাজ করছি। আমাদের ঠিক মাথার উপরে মিনিস্টাররা আছেন। আমরা তাঁদের পাহারা দিচ্ছি।' ভাদিম বলেছিল, লোক দুজন এরপর তাদের বলে যে, তারা কে জি বি-র লোক। মাটির তলা থেকে যাতে কেউ কোনো ধরনের নাশকতামূলক কাজকর্ম করতে না পারে, তা দেখার জন্যই এই 'ভি ভি আই পি' এলাকায় তারা পাহারাদারি করে।

কথা হচ্ছিল ভাদিমদের রান্নাঘরে বসে, চা খেতে খেতে। এখানে বলে রাখা ভালো, মস্কোর অধিকাংশ ফ্ল্যাটেই আলাদা ড্রয়িংরুমের ব্যবস্থা প্রায় নেই-ই। বড়োসড়ো রান্নাঘরের খাবার টেবিলেই অতিথিদের বসানো হয়।

ভাদিম এই গল্পটা বলতে বলতে হাসছিল না। যদিও শুনতে শুনতে আমার হাসি পাচ্ছিল। ও বলল, "কি জানিস সেরিনা—এই যে আমি কথাটা বললাম, তুই তো বিদেশি, বছর দুয়েক আগে স্বদেশি তো দূরের কথা, টয়লেটে বসে নিজেকেও এই অভিজ্ঞতার কথা বলতে পারতাম না। স্রেফ ভয়ে। এই যে এখন, বিশ্বাসী বন্ধু ভাবি বলে, তুই একজন বিদেশি হওয়া সত্ত্বেও তোকে একথা বললাম, এই যে বলতে পারলাম, এই যে বলার সাহস পেলাম—পেরিস্ত্রোইকা-ই এই সাহস জুগিয়েছে।"

মস্কোয় একটা 'অ্যানেকডট' খুব চালু হয়েছিল। পেরিস্ত্রোইকার সমর্থনেই। কেন ভাদিমরা বছর দুই আগেও কোনো কথাই নিজেদের মধ্যেও আলোচনা করতে পারত না, এই 'কথা-না-বলা'-র কালচারটা কেমন ছিল, তা খুব সুন্দরভাবে ধরা আছে এই 'অ্যানেকডট'-এ।

এক দিদিমার সঙ্গে তার ছোট্ট নাতনি চলেছে মস্কোর পথ ধরে। চারিদিকে ছড়ানো ছেটানো লেনিনের প্রচুর মূর্তি। ট্রামের জানলার ধারে বসে, দুধারে লেনিনকে দেখতে দেখতে ছোট্ট মাশা দিদিমাকে জিজ্ঞেস করল—

—দিদিমা, লেনিন কেমন লোক ছিল ?

—খুব ভালো।

—স্তালিন ?

—শয়তান। খুনি একটা !

—ব্রেজনেভ ?

—মাথামোটা, অলস।

—আর গর্বাচভ ?

—অত তাড়া কীসের তোর ? আগে মরতে দে। তবে তো বলব, কেমন লোক ছিল! জীবিত অবস্থায় কোনো নেতা সম্পর্কে কোনোরকম আলোচনা বা তাঁর সমালোচনা করা ছিল একেবারেই নিষিদ্ধ। অকল্পনীয়। সোভিয়েত ইউনিয়ন এভাবেই সমাজতন্ত্রকে ধরে রেখেছিল। আর দেশের মানুষ সব রিপুর উপরে 'ভয়'-কে ঠাঁই দিয়ে সুদিনের অপেক্ষায় ছিল। কয়েক প্রজন্ম ধরে। এরকম সময়েই পেরিস্ত্রোইকা তাদের সেই সুদিনের স্বপ্ন সাকার করার নেশা আরো তীব্র করেছিল।

এই প্রসঙ্গে আমাদের ইউনিভার্সিটির এক শিক্ষিকার কথা মনে পড়ল। ইসলান্দা ফ্রাঙ্কোভনা গুড। নব্বইয়ের পর থেকে পাকাপাকিভাবেই তিনি আমেরিকার বাসিন্দা। আমাদের রুশ ভাষা পড়াতেন ইসলান্দা। মনে আছে একদিন ক্লাসে হঠাৎ ব্যাগ থেকে একটা ছবি বের করে আমাদের দেখিয়ে বললেন—'চিনতে পারো ?' সমস্বরে আমরা বলে উঠলাম—'পল রবসন।' উনি বললেন—'আমার পিসেমশাই!'

ইসলান্দার বাবা ছিলেন মার্কিনি কৃষ্ণাঙ্গ। মা রুশি, গোর্কি (এখনকার পরিবর্তিত নাম 'নিঝ্‌নি নোভগোরাদ') শহরের বাসিন্দা। তিনের দশকের মাঝামাঝি একটি রুশ ছবিতে কৃষ্ণাঙ্গ এক চরিত্রে অভিনয়ের জন্য গোর্কিতে এসেছিলেন মিঃ গুড। তখনই গোর্কি শহরের ওই রুশি মহিলার সঙ্গে পরিচয়—পরিণয়। এবং ইসলান্দার জন্ম। সে সময়ে এই ঘটনা ছিল একেবারেই বিরল।

ছোট্ট গোর্কি শহরে ইসলান্দার 'কালো রঙের বাবা'কে দেখতে আশপাশের বাসিন্দারা ওদের বাড়িতে ভিড় জমাত। ইসলান্দা বিশ্বাস করতেন 'এ ঘটনা ঘটত, আগের ঘটনাটা, সাদা রুশি মেয়ের সঙ্গে কালো মার্কিনির বিয়ে, সে সময় সত্যিই বিরল ছিল বলে।'

ক্লাসে ভাষাশিক্ষার জন্য তিনি বই ব্যবহার করার থেকে, রুশ ভাষায় নিজের জীবনের ও সোভিয়েত সমাজের নানা বিষয়ে গল্প বলে ভাষাশিক্ষার উপর জোর দিতেন। এভাবেই গল্প বলতে বলতে একদিন ইসলান্দা গর্বাচভ ও তাঁর রাজনীতির উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছিলেন। আমি বললাম, আপনারা কোনো নেতা বেঁচে থাকাকালীন তাঁর সম্পর্কে মুখ খোলা তো দূরের কথা, তাঁকে নিয়ে মাথা পর্যন্ত ঘামান না। এই যে এখন গর্বাচভের এত প্রশংসা করছেন, উনি মারা গেলেই ওঁর সমালোচনা শুরু হবে। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে আমাদের রুশ ভাষার শিক্ষিকা বললেন, "আসলে কি, ওই 'খুনি' স্তালিনটা গায়ের জোরে একটা ভয়ের রাজত্ব কায়েম করেছিল। এখন আর সেদিন নেই। গ্লাসনস্ত, পেরিস্ত্রোইকা আমাদের সে সুযোগ দিয়েছেন। গর্বাচভ ভুল করলে, তাঁকেও ছাড়ব না আমরা। জীবিত অবস্থাতেই তিনি সমালোচিত হবেন।"

সত্যি সত্যিই, সবসময় একটা অদ্ভুত স্বপ্নে বিভোর হয়ে থাকত মস্কোবাসী। স্বপ্নটা যেন কেমন ছোঁয়াচে ছিল। কলকাতার সেরিনাও যেন সেই স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছিল। কেমন একটা ঝিমঝিম নেশা ছড়ানো ছিল চারিদিকে।

আমার আর এক পরিচিত লেনা একদিন বলেছিল—'আমরা আগেও খারাপ ছিলাম,

এখনও হয়তো খারাপই আছি ; কিন্তু আগে সত্যি কথাটা বলতে পারতাম না। এখন পারছি। বলতে পারছি যে, আমরা খারাপ আছি। আর এতেই বেশ সুস্থ লাগছে।' ২০-২১ বছরের রুশ মেয়ে লেনা ছিল আমার রুমমেট এন্দির পিয়ানো-শিক্ষক।

সাধারণ নাগরিকের মতোই, 'কমসামোল' এবং সি পি এস ইউ-তে সদ্য নিযুক্ত যুবক-যুবতীরাও তখন নতুন দিনের আশায় ও উত্তেজনায় টগবগ করে ফুটছে।

এখানে এরকমই কয়েকজনের কথা বলছি। বলছি তাদের অনুভব, উপলব্ধি আর প্রতিক্রিয়ার কথা।

২৩ বছরের রুশি মেয়ে ইলেনা সেমোচকিনা পেশায় এঞ্জিনিয়ার। মস্কোর বাসিন্দা। কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য এবং মস্কো সিটি সোভিয়েত অব পিপলস ডেপুটিজ-এর অন্যতম ডেপুটি।

পেরিস্ত্রোইকাকে ইলেনা দেখেছিল এইভাবে—"এখন, এই পরিবর্তিত সময়ে, আমরা ডেপুটিরা নিজেদের আরো বেশি ক্ষমতাবান, আরো বেশি আত্মবিশ্বাসী মনে করছি।"

ইলেনা যেমন তার কাজের ক্ষেত্রের কথা বলেছিল, তেমনই পশ্চিম সাইবেরিয়ার এক কমসামোল কমিটির ফার্স্ট সেক্রেটারি, ২৯ বছরের আলেকসান্দর বাইকোভও তার কাজের ক্ষেত্র নিয়ে ইলেনার মতোই আশাবাদী ছিল।

ও আশা করেছিল, 'পার্টি, ট্রেড ইউনিয়ন এবং সোভিয়েতগুলির মধ্যে ভালো সম্পর্ক স্থাপিত হবে, সংগঠনগুলির কাজ যথাযথভাবে সংগঠিত হবে—এতে কমসামোলগুলি সমস্ত যুবকের জন্য একটি আদর্শ সংগঠন হিসেবে গড়ে উঠতে পারবে।'

এই আলেকসান্দরের মতোই স্বপ্নিল চোখে আরেক আলেকসান্দর—১৮ বছরের মস্কোবাসী লেদ অপরাটের আলেকসান্দর লাতিষেভ, যে কমসামোলের সদস্য নয়, পেরিস্ত্রোইকাকে অভিবাদন জানিয়েছিল। একবুক আশায় স্বপ্ন দেখেছিল, "এখন নতুন নতুন প্রযুক্তি এদেশে আসবে। কৃষিতে, শিল্পে, এমনকী আমার ছোট্ট লেদ মেশিনেও সেই প্রযুক্তির জোয়ার লাগবে। আরো নতুন কিছু তৈরি করতে পারব। তার আগে আর্মির কাজটা করে আসি।* ফিরে এসে কোনো ইনস্টিটিউটে সান্ধ্য ক্লাসে ভর্তি হব। দিনের বেলা লেদ মেশিন চালাব। পড়তে পড়তে নতুন নতুন প্রযুক্তি শিখব। তারপর ভ্লাদিমিরের কাছে, আমার নিজের গ্রামে ফিরে যাব। সেই পুরোনো জায়গা, যেখানে পুরোনো দিনের সুন্দর সুন্দর ক্যাথিড্রাল আছে, যেখানে পুরোনো সময়টা থমকে আছে। সেখানে ছোট্ট একটা বাড়ি বানাব। কিন্তু সবার আগে চাই নতুন প্রযুক্তি।'

একেকজনের কাছে এক এক ভাবে এসেছিল পেরিস্ত্রোইকা। আর্মেনিয়ার মিকায়েল সিমোনিয়ানও কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য। ৩০ বছরের মিকায়েল মস্কোর টেক্সটাইল ইন্সটিটিউট থেকে পাশ করেছিল। অন্য প্রজাতন্ত্রের এই যুবকের কাছে পেরিস্ত্রোইকা এই আশা জুগিয়েছিল যে, 'ক্লাস রুম থেকেই বন্ধুত্ব শুরু হবে।'

---

*সুস্থ, সবল প্রতিটি সোভিয়েত পুরুষ নাগরিককেই ১৮ বছর বয়স পূর্ণ হলে মিলিটারি সার্ভিসে বাধ্যতামূলকভাবেই যোগ দিতে হত দু-বছরের জন্য।

প্রজাতন্ত্রগুলির মধ্যে যে একটা 'অ-বন্ধুত্বসুলভ' সম্পর্ক ছিল, তা বোঝা যায় মিকায়েলের কথা থেকে। এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা পরে করব।

এই আশা, এই স্বপ্ন দানা বাঁধতে বাঁধতে এমন জায়গায় গিয়ে দাঁড়াল যে, মস্কোর নাগরিকেরা (বোধহয় গোটা সোভিয়েতের) এক ধরনের সংস্কারে আচ্ছন্ন হয় পড়ল, যা থেকে আবার সেই 'ব্যক্তিভজনা' শুরু হয়ে গেল।

'পার্সোনালিটি কাল্ট'-এর উদ্গাতা বলে যে স্তালিনকে 'খুনি', 'শয়তান', 'অত্যাচারী' ইত্যাদি আখ্যায় আখ্যায়িত করে পেরিস্ত্রোইকা বাজারে এল, সেই পেরিস্ত্রোইকাই কিনা আরেকটি 'পার্সোনালিটি কাল্ট'-এর জন্ম দিল।

আমার রুমমেট জর্জিয়ার এন্দি, যে কিনা মনেপ্রাণে ঘোরতর রুশ-বিরোধী, সেও গোটা সোভিয়েত ইউনিয়নের স্বার্থে পেরিস্ত্রোইকাকে স্বাগত জানিয়েছিল। পাঠকের মনে আছে, এন্দি আবার স্তালিনেরও ঘোরতর সমর্থক ছিল। আসলে আমি লক্ষ করতাম, ওদের মধ্যে যেন কেমন একটা কিংকর্তব্যবিমূঢ় অবস্থা প্রকট হয়ে উঠেছিল। যে স্তালিনকে গালাগালি দিয়ে পেরিস্ত্রোইকা এল এবং স্তালিনকে গালাগালি দেওয়ার জন্য যে এন্দি রুশিদের গালাগাল দিত—এই দু-পক্ষকেই দেখলাম গোটা সোভিয়েতের কথা মাথায় রেখে, 'নতুন একটা কিছু হবে'—এই ভেবেই যৌথভাবে রীতিমতো 'গুরুভজনা' শুরু করল।

এন্দি একদিন বলে, 'জানিস, কয়েকদিন আগে একটা পত্রিকায় দেখলাম, এক জ্যোতিষী বলেছেন, আমাদের সোভিয়েত ইউনিয়নকে সবরকম দুঃখ-দুর্দশার হাত থেকে উদ্ধার করতে এক মহামানবের আবির্ভাব হবে, যাঁর মাথায় থাকবে একটা জরুল। গর্বাচভ সেই মহামানব। দেখিস না, ওনার মাথায় জরুল! আমাদের আর চিন্তা নেই।'

জ্যোতিষী-বর্ণিত, এন্দি-কথিত এই 'মহামানবে'র কল্পকাহিনি শুনতে শুনতে ভাবতাম, নস্ত্রাদামুসের সেই মজার মজার ভবিষ্যদ্বাণীর কথা।

একদিন মস্কোর এক দোকানে খাবারদাবার কিনতে লম্বা লাইনে দাঁড়িয়ে আছি। আবার ওই মহামানবের গল্প শুনলাম। আমার ঠিক সামনেই দাঁড়ানো চল্লিশোর্ধ্ব দুই রুশি পুরুষ উত্তেজিতভাবে নিজেদের মধ্যে আলোচনা করছিলেন—গর্বাচভ আমাদের উদ্ধারকর্তা। তিনি আমাদের এক নতুন দিনে নিয়ে যাবেন। এই অন্ধকারের জগৎ থেকে আলোর জগতে নিয়ে যাবেন তিনি।—তখন আর এভাবে ঘন্টার পর ঘন্টা লাইনে দাঁড়িয়ে এত কষ্ট করতে হবে না!

কলকাতায়, পার্ক সার্কাস মোড়ের কাছে একটা গির্জার দেওয়ালে লেখা দেখেছিলাম, 'প্রভু যিশু আমাদের অন্ধকার থেকে আলোর জগতে নিয়ে যাবেন।' এ ঢেউ যে মস্কোর লাইনে গিয়ে আছড়ে পড়বে, তা ভাবিনি।

একদিন শুনলাম, রাস্তায় এক রুশ ভদ্রলোক ও ভদ্রমহিলা আলোচনা করতে করতে চলেছেন। তাঁরা বেশ জোরে জোরেই কথা বলছিলেন। মহিলা বললেন, 'বোগ্ পাসিলাল্ গর্বাচভা, স্তোবি স্পাস্তি নাস্।' অর্থাৎ, 'ভগবানই আমাদের বাঁচানোর জন্য গর্বাচভকে পাঠিয়েছেন।'

এইরকমই 'ভগবান', 'গুরু', 'উদ্ধারকর্তা', 'মহামানব' ইত্যাদি নানা বিশেষণে গর্বাচভ

বিশেষিত হচ্ছিলেন। ভাগ্যিস, কোনো অলৌকিকত্ব তখনও তাঁর উপর আরোপিত হয়নি।

ক্রমেই একটা 'মিথ'-এ পরিণত হলেন মিখাইল সের্গেইভিচ গর্বাচভ। বলা হল, অক্টোবর রেভিলিউশনের পর পেরিস্ত্রোইকা হচ্ছে দ্বিতীয় বিপ্লব। বলা হল, গর্বাচভ হচ্ছেন দ্বিতীয় লেনিন। লেনিন যে সমাজতন্ত্রের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছিলেন, তার উপর সুদৃশ্য অট্টালিকা গড়বেন গর্বাচভ। সোভিয়েত নাগরিকের সৌভাগ্য যে গর্বাচভের মতো একজন সুযোগ্য নেতা এদেশে জন্মেছেন!

তখন আমার শোনার পালা। আমি শুধু শুনে যাচ্ছি। ৮৭ সালে মস্কো গেলাম। আবিষ্কার করলাম পেরিস্ত্রোইকা। উপলব্ধি করলাম গ্লাসনস্ত। অনুভব করলাম এই নতুন দুটি শব্দ আসলে 'স্তালিনিজম'-এর বিপরীতার্থক শব্দ। মানুষের প্রতিক্রিয়া শুনতে শুনতে জানলাম কিছু স্বপ্নের কথা। দেখলাম এক নেতা কীভাবে 'ভগবান' হয়ে উঠলেন। ক্রমে ক্রমেই এসে পৌঁছালাম ৮৯-র মাঝামাঝি সময়ে। আমি তখন সবে সেকেন্ড কোর্সের ক্লাসে যেতে শুরু করেছি। টের পেলাম, যেন একটু একটু করে হতাশা দানা বাঁধছে। কোথায় যেন সুর কেটে যাচ্ছে। সব যেন বেতালে বাজছে। স্বপ্নগুলো কেমন যেন বুদবুদের মতো হারিয়ে যাচ্ছে প্রায়। শুরু হল মস্কোয় আমার দেখা হতাশার অধ্যায়। আমি তখনও নির্বাক শ্রোতা, বোবা দর্শক।

ভাঙনের শব্দ শুনতে পাচ্ছি

জর্জিয়া

এন্দির সোনার একটা ক্রশ ছিল। কোনোদিন গলায় পরতে দেখিনি। ওর সঙ্গে একই ঘরে আছি প্রায় দু-বছর। ৮৯-এর ফেব্রুয়ারির এক সকালে হঠাৎ ঘুম ভেঙে দেখলাম, এন্দি ছোট্ট সোনার সেই ক্রশটা কপালে ঠেকাচ্ছে আর বিড়বিড় করে প্রার্থনা করছে—অনেকটা নামাজ পড়ার ভঙ্গিতে, একেবারে উপুড় হয়ে না পড়ে, হাঁটু গেড়ে মেঝেতে বসে খাটের রেলিঙে মাথা ঠেকাচ্ছে। আমি যে এ দৃশ্য দেখছি, তা ওকে বুঝতে দিলাম না। মিনিট দশেক এরকম করার পর এন্দি ক্রশটাকে বারকয়েক চুমু খেয়ে আলমারিতে ভরে রাখল। এই ক্রশ এন্দির সোনার চেইনে 'লকেট' হয়ে গলায় ঝুলল ৮৯-রই এপ্রিলের মাঝামাঝি।

৯ এপ্রিল জর্জিয়ায় ট্যাঙ্ক নামল। রাজধানী ৎবিলিসিতে, এন্দির শহরে, 'জর্জিয়ার স্বাধীনতা পুনরুদ্ধারের জন্য' শান্তিপূর্ণ রাজনৈতিক সংগ্রামের ডাক দিলেন সেখানকার মহিলারা।

ঘটনার সূত্রপাত ৪ এপ্রিল। 'আবখাজিয় ইস্যু' নিয়ে আলোচনার জন্য ৎবিলিসি স্টেট মেডিকেল ইন্সটিটিউটে একটি মিটিং ডাকা হল। সেদিনই সন্ধ্যাবেলা বিভিন্ন ইনফর্মাল অ্যাসোসিয়েশনের প্রতিনিধিরা ৎবিলিসি স্টেট ইউনিভার্সিটিতে মিলিত হয়ে জর্জিয়ার পূর্ণ স্বাধীনতার দাবিতে একটি অস্থায়ী সরকার গঠন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। এই সঙ্গে জর্জিয়া প্রজাতন্ত্রের অন্তর্গত আবখাজিয়া, আদ্‌ঝারিয়া ও দক্ষিণ আসেথিয়াকে স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চল হিসেবে আর মেনে না নেওয়ারও একটি প্রস্তাব অনুমোদিত হয়।

মিটিং শেষে ওই প্রতিনিধিরা গভর্নমেন্ট হাউসের সামনের স্কোয়ারে জড়ো হন। সেদিন রাত্রে প্রায় ৩০ জন জর্জিয়ান, যাদের মধ্যে অধিকাংশই মহিলা, তাঁদের দাবির সমর্থনে অনশন শুরু করেন।

৬ এপ্রিল। আন্দোলনকারীদের পক্ষ থেকে ঘোষণা করা হয়, ইউনিভার্সিটি ও কলেজগুলিতে স্ট্রাইক কমিটি গঠিত হয়েছে। ৎবিলিসির সেন্ট্রাল স্ট্রাইক কমিটি জর্জিয়ার ক্ষমতাসীন সরকারকে প্রকাশ্যে অস্বীকার করে। পাশাপাশি ইনফর্মাল অ্যাসোসিয়েশনের প্রতিনিধিরা জর্জিয়ার পূর্ণ স্বাধীনতার দাবিতে শান্তিপূর্ণ রাজনৈতিক আন্দোলনের ডাক দেন। বলা হয়, অনশন ও অন্যান্য ধর্মঘট চলবে ১৪ এপ্রিল পর্যন্ত। তারপর পরিস্থিতি অনুযায়ী আন্দোলনের কর্মসূচি গ্রহণ করা হবে।

৭ এপ্রিল। আন্দোলনকারীদের সঙ্গে জর্জিয়ার বুদ্ধিজীবীদের একটি বৈঠক বসল। সেখানে চিত্রপরিচালক রিভাজ চিখাদজে সরকারের সঙ্গে খোলামেলা আলোচনায় বসার

জন্য আন্দোলনকারীদের অনুরোধ জানিয়ে বিষয়টির আশু প্রয়োজনীতার উপর জোর দিলেন। এই মতকে নস্যাৎ করে দিয়ে আন্দোলনকারীদের অন্যতম নেতা ইরাক্‌লি ৎসেরেতেলি বলেন, 'স্বাধীন জর্জিয়ার প্রতিনিধি হিসেবে শুধুমাত্র ক্রেমলিনের সঙ্গেই কথা বলতে পারি।'

৮ এপ্রিল। সকাল ১১টা নাগাদ স্কুল কলেজের ছাত্রছাত্রীরা আন্দোলনে সামিল হল। আন্দোলনকারীদের হাতে তখন 'ডাউন উইথ সোস্যালিজিম' 'রাশিয়া ইজ দ্য প্রিজন অব নেশনস' ইত্যাদি লেখা প্ল্যাকার্ড। শাসকগোষ্ঠী নড়েচড়ে বসল। ৎবিলিসিতে সেনাবাহিনী ঢুকতে শুরু করল।

৯ এপ্রিল। 'মিলিটারি অপারেশন' শুরু হল। আমরা মস্কোতে বসে টিভি দেখে এবং খবরের কাগজ পড়ে জানতে পারলাম, জর্জিয়াতে এক ভয়ংকর ঘটনা ঘটেছে। ভোর চারটে থেকে শুরু হয়েছে 'মিলিটারি অ্যাকশন'। লাঠি আর গ্যাসের সাহায্যে স্কোয়ার থেকে আন্দোলনকারীদের 'পরিষ্কার' করার কাজ শুরু হয়েছে।

গোটা অপারেশন-এর মেয়াদ ছিল ৪০-৫০ মিনিট। অনশনকারীদের একজন গুরুতর আহত, ২১ বছরের নাতা খুবাস্‌ভিলি, ৎবিলিসি মিউনিসিপাল হাসপাতালে চিকিৎসারত অবস্থায় এক সাংবাদিককে বলেন, 'আমরা অনশন ধর্মঘট করছিলাম। সবকিছু ছিল শান্তিপূর্ণ। হঠাৎ ইউনিফর্ম পরা একদল লোক আমাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। কী যেন একটা স্প্রে করল ওরা। সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞান হারালাম। যখন জ্ঞান ফিরল তখন আমি হাসপাতালে।' অনশনকারীদের আর একজন নানা দ্‌গেবুআদ্‌জে (৪৪) হাতে পায়ে ব্যান্ডেজ বাঁধা অবস্থায় ওই হাসপাতালেই চিকিৎসাধীন ছিলেন। ইউনিফর্মধারী 'শান্তিরক্ষক'রা তাঁকে লাঠি দিয়ে প্রচণ্ড মারার পর হ্যাঁচড়াতে হ্যাঁচড়াতে স্কোয়ারের বাইরে নিয়ে যাচ্ছিলেন। তারপর তাঁর আর কিছু মনে নেই।

সেদিন শুধু ওই হাসপাতালেই ২০০ জন আহত আন্দোলনকারীকে ভর্তি করা হয়। গুলিতে প্রাণ হারান ১৬ জন। মৃতদের মধ্যে সর্বকনিষ্ঠের বয়স ১৬, সর্বজ্যেষ্ঠের ৭০। রাত এগারোটা থেকে ৎবিলিসিতে কার্ফু জারি করা হয়। মাত্র ৫ মিনিট আগে, ১০টা ৫৫ মিনিটে টেলিভিশনে জেনারেল রোদিওনভ এই কার্ফুর কথা ঘোষণা করেন। কার্ফু চলাকালীন প্রথম রাত্রেই গুলিতে প্রাণ হারান এক জর্জিয় যুবক।

'হোয়াট নেক্সট ?' সোভিয়েত সাপ্তাহিক পত্রিকা 'নোভয়ে ভ্রেমিয়া'-র সাংবাদিক গালিনা সিদোরোভা প্রশ্ন করলেন এদোয়ার্দ শেভারনাদ্‌জেকে। জর্জিয়ান নাগরিক শেভারনাদ্‌জে তখন সোভিয়েত ইউনিয়নের বিদেশমন্ত্রী।

'আই থিঙ্ক দ্য অ্যাবসেন্স অব ডায়ালগ ইজ ওয়ান রিজন ফর দ্য এপ্রিল ট্র্যাজেডি।' একই সঙ্গে শেভারনাদ্‌জে জোর দিলেন নানাত্ববাদের (প্লুরালিজম) বাস্তবায়নের উপর। তিনি আরো বলেন, 'সব স্তরের সব ধরনের মানুষের সঙ্গে কথা বলার ভাষা খুঁজে বের করতে হবে আমাদের। টু অ্যান ইভেন গ্রেটার ডিগ্রি উই মাস্ট এন্টার ইনটু আ ডায়ালগ উইথ আওয়ার ওউন পিপল।' সাক্ষাৎকারের শেষে তিনি বলেন, 'জর্জিয়ার এই আন্দোলনকারীরা আসলে পেরিস্ত্রোইকার বিরোধী।'

জর্জিয়ার আন্দোলনকারীরাও কিন্তু সেদিন তাঁদের জর্জিয়ার পুনর্নির্মাণই চেয়েছিলেন। এও তো এক ধরনের পেরিস্ত্রোইকা।

পেরিস্ত্রোইকা ও গ্লাসনস্তের নীতি বাস্তবায়িত হওয়ার ফলেই যেমন জর্জিয়ান সেনাবাহিনীর তাণ্ডবের খবর গোটা সোভিয়েত ইউনিয়নের সাংবাদপত্রের পাঠক ও টেলিভিশনের দর্শকদের জানা সম্ভব হয়েছিল, ঠিক তেমনই জর্জিয়ার ওই আন্দোলনকারীরা যে গভর্নমেন্ট হাউসের সামনে প্রকাশ্যে সরকারের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ দেখাতে পেরেছিলেন, তাও ওই পেরিস্ত্রোইকারই জন্য।

আলমারির কাপড়ের ভাঁজে লুকিয়ে রাখা ক্রশ এবার প্রকাশ্যে এন্দির গলায় ঝুলল। এ-ও বোধহয় পেরিস্ত্রোইকার সুফল।

জর্জিয়ায় স্বাধীন রাষ্ট্রের দাবিতে একদল আন্দোলন শুরু করল পেরিস্ত্রোইকার প্রভাবে। গর্বাচভের মিলিটারি বাহিনী তাঁদের উপর গুলি চালিয়ে ১৬ জনকে হত্যা করল—এই সংবাদ খবরের কাগজ এবং টেলিভিশনে নিপুণভাবে প্রচারিত হল গ্লাসনস্তের প্রভাবে, গুলি চলল বোধহয় পুনর্নির্মাণের বনিয়াদ শক্ত করতেই আর ১৬ জন জর্জিয়ানকে হত্যার প্রতিবাদে এন্দি, কমিউনিস্ট মস্কোতে, নিজে একজন ইয়ং কমিউনিস্ট হওয়া সত্ত্বেও 'ধর্মীয়' ক্রশ গলায় তুলল প্রকাশ্যে পেরিস্ত্রোইকা-উদ্ভূত খোলা হাওয়ার মদতে। সবই পেরিস্ত্রোইকার জন্য। এ যেন টকটকে লাল থোকা থোকা গোলাপ ফুল ; শ্রেণিবিভক্ত সমাজের এক জোতদারেরও ভালো লাগে আবার এক ভূমিহীন কৃষকেরও ভালো লাগে।

৮৯-এরই জুলাই মাসে বেড়াতে গেলাম এন্দিদের ৎবিলিসির বাড়িতে। অনেকদিন ধরেই এন্দি আর ওর মা নেমন্তন্ন করে করে বোধহয় ক্লান্ত হয়ে গিয়েছিল। এন্দি শুধু বলত ওদের জর্জিয়ার গল্প। পাহাড়ে ঘেরা ছোট্ট শহর ৎবিলিসি আছে সেই জর্জিয়ায়। এন্দি বলত ওদের ৎবিলিসির মতো অমন সুন্দর শহর এই ভূখণ্ডে আর দ্বিতীয়টি নেই।

মস্কোর কুয়াশা-বরফ-কন্‌কনে ঠান্ডা হাওয়ার শন্‌শন্‌ আর তুষারঝড়ের উৎপাত—এই নিয়ে শীতকাল। টানা ছ-মাস এই বিতিকিচ্ছিরি আবহাওয়া সকল-সন্ধ্যা দুপুর-রাত্তির সব কিছুকে মিলিয়ে মিশিয়ে যেন একরকম করে রাখে। সময় কেবল ঘড়ির কাঁটায় পালটায়, আকাশ দেখে বোঝবার জো নেই। সন্ধ্যাবেলাগুলো এন্দির সঙ্গে গল্প করে কাটত। ককেশাস পাহাড়ের কোল ঘেঁষে, কৃষ্ণসাগরের তীরে রোদ ঝলমলে উষ্ণ ওদের জর্জিয়া। এন্দি বলত সেসব গল্প। ওই কন্‌কনে ঠান্ডার মধ্যেও এন্দির গল্প সত্যিই যেন একটু উষ্ণতা ছড়িয়ে দিত। সেসব গল্প শুনতে শুনতেও আমি টের পেতাম জর্জিয়ানদের রুশ-বিদ্বেষের ঝাঁঝ। আক্ষরিক অর্থেই 'ঝাঁঝ' টের পেতাম। সেটা কথার, বিশ্বাসের আর নিশ্বাসের। এন্দিকেও দেখেছি আর অনেক জর্জিয়ানকেই দেখেছি ভীষণ রসুন খায়। প্রায় সব খাবারেই। আর বিশ্বাস, যা এন্দিকে শুধু রুশ-বিদ্বেষীই করেনি, তার মনে রুশিদের সম্পর্কে যে ঘৃণার জন্ম দিয়েছিল, সেই বিশ্বাসেরও ভিত্তি ছিল মস্কোর এই ছ-মাস জোড়া, দিন-দুপুর সন্ধ্যা-রাত্তির এক করা শীতকালটার বিচ্ছিরি আবহাওয়া। এমনিতেই ও কথা বলত খুব উত্তেজিত ভঙ্গিতে, ভীষণ হাত-পা নেড়ে। শীতকালটায় ওর এই উত্তেজনা এবং হাত নাড়ানাড়ির তীব্রতা বেড়ে যেত। একবার উঠে, একবার বসে, খানিক পায়চারি

করে চিৎকার করতে করতে এন্দি বলত, 'এমন ঠান্ডা স্যাঁতসেঁতে ক্লাইমেট! তাই মানুষগুলোও এরকম—যান্ত্রিক, নিষ্প্রাণ, খট্‌খটে-শীতল, যেন এক-একটা রোবোট। আমরা উষ্ণ দেশের মানুষ, সেই জন্যই আমরা এত ফুর্তিবাজ, এত দিলদার। আমরা ইতালিয়ানদের মতো। শুধু দেখতে নয়, আচার-ব্যবহারেও। যেমন ঠান্ডা-শীতল, তেমন শয়তান এই রুশিগুলো।'

এর আগেও অনেকবার এন্দিদের বাড়ি যাব বলে প্ল্যান করেও যাওয়া হয়নি বলে, এবারও যখন ওকে বললাম জুলাই-আগস্টে যাব, শুনে হাত-পা নেড়ে স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতে এন্দি বলল, 'তুই-ও রুশিগুলোর মতোই হয়ে গেছিস। শুধু ইনিয়ে বিনিয়ে মিথ্যে কথা বলিস।'

রুশিদের যে এন্দি একটু অপছন্দ করে তা আগেই টের পেয়েছিলাম। এপ্রিলে জর্জিয়ার গুলি চলার পর লক্ষ করলাম অন্য এন্দিকে—অপছন্দের বিষয়টি জানান দিতে বেশ সোচ্চার। যাবতীয় 'খারাপ জিনিস' যা এন্দির অপছন্দের তা এবং 'রুশিরা' ওর কাছে সমার্থক হয়ে উঠল। কথায় কথায় ও তা প্রকাশ করে ফেলত। আমি ওকে বোঝালাম, সত্যিই এই গরমের ছুটিতে আমি ৎবিলিসি যাব।

গরমের ছুটি থাকত জুলাই-আগস্ট এই দু-মাস। সেসময় মস্কোতে এত গরম পড়ে যে মনে হয় না এটা আদপেও একটা শীতের দেশ। সকাল নটা থেকে কড়া রোদ, বাতাসে আর্দ্রতা কম, ঘরে বাইরে—কোথাও টেকা দায়।

যে ছ-মাস মস্কোয় শীত থাকে, অর্থাৎ অক্টোবর থেকে মার্চ, পুরু বরফের চাদরের নিচে নির্লিপ্ত নিস্তেজ হয়ে ঘুমিয়ে থাকে চারপাশটা। তাপমাত্রা নেমে আসে শূন্যের থেকেও ২৫-৩০ ডিগ্রি নিচে। গাছপালা পাতাহীন। হাঁটু পর্যন্ত উঁচু 'সাপাগি' বা বরফে পথ চলার বিশেষ জুতো, যার বাইরেটা চামড়ার আর ভেতরটা ফারের। ফারের টুপি 'শাপ্‌কা', হাঁটুর নিচ পর্যন্ত লম্বা ভারী ওভারকোট—'পাল্‌তো'। এসব তখন মস্কোর রাস্তায় একমাত্র দৃশ্যমান ঘটনাবলি। চারদিকে কেমন একটা ঝিম্ ধরা, কোলাহলহীন, প্রাণহীন ভাব। সকাল পৌনে নটায়ও আলো ফোটেনি। নটা থেকে ইউনিভার্সিটির ক্লাস শুরু হত। তখন অন্ধকার, আবার যখন ক্লাস শেষ করে সাড়ে তিনটে-পৌনে চারটে নাগাদ হস্টেলে ফিরতাম, তখনও অন্ধকার।

বাইরে নুনের ঢিবির মতো দেখতে বরফের কুচির স্তূপ, সঙ্গে তুষারঝড় আর দিনরাত্তির এক-করা ঘন কুয়াশা।

ভেতরে আমাদের হস্টেলে ঘরগুলো সেন্ট্রাল হিটিংয়ের আওতায়, তাই তাপমাত্রা ২০-২২ ডিগ্রি। একটা পাতলা সোয়েটার পরলেই যথেষ্ট। তবে কাচের জানলার দুই কপাটের মাঝের একটুখানি ফাঁকা অংশটা দিয়ে হু-হু করে কনকনে হাওয়া যাতে না ঢোকে, তারও ব্যবস্থা ছিল। ব্যাপরটা আমার কাছে বেশ অভিনব ঠেকত। দুই কপাটের মাঝখানের সরু লম্বা ফাঁকা অংশটা আগে তুলো দিয়ে ভরাট করা হত। তার উপর সরু সাদা কাগজ, যা রিল আকারে বাজারে কিনতে পাওয়া যেত, দুধ মাখিয়ে সেঁটে দেওয়া হত। আঠার বদলে দুধের ব্যবহার দেখে বেশ অবাক লাগত।

এত ঠান্ডা, এত কষ্টের মধ্যেও সন্ধ্যাবেলা থিয়েটার গিয়ে ব্যালেরিনাদের নাচ আর চাইকোভ্স্কির পাগল-কর সুর শরীরে খানিকটা উষ্ণতা ছড়াত। এর মধ্যেই অনেক রুশিকে বলতে শুনতাম, শীতকালটাই নাকি তাদের সবথেকে পছন্দের ঋতু!

জানুয়ারির শেষভাগে ১০-১৫ দিনের জন্য ইউনিভার্সিটি বন্ধ থাকে—শীতের ছুটি। ৭ ফেব্রুয়ারি থেকে আবার ক্লাস চালু হয়, শুরু হয় সেকেন্ড সেমিস্টার।

বরফ গলা শুরু হয় এপ্রিলের মাঝামাঝি নাগাদ। রাস্তায় জমে থাকা পুরু বরফের মাঝে মাঝে যে ফাটল ধরে, তা দিয়ে কুলকুল করে জল বইতে থাকে। আমাদের এক অধ্যাপক বলতেন, 'তোমরা যাই বল না কেন, তোমরা ট্রপিকাল কান্ট্রির ছেলেমেয়েরা ছয় ঋতুর তফাত ধরতে পারো না তোমাদের দেশে। আমরা তারিয়ে তারিয়ে ছয় ঋতুর পরতে পরতে লুকিয়ে থাকা সৌন্দর্যকে উপভোগ করি।'

অধ্যাপক কন্‌কনে ঠান্ডায় যখন এই ধরনের রোমান্টিক সমস্ত কথাবার্তা বলতেন, এন্দি ঠোঁট বেঁকিয়ে আমায় বলত, "সব ব্যাপারে রুশিগুলোর বাড়াবড়ি। ওয়েদার ভালো বা ছ-টা ঋতুকে স্পষ্টভাবে আলাদা করা যায়, তাতে ওদের কৃতিত্বের কী? রাশিয়ায় ওরা না থেকে আমরাও থাকতে পারতাম, তোরাও পারতি, তাতে কী হল? এটা কি মানুষের তৈরি করা, নাকি রুশিরা এই ওয়েদারটা বানিয়েছে?

ওভারকোট আর গরম কাপড়ের খোলশ ছেড়ে বেরিয়ে আসতে শুরু করল মস্কো। নিষ্প্রাণ, মূক-বধির শীতের মস্কো বসন্তের স্পর্শে তখন বাঙ্ময়। বসন্তের মাদকতায় আমোদিত। হঠাৎ একদিন সকালে সূর্য প্রখর হল। হঠাৎ দেখা গেল, গাছের ডালে ডালে চকচকে সবুজ নতুন পাতা। সরে গেল তুলো। ছিঁড়ে গেল কাগজ। খুলে গেল জানলা। আমার হস্টেলের ঘর তখন আলোয় আলোয় উদ্ভাসিত। হটে গেল শীতের শাসন। যাবতীয় অসাড়, কঠিন, শীতলকে তফাত করে দিয়ে বসন্ত তখন আলোয় আলোয় উজ্জ্বল।

চারদিকে উৎসবের মেজাজ। চারদিকে সবুজ। মখমলের মতো ঘাসের গালিচা। মাথার উপরে, পৃথিবীর সমস্ত নীল রং মিশিয়ে তৈরি করা নীল আকাশটা। বাতাসে একটা নেশা ধরানো গন্ধ। আড়মোড়া ভেঙে উঠে দাঁড়িয়েছে মস্কো। এখন বসন্তকাল—'ভিস্‌না'।

পৃথিবীর স্থলভাগের এক-ষষ্ঠাংশ জুড়ে যে বিশাল সোভিয়েত ইউনিয়ন (আমি যখনকার কথা লিখছি—১৯৮৯, তখনও সোভিয়েত ইউনিয়নের আগে 'পূর্বতর' শব্দটি বসেনি) তার অধিকাংশটাই এশিয়া মহাদেশের অন্তর্গত। প্রকৃতপক্ষে উরাল পর্বতই সোভিয়েত ইউনিয়নকে দুই মহাদেশে ভাগ করেছে। জর্জিয়া এশিয়াতে। বলা বাহুল্য, ভারতও। অতএব এন্দি প্রায়ই আমাকে বলত, 'ইউরোপের এই বিশ্রী ওয়েদারে আমরা, এশীয়রা বেশিদিন থাকতে পারি না। তুই আমাদের বাড়ি চল। কলকাতার মতো ৩৮-৪০ ডিগ্রি টেম্পারেচার না হলেও জর্জিয়ার আবহাওয়া তোর মানানসই লাগবে।'

আমাদের হস্টেলের পেছনে বার্চ গাছের ঘন বন ছিল। শীতকালে গাছের সব পাতা ঝরে যেত। ডালপালা ঢাকা পড়ত বরফে। গরমকালে সেই ফাঁকা ডালপালা সবুজ ঘন পাতায় ভরে যেত। হস্টেলের ঘরে কোনো ইলেকট্রিক পাখা ছিল না। হস্টেল বলে নয়,

গোটা মস্কোতেই অধিকাংশ বাড়িতে পাখার চল নেই। শুধু কয়েকটা দোকানে পাখা ঘুরতে দেখেছি, তা-ও ছোটো ছোটো টেবিল পাখা।

গরমকালে হস্টেলের ঘরে থাকা যখন অসম্ভব হয়ে উঠত, তখন আমরা দল বেঁধে বার্চ গাছের বনটায় গিয়ে বসতাম। ইউনিভার্সিটি কর্তৃপক্ষ সেখানে কাঠের সুন্দর নকশা তোলা কতকগুলি বেঞ্চ বানিয়ে দিয়েছিল। বেঞ্চের মাথার উপর কাঠের শেড, তাতেও নকশা।

অসহ্য গরমে ওখানে বসে খানিক স্বস্তি পাওয়া যেত। তবে কিঞ্চিৎ মশার উৎপাত ছিল। শীতকালে আবার মস্কোয় মশার দেখা পাওয়া যায় না। মাছিরও না। গরম এলেই তারা হাজির হয়। তবুও এই অসহ্য গরম থেকে রেহাই পেতে আমরা বার্চের ছায়ায় গিয়ে বসতাম। এন্দি থাকত আমার সঙ্গে। আর ওর স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতে ঘন ঘন হাত-পা নেড়ে বলত, ওদের বাড়িতে যাওয়ার কথা।

৮৯-এর জুলাইয়ে ৎবিলিসি গেলাম শুধুমাত্র এন্দির নাছোড় নেমন্তন্ন রক্ষা করতে, তা নয়। মস্কোয় বসে টেলিভিশন আর খবরের কাগজে ৎবিলিসির 'এপ্রিল ট্র্যাজেডি' সম্পর্কে জেনেছি। ৎবিলিসিতে সেই আন্দোলন আর জর্জিয়ার ওই মহিলাদের প্রতি আমার এক দুর্নিবার আকর্ষণ তৈরি হয়েছিল। রওনা দিলাম এন্দিদের বাড়ির দিকে।

এয়ারপোর্টে এন্দি আর ওর দাদা গিয়া ফুল হাতে আমায় স্বাগত জানাতে হাজির ছিল। এয়ারপোর্ট থেকে একটু এগিয়ে রাস্তার ধারে একটা বিরাট মূর্তি দেখতে পেলাম। এন্দি বলল, "এই আমাদের 'জর্জিয়ার মা'।"

আমি তাকিয়ে দেখলাম সেই 'মা'-কে। বিশাল মূর্তি। রোদে-জলে রংটা একটু মলিন হলেও ঋজু ভঙ্গি অদ্ভুত একটা তেজের সঞ্চার করেছে মূর্তিটায়। তার বাঁ হাতটা কনুই থেকে আড়াআড়ি ভাবে উপর দিকে তোলা। হাতে ধরা একটা বাটি। ডান হাতে রয়েছে একটা খোলা তলোয়ার। এন্দি বলল, 'ৎবিলিসির যে কোনো জায়গা থেকেই তুই এই মূর্তিটা দেখতে পাবি। ও আমাদের মা। জর্জিয়ার মা। ওই যে বাটি দেখছিস হাতে, ওটা অতিথি আপ্যায়নের জন্য। আর ওই খোলা তলোয়ারটা শত্রুর সঙ্গে লড়াইয়ের জন্য। আমরা বিশ্বাস করি, গোটা জর্জিয়া ওই মায়ের সন্তান। তুই এর থেকে আমাদের স্বভাব চরিত্রটা বুঝতে পারবি।'

জর্জিয়ায় যাওয়ার আগে 'এপ্রিল ট্র্যাজেডি'-র সেই মহিলাদের দেখা, তাঁদের কথা শোনার, তাঁদের সেই আন্দোলনের জায়গা দেখার একটা অদম্য ইচ্ছে তৈরি হয়েছিল আমার। হয়তো তার অন্যতম প্রধান কারণ ছিল, একটা আন্দোলনে মহিলাদের এই বীরত্বপূর্ণ অংশগ্রহণ। জর্জিয়ার এই মায়ের মূর্তি দেখে আমার মনে হল, আন্দোলনে মহিলাদের এরকম সক্রিয় অংশগ্রহণ, আলোড়ন তোলা কোনো নতুন ঘটনা নয়। গোটা জর্জিয়াবাসী যদি এই মূর্তির সন্তান হয়, যা এন্দির বিশ্বাস, তাহলে কাজের প্রেরণাও যে ওই মূর্তির কাছ থেকে আসে, তা বলাই বাহুল্য। আমাদের দেশে অনেক দেবীমূর্তি এখানে ওখানে পূজিত হন। সেখান থেকে কোনো প্রেরণা দেশবাসী নেয় কিনা বা ধর্মীয় দেবমূর্তিদের আদৌ কোনো প্রেরণা দেওয়ার ক্ষমতা আছে কিনা, তা আমি আগে খুব

ভাবতাম। এখন অবশ্য আমার ভুল ভেঙেছে। এখন ধর্মীয় দেবদেবীদের নামে, (নাকি তাদের প্রেরণায় ?) মন্দির-মসজিদ ভাঙছে দেখি। এন্দিরা জর্জিয়ার মায়ের কাছ থেকে লড়াইয়ের প্রেরণা নেয় ; তাতে ট্যাঙ্কের সামনে অনশনরত মহিলারা অনড় থাকার স্পর্ধা পায়।

আমি সেই বিশাল জর্জিয়ার মায়ের মূর্তি দেখতে দেখতে ভাবছিলাম, আমাদের কলকাতায় একটা ময়দান আছে, সেখানে কালো পাথরে তৈরি এক বুড়ির মূর্তি আছে, তার কাঁধে দেশের জাতীয় পতাকা। ওই বুড়ি—মা মাতঙ্গিনী। তার কাছ থেকে কি কেউ প্রেরণা নেয় ? ওই মুহূর্তে আমার জর্জিয়ার মাকে মাতঙ্গিনী মনে হচ্ছিল।

এন্দি তাড়া দিল, 'চল, দেরি হয়ে যাবে।' আমরা গিয়ে গাড়িতে উঠলাম। গিয়া জোরে চালিয়ে দিল।

উঁচুনিচু পাহাড়ি রাস্তা দিয়ে গাড়ি চলেছে। ছবির মতো ছোট্ট সুন্দর ৎবিলিসি। তবে রাস্তায় অসংখ্য গাড়ি, পায়ে হাঁটা লোক বড়ো একটা চোখে পড়ল না। এয়ারপোর্ট ছেড়ে আমরা অন্তত ৫-৭ কিলোমিটার এগিয়ে গেছি এন্দিদের বাড়ির দিকে।

গাড়িতে উঠেই আমি এন্দিকে বলে রেখেছিলাম, ৯ এপ্রিল যেখানটায় গুলি চলেছিল, সেখানটা দেখাতে। মূর্তির কথা আমি আগে এন্দির মুখে শুনিনি। এটা আমার উপরি পাওনা হল।

একটা বেশ বড়োসড়ো বাড়ির সামনে গাড়ির গতি কমিয়ে গিয়া বলল, 'এই যে সেরিনা, এটা আমাদের গভর্নমেন্ট হাউস। ওই ওখানটা দ্যাখ, ওই স্কোয়ারেই ৯ এপ্রিল গুলি চলেছিল।' আমি ভেবেছিলাম সেদিনের ঘটনার কথা কিছু জিজ্ঞেস করব। গিয়া আচমকা তড়িৎগতিতে গাড়ি ছুটিয়ে দিল। এন্দি কেমন যেন চুপ হয়ে গেল।

কিছুক্ষণের মধ্যেই শহরের প্রায় কেন্দ্রে এন্দিদের বাড়িতে পৌঁছে গেলাম। আমার জর্জিয়াতে থাকার জন্য বরাদ্দ দশ দিনের প্রথম দিন শুরু হল।

যখনকার কথা লিখছি, সেই ৮৯ সালে জর্জিয়ার লোকসংখ্যা ছিল ৫৪,৪৯,০০০। সে বছরেই ৎবিলিসির লোকসংখ্যা ১২,৬০,০০০। এই প্রজাতন্ত্রে জন্মেছিলেন স্তালিন। যাঁকে নিয়ে রাশিয়ায় এত গোলমাল, এত বিতর্ক, এত আলোচনা, এমনকী মৃত্যুর এতগুলো বছর পরেও। এই প্রজাতন্ত্রের ৎবিলিসি শহরেই এন্দিদের পাড়ায় এদোয়ার্দ শেভারনাদ্জের বাড়ি। ৮৯-এ তিনি ছিলেন সোভিয়েত বিদেশমন্ত্রী। সেই সুবাদে মস্কোতেই থাকতেন। ৎবিলিসির ফ্ল্যাট তাই ফাঁকাই পড়ে থাকত। এন্দি আমায় দেখাল বাড়িটা।

এন্দির বাবা এঞ্জিনিয়ার। মা সাংবাদিক, 'জারইয়া ভাস্তোকা' বা 'পূর্বের ভোর' কাগজের রিপোর্টার। জর্জিয়ার বেশ নামকরা কাগজ এটি। দাদা গিয়া আমাদের ইউনিভার্সিটি থেকেই পাশ করেছে কয়েক বছর আগে। এন্দির ছোটোভাই দাথো তখনও স্কুলে পড়ত।

ওদের ফ্ল্যাটটা ৎবিলিসির সবচেয়ে অভিজাত এলাকায়। বিশাল বড়ো। ছোটোবড়ো মিলিয়ে গোটা ছয়েক ঘর এবং খান তিনেক বারান্দা। বিশাল একটা খাবার ঘর। মস্কোর ছোটোখাটো ফ্ল্যাটগুলোতে খাবার টেবিল থাকে রান্নাঘরেরই একপাশে। এন্দিদের পাঁচজনের সংসারে তিনটে গাড়ি। ৎবিলিসিতে সকলেই প্রায় এন্দিদের মতো ধনী।

ওদের বাড়িতে পৌঁছাতেই এন্দির মা আমাকে জড়িয়ে ধরে বললেন, 'এতদিনে এলি তাহলে।' এন্দির মা যখনই মস্কোতে আসতেন, আমাদের হস্টেলের ঘরেই থাকতেন। তাই আলাপ আগেই ছিল।

আমার থাকার বন্দোবস্ত হল এন্দির ঘরেই। আমাকে নিয়ে তরতরিয়ে নিজের ঘরের দিকে যেতে যেতে এন্দি বলল, 'আমার সঙ্গো এক খাটে শুতে তোর কোনো অসুবিধা হবে না তো?' ঘরে ঢুকে চোখটা জুড়িয়ে গেল। দরজা-জানলা থেকে শুরু করে সব ফার্নিচার এমনকী পরদা পর্যন্ত সমস্ত ধবধবে সাদা। ঘরের মাঝখানে বড়ো একটা খাট, এক কোণে ড্রেসিং টেবিল, তার পাশে পড়ার টেবিল চেয়ার। অন্য কোণে একটা টিভি। টিভির রং কালো হলেও সাদা নেট দিয়ে চাপা।

চারদিকে চোখ ফিরিয়ে বাহ্ বলে হাতের ফুলের গোছাটা, যেটা এন্দি আমাকে এয়ারপোর্টে দিয়েছিল, ড্রেসিং টেবিলের উপর যেই রাখতে গেছি, এন্দি একেবারে হাঁ হাঁ করে উঠল। "দাঁড়া, দাঁড়া, ওখানে রাখছিস, কেন? ফুলদানি দিচ্ছি, ভালো করে সাজিয়ে রাখ। যেখানের জিনিস, ঠিক সেখানেই রাখবি।" ওর কথা শুনে আমি তো তাজ্জব। এই সেই এন্দি, যে ইউনিভার্সিটি থেকে হস্টেলে ফিরেই ঘরের এক কোণে জুতো দুটো ছুঁড়ে ফেলে, ওভারকোটটা ছুঁড়ে দেয় আরেকদিকে, টুপিটা গড়াগড়ি যায় মেঝেতে, সারা বিছানা জুড়ে ছড়িয়ে রাখে সমস্ত বইখাতা, সেই এন্দি যে কোনোদিন সময়মতো দরকারি বইখাতা খুঁজে পায় না, সেই এন্দি কিনা বলছে, 'যেখানের জিনিস, ঠিক সেখানেই রাখবি'। সেই এন্দি যে হস্টেলের ঘর কোনোদিন একটুও পরিষ্কার করতে চায় না আর এ নিয়ে কিছু বললে উলটে উত্তর দেয় 'প্রতিভাবান বা দার্শনিক গোছের লোকেরা অগোছালোই হয়। একটু এলোমেলো ভাবে থাকলে দেখবি হয়তো আমরাও একদিন বিরাট নামীদামি কেউ হব।' সেই এন্দি, গত দুবছর ধরে যার সঙ্গো আমার একই ঘরে বাস, আর আমার সামনের এই এন্দি, এই ফিটফাট ঘরটার সচেতন মালিক—একই লোক? আমার বিশ্বাস হচ্ছিল না।

সেদিন রাতেই ৎবিলিসি দেখতে বেরোলাম। এন্দি, গিয়া, দাথো, ওদের মা আর আমি। পাহাড়ি ৎবিলিসির চড়াই উতরাই দিয়ে আমরা যাচ্ছি, এয়ারপোর্ট থেকে এন্দিদের বাড়ি যাওয়ার সময় দিনের আলোয় যে ৎবিলিসিকে দেখেছিলাম, এ যেন তার থেকে একেবারে আলাদা—ঝলমলে আলোর পোশাকে সুন্দরী, ধনী ৎবিলিসি।

গাড়িতে ওঠার পর থেকেই দাথো আমার 'গাইড' হয়ে গেছে। "এই দ্যাখ, এই মাঠটাতে আমি বিকেলে খেলতে আসি। ওই বাঁদিকের গলিটা দিয়ে একটু গেলেই আমার স্কুল। জানিস তো, সামনের ওই দোকানটাতে দারুণ 'খাচাপুরি' পাওয়া যায়। তুই কখনো 'খাচাপুরি' খেয়েছিস?'—এতক্ষণ একদমে বক্‌বক্ করে দাথো আমার দিকে তাকাল। আমি বললাম, হ্যাঁ, ওই সামোসার মতো চিজের পুর দেওয়া থাকে, তাকেই তো খাচাপুরি বলে। মস্কোতে বিক্রি হয় তো, খেয়েছি। আমার কথা শুনে গিয়া হো হো করে হেসে উঠল। এন্দির মা বললেন, "মস্কোর রাস্তায় '—'য়ের মতো জিনিসগুলো বিক্রি করে তুই ওগুলোকে খাচাপুরি বলছিস? জর্জিয়ানরা একথা শুনলে তোর উপর খেপে যাবে। রুশিরা

আবার খেতে জানে নাকি ? তোরা ইন্ডিয়ানরা তো বেশ ভালো রান্নাবান্না করিস শুনেছি, তুই যে কী করে এতদিন রুশিদের ওই '—'য়ের মতো খাবারগুলো খাস জানি না! চল আমরা এখানে নামি। আসল খাচাপুরি কাকে বলে খেয়ে দ্যাখ একবার।"

কাফেটাতে খাচাপুরি ছাড়াও নানারকম জর্জিয়ান খাবারদাবার বিক্রি হচ্ছিল। ভাজাভুজি, মশলাদার নানা ধরনের খটোমটো অচেনা নামের খাবার সব। খুব তারিয়ে তারিয়ে খেতে খেতে এন্দি আমাকে বলল, 'এখন বুঝতে পারছিস তো, ইউনিভার্সিটি ক্যান্টিনে খাওয়ার সময় কেন আমি বলি, রুশিগুলো দেখতে যেমন বিশ্রী, খাবার দাবারও তেমনই বিশ্রী—' এন্দির কথা শেষ হওয়ার আগেই গিয়া বলে উঠল, 'আমার তো মনে হয় কয়েক পুরুষ আগেও রুশিগুলো সবকিছু কাঁচাই খেত। এই সবে একটু-আধটু রান্না করতে শিখেছে।' এন্দিদের এই সমবেত 'রুশিবিদ্বেষ' মজাদার খাবারগুলোকেও আমার কাছে কেমন যেন বিস্বাদ করে দিল।

দিনেরবেলার মতো রাতেও ৎবিলিসিতে অসংখ্য গাড়ি; পায়ে হাঁটা লোক চোখেই পড়ছে না। এন্দিকে একথা বলতেই গর্ব মেশানো গলায় ও বলল, 'আমাদের এখানে প্রায় সবারই গাড়ি আছে। গাড়ি না থাকলে মানুষ যে কী করে সুস্থভাবে বাঁচতে পারে ভেবে পাই না।' এন্দির মা সামনের সিট থেকে ঘাড় ঘুরিয়ে বললেন, 'ওর দোষ কী ? মস্কোর গরিব লোকজনকে দেখে ও হয়তো ভেবেছে সব সোভিয়েতই রুশিগুলোর মতো অমন হাভাতে।'

দাথো ওর মাকে জিজ্ঞেস করল, 'আমরা এবার কোথায় যাব ?' উনি জানালেন, ওনার ছোটোমাসি মানে এন্দির দিদিমার বাড়ি। এন্দির এক ভারতীয় বন্ধু ৎবিলিসিতে এসেছে শুনে সেই বৃদ্ধার খুব শখ হয়েছে তাকে দেখার। এন্দির মায়ের এই কথা শুনেই গিয়া খুব উত্তেজিত ভঙ্গিতে ওর মাকে জর্জিয়ান ভাষায় কী যেন বলল। কিছুই বুঝলাম না। শুধু বুঝলাম কোনো একটা ব্যাপারে দুজনের মধ্যে বেশ কথা কাটাকাটি হচ্ছে। এন্দির মুখটা কেমন ফ্যাকাশে হয়ে গেল। ও হঠাৎ আমাকে রুশিতে বলে উঠল, 'এখন বোধহয় দিদিমা ঘুমিয়ে পড়বে। সাড়ে সাতটা বাজতে চলল। আমি বরং তোকে পরে নিয়ে যাব দিদিমার কাছে।'

গাড়ির ভেতরের গুমোট পরিবেশটা কাটানোর জন্য এন্দি অকারণেই খুব বকবক করতে শুরু করল। 'আচ্ছা সেরিনা, প্রায় দু-বছর হতে চলল তুই মস্কোতে আছিস, কিন্তু সত্যি কথা বল তো, এখন পর্যন্ত কোনো 'মস্‌ক্‌ভিচ্ (মস্কোর বাসিন্দা) তোকে নিজের বাড়িতে যেতে বলেছে ? ওরা ভীষণ অদ্ভুত, জানিস তো, কিছুতেই কাউকে বাড়িতে ডাকবে না!' দাথো হঠাৎ গম্ভীর গলায় এন্দিকে বলল, 'শোন, তুই যদি মন দিয়ে পড়াশোনা না করিস, একটা প্যাংলা দেখতে রুশির সঙ্গে ঠিক তোর বিয়ে দিয়ে দেব।' দাথোর এ হেন রসিকতায় (?) সকলে হো হো করে হেসে উঠল।

সুন্দর নতুন একটা শহর, সন্ধ্যার ফুরফুরে হাওয়া, ভরপেট খাওয়া-দাওয়া, অনেকদিন পর পারিবারিক পরিবেশে হইচই করে গল্প—সবকিছু সত্ত্বেও আমার মনটা ক্রমশ বিষণ্ণ হয়ে যাচ্ছিল। রুশিদের ওরা এত অপছন্দ করে ? সবসময় প্রত্যেকটা কথায় তা প্রকাশ

হয়ে পড়ছে। আর ওরা তা লুকানোরও কোনো চেষ্টা করছে না।

এই সেই লেনিনের সোভিয়েত ইউনিয়ন ! বিশ্ব বিপ্লবের কর্ণধার সোভিয়েত ইউনিয়ন ! 'দুনিয়ার মজদুর এক হও' ! স্লোগানের সার্থক রূপকার সোভিয়েত ইউনিয়ন ! যে শহরে পড়াশোনার সুবাদে ৮৭ সাল থেকে আছি, যে শহর ইউনিয়ন অব সোভিয়েত সোস্যালিস্ট রিপাবলিকের রাজধানী, যে শহরে বসে এই জর্জিয়ারই একজন কয়েক দশক ধরে গোটা সোভিয়েত ইউনিয়ন শাসন করেছেন, যে শহরের একটি ইউনিভার্সিটির একটি হস্টেলের একটি ঘরে এই এন্দির সঙ্গেই আমি থাকি, সেই এন্দি, যে একজন সোভিয়েত নাগরিক, জর্জিয়ান সোভিয়েত সোস্যালিস্ট রিপাবলিকের রাজধানী ৎবিলিসিতে যার জন্ম, যে একজন 'ইয়ং কমিউনিস্ট' বা 'কমসামোল' সদস্য, সেই এন্দির মস্কো বা রুশিদের প্রতি এহেন ঘৃণা বা বিদ্বেষের কারণ কী হতে পারে তা নিয়ে ভাবতে বসে সব জট পাকিয়ে যাচ্ছিল।

এন্দির যে রুশিদের পছন্দ না, তা আমি জানতাম, আগেই টের পেয়েছি। কিন্তু সেই অপছন্দ যে কখন ঘৃণার রূপ নিয়েছে, তা এন্দি নিজেও হয়তো জানে না। শুধু কি এন্দি? গিয়া, যে গিয়া ৬ বছর মস্কোয় থেকে প্যাট্রিস লুমুম্বা ইউনিভার্সিটিতে পড়াশোনা করেছে, যে গিয়ার নিঃসন্দেহে মস্কোতে অনেক রুশি বন্ধুবান্ধব বা পরিচিত আছে, যে গিয়া একটা রুশি মেয়েকে একবার বিয়েও করতে চেয়েছিল কিন্তু ওর মায়ের আপত্তিতে শেষ পর্যন্ত করেনি (এন্দিই আমাকে একথা বলেছিল), যে গিয়াও একজন 'ইয়ং কমিউনিস্ট', তারও কী প্রচণ্ড রুশ বিদ্বেষ !

এন্দির মা জর্জিয়ার একটি নাম করা কাগজের সাংবাদিক। তিনিও রুশিদের এত ঘৃণা করেন? কত প্রজন্ম ধরে এই পারস্পরিক ঘৃণা প্রবাহিত? এমনকী, স্কুলপড়ুয়া দাথোও জেনে গেছে, ও একজন জর্জিয়ান, আর শুধু সেই কারণেই রুশিদের গালাগালি দিতে হবে, সুযোগ পেলেই। মনে পুষে রাখতে হবে রুশিদের প্রতি শুধু রাগ, শুধু ঘেন্না, শুধু অপছন্দ, শুধু বিদ্বেষ। ওইটুকু ছেলে, সেও কিনা তার দিদি এন্দিকে শাসায় প্যাংলা রুশির সঙ্গে বিয়ে দিয়ে দেবে বলে। এত ঘৃণা, এত অপছন্দ, রাগ, বিদ্বেষ ! কেমন ইউনিয়ন ! 'লিডার অব দ্য লিডার্স' কমরেড ভ্লাদিমির ইলিচ উলিয়ানভ লেনিনের সোভিয়েতে এ আমি কী শুনছি ! কী দেখছি? এখনও যে দেওয়ালে দেওয়ালে দেখি 'মার্কসবাদ সর্বশক্তিমান কারণ ইহা সত্য, ইহা বিজ্ঞান', তাহলে এমনটা হয় কেন?

গাড়ি হু-হু করে এগিয়ে চলেছে। গিয়া আর ওর মা-র দুর্বোধ্য জর্জিয়ান ভাষায় ঝগড়া থেমেছে। আমার মন ভালো নেই।

আমরা এসে গেলাম বাড়িতে, মানে এন্দিদের বাড়িতে।

পরদিন সকালে উঠেই এন্দিকে বললাম, আজ আর অন্য কোথাও যাব না। তোদের গভর্নমেন্ট হাউসের কাছে নিয়ে চল। ৯ এপ্রিল সেখানে গুলি চলেছিল, সেখানে একবার যাব আজ।

এন্দিদের বাড়ি থেকে মিনিট পাঁচেক হাঁটলেই রুস্থাভেলি প্রসপেক্ট। শহরের যত গুরুত্বপূর্ণ অফিস-কাছারি, ইউনিভার্সিটি সেখানে। গভর্নমেন্ট হাউসও সেখানেই। আমাদের চৌরঙ্গির মতো একটা সদাব্যস্ত ভাব।

চওড়া রাস্তার দুধারে ঘেঁষাঘেঁষি কাফেগুলোর পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় তীক্ষ্ণ গলায় কে একজন 'এন্দি, এন্দি' করে ডেকে উঠল। আমরা পেছন ফিরে তাকালাম। পনিটেল বাঁধা গোলগাল ছটফটে একটা মেয়ে এক দৌড়ে এসে এন্দিকে জড়িয়ে ধরল। তারপর মিনিট খানেক দুজনেই হুড়মুড়িয়ে কথা বলে চলল। কেউ কারোর কথা শুনছে না, দুজনেই শুধু বলছে। আমি শুনলেও এক বর্ণ বুঝছি না। এটুকু শুধু বুঝছি যে ভাষাটা জর্জিয়ান। এতক্ষণে দুজনেই বোধহয় দম নেওয়ার জন্য একটু থামল। হাসিমুখে 'গামারজোবা এন্দি' বলতে বলতে ততক্ষণে একটি ছেলেও এন্দির সামনে এসে দাঁড়াল। 'গামারজোবা' মানে জর্জিয়ান ভাষায় 'হ্যালো'। এখানে আসার আগেই মস্কোতে এন্দির কাছ থেকে যে দু-চারটে জর্জিয়ান শব্দ শিখেছিলাম, তার মধ্যে একটা এই 'গামারজোবা'।

এন্দি এবার সম্বিৎ ফিরে পেল। আমার দিকে তাকিয়ে খুশিতে বলল, "এরা দুজন আমার একেবারে ছোটোবেলার বন্ধু। ক্লাস ওয়ান থেকে টেন পর্যন্ত একই ক্লাসের একই সেকশন-এ আমরা পড়েছি। স্কুল শেষ করে আমি মস্কোতে চলে গেলেও আমার বেশিরভাগ ক্লাসমেটের মতো এরাও ৎবিলিসি স্টেট ইউনিভার্সিটিতে ভরতি হয়েছে। এই গম্ভীর চেহারার 'ভদ্রলোক'টি হলেন আমাদের রিভাজ। জানিস তো, ক্লাসের সব মেয়েদের উপর বরাবর ও খুব 'দাদাগিরি' ফলাত। আর এই 'ক্রাসাভিৎসা' (সুন্দরী)-র নাম তামারা। আমার বেস্ট ফ্রেন্ড।"

তামারা একগাল হেসে এন্দিকে বলল, 'কী লাকি তুই, ভারতীয় মেয়ের সঙ্গে থাকিস, রাতদিন নিশ্চয় ইন্ডিয়ান ফিল্মের গল্প শুনিস।' রিভাজ দু-হাত জোড় করে নমস্কারের ভঙ্গি করে আমাকে জিজ্ঞেস করল, 'এভাবে তো?'

তামারা আর রিভাজও আমাদের সঙ্গে হাঁটতে হাঁটতে গভর্নমেন্ট হাউসের সামনে এসে হাজির হল। সেই গভর্নমেন্ট হাউস! এপ্রিলের সেই দিনগুলোতে টিভির পরদায় বারবার ফুটে ওঠা, বড়ো বড়ো থামওয়ালা হাউস! গম্ভীর চেহারার সাদা রঙের বিরাট সেই জর্জিয়ান গভর্নমেন্ট হাউস।

তামারা আমাকে জিজ্ঞেস করল, "ৎবিলিসিতে তো কত দেখার মতো জায়গা আছে। সব ছেড়ে তুমি এই গভর্নমেন্ট হাউস দেখার জন্য এত ব্যস্ত হয়ে উঠলে কেন?" আমি কিছু বলার আগেই এন্দি হইহই করে বলল, "ৎবিলিসি এয়ারপোর্ট থেকে বেরিয়ে পর্যন্ত গভর্নমেন্ট হাউসে আসার জন্য ও আমাকে একেবারে অস্থির করে দিয়েছে।"

রিভাজের চোয়ালগুলো কেমন শক্ত হয়ে গেল। গলার শিরা ফুলিয়ে উত্তেজিতভাবে বলল, "এক ঘন্টারও কম সময়ের মধ্যে ১৬ জন তরতাজা মানুষকে ঠিক কুকুর-বেড়ালের মতো গুলি করে মারল ওরা। কী জন্য? না, আমরা আর ক্রীতদাসের মতো বাঁচতে চাই না। কিন্তু ওরা যদি ভেবে থাকে, এতটুকুতেই জর্জিয়ানরা ভয় পেয়ে যায়, এত সহজেই আমাদের দমানো যায়, তাহলে ওরা ভুল করেছে। কুত্তার বাচ্চারা, জর্জিয়ানদের আসল রূপ এখনো দেখেনি।" একথা বলেই রিভাজ হাত জোড় করে আমাকে বলল, "সরি, কিছু মনে কোরো না, মুখ দিয়ে খারাপ কথা বেরিয়ে গেল। আসলে সেদিনটার কথা মনে করলেই আমার মাথায় কেমন আগুন জ্বলে ওঠে। নিজেকে সামলে রাখতে পারি না

কিছুতেই।"

হাসিখুশি, গোলগাল, ছেলেমানুষিতে ভরা তামারার মুখটাও ততক্ষণে কেমন কঠোর হয়ে উঠেছে। বয়স যেন বেড়ে গেছে এক মুহূর্তের ব্যবধানে। কর্কশ গলায় ও আমার উদ্দেশে বলে উঠল, "এপ্রিল ট্র্যাজেডির কথা তুমি জানো? কে বলেছে তোমাকে? ও, রাশিয়ান টিভি আর রাশিয়ান খবরের কাগজ থেকে জেনেছ। সব মিথ্যে কথা। নিজেদের মতো করে সাজিয়ে গুছিয়ে খবর বানিয়ে সবাইকে বিভ্রান্ত করেছে ওই বেজন্মাগুলো। আমি তোমাকে বলছি ঠিক কী হয়েছিল। তুমি হস্টেলে গিয়ে বাকি বিদেশি ছাত্রছাত্রীকে, মানে যতজনকে সম্ভব, বোলো সত্য ঘটনার কথা। শয়তানগুলোর মুখোশ খোলা দরকার। জর্জিয়ান টিভিতে যখন ঘোষণা করল যে কর্তৃপক্ষ অনশনকারীদের এই স্কোয়ার থেকে হটাতে আর্মড ফোর্স ব্যবহার করবে, তখন আমি ছুটতে ছুটতে এসে হাজির হয়েছিলাম এখানে। আমারই মতো উদ্বেগ আর আতঙ্কে, টিভির ওই ঘোষণা শোনার পর, এখানে এসে জড়ো হয়েছিল প্রায় দশ হাজার লোক। তাদের মধ্যে ছিল ওই অনশনকারীদের মা, ঠাকুমা, বন্ধু, আত্মীয়-পরিজন সবাই। সেটা ৯ এপ্রিল, ঘড়িতে তখন ভোর চারটে। সেই দশ হাজার লোক কেন ভোরের আলো ফোটার আগেই এই স্কোয়ারে এসে জড়ো হয়েছিল জানো? ওই তিরিশ জন অনশনকারীকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে বাড়ি নিয়ে যাওয়ার জন্য। আমরা তখনই বুঝেছিলাম, এরা পশু। এরা সব করতে পারে।"

এই তিনটি জর্জিয়ান তরুণ-তরুণীর মাঝখানে দাঁড়িয়ে আমি শুনছি এপ্রিল ট্র্যাজেডির কথা। ওদেরই মুখে, ঘটনাটির 'জর্জিয়ান' ব্যাখ্যা, রুশি সাংবাদিকদের 'ইন্টারপ্রিটেশন' নয়। রিভাজ আর তামারার কথা শুনতে শুনতে এন্দির কপালে ভাঁজ পড়েছে, ঘেমে নেয়ে যাচ্ছে ও।

হঠাৎ উত্তেজিতভাবে আমার ডান হাতটা চেপে ধরে এন্দি বলল, "তোকে তো আমি আগেই বলেছি, জর্জিয়ান কালচার বা ট্র্যাডিশন রক্ষার জন্য আমরা সব করতে প্রস্তুত। জর্জিয়ানদের মতো এত প্রাচীন, সুসভ্য একটা জাতকে রুশিগুলো সবসময় সবকিছু শেখাতে চায়। ওদের স্পর্ধাটা একবার দ্যাখ! আর সারা দেশের শিক্ষাব্যবস্থাটা এমন যে, রাশিয়ান মিডিয়ম স্কুলে না পড়লে, মানে রুশ ভাষা খুব ভালোভাবে না জানলে, নিজের মাতৃভাষার থেকেও ভালো করে না জানলে, কেউ জীবনে কিছু করে উঠতে পারে না। কিন্তু কেন আমি আমার নিজের ভাষা ঠিক ভাবে শেখার সুযোগ পাব না? আমাদের স্কুলগুলোতে প্রত্যেকদিন দু-ঘন্টা করে রাশিয়ান ল্যাঙ্গুয়েজ ক্লাস হয়। আর জর্জিয়ান ভাষার ক্লাস হয় সপ্তাহে চার ঘন্টা। আসলে শয়তান রুশিগুলো একটা ব্যাপার জানে। যে জাত নিজের ভাষাকে ভালোবাসে না, নিজের ভাষায় রচিত সাহিত্য পড়ে না, নিজের ভাষায় সাহিত্য রচনা করে না, সে জাত কোনোদিন শক্তিশালী হতে পারে না, উন্নতিও করতে পারে না—"

এন্দিকে কথা শেষ করতে না দিয়েই আমি প্রশ্ন করলাম, তুই কেন পারতপক্ষে আমার সঙ্গে রুশিতে কথা বলতে চাস না? সবসময় আমাকে বলিস তোর সঙ্গে ইংরেজিতে কথাবার্তা বলতে। এন্দি সেই একইভাবে উত্তেজিত ভঙ্গিতে বলে চলল, "আমি খুব ঝটপট ইংরেজিটা শিখে ফেলতে চাই। ভালো রাশিয়ান জানলে সোভিয়েত ইউনিয়নের

মধ্যে, তা-ও মনে রাখিস সব প্রজাতন্ত্রে নয়, আমি করে খেতে পারব। কিন্তু যদি অন্য কোনো দেশে যাই, তখন? রাশিয়ান তো আর আন্তর্জাতিক ভাষা নয়। ফ্রেঞ্চ বা ইংলিশের মতো রাশিয়ান ভাষারও যদি পৃথিবী জোড়া দাম থাকত, তাহলে রুশিগুলোর ভাষা নিয়ে এই ডিক্টেটরশিপ চালানোর মানে বুঝতাম।"

রিভাজ বলল, "এন্দি, তুই বোধহয় জানিস না, এপ্রিলে ওই ঘটনার পর ৎবিলিসির কয়েকটা রাশিয়ান মিডিয়ম স্কুল বন্ধ হয়ে গেছে। স্টুডেন্টস ইউনিয়ন দাবি করেছে, সব স্কুলে প্রত্যেকদিন রাশিয়ানের মতো জর্জিয়ান ভাষাও দু-ঘন্টা করে পড়াতে হবে। যতদিন না এই দাবি মেনে নেবে, ততদিন আমরা স্কুল খুলতে দেব না।"

একথা শুনে এন্দি একেবারে একটা শিশুর মতো হাততালি দিয়ে লাফিয়ে উঠে বলল, "ব্রাভো, ব্রাভো, এত বড়ো একটা সুসংবাদ তোরা আগে আমাকে দিসনি! ওই রুশি সাদা আরশোলাগুলো এবার বুঝবে জর্জিয়ার সূর্যের মতো জর্জিয়ার মানুষও তেজি। আমাদের দমিয়ে রাখা অত সহজ নয়।"

তামারা হঠাৎ একটু বাঁকা হাসি হেসে আমার দিকে তাকিয়ে বলল, "আমরা সবাই মিলে রুশিদের এত গালাগালি দিচ্ছি বলে তুমি আবার রেগে যাচ্ছ না তো? বলা যায় না বাবা, মস্কোর বাসিন্দা তুমি।" এন্দি বলল, "তোর চিন্তার কারণ নেই। ও একেবারে রুশি হয়ে ওঠেনি। আমার রুমমেট কী না। তামারা জিজ্ঞস করল, "তোদের ক্লাসে কোনো রুশি ছেলেমেয়ে পড়ে না?" এন্দি গড়গড় করে বলে গেল—"লেনা, ভাদিম, দিমা, আনা, মাশা, ভালোদিয়া, মারিয়া, মিশা—সবাই আমাদেরই কোর্সের। ওদের কথা আর আলাদা করে কী বলব? তোরা কি ভেবেছিস ফ্রেন্ডশিপ ইউনিভার্সিটিতে পড়ে বলে ওরা বাকি রুশিদের থেকে অন্যরকম? ভালোদিয়া একদিন আমায় বলে কি, তুই এত ভালো রুশি বলিস কী করে? তোদের জর্জিয়ান অ্যাকসেন্ট এত ভয়ানক, যে কোনো ভাষাই তোরা নিজেদের ভাষার মতো করে বলিস। জর্জিয়ানরা রুশ বললে সব কথা আমি বুঝতে পারি না। তুই বললে অবশ্য প্রায় সবটাই বুঝি। আমার মুখের উপর এমন করে বলল 'স্বোলাচ'- (সোয়াইন)টা। আর কী 'নাখাল' (নির্লজ্জ) ভেবে দ্যাখ, ছুটি পড়ার আগে আমাকে আবার বলে, বাড়ি থেকে আমার জন্য জর্জিয়ান কনিয়াক আনিস কিন্তু। রুশিগুলো এত লোভী! এক বোতল ভোদ্কা বা কনিয়াক দিয়ে সব রুশিকে কেনা যায়। আর মেয়েগুলো? হস্টেলে তো দেখি, রুশি মেয়েমাত্রই বেশ্যা। রুশি পুরুষগুলো একদম ভেড়া। মেয়েগুলোকে শাসন তো করেই না, উলটে ভীষণ ভয় পায়। ওদের পরিবারে মেয়েরাই কর্তা, পুরুষগুলো একেবারে স্ত্রৈণ, শুধু ভোদ্কা খেয়ে পড়ে থাকে। রুশি মেয়েগুলোকে 'লাইনে' রাখার জন্য দরকার আমাদের জর্জিয়ানদের মতো পুরুষ। শাসন করে একদম ঠিক রাখবে। কীরে রিভাজ, বলিস তো তোর জন্য একটা মস্কোর মেয়ে খুঁজে দিই!"

প্রায় ঘন্টাখানেক ধরে গভর্নমেন্ট হাউসের সামনের সেই স্কোয়ারে, যেখানে ৯ এপ্রিল সামরিক বাহিনীর গুলিতে ১৬ জন জর্জিয়ান প্রাণ হারিয়েছেন, সেখানে দাঁড়িয়ে আমরা কথা বলছি। আমরা বলছি মানে এন্দি, রিভাজ আর তামারা বলছে, আমি শুনে যাচ্ছি। রোদ ক্রমশ চড়া হচ্ছে। তামারা আর রিভাজ এন্দি ও আমাকে বিদায় জানিয়ে চলল জুরাব

নামে ওদের এক বন্ধুর বাড়ির দিকে। সেখানে যাওয়ার জন্যই ওরা আসলে বেরিয়েছিল। এন্দি আর আমিও হাঁটতে শুরু করলাম এন্দিদের বাড়ির দিকে।

এন্দি হঠাৎ কেমন কাচুমাচু মুখ করে আমাকে বলল, "তোকে একটা কথা বলব, তুই কিছু মনে করবি না বল।" অবাক হয়ে বললাম, কী কথা? "সত্যি বল, তুই রাগ করবি না।" আচ্ছা, কথাটা না বললে, কী করে বুঝব? বলবি তো তুই—আমার আশ্বাস শুনে এন্দি বলল, "কাল সকালে আমরা বাকুরিয়ানি যাব। ওখানে বাবার বন্ধুর একটা বাংলো আছে পাহাড়ের উপর, সেখানে আমরা এক সপ্তাহ থাকব।" আশ্চর্য হয়ে বললাম, এই কথাটা বলার জন্য তুই এত ইতস্তত করছিলি! ও বলল, "না, তোর কোনো অসুবিধা হবে না তো!" এন্দিকে আশ্বস্ত করে বললাম, অসুবিধা হবে কেন? ভালোই তো, আর একটা শহর দেখা হয়ে যাবে আমার। এ কথা শুনে এন্দি শান্ত হল বটে, কিন্তু আগের মতো সহজ হয়ে গলগল করে কথা বলতে পারল না বেশ অনেকক্ষণ।

সেদিন বিকেলে এন্দির সঙ্গে আবার হাঁটতে বেরলাম। পুরোনো ৎবিলিসির দিকে গেলাম। ইট বাঁধানো সরু সরু রাস্তা, রাস্তার দুধারে পুরোনো দোতলা বাড়ি, রাস্তার একধারে একটা পুরোনো ট্রামের অকেজো বগি পড়ে আছে, বাচ্চারা তাতে ঢুকে খেলা করছে। রাজারাজড়ার শাসনকালে গোটা ৎবিলিসি উঁচু প্রাচীর দিয়ে ঘেরা ছিল। সেই প্রাচীরের কিছুটা অংশ এখনও রয়ে গিয়েছে। পুরোনো ৎবিলিসিকে ঠিক আগের রূপে রাখার জন্য সরকার থেকে ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। এলোপাথাড়ি কোনো আধুনিকতার ছোঁয়া যাতে শহরের পুরোনো অংশের মেজাজটা নষ্ট না করে দেয়, সেজন্য সরকার সজাগ দৃষ্টি রেখেছে। বহু বছর আগে ৎবিলিসি কেমন ছিল তার একটা আন্দাজ পাওয়া যায় এখনও।

পুরোনো ৎবিলিসির ছায়ামাখা শান্ত গলিগুলো দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে গেলাম একটা চার্চে। এন্দিরই উৎসাহে। মোমবাতি জ্বালিয়ে কী যেন মানত করবে ও। এন্দি যতক্ষণে ধর্মকর্ম সারছিল, আমি ততক্ষণে ঘুরে দেখছিলাম চারপাশটা। বিরাট উঁচু গম্বুজওয়ালা অর্থোডক্স চার্চ। ভেতরটা, দেওয়ালের সবখানে অপূর্ব কারুকাজ। একপাশে বেশ ভিড়। জমকালো লম্বা গাউন পরা ধর্মযাজক খ্রিস্টধর্মে দীক্ষা দিতে 'ব্যাপ্‌টাইস্' করছেন একটা শিশুকে, জর্জিয়ান সোভিয়েত সোস্যালিস্ট রিপাবলিকের এক ভাবী নাগরিককে। শিশুটির আত্মীয়স্বজন, আমি নিঃসন্দেহ যে তাদের অধিকাংশই সি পি এস ইউ-এর সদস্য, গদগদ মুখে ধর্মযাজকের উচ্চারিত মন্ত্রের সঙ্গে গলা মেলানোর চেষ্টা করছেন। চার্চের ওদিকটায় জর্জিয়ান রিপাবলিকের আর এক নাগরিক, আমার রুমমেট এন্দি, একজন ইয়ং কমিউনিস্ট, যে আর কয়েক বছর পরে অনিবার্যভাবে সি পি এস ইউ-এর সদস্যপদ গ্রহণের জন্য নানা দরজায় ধরনা দিতে পিছপা হবে বলে মনে হয় না, সেই এন্দি এখন মাথায় স্কার্ফ জড়িয়ে মোমবাতি জ্বালিয়ে বিড়বিড় করে প্রার্থনামন্ত্র উচ্চারণ করছে।

এন্দি, দাথো আর আমি পরদিন সকালবেলা গেলাম বাকুরিয়ানিতে। জর্জিয়ার উত্তরদিকে, ছোট্ট পাহাড়ি শহরে। শহর না বলে গ্রাম বলাই ভালো। পাহাড়ের উপর যে কাঠের বাংলোটায় আমরা ছিলাম, সেখানে রানিং হট ওয়াটার বা সেন্ট্রাল হিটিংয়ের কোনো

ব্যবস্থা ছিল না। যদিও তাপমাত্রা বছরের কোনো সময়েই ১০-১২ ডিগ্রির উপরে ওঠে না। দোকান বাজারও অনেক দূরে। এক সপ্তাহের মতো খাবারদাবার আমরা ৎবিলিসি থেকেই নিয়ে গিয়েছিলাম।

সোভিয়েত দেশের রাজধানী মস্কোর বাসিন্দারা দেশের অন্যান্য নাগরিকদের তুলনায় বেশি সুযোগসুবিধা ভোগ করে। অন্যান্য সকলে তাই মস্কোবাসীকে হিংসা করে, অপছন্দ করে। মস্কোবাসীর উপর বাকি সকলের খুব রাগ। জর্জিয়ার রাজধানী ৎবিলিসির লোকরাও তো জর্জিয়ার অন্যান্য অঞ্চলের লোকের থেকে বেশি আরামে থাকে। ৎবিলিসির লোকদেরও কি বাকি জর্জিয়াবাসারী ওইরকম অপছন্দ বা হিংসা করে? সহ্য করতে পারে না একেবারে?

বাকুরিয়ানির ছোট্ট সেই কাঠের বাংলোটায় জবুথবু শীতে আমরা তিনজন এক সপ্তাহ কাটালাম। একমাত্র 'পুরুষ' সদস্য হিসেবে বছর দশেকের দাথো প্রায়ই এন্দি আর আমাকে শাসন করত। দাথোর 'অভিভাবকত্বে' বিরক্ত হয়ে এন্দি এককেসময় বলত, "দাথো এখন থেকেই জেনে গেছে যে ও পুরুষ আর সেইজন্য সব মেয়েদের শাসন করার অধিকারও ওর জন্মগত। সব জর্জিয়ান পুরুষগুলোই এরকম।" জর্জিয়ান মেয়েদের উপর ওদের পুরুষদের দাপট দেখলে সত্যি অবাক হতে হয়। স্ত্রীদের ভরণপোষণের সঙ্গে সঙ্গে তাদের মারধোর করাটাও খুব জরুরি আর স্বাভাবিক ঘটনা বলে অধিকাংশ জর্জিয়ান মহিলাও মেনে নেন। এমনকী, অতিথিদের সামনেও স্বামীর মাথা কোনো কারণে 'গরম' হয়ে গেলে স্ত্রীকে উত্তমমধ্যম দিতে ইতস্তত করে না জর্জিয়ান পুরুষরা। বাঙালিরা সাধারণত স্ত্রীর গায়ে হাত তোলে না একথা শুনে এন্দি বিশ্বাস করত না কিছুতেই।

বাকুরিয়ানিতে বেশ ঠান্ডা। অথচ আমি শীতের জামাকাপড় কিছু সঙ্গে আনিনি। ৎবিলিসিতে থাকার কথা ভেবেই আমি এসেছিলাম। তাই সোয়েটার, মাফলার আনার প্রশ্নই ওঠেনি। দ্বিতীয় দিন বেশ জাঁকিয়ে ঠান্ডা পড়ল। এন্দি আর আমি খাটেই কম্বল মুড়ি দিয়ে বসে রইলাম। বাইরে যাওয়ার ইচ্ছা থাকলেও উপায় নেই। গল্প করতে করতে এন্দি হঠাৎ বলে উঠল, "এ সবের জন্য গিয়াই দায়ি।" কিছু বুঝতে না পেরে অবাক হয়ে এন্দিকে জিজ্ঞেস করলাম, কী সবের জন্য? লক্ষ করলাম এন্দির মুখটা কেমন ফ্যাকাশে হয়ে গেল। আমাকে হঠাৎ দুহাতে জড়িয়ে ধরে কেমন কাতর গলায় ও বলল, "ভেবেছিলাম পুরো ব্যাপারটা তোর কাছে চেপে যাব, কিন্তু পারলাম না। সবটা খুলে তোকে না বললে কিছুতেই স্বস্তি পাচ্ছি না আমি।" আমি তো মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারছি না। এন্দি নিজেকে একটু সামলে নিয়ে খুব ধীরে ধীরে (যা একেবারেই ওর স্বভাববিরুদ্ধ) বলতে লাগল, "তুই আমাদের ৎবিলিসির ফ্ল্যাটে আসার পর থেকেই গিয়া মায়ের উপর ভীষণ চোটপাট করছিল। একজন বিদেশি, যে আবার আপাতত মস্কোতে থাকে, তাকে আমাদের ফ্ল্যাটে রাখাটা নাকি খুবই সন্দেহজনক। তুই তো জানিস, আমার মা-বাবা দুজনেই সি পি এস ইউ-এর প্রভাবশালী সদস্য। বিদেশি কোনো নাগরিকের সঙ্গে বেশি মাখামাখি করলে পরে আমাদের বিপদ হতে পারে বলে গিয়ার ভয়। ও নিজেও তো একজন কমসামোল সদস্য, অর্গানাইজেশন থেকে যদি ওকেও কেউ প্রশ্ন করে, এই সন্দেহে

গিয়া মাকে খুব বকাবকি করতে শুরু করে। তাছাড়া জর্জিয়ার উগ্র জাতীয়তাবাদীরা যদি তোকে 'রাশিয়ার চর' ভাবে—এই সমস্ত ভেবে গিয়া মাকে কিছু একটা ব্যবস্থা করতে বলে। মা-বাবা তাই অনেক ভেবেচিন্তে বাকুরিয়ানির এই বাংলোতে তোকে পাঠিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। এখানে আশেপাশে লোকজন নেই, কেউ তোকে দেখতে পাবে না আর কোনো প্রশ্নও তুলবে না কেউ।" একটু থেমে এন্দি আবার যেন 'কনফেস' করার ভঙ্গিতে বলে চলল, "সেদিন, তোর মনে আছে নিশ্চয়, মা যখন তোকে নিয়ে আমার দিদিমার বাড়ি যাওয়ার কথা বললেন, গিয়া কেমন খেপে উঠল। দিদিমা বুড়ি মানুষ, বেশি কথা বলেন। তোর গল্প হয়তো প্রতিবেশীদের কাছে করবেন আর নানা জনের মনে নানা ধরনের প্রশ্ন দেখা দেবে—"

কেমন ছলছল চোখে এন্দি আমায় বলল, "গিয়া তোকে বিদেশি বা যাই ভাবুক না কেন, আমি তোকে একেবারে নিজের বোনের মতো ভাবি। নিজের ভাবি বলেই কথাগুলো তোকে বললাম। তুই প্লিজ আমাদের ভুল বুঝিস না।"

বাকুরিয়ানির পাহাড়ি রাস্তায় হাঁটতে বেরিয়ে একদিন আমরা অনেক দূরে চলে গিয়েছি। ফেরার সময় চড়াই ভেঙে উঠতে উঠতে একেবারে হাঁপিয়ে গিয়েছি। যদিও এখানকার চড়াই দার্জিলিংয়ের মতো নয়। অনেকটা সমতল জুড়ে এই চড়াই, তবুও উপরে উঠতে হাঁফ ধরে যায়। হঠাৎ শুনি ঘড়ঘড় শব্দ। পেছন ফিরে দেখি একটা ছ্যাকড়াগাড়ি। দুর্বোধ্য জর্জিয়ান ভাষায় কোচোয়ানকে কীসব বলল এন্দি। কুঁচকে যাওয়া মুখের জীর্ণ চেহারার কোচোয়ান হলুদ দাঁত বের করে হেসে হাত দিয়ে ইশারা করল। আমরা ছ্যাকড়াতে উঠলাম। ঘোড়ার গায়ের বিকট গন্ধ (কোচোয়ানের জীর্ণ কোটটারও হতে পারে অবশ্য) আর মাছির ভনভনানিতে অস্থির হচ্ছি যখন, তখন হঠাৎ সেই বৃদ্ধ কী একটা বলাতে এন্দি দেখি একেবারে হেসেই খুন। বৃদ্ধ রুশ ভাষা জানে না। এন্দি তার কথা আমাকে তর্জমা করে শোনাতে আমার তো আক্কেল গুড়ুম! আমি ভারতীয়, তার মানে 'শ্রী ৪২০'-এর নার্গিস আর রাজকাপুরের দেশের লোক! বৃদ্ধের ছোটোছেলের এখনও বিয়ে হয়নি। আমার সঙ্গে ছোটোছেলের বিয়ে দিতে চায় সে। এহেন অভিনব প্রস্তাবে ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে বৃদ্ধের দিকে তাকিয়ে দেখি, রাস্তার দিকে নয়, সে আমার দিকেই একমুখ হাসি নিয়ে তাকিয়ে। বাঁহাতে ঘোড়ার লাগাম সামলে ডান হাত আমার দিকে বাড়িয়ে দিল হ্যান্ডশেকের জন্য।

ছ্যাকড়া গাড়ি এগিয়ে চলেছে। এন্দি জর্জিয়ান ভাষায় বুড়ো কোচোয়ানের সঙ্গে কী নিয়ে যেন কথা বলে চলেছে। আমি ভাবছি, সত্যিই ভাবছি, আমার দেশের কথা। অবশ্য দেশ বললে এখনও আগে মনে হয় বাংলার কথা। তারপর গোটা ভারত।

বাইরে না গেলে 'দেশ' বিষয়টা যে কী, তা এত ভালো করে বোঝা যায় না। সেসময় বড়ো বেশি করে বুঝি, আমি ভারতীয়। গোটা ভারতটা আমার দেশ। তার প্রতি ইঞ্চিতে ইঞ্চিতে আমার অধিকার, আমার ছোঁয়াচ, আমার কল্পনা-গর্ব-স্বপ্ন মাখামাখি।

আমাদের ইউনিভার্সিটিতে কলকাতার বাঙালি ছিল ছেলেমেয়ে মিলিয়ে ২০ জন। পাঞ্জাবি ৩০, হরিয়ানার ১০, বিহারের ৫০, ওড়িশার ৭, মধ্যপ্রদেশের ৫, উত্তরপ্রদেশের

১০, দিল্লির ৪০, মহারাষ্ট্রের ৩০ আর দক্ষিণ ভারতের প্রায় ১০০ জন। কাশ্মীরি ছিল জনা পঞ্চাশেক। তারা অবশ্য হেঁকে বলত, "আমরা আজাদ কাশ্মীরের, ভারতের নই।" কাশ্মীরের কেউ কেউ শীতের সময়ে কলকাতায় বাড়ি বাড়ি ঘুরে শাল বিক্রি করতে আসে। তাদের আমরা অনেকেই বাড়ির লোকের মতোই ভাবি। ঠিক যেমন তারা ভারতীয় কিনা বা আজাদ কাশ্মীরি কিনা, এসব নিয়ে প্রশ্ন তুলি না—ভারতীয় ভাবি, মস্কোতে গোটা পঞ্চাশেক 'আজাদ কাশ্মীরি'-কেও ভারতীয়ই ভাবতাম। কেননা, কাশ্মীর ভারতের অংশ, এ বিশ্বাস আমার সেই ক্লাস থ্রিতে ভূগোলে ভারতের ম্যাপ আঁকতে আঁকতেই গড়ে উঠেছে।

ইউনিভার্সিটির চত্বরে বা বাইরে, কোথাও যদি এই ভারতীয় ছাত্রছাত্রীরা, এমন কিছু করত যাতে কেউ (অভারতীয়) গালাগালি করে সব ভারতীয়কেই এক করে দিত, সেসময় আমার খারাপ লাগার সীমা থাকত না। সব ভারতীয় ভালো, এরকম আমি একেবারেই ভাবি না। বাঙালিদের সম্পর্কে এ ধারণাটা আমার আরো বদ্ধমূল। তুলনামূলকভাবে বাঙালি ছাত্রছাত্রীর সঙ্গে যেহেতু আমার পরিচয়টা বেশি ছিল, তাই তাদের নীচতাটা আমি অনেক বেশি করে, অনেক কাছ থেকে দেখতে পেয়েছি। একারণে সবসময় ভয়ে তটস্থ থাকতাম, পাছে তাদের এই নীচতা অভারতীয়দের কাছে ফাঁস হয়ে পড়ে আর সেই সুযোগে অভারতীয়রা গোটা দেশ তুলে গালাগাল দেয়।

মার্কিনিদের কাছে, ব্রিটিশদের কাছেও অন্যান্য দেশের কিছু লেখক, শিল্পী তথা 'বুদ্ধিজীবী'র কাছে ইন্ডিয়া হল যাবতীয় অনাহার, অশিক্ষা, অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ এবং ব্ল্যাক ম্যাজিকের দেশ। আর রুশিদের কাছে, সোভিয়েত ইউনিয়ন ভাঙার আগে গোটা সোভিয়েতের কাছেই 'ইন্দিয়া' (ইন্ডিয়া) রাজকাপুর আর নার্গিস দত্তর দেশ। সেখানে গালিব বা জীবনানন্দ বা প্রেমচন্দ, কিষাণচন্দ কিংবা বেদ-উপনিষদ তো দূরের কথা, রবীন্দ্রনাথই খুঁজে পেতে জনাকয়েকের পরিচিত। সত্যজিৎ রায়কে কেউ কেউ জানে। ঋত্বিকের কেউ নামও শোনেনি। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় বা ইউ আর অনন্তমূর্তির কথা ছেড়েই দিলাম।

এসব নিয়ে আমার মধ্যে সবসময় একটা আলোড়ন চলত। আর ঠিক তখন দুটো ঘটনা পাশাপাশি ঘটত—

(১) ভারতীয় ছাত্রছাত্রীর একাংশ এমন অসভ্য আচরণ করত, জীবনযাপনের এমন চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করত, যাতে 'নোংরা কুকুর' ছাড়া অন্য কোনো বিশেষণ বরাদ্দ করার উপায় থাকত না। সাংস্কৃতিক বিনিময়ের জন্য দু-দেশের মধ্যে যে চুক্তি, তার অন্তর্গত ছিল আমাদের ওদেশে পড়তে যাওয়াটা। কোন সংস্কৃতির প্রতিভূ হয়ে এখানকার ছাত্রছাত্রীরা সেখানে যেত, কোন সংস্কৃতির আদান-প্রদান হত এবং কোন সংস্কৃতির চর্চা হত, তা নিয়ে পরে বিশদভাবে আলোচনা করব। ছ্যাকড়া গাড়িতে যেতে যেতে সেসব কথাই আমার মনে হচ্ছিল।

(২) সোভিয়েত নাগরিকরা ভারত বলতে বুঝত রাজকাপুরের দেশ। এন্দির মা একদিন বলেছিলেন, "রাজকাপুর যখন এখানে এসেছিলেন, আমি দেখতে গিয়েছিলাম। হ্যান্ডশেক

করে দেখেছি, কী নরম হাত আর কী দেখতে !" হাল আমলের রুশি মেয়েগুলোকে বলতে শুনতাম, "তোদের দেশের মেয়েগুলো কী লাকি। তোদের ওখানে মিঠুন আছে।"

কোচোয়ানের কথা শুনে এসব কথা পরপর মনে আসছিল। সম্বিৎ ফিরে পেলাম এন্দির ঝাঁকুনিতে। বলল, "এই, কোচোয়ান বলছে, তুই রাজি থাকলে মাসখানেকের মধ্যেই বিয়েটা হয়ে যেতে পারে। তোকে দেখে খুব পছন্দ হয়েছে ওর।"

আমি প্রথমে হতাশ হলেও, দুঃখ পেলেও, অবাক হলেও, একটা ব্যাপার আমার খুব ভালো লাগল। হতাশা আর দুঃখ ছিল এই কারণে কোচোয়ানও ভারত বলতে রাজকাপুর, নার্গিস ছাড়া অন্য কিছু বোঝে না। অবাক হলাম বিয়ের প্রস্তাব দেওয়ায়। বেচারি কোচোয়ান, তার কাছে 'ভারত' যেভাবে হাজির হয় তাতে শুধু রাজকাপুরই থাকে। ওর আর দোষ কী ?

কমিউনিস্ট সোভিয়েত ইউনিয়নে কয়েক দশক ধরে 'ভারত' বলতে রাজকাপুরই থেকেছেন। হালে এসেছেন মিঠুনরা। কমিউনিস্ট সোভিয়েত ইউনিয়নে কয়েক দশক ধরেই ইয়ং কমিউনিস্টরা লুকিয়ে লুকিয়ে প্রার্থনা করেছে। এসব একদিনের ব্যাপার নয়। স্তালিনভক্ত এন্দি ও এন্দিদের পরিবার কয়েক দশক ধরেই সোনার ক্রুশ বানানোর প্রয়োজনীতা বোধ করেছে। আগে ওরা সেই ক্রুশ লুকিয়ে রাখত, পেরিস্ত্রোইকার দৌলতে গলায় ঝুলিয়েছে।

এই এন্দিদেরই পরিবারের একজন গিয়া। ইয়ং কমিউনিস্ট, ১১০টা দেশের ছেলেমেয়ের সঙ্গো ছ-বছর মস্কোয় পড়াশোনা করেছে। সি পি এস ইউ-এর সদস্যপদের দাবিদার গিয়াও লুকিয়ে লুকিয়ে কপালে ক্রুশ ঠেকিয়ে প্রার্থনা করেছে। এখন সে 'কমিউনিস্ট সোভিয়েত ইউনিয়ন' থেকে 'কমিউনিস্ট রাশিয়ার' আগ্রাসনের হাত থেকে জর্জিয়াকে মুক্ত করতে লুকানো সোনার ক্রুশ প্রকাশ্যে বের করেছে। এবং আমায় বিদেশি, 'রাশিয়ার স্পাই' বলে সন্দেহ করেছে। সেসময় এক জর্জিয়ান বৃদ্ধ কোচোয়ান সত্যিই আমায় ভাবাল।

সত্যি কথা বলতে কী, এত দূরের জর্জিয়ার এই অচেনা বৃদ্ধের হাস্যোজ্জ্বল মুখ আর এমন সব স্বাভাবিক প্রস্তাব মুহূর্তেই আমার ভেতরে এমন একটা আলোড়ন তুলল যে আমি এতসব কথা ভেবে ফেললাম। আমার মনে পড়ল এন্দির দাদা গিয়ার কথাও।

আমি এমন একজনের দেখা পেলাম, রাজনীতির জটিল, নোংরা ছোঁয়া যাকে অকারণে অতি সাবধানি বা সন্দেহবাতিক, কুটিল করে তুলতে পারেনি। এই বৃদ্ধ কোচোয়ানের সারল্য ও সহজিয়া জীবনধারার কাছে রাজনীতি তার সর্বশক্তিমান ক্ষমতা নিয়েও একেবারে হেরে গেছে। বৃদ্ধ সি পি এস ইউ-এর কার্ড হোল্ডার কিনা, আমার জানা হয়নি। সাম্যবাদ, সমাজতন্ত্র, বিশ্বভ্রাতৃত্ব বা এ ধরনের কোনো 'তন্ত্র' বা 'বাদ'-এ সে বিশ্বাসী কিনা, তা-ও জানার কোনো প্রয়োজন বোধ করিনি। শুধু বুঝেছি, কোনো অর্গানাইজেশন-এর কাছে জবাবদিহি করার ভয়ে বা কোনো অর্গানাইজেশন-এ নিজের অবস্থান মজবুত রাখার জন্য বা কোনো অর্গানাইজেশন-এর প্রতি নিজের আনুগত্য প্রশ্নহীন প্রমাণের জন্য এই বৃদ্ধ তার সাধারণ মানবিক আচার আচরণ, বোধবুদ্ধি বা সৌজন্যবোধকে বিসর্জন দেয়নি।

আমি এন্দিকে এর আগের রাতেই জিজ্ঞেস করেছিলাম, স্তালিন যে পাড়ায় জন্মেছিলেন, তার নাম কী রে? 'পাড়া' ব্যাপারটা কী তা বোঝাতে কলকাতার ডেমোগ্রাফিকাল ম্যাপটা এন্দিকে বুঝিয়েছিলাম। এন্দি বলল, "পাড়া বলে তো আমাদের এখানে কিছু নেই, আছে 'রাইয়ন' (রিজিয়ন)।" তবে স্তালিনের 'রাইয়ন'-এর নাম এন্দি মনে করতে পারল না। আমি এন্দিকে বললাম, এই কোচোয়ানকে জিজ্ঞেস কর তো, ও জানতে পারে। 'গোরি', কোচোয়ান এন্দির প্রশ্নের জবাব দিল।

এরপর আমি এন্দিকে এক একটা প্রশ্ন করি। এন্দি কোচোয়ানকে বলে। কোচোয়ান এন্দিকে উত্তর দেয়। এন্দি সেটা আবার আমাকে অনুবাদ করে বলে। এভাবে স্তালিন সম্পর্কে, ৯ এপ্রিলের ঘটনা সম্পর্কে ওই কোচোয়ানের যে মন্তব্য আমি শুনেছি, তা এখানে তুলে দিলাম—

"এখন তোমরা যাকে ৎবিলিসি বল, তখন তার নাম ছিল তিফ্‌লিস্। সেই তিফ্‌লিসের এক প্রভিন্স গোরি শহর। ওই গোরিতেই জন্মেছিলেন স্তালিন। স্তালিনের পুরো নাম কী বল তো? যোশেফ ভিসারিওনোভিচ স্তালিন, টাইটেল ছিল জুগাশ্‌ভিলি। তবে উনি টাইটেলটা ব্যবহার করতেন না। স্তালিন ছিলেন আমার থেকে ঠিক ৩৫ বছরের বড়ো। আমার জন্ম ১৯১৪-তে আর স্তালিনের ১৮৭৯-এ। এখন আমার ৭৫ চলছে। জন্মদিনটা একই। স্তালিনের ২১ ডিসেম্বর, আমারও। মস্কোতে ওরা হইহুল্লোড় করে কমরেড স্তালিনের জন্মদিন পালন করত, সারা দেশে সেদিন উৎসব হত, আর আমার বউ বাড়িতে কেক তৈরি করত। কনিয়াক আর কেক খেয়ে বাড়িতে আমার জন্মদিনের অনুষ্ঠান হত।

স্তালিনের সঙ্গে শুধু জন্মদিনটাতেই নয়, আরো কয়েকটি 'মিল' ছিল আমার। স্তালিনের জন্ম চাষা পরিবারে, আমারও। ডিডি-লিলো নামে একটা গ্রাম আছে। স্তালিনের বাপ-ঠাকুর্দার ভিটে ওই গ্রামে। স্তালিনের বাবা ভিসারিওন ইভানোভিচ জুগাশ্‌ভিলি ছিলেন একজন মুচি। তিফলিসে জুতোর এক ফ্যাক্টরিতে কাজ করতেন ভিসারিওন। ছোটোবেলায় বাবার মুখে এসব গল্প শুনতাম। আমার মা-র বাপের বাড়ি যে গ্রামে তার নাম গাম্‌বারিউলি। এই গ্রাম কেন বিখ্যাত বল তো?" এক নিশ্বাসে এতক্ষণ কথা বলে বৃদ্ধ তাকাল এন্দির দিকে। এন্দি তার প্রশ্নের উত্তরে বলল, "জানি না।" বৃদ্ধ একগাল হেসে বলল, "আজকালকার অনেক জর্জিয়ান ছেলেপুলেই দেখি জানে না। আমরা কিন্তু সবাই জানতাম। আরে, গাম্‌বারিউলিতেই জন্মেছিলেন ইকাতেরিনা গিয়োরগিয়েভনা, স্তালিনের মা। ইকাতেরিনার বাবার নাম গিলাদ্‌জে। তিনি ছিলেন একজন ভূমিদাস। তার মানে, স্তালিনের দাদুর বাড়ি আর আমার দাদুর বাড়ি একই গ্রামে। ছোটোবেলায় আমার মা অবশ্য স্তালিনের মাকে কয়েকবার মাত্র দেখেছিলেন, তিনি যখন শ্বশুরবাড়ি থেকে বাপের বাড়ি আসতেন, তখন। মা বড়ো হওয়ার আগেই ইকাতেরিনার বিয়ে হয়ে গিয়েছিল।"

এন্দিকে বললাম, জিজ্ঞেস কর তো, ও কখনও স্তালিনকে সামনাসামনি দেখেছে কিনা? ঝলমলে মুখে 'হ্যাঁ' বলে আমাদের সেই ঘটনার কথা শোনাল বৃদ্ধ।

"সেটা ১৯৩৬ সাল হবে। ৎবিলিসির একটা বেকারিতে কাজ করতাম আমি। হঠাৎ একদিন শুনলাম, ৎবিলিসিতে আসছেন কমরেড স্তালিন। 'পাইওনিয়র'দের (কম্‌সামোলেরও

আগে হবু কমিউনিস্টদের প্রথম যে অর্গানাইজেশন-এর আওতায় সংঘবন্ধ জীবনের দীক্ষা দেওয়া হত। স্কুলের একদম নিচু ক্লাসের পড়ুয়ারা এর সদস্য হত) কোনো একটা অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়ার জন্য। বাচ্চাদের তো ভীষণ ভালোবাসতেন স্তালিন। আমরা তাঁর আসার কথা শুনে সব কাজকাম ফেলে ছুটলাম একবার তাঁকে দেখতে পাওয়ার আশায়। গোটা ৎবিলিসিতে সেদিন যেন ছুটির দিন। সবাই সব কাজকর্ম ছেড়ে এসে জড়ো হল রাস্তার দু-ধারে। আমিও গিয়ে ভিড়ে গেলাম সবার সঙ্গে। পরপর ৪-৫টা কালো গাড়ি এল। একটা গাড়ি থেকে তিনি নামলেন। এই সেই স্তালিন! তার আগে কত ছবি দেখেছি। কী অপূর্ব দেখতে ছিল তাঁকে! আমার ৭৫ বছরের জীবনে কত লোকই দেখলাম, কিন্তু অমনটি আর দেখলাম না। একটা ক্যাপ আর গলাবন্ধ কোট পরেছিলেন তিনি। মোটা গোঁফ, উঁচু নাক। একেবারে সাচ্চা জর্জিয় চেহারা। খুব লম্বা ছিলেন না তিনি। কিন্তু কী ব্যক্তিত্ব! হাসিমুখে আমাদের দিকে তাকিয়ে হাত নাড়তে নাড়তে এগিয়ে গেলেন 'পাইওনিয়ার' সেই বাচ্চাগুলোর দিকে। একটা বাচ্চাকে কোলে তুলে নিলেন। সব বাচ্চাদের সঙ্গে কথা বলতে লাগলেন। আদর করলেন। ছোটোদের সঙ্গে এক নিমেষে নিজেও যেন একটা শিশু হয়ে গেলেন তিনি।

"বাকুরিয়ানিতে ফিরে বাবাকে ওই গল্প বলেছিলাম। স্তালিনের কথা শুনে বাবা যা বলেছিলেন তা আজও আমার কানে বাজে—যে দেশের এমন লিডার, সে দেশে বাস করা কত গর্বের।

"কয়েক বছর পরে বুঝলাম বাবা কত বড়ো একটা সত্যি কথা বলেছিলেন সেদিন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কথা বলছি আমি। স্তালিন তখন না থাকলে কী হত কে জানে, ভাবতেও ভয় লাগে। জার্মানগুলো গোটা পৃথিবীটা তাহলে লন্ডভন্ড করে দিত। 'স্তালিনের জন্য, আমাদের দেশের জন্য'—এই মন্ত্র মুখে নিয়ে সোভিয়েতরা সেদিন শত্রুদের ধ্বংস করেছিল।

"আর যুদ্ধের পরের সেই ভয়নাক দিনগুলো! পেটে খাবার নেই, গায়ে জামা নেই। কিন্তু তা-ও আমরা একটুও ঘাবড়ে যাইনি। আমরা জানতাম, কমরেড স্তালিন আমাদের মাথার উপর আছেন, আমাদের আর কোনো চিন্তা নেই। তিনিই আমাদের ঠিক রাস্তার হদিস দেবেন। আবার আমাদের সুখের দিন ফিরে আসবে। তখন স্তালিনের নামটাই গোটা সোভিয়েত সমাজকে ঐক্যবদ্ধ করে রেখেছিল। এত শক্তি ছিল ওই নামটার। পরে তো প্রমাণও হয়ে গেছে যে আমরা সেদিন স্তালিনকে বিশ্বাস করে ভুল করিনি। যুদ্ধের পরের ভাঙাচোরা দেশটাকে তিনিই তো আবার স্বাস্থ্যবান আর সমৃদ্ধ করে তুলেছিলেন।"

তাহলে তোমরা এই 'সমৃদ্ধ' সোভিয়েত ইউনিয়ন থেকে জর্জিয়াকে মুক্ত করতে চাইছ কেন?—এন্দির মারফত প্রশ্ন করলাম বৃদ্ধকে। জবাবটাও এল একইভাবে, ভায়া এন্দি। এন্দি সেই তখন থেকেই বৃদ্ধের বক্তব্য জর্জিয়ান ভাষা থেকে ইংরেজিতে অনুবাদ করে আমাকে শোনাচ্ছে। আবার আমার ইংরেজিতে করা প্রশ্ন তর্জমা করে জর্জিয়ান বৃদ্ধকে জিজ্ঞেস করছে। আমার প্রশ্নের উত্তরে বৃদ্ধ কোচোয়ান বলল, "খারাপ ভাবে বেঁচে আছি। আর যে কটা দিন বাঁচব, ভালোভাবে বাঁচতে চাই।"

প্রশ্ন করলাম, জর্জিয়া স্বাধীন হলেই কি ভালোভাবে বাঁচতে পারবে? "ওদের সঙ্গো এক হয়ে থাকলে ওরা আমাদের সুখী হতে দেবে না। মস্কোর লোকেরা সুখে থাকে। ওরা আমাদের দুঃখ কষ্ট বোঝে না। মহান স্তালিন থাকলে অবশ্য এমনটা হত না।"

মস্কোতে তো অনেক জর্জিয়ানও থাকে। তারাও কি তোমাদের দুঃখ বোঝে না? আমার এই প্রশ্নের জবাবে এক মুহূর্ত চিন্তা না করে বৃদ্ধ বলল, "না, তারাও বোঝে না।" এন্দিকে এবার বললাম, তুই তো মস্কোতে থাকিস এখন। তার মানে তুই-ও ওই সুখভোগকারীদের দলেই পড়ছিস। এদের দুঃখ বুঝিস না। তোকেও কি তাহলে নিজেদের লোক বলে ভাবতে পারছে না ও। এন্দি বলল, "না, এটা আমি ওকে জিজ্ঞেস করব না।"

অনেকক্ষণ থেকেই প্রশ্ন জাগছিল। এবার সুযোগ পেয়ে জানতে চাইলাম, রুশ ভাষা শেখোনি? কোনোদিন শেখার ইচ্ছাও হয়নি? স্পষ্টভাবে এক কথায় দৃঢ় উত্তর, "না।" এন্দি হঠাৎ বলে উঠল, "না জেনে তো ভালোই হয়েছে। ভাষাটা জানলে ওই সাদা আরশোলাগুলো যা বলত, তাই বিশ্বাস করত।" কিন্তু ইউনিয়নের তাহলে কী হবে? সারা দেশের মানুষের যদি একটা বোধগম্য ভাষা না থাকে তাহলে 'একই দেশের মানুষ'—এ বোধ জাগবে কী করে?

আমাদের বাংলোটা দেখা যাচ্ছে। বৃদ্ধের কথা শুনতে শুনতে কখন যে লম্বা রাস্তাটা পেরিয়ে এসেছি, বুঝতে পারিনি। এন্দিকে বললাম,আমার আর একটা প্রশ্ন আছে। জিজ্ঞেস কর তো ও-ও আমাকে 'রাশিয়ার স্পাই' ভাবে কিনা। এন্দির মুখটা লাল হয়ে গেল। থমকে গিয়ে বলল, "না, আমি ওকে এটা জিজ্ঞেস করব না।"

বাকুরিয়ানিতে আরো দু-দিন ছিলাম। বাংলোতে করার মতো কিছু ছিল না। টিভি দেখে, তাস বা দাবা খেলে, গল্প করে বা সঙ্গো আনা গল্পের বই পড়ে এন্দির আর আমার সময় তা-ও কোনোরকমে কেটে যাচ্ছিল। কিন্তু দাথো বেচারির হয়েছিল মুশকিল। খেলার সঙ্গী না পেয়ে প্রায়ই ঘ্যানঘ্যান করে বেড়াচ্ছিল ও। ঠান্ডার চোটে সন্ধ্যার পর বাইরে বেরনোরও উপায় ছিল না। ৎবিলিসিতে ফেরার আগের দিন দুপুর থেকেই দাথোর মেজাজটা গেল বিগড়ে। নাকি-কান্না কেঁদে এন্দিকে সমানে বলে চলেছে, "আর এক মুহূর্তও এখানে থাকতে ইচ্ছা করছে না আমার। ঠিক করে বল, আমরা কবে বাড়ি ফিরব।" এন্দি ওকে থামানোর অনেক চেষ্টা করেও পারছিল না। একসময় আর থাকতে না পেরে দুর্বোধ্য জর্জিয়ানে প্রচণ্ড জোরে চিৎকার করে উঠল এন্দি। দাথো আরো জোরে তীক্ষ্ণ গলায় চেঁচিয়ে ওকে কীসব বলতে লাগল। ভীষণ রাগ রাগ চোখে আমার দিকে প্রায়ই তাকাচ্ছিল ও। দাথোও জর্জিয়ানেই চেঁচাচ্ছে। কিছু বুঝছি না। শুধু দু-একবার নিজের নামটা শুনতে পেলাম বলে মনে হল। বুঝতে পারলাম, নিশ্চয় ও বলছে, আমার জন্যই ওদের এত ঝামেলা। গরমের ছুটির একটা সপ্তাহ ওদের দুজনকেই যে এই বন্ধুহীন-নির্জন-নির্বাসনে কাটাতে হচ্ছে, তা-ও আমারই কারণে!

মনটা ভীষণ খারাপ হয়ে গেল। কিছু ভালো লাগছিল না। বারান্দায় গিয়ে দাঁড়ালাম। হিমেল হাওয়া ছুঁচের মতো এসে গায়ে বিঁধছে। বাইরেটা ভীষণ অন্ধকার। দূরে উঁচু উঁচু গাছের সারি অন্ধকারটাকে আরো গাঢ় করে নিঝুম দাঁড়িয়ে আছে। আরো দূরে কয়েকটা

বাড়ির টিমটিমে আলো বন্ধ কাচের জানলা ভেদ করে বাইরে বেরনোর চেষ্টা করছে। মস্কোর হস্টেলে নিজের ঘরের চেনা চারটে দেওয়াল, আমার পড়ার টেবিল, আমার খাটটা দু-হাত দিয়ে ছুঁতে খুব ইচ্ছা করছিল।

অবশেষে। ৎবিলিসি হয়ে মস্কো ফেরার পালা।

ফেরার দিন এন্দি আমায় এগিয়ে দিতে এল। আগস্টের শেষে ও মস্কো ফিরবে। গরমের ছুটি থাকে আগস্টের শেষপর্যন্ত। ওরা আমাকে অনেক করে আরো কয়েকদিন থাকতে বলেছিল, কিন্তু আমি ফিরে গিয়ে এবার ইউনিভার্সিটির এক্সকারশনে ইউক্রেন যাব।

এয়ারপোর্টে অন্যান্য কথা বলার পর এন্দি হঠাৎই জিজ্ঞেস করল, "সেরিনা, তুই সেদিন ওই কোচোয়ানের কাছে কেন জানতে চেয়েছিলি, ও-ও তোকে রাশিয়ার স্পাই ভাবে কিনা !" আমার মনে হল, এন্দির কথায় যেন ঝাঁঝ আছে। ও যেন আমার কাছে কৈফিয়ত তলব করছে। মুহূর্তে আমি যেন দপ করে জ্বলে উঠলাম, যা একেবারেই আমার স্বভাববিরুদ্ধ। কী যে আমার হয়েছিল সেদিন, তা আমি জানি আর এন্দি জানে। বললাম, তোর জেনে কী লাভ ?

—যেহেতু তুই ব্যাপারটা জানতে চেয়েছিস, তাই তার কারণটা আমি জানতে চাইছি।

—কোচোয়ানের কথা শুনে, অবশ্যই তোর মারফত, আমার মনে হচ্ছিল, জর্জিয়াকে ও তোর দাদা গিয়ার থেকে বেশি ভালোবাসে। সে ভালোবাসার ভেতর কোনো ধান্দা নেই। মস্কোর বিরোধিতা করে, রুশিদের গালাগালি দিয়ে, সি পি এস ইউ-এর কার্ড হোল্ডার হওয়ার জন্য মস্কো গিয়েই রুশিদের তেলানোর কোনো ইচ্ছা ওর নেই, যা তোর দাদার আছে।

—স্তো তি গাভারিস্ ? (উত্তেজনায় এন্দি রুশ ভাষাতেই বলে উঠল, যার অর্থ 'কী বলছিল তুই' ?) আর ইউ ফিলিং সিক ? (এন্দি আমার সঙ্গে সাধারণত ইংরেজিতেই কথা বলত।)

—আমার সমস্ত 'ইল্যুশন' কেটে গেছে। এটাকে যদি তুই সিকনেস বলিস তো, তাই।

—কেন ? কী ব্যাপারে তোর 'ইল্যুশন' ছিল ?

—তোর কাছ থেকে জর্জিয়ার গল্প শুনে শুনে ইল্যুশন তৈরি হয়েছিল। এপ্রিল ট্র্যাজেডির খবর শুনে ইল্যুশন তৈরি হয়েছিল। জর্জিয়ায় এসে ওই মায়ের মূর্তি দেখে ইল্যুশন তৈরি হয়েছিল।

—কে তোর ইল্যুশন ভাঙাল ?

—তুই। তোরা।

—আমরা !

—হ্যাঁ।

—সেরিনা !!!

—চিৎকার করিস না। তোদের ডুপ্লিসিটি, তোদের ভণ্ডামি আর রুশিদের ঘেন্না করার ধরন আমার মোহভঙ্গ ঘটিয়েছে।

—কী বলছিস তুই ?

—একটা কথা শোন এন্দি—রুশিরা যদি এত খারাপ, তাহলে মস্কোতে বসে ওদের সামনে তুই কখনও একথা বলিস না কেন ? এখানে এসে বুঝলাম, তুই রুশিদের শুধু অপছন্দই করিস না, ঘেন্না করিস রীতিমতো। 'সব রুশি মেয়েই বেশ্যা', তাই না ? 'সব রুশিকেই ভোদ্‌কা দিয়ে কেনা যায়', তাই না ? তুই এখান থেকে ব্যাগ ভরতি ভোদ্‌কা, কনিয়াক নিয়ে মস্কো যাস কেন ? কাকে ঘুষ দিতে ? কী জন্য ? পরীক্ষায় নম্বর বাড়ানোর জন্য ? তোর মা যখন তোর সঙ্গে দেখা করতে যান, তখনও ব্যাগ ভরতি মদের বোতল সঙ্গে নিয়ে যান কেন ? প্রফেসরদের ঘুষ দিতে ? তোদের আদর্শবাদ তখন কোন ধুলোয় লুটিয়ে পড়ে ? মিথ্যে কথা বলিস কেন ? আতিথেয়তার নাম করে মদের বোতল দেওয়ার সময় বলে দিস না কেন, এটা ঘুষ ? সব রুশি মেয়েদের তোর বেশ্যা মনে হয় কোন যুক্তিতে ? তোরা যখন মদ ঘুষ দিয়ে নম্বর বাড়াতে চাস, তখন কোন মানসিকতা কাজ করে ? তোর দাদা মস্কোতে গিয়ে সি পি এস ইউ-এর কার্ড পাওয়ার জন্য তদ্বির করে আর জর্জিয়ায় ফিরে বিপ্লবী বনে যায় ? আমাকে তার 'রাশিয়ার চর' বলে মনে হয় ? জামার তলায় ক্রশ লুকিয়ে রাখে, ধান্দার জন্য সমাজতন্ত্রের বুলি আওড়ায়, মেয়েদের ভারবাহী গাধা মনে করে আর তোরাও, মেয়েরা, নিজেদের মনে করিস পুরুষের চাকর। হস্টেলে তুই চা পর্যন্ত বানিয়ে খেতে চাস না। আর এখানে আমি সেই তোকে দেখেছি, রাত একটা পর্যন্ত দুই ভাইয়ের শার্ট প্যান্ট ধুয়ে ইস্ত্রি করেছিস তাদের হুমকিতে। তারা তোকে বলেছে, মেয়েদের একাজগুলো করা উচিত, তারাই এগুলো করবে। তুই মুখ বুজে তা সহ্য করেছিস। তুই একজন ইয়ং কমিউনিস্ট। তুই নারী পুরুষের সমান অধিকারের কথা বলিস। শোন এন্দি, আমার মোহভঙ্গ হয়েছে। আমি তোদের মানসিকতাকে ঘেন্না করি। আমি জর্জিয়া থেকে ফিরে যাচ্ছি বুড়ো কোচোয়ানকে মনে রেখে। তোরা হয়তো সোভিয়েত ইউনিয়ন থেকে বেরিয়ে যাবি, তোদের জর্জিয়া হয়তো স্বাধীনও হবে, তবুও তোদের মানসিকতা পালটাবে না। বুড়ো কোচোয়ানকে আমি ও কথাটা জিজ্ঞেস করতে চেয়েছিলাম একটা ব্যাপার জানার জন্য—ও-ও তোদের মতো কিনা ? ওই বৃদ্ধের মুখটা আমার মনে থাকবে। তার হাসি, তার সারল্য, তার মানুষসুলভ আচরণ,সে আর তারই মতো রোগা তার ঘোড়াটাকে আমি মনে রাখব।

ইউক্রেন

জর্জিয়ায়, এন্দির বড়িতে এক্সকারশনে যাইনি। এক্সকারশনে গেলাম ইউক্রেন। জর্জিয়া থেকে ফিরেই। সেটাও ১৯৮৯।

তখনও সোভিয়েত ইউনিয়ন ভাঙেনি। বিদেশি ছাত্রছাত্রীর জন্য সে সময় আমাদের ইউনিভার্সিটি অঢেল খরচ করত। এরই অন্তর্গত ছিল এক্সকারশনটাও। সোভিয়েত ইউনিয়নের সবকটা প্রজাতন্ত্রে বেড়াতে নিয়ে যাওয়া হত। এজন্য বিদেশি ছাত্রছাত্রীকে দিতে হত নামমাত্র রুবল। বাকি সিংহভাগ খরচের দায়িত্ব বহন করত ইউনিভার্সিটি।

বছরে দু-বার—শীতের মরশুমে একবার আর গরমের সময় একবার, ইউনিভার্সিটি বন্ধ থাকত। এই ছুটিগুলোতেই এক্সকারশনে যেতাম। ছুটির দিনকয়েক আগেই ইউনিভার্সিটির অনেকগুলো নোটিস বোর্ডে লটকে দেওয়া হত এস্কারশনের নানা খুঁটিনাটি তথ্য—কোথায় নিয়ে যাওয়া হবে, কতদিনের ট্যুর, কত রুবল দিতে হবে, কবে রওনা দেওয়া হবে ইত্যাদি। বলে রাখি, আমাদের দিতে হত মাত্র ২৫/৩০ রুবল। সে সময় আমরা স্টাইপেন্ড পেতাম ১০০ রুবল।

অধিকাংশ সময়েই আমাদের নিয়ে যাওয়া হত ট্রেনে। তবে দু-একটা এক্সকারশনে প্লেনে যাওয়ারও বন্দোবস্ত থাকত।

১৬-১৮ জনের ছোটো ছোটো একেকটা করে গ্রুপ হত। একেক গ্রুপের দায়িত্বে থাকতেন একেকজন সিনিয়র টিচার বা প্রফেসর। তাঁকে সাহায্যের জন্য একজন সোভিয়েত ছাত্রীও থাকত গ্রুপে। একেক গ্রুপ একেক দিকে এক্সকারশনে যেত। যে সোভিয়েত ছাত্রীটি গ্রুপের সঙ্গে যেত, তাকে অবশ্যই 'কম্‌সামোল্‌কা' বা কম্‌সামোল সদস্য হতে হত। ইয়ং কমিউনিস্ট হিসেবে বিদেশি ছাত্রছাত্রীর 'দেখাশোনা' করাটা পার্টির প্রতি তার একটা দায়িত্বের মধ্যে পড়ত। এবং এই সোভিয়েত ছাত্রীটিকে বেড়াতে যাওয়ার জন্য এক রুবলও দিতে হত না। পুরোটাই 'ফ্রি'।

সোভিয়েত জমানায় ট্রেন আর প্লেনের ভাড়া প্রায় কাছাকাছিই ছিল। অনেক ক্ষেত্রে আবার প্লেনের টিকিটের দাম ট্রেনের টিকিটের তুলনায় কম হত। ট্রেনের কামরা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, একেকটা কূপে চারটে বাঙ্ক, পরিষ্কার কম্বল, চাদর, বালিশ, কূপের মধ্যে মাল রাখার বড়ো একটা খোপ, ট্রেনের জানলায় পরিষ্কার সাদা পরদা, ছোটো টেবিলে ফুলদানিতে তাজা ফুল—সব মিলিয়ে সুন্দর ব্যবস্থা। মনে রাখা দরকার, আমি সাধারণ একটি দ্বিতীয় শ্রেণির বগির কথা বললাম। এই ধরনের বগিতে চেপেই আমরা এক্সকারশনে যেতাম।

বেড়াতে নিয়ে গিয়ে শহরের সেরা হোটেলেই তোলা হত আমাদের। টু-সিটেড রুম। শহরের দ্রষ্টব্য জায়গাগুলো দেখার জন্য বিরাট লাক্সারি বাস ও একজন গাইডের ব্যবস্থা

থাকত। শুধু ওই শহরের মধ্যে নয়, তার আশেপাশের নানা জায়গাতেও বাসে করে আমাদের নিয়ে যাওয়া হত।

এক্সকারশনে নিয়ে যাওয়ার গোটা ব্যাপারটাই ছিল সোভিয়েত শিক্ষানীতির অন্তর্গত। এরকমই একটা এক্সকারশনে গেলাম ইউক্রেন।

মস্কোতে শুনতাম, এমনকী রুশিরাও বলত—এই যে সোভিয়েত ইউনিয়ন আর রাশিয়া একাকার হয়ে গেছে, দুনিয়ার লোক সোভিয়েত ইউনিয়ন বলতে রাশিয়া বোঝে, আর রাশিয়া বলতে বোঝে পুরো সোভিয়েত ইউনিয়ন—এটাও নাকি স্তালিনেরই অপকীর্তি! অথচ এসব বলে কয়েও, মস্কোতে বসে, রুশিরাই গোঁফে তা দিতে দিতে অন্য প্রজাতন্ত্রের বাসিন্দাদের শোনাত, বিপ্লবটাকে এখনও দুনিয়ার লোক 'রুশ বিপ্লব' বলেই জানে। এবং বিপ্লবটা আসলে রাশিয়াতেই হয়েছিল।

পেরিস্ত্রোইকা আর গ্লাসনস্ত নিয়ে মস্কোয় আলোচনাটা তখন রীতিমতো বাড়াবাড়ির পর্যায়ে দাঁড়িয়েছে। গর্বাচভ এবং তার নয়ানীতির সন্দেহাতীত সাফল্যে আপামরের আগাম খুশি হওয়াটাও তখন একটা ফ্যাশন। এবং সঙ্গে সঙ্গে চলেছে স্তালিনের মুণ্ডপাত।

৮৯-থেকে 'প্রাভ্দা' সমাজ, রাজনীতি এবং বিজ্ঞান বিষয়ক একটি মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করতে শুরু করে। নাম ছিল 'রোদিনা' (মাতৃভূমি)। পত্রিকাটির সার্কুলেশন ছিল তিন লাখ। নতুন নতুন এই ধরনের পত্রিকা ছাপিয়ে সেখানে গর্বাচভের নয়ানীতির সাফল্যের ফিরিস্তি গাওয়া হত। পাশাপাশি চলত—সে সময়কার যাবতীয় রুশির এক এবং অদ্বিতীয় কাজ—স্তালিনকে গালাগালি দেওয়া।

গন্ডায় গন্ডায় এই ধরনের পত্রপত্রিকা আর পুস্তিকা ছাপিয়ে সেখানে বলা হত, স্তালিনের জন্যই আজ রাশিয়া ও সোভিয়েত ইউনিয়ন সমার্থক হয়ে দাঁড়িয়েছে। "...in regard to the Russian people alone Stalin used the attributes 'great' and 'heroic' and in the social consciousness the words 'Russian' and 'Soviet' were identical and inseparable." (The country and its peoples, Novosti Press Agency, Moscow, 1989, pg:9)

সোভিয়েত ইউনিয়নের শস্যভাণ্ডার ও খনিজভাণ্ডার বলে খ্যাত যে প্রজাতন্ত্র সেই ইউক্রেন। ইউক্রেনিয়ান সোভিয়েত সোস্যালিস্ট রিপাবলিক। সোভিয়েতের ১৫টি প্রজাতন্ত্রের একটি। অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক গুরুত্বের ক্ষেত্রে রুশ প্রজাতন্ত্রের পরেই যে প্রজাতন্ত্রের স্থান, সেই ইউক্রেন। যে প্রজাতন্ত্রের উত্তর-পশ্চিমে পোল্যান্ড, পশ্চিমে চেকোশ্লোভাকিয়া, (অধুনা চেক্ ও শ্লোভাকিয়া) দক্ষিণ-পশ্চিমে হাঙ্গোরি ও রুমানিয়া আর দক্ষিণে কৃষ্ণসাগর, সেই ইউক্রেন। ৮৯ সালে যে প্রজাতন্ত্রের লোকসংখ্যা ছিল ৫১, ৭০, ৪০০০, সেই ইউক্রেন। ১৯২২ সালের ৩০ ডিসেম্বর যে প্রজাতন্ত্র সোভিয়েত ইউনিয়নের সদস্যপদ গ্রহণ করে, সেই ইউক্রেন। রাশিয়ার সঙ্গো যে প্রজাতন্ত্রের সবথেকে বেশি ভাব, সেই ইউক্রেন। রুশিদের সঙ্গো যে প্রজাতন্ত্রের বাসিন্দাদের বৈবাহিক সম্পর্কের সংখ্যা সব থেকে বেশি, সেই ইউক্রেন। যে প্রজাতন্ত্রের কথ্য ভাষার এমনকী হরফের সঙ্গোও রুশ ভাষার সব থেকে বেশি মিল, সেই ইউক্রেন। রাশিয়ার সঙ্গো যে প্রজাতন্ত্রের সাংস্কৃতিক

ঘনিষ্ঠতা সব থেকে প্রকট, রাশিয়ার 'বন্ধু-প্রজাতন্ত্র' বলে পরিচিত, সেই ইউক্রেন—আমাদের এক্সকারশনের গ্রুপ পৌঁছাল সেখানে।

চেহারার দিক থেকেও রুশিদের সঙ্গো ইউক্রেনিয়দের প্রচুর মিল। যদিও রুশিরা সাধারণত ব্রন্ড আর ইউক্রেনিয়দের চুল কালো, তবে সবসময় তা মেলে না। আমাদের ইউনিভার্সিটির ছাত্রছাত্রী ও শিক্ষকদের মধ্যে ইউক্রেনিয়দের সংখ্যা ছিল প্রচুর। কিন্তু তাদের চেহারা দেখে বোঝার উপায় ছিল না। (দক্ষিণ ভারতীয় ও শ্রীলঙ্কার বাসিন্দাদের চেহারার বিচারে যেমন আলাদা করা যায় না, ঠিক তেমন)। পদবি দেখে যা শুধু আন্দাজ করা যেত, কে কোথাকার।

রাশিয়ার দক্ষিণ-পশ্চিম কোণ ঘেঁষে অবস্থিত যে প্রজাতন্ত্র, সেই ইউক্রেনের বাসিন্দাদের রুশিরা 'খাখোল' বলে। ইউক্রেনিয় ভাষায় 'খ'-এর খুব ছড়াছড়ি বলেই বোধহয়। তবে এই নামের মধ্যে বিদ্রূপ বা শ্লেষের কোনো গন্ধ নেই। নেহাৎ-ই মজা করে বলা, বন্ধুমহলেই যার চল বেশি। 'খাখোল' বললে কোনো ইউক্রেনিয়কে কখনো রাগতে দেখিনি। প্রতিবেশী দুই প্রজাতন্ত্রের বাসিন্দাদের সম্পর্কের মধ্যে রেষারেষির কোনো আঁচ পাওয়া যেত না। আটের দশকের শেষভাগে সোভিয়েত ইউনিয়নের নানা প্রান্তে যখন দেনা-পাওনার হিসেবনিকেশ দানা পাকিয়ে উঠছে, তখনও রুশিরা একেবারে নিঃসন্দেহ ছিল যে, ইউক্রেনের সঙ্গো রাশিয়ার সম্পর্ক কখনো খারাপ হবে না। মস্কোতে বসে আমারও সেরকম ধারণাই গড়ে উঠেছিল।

ৎবিলিসিতে এন্দিদের বাড়িতে, জর্জিয়ার রাস্তাঘাটে ছড়িয়ে থাকা তীব্র রুশ-বিদ্বেষ, গোটা প্রজাতন্ত্রেই একটা দমবন্ধ করা পরিবেশ তৈরি করেছিল। ওখানে গিয়ে তাই নতুন একটা জায়গা দেখার আনন্দের বদলে বিরক্তিই জমা হয়েছিল বেশি।

জর্জিয়া থেকে ফেরার পর, একটা 'বিশুদ্ধ' বেড়ানোর লোভে, তড়িঘড়ি ব্যাগ গুছিয়ে রওনা দিলাম তাই ইউক্রেনের উদ্দেশে। নির্ভেজাল বেড়ানোর আনন্দ পেতে, গরমের ছুটির কটা দিন অন্তত একেবারে 'ছুটির মেজাজে' কাটাতে তাই এসে পৌঁছালাম কিয়েভ, ইউক্রেনের রাজধানীতে।

"দ্‌নিপার নদীর তীরে প্রাচীন শহর কিয়েভ। কত শতক ধরে কত ঝড়ঝাপটা সয়ে আজও দাঁড়িয়ে আছে কিয়েভ—" সকালে কিয়েভে পৌঁছানোর পর হোটেলের রুমে ব্যাগ রেখেই আমরা বেরিয়ে পড়েছি। আমাদের পুরো গ্রুপটাই। বাসে করে কিয়েভের দ্রষ্টব্য জায়গাগুলো দেখতে। গাইড, কিয়েভের বাসিন্দা, তাঁর নিজের শহরের গল্প শোনাচ্ছেন আমাদের। "সেই ৯ শতকে এই কিয়েভকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছিল সামন্ততান্ত্রিক রাষ্ট্র—কিয়েভস্কায়া রুস্। ১০-১১ শতকে এই রাষ্ট্র উৎপাদন, কৃষি ও বৈদেশিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে বিশেষ উন্নতি করে। কিন্তু বেশিদিন এই সুখের সময় রইল না। ছোটো ছোটো রাজ্যের যে রাজারা হাত মিলিয়ে একসঙ্গো এই রাষ্ট্র গড়ে তুলেছিলেন, তাদের নিজেদের মধ্যেই মারামারি শুরু হয়ে গেল। ১১৩২ সালে ভেঙে পড়ল কিয়েভ্স্কায়া রুস্।"

বাস এগিয়ে চলেছে কিয়েভের রাস্তা ধরে। জুলাই মাসের রোদ গায়ে মেখে চারপাশটা একেবারে সবুজ। 'গাছ লাগান, প্রাণ বাঁচান' স্লোগান কোথাও চোখে না পড়লেও প্রায়ই

বাগান দেখা যাচ্ছে। রঙিন ফুল আর কচি ঘাসের যত্ন মেশানো বাগান। আমাদের মধ্যে থেকে কে একটা বলে উঠল, "কিয়েভ এত সবুজ!" তৃপ্তির হাসি হেসে আমাদের গাইড বললেন, "কিয়েভকে 'বাগান-শহর' বলা হয়, এত বাগান আছে আমাদের এখানে! পার্কও অগুনতি।"

কলম্বিয়ার ছেলে খুয়ান বলল, "কিয়েভকে তো মিউজিয়ম শহরও বলা হয়।" খুশি গলায় গাইড ভদ্রমহিলা বললেন, "বাহ্, কিয়েভ সম্পর্কে বেশ খোঁজখবর রাখো তো তোমরা। কিয়েভে কটা মিউজিয়ম আছে জানো? প্রায় ৩০টা। মিউজিয়ম অব ওয়েস্টার্ন অ্যান্ড ওরিয়েন্টাল আর্ট, মিউজিয়ম অব রাশিয়ান আর্ট, হিস্টোরিকাল মিউজিয়ম ইত্যাদি। আর একটা 'স্পেশাল' মিউজিয়ম আছে। একেবারে খোলা আকাশের নিচে সেটা। গেট দিয়ে ঢুকলে মনে হবে, গত শতকের কোনো গ্রামে ঢুকে পড়েছ। প্রায় ২০-২৫টা কুটির আছে সেখানে। তবে সবকটা একে অন্যের থেকে আলাদা। ১৮ বা ১৯ শতকে ইউক্রেনের বিভিন্ন অঞ্চলে যেভাবে বাড়ি তৈরি হত, তারই একেকটা নমুনা এখানে বসানো আছে। বাড়িগুলোর ভেতরে সেইসব জায়গার বাসন-কোসন, ফার্নিচার—সব সাজানো আছে। দেখে মনে হয়, বাড়ির বাসিন্দারা কিছুক্ষণের জন্য কোথাও বেরিয়েছে। যে কোনো মুহূর্তে এসে হাজির হবে। বাড়িগুলোর মধ্যে আরো থাকেন তখনকার মতো পোশাক-আশাক পরা একেবারে সে যুগের আদলে সাজগোজ করা একেকজন মহিলা। এরা এই মিউজিয়মের গাইড।

এমন অভিনব মিউজিয়মের গল্প শুনেই আমরা সকলে একসঙ্গে বলে উঠলাম, "আমরা যাব না ওখানে?" গাইড আমাদের আশ্বস্ত করে বললেন, "নিশ্চয় যাব।"

অসাধারণ সেই মিউজিয়ম। বিশাল এলাকা প্রাচীর দিয়ে ঘেরা। বড়ো কাঠের গেট। একপাশে টিকিট কাউন্টার। আমাদের গাইড সবার জন্য টিকিট কাটলেন। গেট পেরিয়ে আমরা মিউজিয়মে ঢুকলাম। খোলা আকাশের নিচে মিউজিয়ম—'মুজেই পাদ আত্‌ক্রিতিম নিয়েবম্'। আমি যেন একটা টাইম মেশিনে চেপে বসেছি। প্রাচীনকালের গোটা ইউক্রেন আমার সামনে হাজির। আমি দেখছি, দুচোখ ভরে দেখছি।

বাড়িগুলো কাঠের। দু-তিন ধাপ সিঁড়ি বেয়ে উঠে রেলিং দেওয়া কাঠের বারান্দা। একেক অঞ্চলের বাড়ির একেক ধরনের রেলিং। অভিজ্ঞ চোখ কারুকার্যের রকমফের দেখেই ধরতে পারে কোন বাড়ি কোন অঞ্চলের। শীতের দেশ তাই ছোটো ছোটো দরজা। জানলাও ছোটো। কাচের শার্সি দেওয়া। তাতে টানটান পরদা। পরদাগুলো তাঁতে বোনা। যে জায়গায় যেভাবে কাপড় বোনা হত, সেই বিশেষ ডিজাইন ফুটে উঠেছে পরদার গায়ে। খাবার টেবিল-চেয়ার। টেবিলে বাসন, চামচ-কাঁটা সাজানো। কাঠের তৈরি চামচের গায়ে যে কারুকাজ, তাতেও আঞ্চলিক ছাপ। আধুনিক বেসিনের বদলে মাটির গামলা, এমনকী জল তোলার মগটা পর্যন্ত এক কোণে রাখা আছে।

খাবার ঘরের একপাশে মাটির তৈরি আভন্। তখন তো আর কারখানায় পাঁউরুটি তৈরি হত না। বাড়িতেই এই ধরনের মাটির চুল্লিতে বানানো হত রুটি। আভনগুলো দেখতে চমৎকার। এর ব্যবহারিক দিকটার কথা ভেবেই যেন তৈরি করা এভাবে—ফুট

তিনেক উঁচু, তিন ফুট মতোই চওড়া আর পাঁচ ফুট লম্বা একটা মাটির বেদি। একটা কোনায় থাকত আভনগুলো। ফলে এর দুটো দিকের দেওয়াল আর বাড়ির দেওয়াল একই হল। বাকি রইল আর একপাশ, সামনের দিকটা আর উপরটা। উপরটা আর একটা পাশ মাটি দিয়ে নিটোল করে বন্ধ। তবে আভনটা 'সলিড' নয়। ভেতরটা ফাঁপা। সামনের দিকে দেওয়ালে থাকত কয়েকটা ফুটো। সেখান দিয়েই আভনের ভেতরে জ্বালানি দিয়ে আগুন ধরানো হত।

সেন্ট্রাল হিটিংয়ের কোনো ব্যবস্থা গ্রামের বাড়িতে থাকত না। বাড়ি গরম থাকত আভনের তাপে। ছোটো ছোটো জানালা থাকায় সেই তাপ সহজে বেরতে পারত না। বাইরে থেকে হিমেল হাওয়াও ঢুকতে পেত না অনায়াসে। সারাদিন জ্বলার পর আভনের উপরটা গরম হয়ে থাকত। বাড়ির বয়স্ক আর শিশুরা রাত্রে ওই গরম 'বিছানায়' অর্থাৎ আভনের মাথায় ঘুমাত। বাড়ির অন্যান্যরা যে খাটগুলোতে ঘুমাত তাও রাখা আছে। বিছানা-বালিশ শুদ্ধ।

ভূমিদাস বা খেটে খাওয়া গরিব মানুষের চামড়ার জুতো কেনার সামর্থ্য ছিল না। শীত আর বরফের হাত থেকে বাঁচতে পাতা দিয়ে বোনা বিশেষ একধরনের জুতো পরত তারা। সেই জুতোও রাখা আছে একধারে।

এমনকী, ওই খোলা মিউজিয়মে যে ক-জন গাইড রয়েছেন, তাঁরাও যেন দ্রষ্টব্য। যে 'অঞ্চলের' গাইড, সেই অঞ্চলের পুরোনো দিনের পোশাক পরে আছেন। তাঁরাই সারা বাড়ি ঘুরিয়ে দেখালেন আমাদের।

অনেক সোভিয়েত মহিলা চাকরি থেকে অবসর নেওয়ার পর মিউজিয়মগুলিতে গাইডের কাজ নিতেন। এখানেও তাই ছিল। তবে এখানকার গাইডদের সঙ্গে পৃথিবীর অন্যান্য সমস্ত জায়গার গাইডদের মনে হয় একটা মৌলিক পার্থক্য লক্ষণীয়। সেই পার্থক্যটাই নিমেষে একটা টাইম মেশিনে বসিয়ে মিউজিয়ম দেখতে আসা লোকেদের পৌঁছে দেয় বহুযুগ আগের ইউক্রেনে। পুরোনো লম্বা গাউন আর মাথায় 'প্লাতোক' (স্কার্ফ) বাঁধা ওই গাইডরা আগের দিনের ওই সব বাড়িগুলোর আঙিনায় দর্শকদের নিয়ে ঘুরতে ঘুরতে, তখনকার গল্প শোনান।

বিভিন্ন অঞ্চলের বাড়ি ছাড়াও মিউজিয়ম চত্বরে আছে তাঁতঘর। অঞ্চল হিসেবে তাঁতেরও রকমফের। একদিকে আছে বিরাট একটা 'উইন্ড-মিল'। শস্য ঝাড়াই করা হত এর সাহায্যে। বাতাসে ঘুরত ওই কাঠের 'মিল' আর গম-ধান ঝাড়াই হয়ে যেত।

যেন পুশকিনের সেই 'ক্যাপ্টেনের মেয়ে'-র গ্রামে বা জেলে আর সোনালি মাছের সেই উপাখ্যানের হতভাগা জেলের বাড়িতেই বেড়াতে এসেছি।

সোভিয়েত ইউনিয়নের অন্যান্য প্রজাতন্ত্রে পরে যখন বেড়াতে গিয়েছি, তখন ইউক্রেনের এই মিউজিয়মের মতো মিউজিয়ম সেখানেও দেখেছি। গত শতকের ঘরবাড়ি, ঐতিহ্য, সংস্কৃতিকে দুহাতের মুঠোয় ধরে রেখেছে সব কটা প্রজাতন্ত্র।

পুরোনোকে হারিয়ে ফেলে, অতীতকে অবহেলা করে, শিকড়বিহীন কোনো সভ্যতার সাফল্যে আস্থা ছিল না সোভিয়েত সরকারের। তাই তাদের সক্রিয় তত্ত্বাবধানের ফলে

গড়ে উঠেছিল এই মিউজিয়মগুলি।

ইউক্রেনের মিউজিয়ম নতুন আর পুরোনোর মধ্যে সুন্দর এক মেলবন্ধন ঘটিয়েছে। সেখানে রয়েছে প্রাচীনকালের ঘরবাড়ি জিনিসপত্তর। এর মধ্যে চল্লিশ শতাংশই 'ওরিজিন্যাল'। কোথাও হয়তো খুঁজে পাওয়া গেছে পুরোনো ঘর বা কোনো গ্রামে হয়ত ছিল বহু প্রাচীন কোনো চার্চ—মেশিনের সাহায্যে ওইসব স্মারকগুলি সযত্নে তুলে এনে বসানো হয়েছে মিউজিয়ম চত্বরে।

এক্সকারশনের রুটিন অনুসারে কিয়েভের বিভিন্ন মিউজিয়ম, চার্চ, মনাস্টারি ঘুরে প্রথম দুটো দিন কেটে গেল। কয়েকটা চার্চের চুড়োয় ক্রশের নিচে ধাতব চাঁদ-তারা দেখে বেশ অবাক লাগল। আমাদের গ্রুপের সঙ্গে যে 'কম্‌সামোল্‌কা' এসেছে, তার নাম সোয়েতা। ওর কাছে কারণটা শুনলাম। ১২৪০ সালে মঙ্গোল-তাতাররা কিয়েভস্কায়া রুস্‌ আক্রমণ করে। তাতাররা যুদ্ধে জয়লাভ করে এবং নিজেদের প্রতাপের চিহ্ন হিসেবে গির্জার ক্রশের নিচে চাঁদতারা বসিয়ে দেয়।

বাসের জানলা দিয়ে নতুন একটা শহরকে কতটুকু আর চেনা যায়? পরের দিন তাই আমরা সকলে মিলে ঠিক করলাম, পায়ে হেঁটে কিয়েভকে দেখব এবার। যতটুকু পারা যায় তিন-চার ঘন্টায়। গরম বা রোদের তেজ খুব একটা নেই। হাঁটার পক্ষে একেবারে আদর্শ!

জারের 'সামার প্যালেস।' বাইরে থেকেই দেখতে হল। মেরামতির কাজ চলছে। তাই ভেতরে যাওয়া গেল না। তবে বাইরে থেকেই প্রাসাদের রাজকীয় চরিত্রটা বোঝা যাচ্ছিল। লেনিনগ্রাদে জারের 'উইন্টার প্যালেস' দেখেছি। বাইরে থেকেও, আবার ভেতরে ঢুকে ঘরগুলোতে ঘুরে ঘুরেও। সামার প্যালেসের ভেতরটাও তাই শীতপ্রাসাদের আদলে মনে মনে কল্পনা করে নিলাম।

হাঁটতে হাঁটতে, ঘুরতে ঘুরতে, কিয়েভের মানুষজন, দোকান-বাজার, বাগান, সবুজ পার্ক দেখতে দেখতে একটা জায়গায় অনেক মানুষের জটলা দেখে আমরা থমকে দাঁড়ালাম। অনেকগুলো প্ল্যাকার্ড হাতে একদল লোক বসে। এক-একটিতে একেক রকম স্লোগান। 'সব প্রজাতন্ত্রকে শোষণ রাশিয়া আর কতদিন চালাবে?' 'যে যা পেরেছে উৎপাদন করে মস্কোর পেট ভরিয়েছে, মস্কোর দোকান ভরে তুলেছে, তার বদলে মস্কো কী দিয়েছে বঞ্চনা ছাড়া'? 'ইউনিয়নের নামে এতদিন রাশিয়ার কর্তৃত্ব চলেছে। সব প্রজাতন্ত্রের সমান অধিকার শুধু কথার কথা রয়ে গেছে। এ আর সহ্য করা যায় না। আমরা স্বাধীনতা চাই।' 'ইউক্রেনের স্বাধীনতাই একমাত্র আমাদের নতুন জীবনের সন্ধান দিতে পারে।'

আমাদের বুশি সিনিয়র টিচার অবাক হয়ে বিড়বিড় করে, বোধহয় নিজেকেই প্রশ্ন করলেন, 'এখানেও?' সিনিয়র টিচারের মতো আমরাও হতবাক। আমাদের মনেও তখন একটাই প্রশ্ন, 'এখানেও?' যে রাশিয়ার সঙ্গে ইউক্রেনের সম্পর্কের বয়স হাজার বছরেরও বেশি, শেষ পর্যন্ত সেই সম্পর্কেও চিড় ধরল। এ কোন বিষাক্ত শতকে আমরা জন্মেছি?

প্রায় ৫০-৬০ জন প্ল্যাকার্ড হাতে বসে আছেন। কিন্তু কোনো স্লোগান দিচ্ছেন না তাঁরা, কোনো চেঁচামেচি করছেন না। তাঁদের মুখগুলোতে ক্ষোভ বা রাগের থেকে

আশাভঙ্গ, বিশ্বাসভঙ্গের যন্ত্রণাই বেশি ফুটে উঠেছে। অনেক দিনের পুরোনো, খুব চেনা, খুব জানা কোনো বন্ধুর কাছ থেকে হঠাৎ আঘাত পেলে মানুষ যেমন দিশেহারা হয়ে যায়, তাঁদের মুখে সেই ভাব। তাই স্লোগান বা মিছিলের রাস্তা বেছে নেননি তাঁরা। নীরবে সোচ্চার হয়েছেন।

এই ক-দিনের নির্ভার বেড়ানোর আনন্দটা নিমেষে উধাও হয়ে গেল। সবুজ কিয়েভ চোখের সামনে একটু একটু করে ফ্যাকাশে হতে শুরু করল। মাথার উপরের যে আকাশটা, চোখ ঝলসানো নীলের গর্বে এতদিন টানটান করে নিজেকে বিছিয়ে রেখেছিল, সেও যেন কেমন ঘোলাটে হয়ে গেল। কিয়েভের রাস্তাঘাটে, ট্রামেবাসে, পার্কে, দোকানে এই কদিন যে সরল হাসি মাখা মুখের ভিড় দেখেছি, তারা সবাই একসঙ্গে কী করে উধাও হয়ে গেল। এখন চারপাশে বিষণ্ণ চোখের, ক্লান্ত, হতাশ সারি সারি মুখের ভিড়।

আমার কেমন অবাক লাগছিল। একটা নতুন কোনো উপলব্ধি যেন আমায় নাড়িয়ে দিয়ে গেল। যে মস্কো দুনিয়া জুড়ে সাম্য, ন্যায় শান্তির কথা শুনিয়েছে, এই আদর্শে বিশ্বাসী করতে চেয়েছে গোটা দুনিয়াকে, তার বিরুদ্ধেই এত অভিযোগ! অবিচারের অভিযোগ! অত্যাচারের অভিযোগ! অন্যায়ের অভিযোগ!

কিয়েভে চারদিন কাটিয়ে গেলাম লভভে। ইউক্রেনের একেবারে পশ্চিমপ্রান্তে। পোল্যান্ডের লাগোয়া লভভ্। মাঝে কাঁটাতারের সীমান্ত।

সুন্দর শহর লভভ্। প্রাচীন শহর লভভ্। ১২৫৬ সাল থেকে এর কথা জানাজানির শুরু। ১৪ শতকের শুরু থেকে লভভ্ ছিল পোল্যান্ডের দখলদারিতে। ১৭৭২-এ লভভ্ চলে যায় অস্ট্রিয়ার অধিকারে। সে সময় লভভের নাম ছিল লেম্‌বার্গ। ১৯১৮ থেকে আবার পোল্যান্ড দখল নেয় লভভের। অবশেষে ১৯৩৯ সাল থেকে ইউক্রেনিয়ান সোভিয়েত সোস্যালিস্ট রিপাবলিকের অন্তর্গত হয় লভভ্। পোল্যান্ড, অস্ট্রিয়া, ইউক্রেন তাই একাকার হয়ে মিশে আছে লভভের স্থাপত্যে, রাস্তাঘাটে, মানুষের চেহারায়, আচার আচরণে।

লভভের মধ্যে যেন বিশ শতকটা ভালো করে ঢোকার অনুমতি পায়নি। চড়াই-উতরাই, ইট বাঁধানো সব রাস্তা। পুরোনো লভভে পিচ বাঁধানো রাস্তা নেই। আমার চোখে অন্তত পড়েনি। রাস্তার দুপাশে ল্যাম্পপোস্ট। ধাতব খুঁটির উপর কাচের বাক্সবন্দী আলো। ছোটো ছোটো দোতলা বাড়ি। সদর দরজার সামনে দু-তিন ধাপের সিঁড়ি রাস্তার বুক ফুঁড়ে উঠেছে। মাঝেমধ্যে হুশহাশ করে বেরিয়ে যাওয়া গাড়িগুলোই যা একটু ছন্দপতন ঘটাচ্ছে। ওগুলো হটিয়ে দিয়ে পরদা ঢাকা সাদা ফিটন আর ঘোড়ার খুরের খটাখট শব্দ যদি শোনা যেত—গত শতকের ইউরোপের কোনো শহর হাজির হত মুহূর্তে।

পুরোনো লভভে হেঁটেই ঘুরছিলাম আমরা। ওখানে ঘুরতে ঘুরতে বারবার আমার একটা কথাই মনে হচ্ছিল। ৫০ বছর আগে সোভিয়েত ইউনিয়নের মানচিত্রে নাম লিখিয়েছে লভভ্। কিন্তু এই অর্ধ শতাব্দীতেও 'সোভিয়েতিকরণের' ছাপ লভভের দেহে পড়েনি।

আমাদের গ্রুপের সেই সোভিয়েত-ছাত্রী সোয়েতা আর আমি হোটেলে একই ঘরে ছিলাম। সারাদিন ঘোরার পর সন্ধ্যাবেলায় ঘরে বসে টিভি দেখছিলাম। সোয়েতা বলল,

"এখানে ভালো একটা বাজার আছে। পোল্যান্ড থেকে নানারকমের বিদেশি জিনিসপত্র পাচার হয়ে ওই বাজারে আসে। একেবারে খোলামেলা বিক্রি হয় না অবশ্য, তবে দোকানিরা যদি বোঝে বিপদের সম্ভাবনা নেই, তাহলেই হল। কস্‌মেটিক্‌স, জুতো, জ্যাকেট, জামাকাপড়, কী না পাওয়া যায়! দামও বেশি না। চল ঘুরে আসি একবার।" দোকান-বাজারে ঘোরাটা আমার পছন্দসই কাজ নয়। তার উপর কোথাও বেড়াতে গিয়ে বাজারে ঘোরা? না, সে বড়ো বিরক্তিকর! আমার ইচ্ছা নেই দেখে সোয়েতা একাই গেল।

আমাদের ঘরটা রাস্তার দিকে। টিভি বন্ধ করে জানলা দিয়ে আটতলার উপর থেকে সন্ধ্যার লভভ্‌কে দেখতে লাগলাম। আলোআঁধারিতে মেশা লভভ্‌কে যেন আরো পুরোনো লাগছিল। ওই থমথমে ল্যাম্পপোস্টের সারি, আঁকাবাঁকা চড়াই-উতরাই রাস্তা, কত শতকের ইতিহাস নিজেদের বুকে লুকিয়ে রেখেছে।

শহরটার ঝিমঝিমে নেশায় যখন বুঁদ হয়ে আছি, তখন হঠাৎ দরজায় খুটখুট শব্দ। ভাবলাম সোয়েতা ফিরেছে। কিন্তু ওর কাছে তো চাবি থাকার কথা। আবার খুটখুট। খুব সন্তর্পণে, খুব চুপিসাড়ে। দরজা খুলে অবাক হলাম। দ্বিধা জড়ানো হাসি মুখে এক ভদ্রমহিলা দাঁড়িয়ে। এই হোটেলেরই কর্মী। সকালে দেখেছি। ঘর পরিষ্কার করতে এসেছিলেন। কিন্তু হোটেলের কর্মচারীরা তো জোরে 'নক' করেন। তাহলে এত আস্তে, প্রায় না শুনতে পাওয়ার মতো দরজা নেড়ে—কারণটা যখন কিছুতেই আন্দাজ করতে পারছি না, তখন মহিলা বললেন, "ভেতরে আসতে পারি?"

—কী ব্যাপার, বলুন তো?

—বলছি। ভেতরে আসি?

—আসুন।

দরজায় টোকাটার মতোই সন্তর্পণে চেয়ারে বসলেন মহিলা। হাতে ধরা মাঝারি সাইজের প্যাকেটটা টেবিলে রাখলেন। তারপর, যেন কোথা থেকে শুরু করবেন, এমন একটা ভাব নিয়ে একটু অপ্রস্তুত হেসে বললেন, "বিশ্রাম করছিলে, বিরক্ত করলাম। আমি 'তুমি' করেই বলছি। তুমি আমার মেয়ের বয়সিই হবে।"

ধানাইপানাই আমার ভালো লাগছিল না। অথচ মুখের উপর কিছু বলাও যায় না। ইনি কিছু এটা বলতে চান সেটা বুঝেছি, কিন্তু কী?

আচমকা মহিলা সঙ্গে আনা প্যাকেটটা টেবিলের উপর উপুড় করে দিলেন। বিভিন্ন সাইজের মেকআপ-বক্স, লিপস্টিক, সাবানে টেবিলটা ভরে গেল।

দক্ষ ব্যবসায়ীর ভঙ্গিতে মহিলা আমার দিকে তাকিয়ে মুখের ভাষা বোঝার চেষ্টা করলেন। তারপর বললেন, "সব বিদেশি। পোল্যান্ড, হাঙ্গেরি, চেকোশ্লোভাকিয়া, রুমেনিয়ার জিনিস। খুব ভালো কোয়ালিটির। আমাদের দোকানগুলোতে যে সব সোভিয়েত জিনিসপত্র পাওয়া যায় তার সঙ্গে কোনো তুলনাই চলে না—"

ওকে মাঝপথে থামিয়ে আমি বললাম, এসব তো আমার লাগবে না। একটুও দমে না গিয়ে বিজ্ঞাপনের ঢঙে মহিলা বলে চললেন, "তুমি নিয়েই দেখো না। আমি নিজে ব্যবহার করেছি বলেই বলছি, খুব ভালো কস্‌মেটিক্‌স সব।" একটা সুন্দর দেখতে বাক্স খুলে

আমার সামনে মেলে ধরলেন তিনি। অনেকগুলো ছোটো ছোটো চৌকো খোপের মধ্যে কতরকমের রং! এই রং সব মুখে মাখার? বাক্সটা আমার দিকে আরেকটু এগিয়ে দিয়ে বললেন, "মোট ৬৪টা রং আছে। দাম না হয় একটু কমিয়েই দেব।"

বুঝতে পারছিলাম, ধৈর্য হারাচ্ছি। বিরক্তির সঙ্গে বললাম, আপনি যে এভাবে ঘরে ঢুকে জিনিস বিক্রি করছেন, এটা তো বেআইনি। আমি যদি কমপ্লেন করি। আপনার ভয় করছে না?

আমার কথা শুনে মহিলার মুখটা লাল হয়ে গেল। রুক্ষ গলায় চ্যালেঞ্জের সুরে বললেন, "কাকে কমপ্লেন করবে? কে আমার বিচার করবে? উপরওয়ালা? উপরে যারা বসে আছে, যাদের ক্ষমতা আছে, তারা বড়ো বড়ো 'ধান্দা'-র সঙ্গে জড়িত। আমরা ছোটোখাটো লোক, তাই দু-চারটে জিনিস নিয়ে ঘরে ঘরে ঘুরে এক্সট্রা কিছু রোজগারের চেষ্টা করছি। আর ওরা কী করে জানো? ব্ল্যাক মার্কেটে ডলার এক্সচেঞ্জের ব্যবসা থেকে শুরু করে বড়ো বড়ো মাল পাচার। তবে আমি ওদের দোষ দিই না। আমরা কত মাইনে পাই শুনলে বিশ্বাস করবে না। সংসার তো চালাতে হবে! রাষ্ট্র বা সরকার যদি আমাদের কথা চিন্তা না করে তাহলে নিজেদের কথা তো নিজেদেরই ভাবতে হবে। এটাকে তোমার অন্যায় মনে হচ্ছে?"

এই প্রশ্নের কোনো জবাব আমি সেদিন দিতে পারিনি। মহিলাকে সেদিন একথাও বলতে পারিনি যে, একটা লিপস্টিক বা সাবান কিনে কেউ তাঁকে হতাশার চোরাবালি থেকে টেনে তুলতে পারবে না। অন্তহীন, অপরিমেয় হতাশা সর্বভুক জন্তুর মতো গ্রাস করতে চাইছে। শুধু তাঁকে নয়, গোটা জাতটাকে, গোটা সোভিয়েত জাতটাকে।

আমি, সেই কোন দূরের কলকাতার সেরিনা, ৬ বছরের একটা কোর্স করতে এসেছি মস্কোতে। মস্কো বা সোভিয়েত ইউনিয়নের উন্নতি বা অবনতিতে প্রত্যক্ষভাবে আমার কিছু যায় আসে না। আসার কথাও নয়। ৬ বছর পরে আমি আবার নিজের দেশে, নিজের বাড়িতে, নিজের জায়গায় ফিরে যাব। সোভিয়েতের সাধারণ মানুষের দুঃখ-কষ্ট-হাসি-আনন্দ, বাইরের একটা বৃত্তে দাঁড়িয়ে, নির্লিপ্ত চোখে, নির্লিপ্ত মনে দেখার কথা আমার। হয়নি। ওভাবে হয়ও না। হওয়া সম্ভব না।

মস্কোতে পা দেওয়ার পর, সোভিয়েতের নতুন করে গড়ে ওঠার প্রক্রিয়া, স্বপ্ন, আমাকেও নেশা ধরিয়েছিল। আমিও একটা ভালো কিছুর আশায় দিন গুনতাম, মস্কোর আর অন্যান্যদের মতোই। তারপর, চারদিকের আকাশ-বাতাস জোড়া সেই নেশার রং ফিকে হতে লাগল ক্রমশ। সাধারণ মানুষের দিশেহারা মুখচোখ আমাকে ধাক্কা দিতে লাগল বারবার।

যেন, পথ খুঁজে না পাওয়া, মিশমিশে একটা জঙ্গলে, আমাকে একেবারে একা দাঁড় করিয়ে, লভভের হোটেলের কর্মী, সেই ভদ্রমহিলা, ঘর থেকে চলে গেলেন। তাঁর হাতে একটা প্যাকেট। সেই প্যাকেটে অনেক রকমের রং। বিদেশি রং। সেই রং চোখমুখে মাখলে মুখের আসল চেহারা, রং সব চাপা পড়ে যায়! সব মালিন্য, সব যন্ত্রণা, সব হতাশার কালো ঢেকে যায়। আসলটা, সত্যটা আড়ালে চলে যায়। সব কষ্ট যেন ভুলে

থাকা যায় ওই রঙের প্রলেপে। যেমন মাটির নিচে থেকে যায় শিকড়টা, দেখা যায় না। উপরে থাকে দিব্যি পাতা-ফুল ফলে ভরা গাছ—তেমনই ; সুন্দর রঙিন মানুষ।

লভভ্ যেমন পোল্যান্ডের গা-ঘেঁসা একটি সীমান্ত শহর, তেমনই ইউক্রেনের একেবারে দক্ষিণ-পশ্চিমে আর একটি সীমান্ত শহর উঝ্গোরাদ। এই শহরকে ঘিরে রয়েছে তিনটি দেশ। উত্তরে পোল্যান্ড, পশ্চিমে চেকোশ্লোভাকিয়া আর দক্ষিণে হাঙ্গেরি। ইউক্রেনের দক্ষিণ-পশ্চিম প্রান্তে যে 'ওব্লাস্ত' (প্রভিন্স), তার নাম জাকারপাতস্কায়া। এই ওবলাস্তেরই রাজধানী উঝ্গোরাদ। এখানকার লোকেরা বলে, এখান থেকে দক্ষিণ দিকে মিনিট পনেরো সাইকেলে গেলেই হাঙ্গেরি। চেকোশ্লোভাকিয়ার পাহাড় উঝ্গোরাদে দাঁড়িয়ে দেখা যায়। পোল্যান্ডও একেবারে হাতের নাগালে।

লভভ্ ছেড়ে আমরা পৌঁছলাম উঝ্গোরাদে। এখানে থাকব দুদিন।

জুলাই মাস শেষ হতে চলল। ঋতুর হিসেবে গরমকাল। কিন্তু উঝ্গোরাদে যেন হেমন্ত। তাপমাত্রা ১৯-২০ ডিগ্রি। কখনো আরো কম।

ভৌগোলিক অবস্থানের জন্য ছোটো উঝ্গোরাদের রাজনৈতিক গুরুত্ব যেমন প্রশ্নাতীত, তেমন অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেও এই শহর যথেষ্ট উল্লেখযোগ্য। আসলে গোটা জাকারপাতস্কায়া ওব্লাস্তই খুব ধনী। নানাধরনের খনিজ দ্রব্য, বনজ সম্পদ তো আছেই। তাছাড়াও গম, ভুট্টা, সূর্যমুখী (তেলের জন্য), তামাক, আলু, আঙুরসহ নানাধরনের ফলের ব্যাপক চাষ হয় এই প্রভিন্সে। গোটা প্রজাতন্ত্রে উৎপাদিত মোট মাংস বা দুগ্ধজাত খাবারদাবারের একটা বড়ো অংশ যায় এখান থেকেই। এছাড়া এখানে আছে মেটাল ওয়ার্কিং ও হেভি এঞ্জিনিয়ারিং ইন্ডাস্ট্রির বিভিন্ন কারখানা। এহেন একটি ওব্লাস্তের রাজধানী উঝ্গোরাদও যে খুবই গুরুত্বপূর্ণ, তা বলাই বাহুল্য।

উঝ্গোরাদে আমরা যে হোটেলটিতে উঠেছিলাম, সেটা ছিল একেবারে ঝকঝকে নতুন। হাঙ্গেরির সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে তৈরি। হোটেলে এবং গোটা শহরটাতেও প্রচুর বিদেশি চোখে পড়ছিল। অধিকাংশই আশপাশের দেশগুলোর। লভভের মতোই এখানেও সোয়েতা আর আমি একই রুমে ছিলাম।

ছোট্ট উঝ্গোরাদ আমাদের দেখা হয়ে গেল একদিনেই। দ্বিতীয় দিনটা নিজের ইচ্ছামতো কাটানোর সুযোগ পেল সকলে। আমাদের হোটেলের পাশেই ছিল একটা 'উনিভারমাগ' (ডিপার্টমেন্ট স্টোর)। সোয়েতার আনন্দ আর ধরে না। সারা দুপুর দোকানটাতে কাটিয়ে ব্যাগভরতি জিনিসপত্র নিয়ে ফিরল। বিকেলের দিকে আবার বেরলো। ফিরল একটা সোনার আংটি কিনে। মুখে বিজয়ীর হাসি। মস্কোতে নাকি এত সুন্দর ডিজাইনের আংটি মেলা ভার।

একস্কারশনের মেয়াদ শেষ হয়ে এল। এখান থেকে মস্কো লম্বা রাস্তা। ট্রেনে দু-দিন একরাত লাগে। উঝ্গোরাদে শেষ সন্ধ্যা। আমি ঘরেই ছিলাম, একা। সোয়েতা কোথায় যেন বেরলো। কিছুক্ষণ পর ফোনটা বেজে উঠল। ওপারে সোয়েতার গলা। "সেরিনা, তুই এক্ষুনি একবার আয়। প্লিজ। আমি ৯১৩ নম্বর ঘরে আছি। লিফটের জন্য অপেক্ষা করিস না, দেরি হবে। সিঁড়ি দিয়েই চলে আয়। এক্ষুনি। খুব দরকার।" ঘাবড়ে গেলাম। যে

অবস্থাতে ছিলাম, সেভাবেই ছুটলাম সিঁড়ি বেয়ে উপরে। সাত, আট, নয়। ন-তলার তেরো নম্বর ঘর।

দরজা নাড়তেই বছর পঞ্চান্নর এক ভদ্রলোক খুলে দিলেন। ভেতরে একটা সোফায় সোয়েতা বসে। মুখটা কেমন ফ্যাকাশে। পাশের সোফায় আর এক ভদ্রলোক বসে। বয়স ৩৬-৩৭ হবে। টেবিলে প্রচুর খাবার সাজানো। পাশে শ্যাম্পেনের একটা খোলা বোতল।

আমাকে দেখতে পেয়ে সোয়েতা যেন প্রাণ পেল। ভেতরে ডেকে নিজের পাশে বসাল। কিছুই বুঝতে পারছিলাম না। সোয়েতাকে জিজ্ঞেস করলাম, কী হয়েছে তোর? ওভাবে ডাকলি যে! উত্তরে ও বলল, "তুই আমার সঙ্গে থাক। ঘরে গিয়ে সব বলব।"

—কিন্তু এরা কারা! এখানে তুই এলি কী করে?

—এরা দুজন হাঙ্গেরির। এঞ্জিনিয়ার। মস্কোতে ফোন করার জন্য নিচে গিয়েছিলাম। এরাও ওখানে ছিল। আলাপ হল। তারপর ওরা আমাকে ওদের ঘরে ডাকল, কফি খাওয়াবে বলে। ঘরে আসার পর আমার কেমন যেন লাগছিল। তাই তোকে ডাকলাম।

—এখন আমাকে কী করতে হবে?

—একটু বোস। এক্ষুনি চলে যাব।

বয়স্ক লোকটা ভাঙা ভাঙা রুশি জানে। মাঝবয়সিটা একদম জানে না, দু-চারটে ইংরেজি শব্দ জানে শুধু। বয়স্কটা সোয়েতাকে বলল, "আদ্‌না মিনুত্‌কা" (এক মিনিট)। সোয়েতা উঠে দাঁড়াল। ওরা দুজনে ভেতরের ঘরে গেল।

মাঝবয়সিটা তখন খুব কসরৎ করে বলছে, "ইন্দিয়া? রাজীব গান্ধি? ইন্দিয়া হাঙ্গেরি ফ্রেন্দ।" দুহাত মুঠো করে ইন্ডিয়া হাঙ্গেরির ফ্রেন্ডশিপ বোঝাতে ব্যস্ত লোকটাকে আর ভেতরের ঘরে ওই বয়স্ক লোকটাকে মুহূর্তের জন্যও সহ্য করতে পারছিলাম না। দরজার কাছে গিয়ে গলাটা চড়িয়ে সোয়েতাকে বললাম, আমি যাচ্ছি। যাওয়ার হলে চল। ভেতরের ঘর থেকে সোয়েতা বেরিয়ে এল। মুখটা লাল টকটকে।

লোক দুটো বেশ অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করতে লাগল, "কী হয়েছে? কোথায় যাচ্ছ?" ওদের কথার কোনো উত্তর না দিয়ে দ্রুত পায়ে সিঁড়ি দিয়ে নামতে লাগলাম।

ঘরে ঢুকে ধড়াম করে দরজাটা বন্ধ করে হাঁপাতে লাগল সোয়েতা। কিছুক্ষণ পরে আমাকে বলল, "গ্রুপের কাউকে কিছু বলিস না তুই। প্লিজ! কথাটা ফাঁস হয়ে গেলে ফিরে গিয়ে ইউনিভার্সিটিতে আমাকে অনেক দুর্ভোগ পোহাতে হবে।"

বেশ কিছুক্ষণ চুপচাপ থেকে সোয়েতা খুব আস্তে বলল, "ওদের একজন, যে আমাকে ভেতরের ঘরে ডাকল, আমাকে বিয়ে করতে চাইছে। বুদাপেস্তে নাকি ওর নিজের বাড়ি, গাড়ি আছে।"

—কিন্তু তুই আমাকে ওভাবে ডাকলি কেন? কী হয়েছিল?

খানিকক্ষণ বোকার মতো হাসল সোয়েতা। তারপর একটা অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে বলল, "ভয় করছিল।" আমার অত্যন্ত বিরক্ত লাগছিল। খাট থেকে উঠে গিয়ে জানলার কাছে দাঁড়ালাম। সোয়েতা আমার কাছে এসে ঘ্যানঘ্যান করতে লাগল।

—হাঙ্গেরির লোকেরা রুশি মেয়েদের খুব পছন্দ করে। স্ত্রী হিসেবে রুশিরা নাকি খুব

ভালো। ওরা বলছিল। আমি চুপ করে রইলাম। সোয়েতা বলল, "তুই জানিস এটা?"

—তুই কি ওই বুড়োটাকে কথা দিয়ে এসেছিস?

—এখনও কিছু বলিনি। ওকে বলেছি, পরে জানাব। আমার বয়স তো অনেক হয়ে গেল। পঁচিশ চলছে। এখন পর্যন্ত একবারও বিয়ে হয়নি। ওর বয়স পঞ্চাশ ঠিকই, কিন্তু বাড়ি, গাড়ি, টাকাপয়সা আছে। বিয়েটা তো করতেই হবে। তাই ওকেই করব ভাবছি।

ঘেন্নায় গা-টা কেমন গুলিয়ে উঠল আমার। শুধু সোয়েতা নয়, এই 'পঁচিশ-আতঙ্ক' দেখেছি অধিকাংশ রুশি মেয়ের মধ্যেই। পঁচিশ বছরের মধ্যে যেমন করে হোক, যাকে হোক, বিয়ে একটা করে ফেলতেই হবে। না হলে সকলে 'স্তারায়া দিয়েভা' (আক্ষরিক অনুবাদে 'বুড়ি কুমারী') বলবে যে! মস্কোতে আমাদের হস্টেলে দুটি রুশি-ছাত্রীর মধ্যে কী কারণে যেন ঝগড়া লেগেছিল। একজন আরেকজনকে 'স্তারায়া দিয়েভা' বলে গালাগালি দিচ্ছিল, এ আমি নিজের কানে শুনেছি। পনেরো-ষোলো বছর বয়স থেকেই রুশি মেয়েরা তাই 'তৎপর' হয়ে ওঠে এই গালাগালিটা এড়াতে। সতেরো-আঠারোতে অধিকাংশই প্রথমবারের মতো বিয়েটা সেরে ফেলে। স্কুলের সহপাঠী বা পাড়ার কোনো ছেলের সঙ্গে। দু-চার বছর পর, বয়স আরেকটু বাড়লে, কিছুটা 'ম্যাচিওরিটি' এলে কৈশোর বা কৈশোর-শেষের সেই প্রথম স্বামীটিকে আর সহ্য হয় না। হাজারটা খুঁত চোখে পড়ে। চটজলদি বিয়ের মতো চটজলদি ডিভোর্সও সারা হয়ে যায়। দ্বিতীয় বিয়ের জন্য পছন্দসই সঙ্গী খুঁজতে পঁচিশ পেরোলেও খুব একটা দুশ্চিন্তার কারণ ঘটে না। 'কুমারী' তো নয়। 'স্তারায়া দিয়েভা'-র প্রথমবার বিয়ের জন্য পাত্র খোঁজার তুলনায় সাতাশ-আঠাশের ডিভোর্সির দ্বিতীয় বা তৃতীয় সঙ্গী খুঁজে পাওয়া অনেক সহজ।

'একবারও বিয়ে না হওয়া' পঁচিশের সোয়েতার পঞ্চাশের এক প্রৌঢ়ের দেওয়া বিয়ের প্রস্তাবে (আলাপের ঘন্টাখানেকের মধ্যেই!) উদ্বেল হয়ে ওঠাটা তাই আমার খুব একটা অচেনা ঠেকছিল না। কিন্তু কেমন যেন লাগছিল।

সেদিন এন্দিকে প্রায় গালাগালি দিয়ে এসেছিলাম ওর 'অকারণ' রুশ-বিদ্বেষের জন্য। সোয়েতার ব্যবহারে মনে হল, এন্দির রুশ-বিদ্বেষ যেন আমার মধ্যেও একটু একটু করে ঘাঁটি গাড়তে শুরু করেছে। সত্যি কথা বলতে কি, মনে হচ্ছিল, যেখানে যত রুশ-বিরোধী কথা শুনেছি এ পর্যন্ত, তার সবকটা এক এক করে সোয়েতাকে শুনিয়ে দিই। অবশ্যই সোয়েতা একা গোটা রুশ জাতটার প্রতিনিধি নয়। তবুও সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টির ভাবী সদস্য, আজকের কম্‌সামোলকার যে সামান্যতম দায়িত্ববোধ বা সচেতনতা থাকার কথা, তা ওর মধ্যে দেখিনি। এরকম সোয়েতারাই যদি সংখ্যায় অধিক হয়, তাহলে এন্দির কথায় বা লভভে আমার ঘরে রং বেচতে আসা ওই মহিলার ব্যবহারে যে যুক্তি থাকে,তা মানতেই হয়। ক্রমশই বুঝতে পারছি, শুরু হয়েছে আমার হতাশ হওয়ার পালা।

উঝ্‌গোরাদ থেকে মস্কো ফেরার সময় ট্রেনের কূপের সামনে যে লম্বা করিডর, সেখানে দাঁড়িয়ে আছি। সমৃদ্ধ ইউক্রেন চিরে ট্রেন এগিয়ে চলেছে। দুপাশে শস্যভরা সবুজ খেত। সামনের রাতটা আর গোটা দিন এই ট্রেনেই কাটাতে হবে। এই হিমের দেশে সবুজ বড়ো ক্ষণস্থায়ী। বড়ো আকাল সবুজের। সবটা মনপ্রাণ আর দুটো চোখ দিয়ে তাই তারিয়ে

তারিয়ে চেখে নিচ্ছিলাম রেললাইনের দু-পাশের ওই অন্তহীন সবুজকে। "ক্রাসিভা দা!" (সুন্দর না!) ভদ্রলোক কখন পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন খেয়ালই করিনি। ট্র্যাকসুট পরা, বছর চল্লিশেক বয়স হবে। বুঝলাম, আলাপ করতে চাইছেন। গল্প করে কিছুটা সময় কাটানোর ইচ্ছায়।

আমাদেরই মতো উঝ্‌গোরাদ থেকে মস্কো যাচ্ছেন উনি। বললেন, "আমার নাম দিমিত্রি প্রোখারভ। বাড়ি সাইবেরিয়ায়। খান্‌তি মানসিস্ক নামে একটা শহরে। আমি এস্কিমো।"

এস্কিমো! সেই এস্কিমো! ইগলুর এস্কিমো! যেখানে ছ-মাস দিন, ছ-মাস রাত? কুকুরে স্লেজগাড়ি টানে! সেই যেখানে বাচ্চাকে স্নান করানোর বদলে মায়েরা গা চেটে পরিষ্কার করে দেয়? উত্তেজনায় আমার সারা গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল!

আমি যেন দেখতে পেলাম, বরফ আর আপাদমস্তক ফারের জামা কাপড়ে ঢাকা ছোটোখাটো চেহারার একটা লোক হামাগুড়ি দিয়ে ইগলুতে ঢুকছে!

আমার ভাবনা শুনে দিমিত্রি সোনা দিয়ে বাঁধানো দাঁত বের করে একগাল হাসলেন। মঙ্গোলয়েড ধাঁচের মুখে নরুন-চেরা চোখদুটো বুজে গেল সে হাসিতে। বললেন, "তোমাদের 'ইন্দিয়া'র (ইন্ডিয়া) কথা উঠলেই, এই মোটা মোটা সাপ, হাতি আর বাঘের কথা মনে হয় আমার। আসলে ছোটোবেলায় পড়া বই থেকে মনে যে ছবিটা গেঁথে যায়, তা বোধহয় মানুষ সারাজীবন বয়ে বেড়ায়।"

ইরতিশ নদীর তীরে, পশ্চিম সাইবেরিয়ার বন্দর-শহরে খান্‌তি মানসিস্কের একটা হাইস্কুলে ভূগোল পড়ান দিমিত্রি। বছরের বেশিরভাগ সময়টাই ওঁদের ওখানে শীতকাল। সাইবেরিয়ার একেকটা জায়গার মতো শীতকালে মাইনাস ৫০ ডিগ্রি না হলেও, তাপমাত্রা শূন্যের থেকে ১৮ বা ২৩ ডিগ্রি নিচে থাকে। 'গরমকাল' বলতে জুলাই মাসটা। তখন তাপমাত্রা ১৬-১৯ ডিগ্রি।

খোদ 'সাইবেরিয়ান'-এর মুখ থেকে সাইবেরিয়ার গল্প শোনার জন্য দিমিত্রিকে ডাকলাম আমাদের কূপে। লম্বা ট্রেন যাত্রার একঘেয়েমি কাটাতে দিমিত্রিও উৎসাহভরে আমাদের সঙ্গে গল্পে মেতে উঠলেন।

"আমরা হচ্ছি 'সোভিয়েত-নর্থ'-এর বাসিন্দা। 'নর্থ' মানে সোভিয়েত ইউনিয়নের মোট এলাকার অর্ধেকটা। যার বিস্তার একেবারে পশ্চিমে কোলা পেনিনসুলা থেকে দক্ষিণ-পূর্বে সাখালিন আইল্যান্ড পর্যন্ত। ছোটো ছোটো অনেক ধরনের জাতি এই এলাকায় বাস করে। সামি, নেন্তসি, খান্তি, মানসি, ইয়ুকাগির, নেগিদাল, কেত, নগানাগান, সেলকাপ, চুক্‌চি, ওরোচি, এস্কিমো প্রভৃতি। এদের বলা হয় 'স্মল ন্যাশানালিটিস অব দ্য নর্থ'। এখন এদের মোট সংখ্যা হবে ১ লাখ ৬০ হাজারের মতো।"

"আপনাদের ওখানে নাকি এখনও যাযাবর গোষ্ঠী আছে?" প্রশ্ন করল লেবাননের আইয়ুব। দিমিত্রি বললেন, "হ্যাঁ, তা আছে। প্রায় ১৫ হাজার লোক সারা বছর ঘুরে বেড়ায়। তাদের নির্দিষ্ট ঘরবাড়ি নেই। আগে সংখ্যাটা আরো বেশি ছিল। সরকারের তরফ থেকে বিশেষ পলিসি নিয়ে অনেককে একটা স্থায়ী ঠিকানায় বাঁধা হয়েছে। এটা একটা

অবৈজ্ঞানিক পদক্ষেপ। এর ফলে 'ট্র্যাডিশনাল ইকনমিক কমপ্লেক্স'টা ভেঙে পড়েছে। জনগোষ্ঠীর একটা বড়ো অংশ তাদের জাতীয় ও সাংস্কৃতিক 'আইডেন্টিটি' হারাতে বসেছে। এর প্রধান কারণ, যাযাবর-জীবনকে 'হীন' চোখে দেখা। বল্গা হরিণ উৎপাদন আর পালনই ছিল এই গোষ্ঠীগুলির প্রধান জীবিকা। অথচ এদের জন্য যখন আধুনিক বাড়ি তৈরি করা হল, তখন এদের জীবিকাটা যাতে টিকে থাকতে পারে, সে কথা কেউ চিন্তা করেনি। ভাবা হয়েছিল, যাযাবরদের জন্য স্থায়ী একটা ঠিকানার ব্যবস্থা করাটাই যথেষ্ট। এখানেই সব থেকে বড়ো ভুলটা করা হয়েছে।"

আমাদের কূপে গল্পের আঁচ পেয়ে পাশের কূপে থেকে খুয়ান, কার্লোস, মিগেলরাও উঠে এসেছে। ট্রেন হু হু করে এগিয়ে চলেছে। কোথাও থামার নাম নেই। বগির 'প্রাভোদনিক' (কন্ডাক্টর)-এর কাছ থেকে সবার জন্য চা আনা হয়েছে। চা খেতে খেতে সকলে দিমিত্রির কথা শুনছি।

মিগেল বলল, "আপনাদের সাইবেরিয়ায় কত ধরনের প্রাকৃতিক সম্পদ, উত্তরের নদী বন আর তুন্দ্রা। তা সত্ত্বেও, ওখানকার বাসিন্দাদের জীবনযাত্রার মান, সোভিয়েত ইউনিয়নের অন্যান্য অঞ্চলের লোকেদের তুলনায় নিচু কেন?" কথাটা শুনে দিমিত্রি কিছুক্ষণের জন্য একদম চুপ করে গেলেন। যেন একটা গভীর চিন্তায় ডুবে থাকার পর বললেন, "উত্তরের অধিবাসীদের সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের উপর ভিত্তি করেই অর্থনৈতিক জীবনটা গড়ে উঠেছে। আমাদের প্রধান তিনটি জীবিকা হল—বলগা হরিণ পালন, পশুশিকার ও মাছ ধরা। এখন মোট জনসংখ্যার মাত্র ৪৩ শতাংশ এই পেশাগুলির সঙ্গে যুক্ত। তিন দশক আগেও সংখ্যাটা ছিল ৭০ শতাংশেরও বেশি। এই 'প্রোডাক্টিভ ব্রাঞ্চ'গুলি আজ গভীর সংকটের মুখোমুখি। কেন জানো? প্রথমত, ভারসাম্যহীন অর্থনীতি। দ্বিতীয়ত, শিল্পায়নের ধাক্কায় চারণভূমি, শিকারভূমি ও মাছ ধরার পুকুর, নদীনালা সরাসরি প্রভাবিত হয়েছে। যে বলগা হরিণের চাষ ছিল আমাদের জাতীয় সম্পদ, তা আজ রাষ্ট্রের হাতে। হরিণ এখন ডিপার্টমেন্টাল প্রপার্টি। ডিপার্টমেন্টগুলির অব্যবস্থা ও অযোগ্য প্রশাসনের কবলে বলগা হরিণের সংখ্যা এখন ১.৮ মিলিয়ন, যা এই শতকের মধ্যে সবথেকে কম। আমাদের আরো একটি সম্পদ ছিল, বুনো জন্তু জানোয়ারের গা থেকে ফার সংগ্রহ করা। এই ফার দিয়ে বহুমূল্য শীতের পোশাক, টুপি ইত্যাদি তৈরি হয়। এখন এই শিল্পও প্রায় ধ্বংসের মুখে।

'প্যারাডক্স'-টা কোথায় জানো? আধুনিক প্রযুক্তি বা শিল্পায়নের পুরো প্রক্রিয়াটার মাধ্যমে নর্থের লোকদের কোনো উন্নতি হয়নি। উলটে যা হয়েছে, তা হল, গ্যাস টর্চের বেগুনি আলো দিন আর রাতকে এক করে দিয়েছে। নদীর জলে তেল ভেসে বেড়াচ্ছে। ট্রাকের ভারী চাকার নিচে বলগা হরিণের খাওয়ার ঘাস পিষে যাচ্ছে। অথচ এসব নিয়ে কারোর মাথাব্যথা নেই। কর্তৃপক্ষের এই নির্বিকার মনোভাবের ফলে সাইবেরিয়ার অর্থনৈতিক কাঠামো আজ ভেঙে পড়ার মুখে। আরো একটা উদাহরণ দিই। আমাদের খান্‌তি-মান্‌সি ও ইয়ামালো নেনেত্‌স অটোনমাস এরিয়া সারা পৃথিবীতে জ্বালানি সরবরাহ করে। অথচ এই এলাকার বাসিন্দারা 'ফুয়েল-এনার্জি' বাবদ এক 'পাই'ও পায় না। কিন্তু

তেল ও গ্যাস সন্ধানকারীদের নিরবচ্ছিন্ন 'দৌরাত্ম্য' সহ্য করতে হয় এদের।

এই পুরো প্রক্রিয়াটার সরাসরি প্রভাব পড়েছে সাইবেরিয়ার তরুণ প্রজন্মের মানসিকতার উপর। অল্পবয়সিরা এখন আঞ্চলিক প্রাচীন পেশাগুলিতে আসতে ভয় পায়। তারা অদক্ষ ও 'কমদামি' শ্রমিক হিসেবে যেকোনো চাকরি বেছে নেয়। এমনিতেই চাকরির বাজারে এদের চাহিদা নেই, কারণ নিজেদের মাতৃভাষাটাও এরা ভালো করে জানে না।"

দিমিত্রির কথা শুনতে শুনতে, শ্বেত ভালুক আর নির্বাসনের দেশ সাইবেরিয়া সম্পূর্ণ নতুন চেহারায় আমাদের সামনে ফুটে উঠছিল। পৃথিবীর এক-ষষ্ঠাংশ জুড়ে যে সোভিয়েত ইউনিয়ন, তার অর্ধেকটা—উত্তরের বিরাট একটা অংশ জুড়ে সাইবেরিয়া। সেই উত্তরাংশের বাসিন্দারা—'স্মল ন্যাশনালিটিস অব দ্য নর্থ'। এই ছোটো ছোটো জাতিগুলির অনেক সমস্যা। সেই সমস্যা ছোটো নয়। তা বড়ো, তা জটিল। ছোটো জাতিগুলির সমস্যা নিয়ে কেউ মাথা ঘামায় না, সমস্যার বিশেষ চরিত্র নিয়ে কেউ ভাবনাচিন্তা করে না—এ নিয়ে অনেক অভিযোগ, অনেক অভিমান এদের মনে। সেই অভিযোগ, অভিমানের তীরও অনিবার্যভাবেই ঘুরে যায় প্রশাসনের কেন্দ্রবিন্দুকে লক্ষ্য করে—মস্কোর দিকে।

কথা বলতে বলতে দিমিত্রি উত্তেজিত হয়ে যাচ্ছিলেন। হঠাৎই বলে উঠলেন, "চেরনোবিলে কী হল ? মস্কোর ব্যাপারটা দ্যাখো। ওদের যাবতীয় পরীক্ষা-নিরীক্ষার ক্ষেত্র হল অন্য প্রজাতন্ত্রগুলো। যেন তারা সব গিনিপিগ ! মরলে অন্যরাই মরবে। মস্কোর গায়ে আঁচটিও লাগবে না।"

লাতভিয়া

ইউক্রেন থেকে ফিরলাম। ক্লাস শুরু হতে তখনও মাসখানেক বাকি। লম্বা গরমের ছুটিতে আমাদের হস্টেল যথারীতি ফাঁকা। সোভিয়েত ছাত্রছাত্রীরা বাড়ি চলে গেছে। বিদেশিদেরও অধিকাংশই মস্কোর বাইরে। যে কজন রয়েছে, আমি তাদের মধ্যে একজন। মস্কোয় থেকে যাওয়া এই জনাকয় ছাত্রছাত্রীর জন্য বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ফের একস্‌কারশনের বন্দোবস্ত করা হল। এবার যাওয়া হবে লাতভিয়ায়।

নির্ভেজাল বেড়ানোর আনন্দে বাদ সেধেছে ইউক্রেন। জর্জিয়ার মতোই একটা তিক্ত অভিজ্ঞতা নিয়ে আমি ফিরেছি সেখান থেকে। এমনটা হবে তা মস্কোয় বসে বুঝিনি। ইউক্রেন সম্পর্কে আমার অন্যরকম ধারণা ছিল। কী আর করা!

লাতভিয়ার কথা মস্কোতে বসেই অনেক শুনেছি। বেশ কিছুদিন ধরে সেখানে বহু সমস্যা দানা বেঁধেছে। রুশ-বিরোধী নানা কর্মসূচি পালিত হচ্ছে। অনেক রকম সমস্যা।

শুধু লাতভিয়াতেই নয়। প্রকৃতপক্ষে এস্তোনিয়া, লিথুয়ানিয়া এবং লাতভিয়াকে নিয়ে বাল্টিক সাগরের তীরে এই 'প্রিবাল্‌তিকা' জুড়েই রয়েছে ব্যাপক এক রুশ বিদ্বেষ।

ইউনিভার্সিটিতে ক্লাস শুরু হওয়ার পর থেকেই সিনিয়র ছাত্রছাত্রীর কাছে শুনতাম—"সুযোগ পেলেই প্রিবাল্‌তিকায় যাবি।" বাল্টিক রিপাবলিকগুলো, এই তিন সোভিয়েত প্রজাতন্ত্রই নাকি 'আসল ইউরোপ'। শুনতাম—"রাশিয়া তো ইউরোপের গ্রাম।"

প্রিবালতিকার বাসিন্দারা নাকি ভীষণ কালচার্ড, প্রচণ্ড মার্জিত। রুশিদের মতো এমন হাউমাউ করে কথা বলে না। মস্কোর দোকানে রুশি সেলসগার্লরা খদ্দেরদের সঙ্গে যেমন দুর্ব্যবহার করে, প্রিবালতিকাতে নাকি তা কল্পনাতীত। ওখানে 'সাভ্‌সেম দ্রুগোয়ে দিয়েলা' (একেবারে অন্য ব্যাপার)।

মস্কো পৌঁছানোর মাস দুয়েকের মধ্যেই আমার এসব কথা জানা হয়ে গিয়েছে। শুনলাম, ইউনিভার্সিটি থেকে আমাদের লাতভিয়ায় নিয়ে যাওয়া হবে। যদিও জানি, ওখানে গিয়েও আমি আবার একটা ধাক্কা খাব—সেই একঘেয়ে রুশ বিদ্বেষ, আর সেই তিক্ত অভিজ্ঞতা, এ নিয়েই ফিরতে হবে, তবুও একটা অদ্ভুত উত্তেজনা হচ্ছিল।

লাতভিয়ায় তো যাচ্ছি। সেই কমসামোল্‌কা সোয়েতা আবার সঙ্গে যাবে না তো! শুনলাম,না। লাতভিয়ায় যাচ্ছে অন্য একজন।

রুবল জমা দিয়ে নাম লিখিয়ে নিলাম। লিস্টের প্রথমেই আমার নাম লিখতে লিখতে হাসিমুখে সিনিয়র টিচার বললেন "এবারের গরমের ছুটিতে তুমি কিন্তু আর কোথাও যেতে পারবে না। একবারে দুটো একস্‌কারশনের বেশি যাওয়া যায় না। সবাই যাতে সুযোগ পায়, তাই এমন ব্যবস্থা।"

নিয়মটা আমার জানাই ছিল। ভাবলাম, লাতভিয়া থেকে বেড়িয়ে তো আসি। তারপর

দেখা যাবে, ছুটির বাকি দিন কটা কীভাবে কাটাব।

প্রত্যেক একস্‌কারশনের আগে একটা মিটিং হত। যে টিচার নিয়ে যাবেন, তিনি এই মিটিং ডাকতেন। যারা যাওয়ার জন্য নাম লেখাত, তারা সবাই শেষ পর্যন্ত যাচ্ছে কিনা, তা মিলিয়ে দেখা হত। তাছাড়া একস্‌কারশনে গিয়ে বিভিন্ন ফ্যাকাল্টির নানা কোর্সের যে সব ছাত্রছাত্রীরা সপ্তাহখানেক একসঙ্গে কাটাবে, তারা যাতে একে অন্যের মুখটা অন্তত চেনে তার জন্য মিটিংটা জরুরি ছিল।

লাতভিয়া যাওয়ার আগের দিন যথারীতি মিটিংয়ে গিয়ে আমি তো অবাক, সব মিলিয়ে প্রায় ৪০-৪৫ জন ছাত্রছাত্রী একটা ঘরে ভিড় করেছে। কিন্তু যাবে তো মোট ১৮ জনের একটা গ্রুপ! কিছুক্ষণ পরে ব্যাপারটা বুঝলাম। যদি কেউ শেষ মুহূর্তে না যায়, সেই ভেবে বাকিরা এসেছে। দেখা গেল, ফার্স্ট লিস্টের সকলেই হাজির। প্রিবাল্‌তিকায় যাওয়ার সুযোগ কেউ হারাতে চায় না। বাকিদের পরের বার নিয়ে যাওয়ার আশ্বাস দিলেন সিনিয়র টিচার। আমাদের সহপাঠী, বলিভিয়ার উইলসর টিচারকে বলল, "কাল সন্ধ্যাতে আপনারা যখন রওনা দেবেন, তখন আর একবার আসব। ব্যাগট্যাগ গুছিয়েই। বলা তো যায় না, একেবারে শেষ মুহূর্তে যদি কেউ যেতে না পারে!"

মিটিং শেষে বেরিয়ে আসার মুখে গালিয়ার সঙ্গে দেখা। আমাদের কোর্সেই পড়ে গালিয়া। বাড়ি মস্কোতেই। কী একটা কাজে ইউনিভার্সিটিতে এসেছে। আমাকে জিজ্ঞেস করল, "বেড়াতে যাচ্ছিস? কোথায়?" বললাম, লাতভিয়া। ঝলমলে মুখে গালিয়া বলল, "কী মজা তোর! ওখানে 'ফারফোর' (পোর্সেলিন)-এর দারুণ সব জিনিস পাওয়া যায়। বেশি করে রুবল নিয়ে যা সঙ্গে।"

পরদিন বিকেলে ইউনিভার্সিটির সামনে থেকে, ইউনিভার্সিটিরই বাসে আমরা চড়ে বসলাম। ফার্স্ট লিস্টের সেই ১৮ জনই। উইলসর সত্যিই ব্যাগ নিয়ে হাজির হয়েছিল। কিন্তু এবার আর ওর যাওয়া হল না। বাস ছেড়ে দিল। ফাঁকা ইউনিভার্সিটি চত্বরে উইলসর একা দাঁড়িয়ে হাত নাড়তে নাড়তে চেঁচিয়ে বলল, "হ্যাপি জার্নি!"

লাতভিয়ার রাজধানী রিগায় আমরা যে হোটেলটায় উঠেছিলাম, সেটা ছিল শহরের একেবারে মাঝখানে। অন্যান্য জায়গায় একস্‌কারশনে গিয়ে যে হোটেলে উঠেছি, সেগুলো সাধারণ চারতারা, পাঁচতারা হোটেল যেমন হয়, তেমন। রিগার হোটেলটা ছিল একেবারে অন্যরকম। কোনো জমিদার বা ব্যারনের বিরাট এক প্রাসাদকে অপরিবর্তিত অবস্থায় রেখে সেই হোটেল। বাড়িটার মাথা গম্বুজাকৃতি। ঘরের ভেতরে ছাদের দেওয়ালে সোনালি কারুকাজ। খাটে শুয়ে উপরদিকে তাকিয়ে মনে হচ্ছিল অষ্টাদশ শতকের কোনো ধনীগৃহে বেড়াতে এসেছি যেন। হোটেল-সুলভ কোনো যান্ত্রিকতা ছিল না রিগার সেই অতিথিশালায়।

দুনিয়ার সব বড়ো শহরেই বোধহয় পুরোনো পাড়া আর নতুন পাড়া—দুটো ভাগ থাকে। সোভিয়েত ইউনিয়নের যে কটা শহরে আমি গিয়েছি, সব জায়গাতেই এই বিভাজন চোখে পড়েছে। বড়ো বড়ো সোভিয়েত শহরের আধুনিক অঞ্চলগুলো সব প্রায় একইরকম। হাইরাইজ, চওড়া রাস্তা, সার সার দোকান, উর্ধ্বশ্বাসে বাস-ট্রাম-গাড়ি ছুটে চলেছে। ব্যস্ত মানুষের দল হনহনিয়ে এগোচ্ছে। চারদিক বড়ো ব্যস্ত, বড্ড যান্ত্রিক। বড্ড

একঘেয়ে, একরকম।

পুরোনো পাড়াতে গেলে কিন্তু একেবারে অন্যরকম। ছবিটা পুরো পালটে যায়। শহরের মূল চরিত্রটা ধরা যায় পুরোনো অঞ্চল দেখেই। পুরোনো পাড়াগুলো নিজস্বতায় ভরা। ইট বাঁধানো সরু রাস্তা, রাস্তার দু-পাশে পুরোনো সব বাড়ি, এককেটা বাড়ি একেকরকম। মাঝেমধ্যে পুরোনো গির্জা। চারদিকে কেমন একটা ঘুম ঘুম, নিস্তব্ধ ভাব।

পুরোনো মস্কো বা পুরোনো ৎবিলিসি বা পুরোনো রিগার মধ্যে কিছু মিল থাকলেও প্রতিটা শহরের নিজস্বতা, রাস্তার বিছানো ইটে, বাড়ির আকারে স্পষ্ট। দিদিমার তোরঙ্গা খোলার পর যে গন্ধ নাকে পেতাম, সব শহরের পুরোনো পাড়াতে গেলে সেই গন্ধটা আমার চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। তাও মস্কো, রিগা, ৎবিলিসি, সেন্ট পিটার্সবুর্গ সেখানে একাকার হয়ে যায় না। আসলে, আমরা এই বিশ শতকের মানুষেরা, দুনিয়া জুড়েই, আধুনিকতার নামে এক বৈচিত্রহীন সর্বজনীনতাকেই বোধহয় সবথেকে প্রাধান্য দিই।

পুরোনো রিগার সরু রাস্তার মুখে আমাদের বাসটা দাঁড়াল। আমরা পায়ে হেঁটে চললাম একটা দুর্গের দিকে। খাড়া সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে চোখটা জুড়িয়ে গেল। উপর থেকে গোটা রিগা শহরটা দেখা যায়। দুর্গের মাথায় এককোণে একটা মোরগ। টিনের তৈরি। গাইড বললেন, মোরগ হচ্ছে রিগা শহরের প্রতীক। পরে দেখলাম পুরোনো অনেক বাড়ির মাথায় ওইরকম টিনের মোরগ আছে।

দুর্গটা ঘুরে দেখছি। পেছনে থেকে কে যেন 'হ্যালো' বলে উঠল। তাকিয়ে দেখি, ১৫-১৬ বছরের একটা মেয়ে হাসি হাসি মুখে দাঁড়িয়ে। এখানে আসার সময় বাসে ওকে দেখেছি। হ্যান্ডশেকের জন্য হাত বাড়িয়ে দিয়ে বলল, "আই অ্যাম ইয়েভা।"

ক্লাস টেন-এ পড়ে ইয়েভা। ওদের স্কুলেও এখন গরমের ছুটি। স্কুলে ইংরেজি শেখে ও। বিদেশি ছাত্রছাত্রীর একটা গ্রুপ রিগাতে বেড়াতে আসছে শুনে নিজের উৎসাহেই আমাদের সঙ্গে এসেছে। বিদেশিদের সঙ্গে কথা বললে ইংরেজি ভাষাটা প্র্যাকটিস হবে, এই আশায়।

পিঠভরতি কোঁকড়া সাদা চুল, নিষ্পাপ মুখ, রাজহাঁসের মতো ধবধবে ইয়েভাকে দেখে এক মুহূর্তেই আমার ভীষণ ভালো লেগে গেল। নিজে থেকেই ও আমাকে বলল, "রিগা ঘুরিয়ে দেখাব তোমাকে।" আমি তো এক কথায় রাজি। তারপর যে কটা দিন রিগাতে ছিলাম সেই স্মৃতি আর ইয়েভা একেবারে একাকার হয়ে আছে।

ইয়েভা আমাকে হঠাৎ জিজ্ঞেস করল, "মস্কোতে থাকতে তোমার ভালো লাগে?" বললাম, প্রথম প্রথম কলকাতার জন্য, বাড়ির জন্য মন খারাপ করত। এখন অভ্যাস হয়ে গেছে। ভালোই লাগে। ও মাথা নেড়ে বলল, "সে কথা বলছি না। বিদেশে, সে যে কোনো জায়গা হোক না কেন, 'হোম-সিকনেস' তো হবেই। মস্কোর লোকেরা তো ভীষণ 'রাফ' আর কেমন যেন একটু—সেইজন্য জিজ্ঞেস করছি। আমি বছর দুয়েক আগে একবার মস্কো গিয়েছিলাম। স্কুল থেকে নিয়ে গিয়েছিল। আমার একটুও ভালো লাগেনি। আমার বন্ধুদেরও পছন্দ হয়নি। শহরটাও না, শহরের লোকজনদেরও না।"

—কিন্তু মস্কোর বাসিন্দাদের তো প্রিবালতিকা সম্পর্কে ভীষণ একটা মুগ্ধ ভাব আছে।

... খুব সত্যি, তবু—এটাও ওরা এককথায় স্বীকার করে।

—আমরা যে ওদের থেকে একদম আলাদা, এটা স্বীকার করতে ওরা বাধ্য। প্রতি পদে পদে এটা বোঝা যায়। তাই ব্যাপারটা ওদের স্বীকৃতির ধার ধারে না। আর তুমি যে মুগ্ধ ভাবটার কথা বলছ, সেটা প্রিবালতিকা সম্পর্কে, না প্রিবালতিকায় তৈরি জিনিসপত্র সম্পর্কে—এনিয়ে আমার যথেষ্ট সন্দেহ আছে। রিগার রাস্তায় অনেক দূর থেকে আমরা রুশিদের দেখলে চিনতে পারি। দুহাতে বিরাট দুটো ব্যাগ থেকে উপ্‌ছে পড়ছে জিনিসপত্র, গলদঘর্ম হয়ে থপথপে পায়ে এগিয়ে আসছে আর ভাবছে, আর কোন দোকানে ঢোকা যায়। পুরো লুঠতরাজের মতো। আমাদের দোকানে যা পায়, সমস্ত কিনে নেয় রুশিগুলো। শেষে আমাদের জন্যই কিছু থাকে না। তুমি জানো, অনেক রুশি প্রিবালতিকাতে আসে শুধু 'শপিং' করার জন্য। নিজেদের জন্য তো কেনেই, তাছাড়া মস্কোতে ওদের আত্মীয়স্বজনদের জন্যও এখান থেকে ব্যাগভরতি করে জিনিস নিয়ে যায়। শুধু জামাকাপড়, জুতো, বাসনপত্র বা 'ইলেকট্রনিক গুড্‌স' নয়, মাখন, চিজ, মিল্ক পাউডার পর্যন্ত! এককেসময় আমার মনে হয়, দোকানে-দোকানে ঘোরা ছাড়া রুশিগুলোর জীবনে যেন আর কোনো কাজ নেই!

ইয়েভার কথা শুনতে শুনতে ভাবছিলাম, কলকাতা শহরের ক্লাস টেনের মেয়েরা নিজের দেশ, চারপাশটা সম্পর্কে এত খোঁজখবর রাখে!

আমার হঠাৎ গালিয়ার কথা মনে পড়ল। রিগায় আসছি শুনে গালিয়ার প্রথমেই মনে হয়েছিল, এখানে পোর্সেলিনের খুব সুন্দর জিনিসপত্র পাওয়া যায়! সঙ্গে সঙ্গে ও আমাকে বেশি করে রুবল নিয়ে আসার পরামর্শ দিয়েছিল। অর্থাৎ, শুধু দেখে 'অ্যাপ্রিশিয়েট' করলেই চলবে না, যতক্ষণ না নিজের 'মালিকানা' প্রতিষ্ঠিত হয় ওই কয়েকটি বস্তুর উপর, ততক্ষণ স্বস্তি নেই!

সাশা নামের একটি ছেলে, আমাদের ইউনিভার্সিটির ছাত্র, রুশি, আমাকে একদিন নিজের নতুন লেদার জ্যাকেটটা দেখিয়ে বলেছিলেন, "দিল্লিতে কেনা।"

—তাই নাকি! কবে গিয়েছিলি ইন্ডিয়া? কেমন লাগল? শুধু দিল্লি না আগ্রাতেও গিয়েছিলি? আমার উৎসাহভরা প্রশ্নগুলো শুনে খুব নির্লিপ্ত গলায় সাশা বলেছিল, "দিল্লির পালিকা বাজারটা সত্যিই ভালো। জিনিসপত্র বেশ সস্তা। 'কোয়ালিটি'ও খারাপ না।"

—আর কুতুবমিনার? লালকেল্লা? তাজমহল? ভালো লাগেনি?

—চারদিন মোটে ছিলাম। পালিকা বাজের 'শপিং' করতেই গিয়েছিলাম। অন্য কোথাও ঘোরা হয়নি।

হকচকিয়ে গিয়েছিলাম। ২৩-২৪ বছরের রুশ যুবক সাশার জীবনে এটাই ছিল প্রথম বিদেশ ভ্রমণ! সাশার এই 'দিল্লি ভ্রমণের' গল্প শুনেছিলাম ৯১ সালে। তখন আরো একবার, বছর দুয়েক আগে, ৮৯ সালে শোনা গালিয়ার কথাগুলো আমার মনে পড়ে গিয়েছিল।

ইয়েভার সঙ্গে একদিন বেরোলাম পুরোনো গির্জাগুলো দেখতে। অনেককাল আগের সে সমস্ত গির্জা।

রিগার গির্জাগুলো অধিকাংশই গত শতকের। তবে 'অর্থোডক্স চার্চ'গুলোতে যেমন

বসার বেঞ্চ থাকত না, এখানে তেমন নয়। বসবার জন্য এখানে রয়েছে সারি সারি বেঞ্চ।

ইয়েভা আমাকে নিয়ে গেল একটা গির্জার ভেতরে। সেখানে রয়েছে একটা বড়ো পাইপ অর্গান। কতকটা আমাদের কলকাতায় জব চার্নকের সমাধির লাগোয়া গির্জার ভেতরে পাইপ অর্গানটার মতো। কলকাতার পাইপ অর্গানটার সুর কখনো শুনিনি। যখনই দেখেছি তখনই সে নিস্তব্ধ।

ইয়েভাকে বললাম, এটা কখন বাজে তুমি জানো? ও বলল, "আজই বাজবে।" আমরা অপেক্ষায় রইলাম।

বেজে উঠল অর্গান। অর্গানের সঙ্গে লাগানো বিরাট মোটা মোটা পাইপ। বাজনদারকে দেখা যাচ্ছে না। কিন্তু বোঝা যাচ্ছিল রিডের উপর দ্রুত ঘুরে বেড়াচ্ছে তাঁর আঙুলগুলো। অপূর্ব সে সুর। দরাজ তার আওয়াজ। অনেকটা গ্রেগোরিয়ান চ্যান্ট ধরনের।

মাতাল করা সে সুর বিশাল গির্জাটার হলের ভেতরে দেওয়ালে দেওয়ালে ধাক্কা খেয়ে অনুরণন তুলছিল। একটা আক্ষেপের মতো, একটা যন্ত্রণার মতো সেই সুরটা টুকরো টুকরো হয়ে ভেঙে ভেঙে ছড়িয়ে পড়ছিল। যেন মিশে যাচ্ছিল আমার রক্তের রেণুতে রেণুতে। মুক্তির পথ খুঁজছিল সেই সুর। কতক্ষণ আমি ঠায়ে সেদিকে তাকিয়ে খেয়াল নেই।

আমার চারপাশে যারা, তারা যেন চন্দ্রাহত। ভক্তিভারে আনত। সামনের দিকে যিশুর ছবি। সেদিকে তাকিয়ে সবাই, যেন চোখের পলক পড়ে না।

ইয়েভা বলল, "যাবে?" বুঝলাম, এতক্ষণ তন্ময় হয়েছিলাম। সুরের এ এক অদ্ভুত ক্ষমতা। মুহূর্তে পাম এভিনিউয়ের সেরিনাকে রিগার এক বাসিন্দার সঙ্গে গা ঘেঁষাঘেঁষি করে একই বেঞ্চে বসিয়ে রাখে, কিচ্ছু টের পাওয়া যায় না।

ইয়েভার সঙ্গে বেরিয়ে এলাম। হাঁটতে হাঁটতে ভাবছিলাম ওই পাইপ অর্গানটার কথা। আমার কেন যেন মনে হল পাইপ অর্গানটা একটা ক্রীতদাস। ধর্মের দাস। মস্কো-বিরোধীরা বা সোভিয়েত-ধারণা বিরোধীরা রিগায় একইসঙ্গে বিক্ষোভও করে আবার গির্জার জাঁকজমক গমককেও বাড়িয়ে চলে। এ-ও আন্দোলনের একটি কর্মসূচি! ওই সুর গির্জার বাইরে, ধর্মের গন্ডির বাইরে কতটা মোহময়ী?

প্রায় ঘন্টাতিনেক হল, সেই সকাল থেকে বাচ্চা মেয়েটার সঙ্গে ঘুরে বেড়াচ্ছি। যেমন সুন্দর তার কথা বলার ধরন, তেমন সুন্দর তার ব্যবহার। আমায় সে তাদের শহরের সব দ্রষ্টব্যগুলো না দেখিয়ে ছাড়বে না। এমন পছন্দের 'গাইড' পাওয়া গেলে ঘুরতে আপত্তি কোথায়? আর আমি তো দেখতেই এসেছি।

ইয়েভা আমায় নিয়ে গেল রিগার ইউনিভার্সিটিতে। গরমের ছুটিতে যদিও বন্ধ, ও বলল ভেতরে ঢোকার ব্যবস্থা করে দেবে।

বন্ধ গেটের সামনে দাঁড়িয়ে ও লাতভিয়ান ভাষায় চিৎকার করে কী সব যেন বলল। বিশাল বড়ো বাড়ি। ফাঁকা চত্বর। কোনো লোকজন নেই। গেটের একটু পাশে, ভেতরদিকে রয়েছে একটা ঘর। রাস্তা থেকে এতটুকুই দেখা যাচ্ছে। দু-তিন মিনিট দাঁড়িয়ে আছি।

কোনো লোকের দেখা নেই। মুখ কাচুমাচু করে ইয়েভা বলল, "আছে, আছে। এক্ষুনি বেরোবে কেউ। থাকে তো ওই ঘরেই।" বললাম, ঠিক আছে। আমি অপেক্ষা করছি। ইয়েভা আর একবার হাঁকডাক শুরু করল। খানিকক্ষণ পরে চাবির গোছা হাতে এক বৃদ্ধা বেরিয়ে এলেন। হাঁটুর নীচ পর্যন্ত কালো স্কার্ট, সাদা জামা, মাথার সাদা ধবধবে চুল, কাটাকাটা নাক, চোখ মুখ। গেটের সামনে এসে বললেন, "এখন তো ইউনিভার্সিটি বন্ধ। কী চাই তোমাদের?" ইয়েভা তাঁকে বলল, "এ আমার ভারতীয় বন্ধু। কালই চলে যাবে। খুব দেখার ইচ্ছা ইউনিভার্সিটিটা। যদি আপনি একটু খুলে দেন, ভালো হয়।" সেই বৃদ্ধা 'ইন্দিয়া, ইন্দিয়া' বলে দু-বার মাথা নাড়িয়ে গেটটা খুলে দিলেন।

ভেতরে ঢুকেই একটা ফাঁকা চত্বর। তার শেষপ্রান্ত থেকে বিশাল চওড়া খাড়া সিঁড়ি উঠে গেছে। সিঁড়ির ল্যান্ডিং থেকে শুরু করিডর। তার পাশে পাশে ঘরগুলো। সেসব ঘর আর ওই বৃদ্ধা খুলে দেননি। করিডর বরাবর রয়েছে লাতভিয়ার বিখ্যাত মনীষীদের পাথরের আবক্ষ মূর্তি।

একটা মাত্র হলঘর খোলা ছিল! অতবড়ো হলঘর আর কোথাও আমি এখনও পর্যন্ত দেখিনি। সেখানে ইউনিভার্সিটি ছাত্রছাত্রীরা নাচগানের ক্লাস করে। হলের এককোণায় রাখা আছে একটা বিরাট রাজকীয় পিয়ানো।

ইয়েভা সেই পিয়ানোটাতে গিয়ে টুংটাং করে দু-তিনবার আওয়াজ করল। বৃদ্ধা হলঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে ছিলেন। সেখান থেকে চিৎকার করে উঠলেন, "উঁহু, উঁহু, হাত দিও না।" জিভ কেটে ইয়েভা আমায় বলল, "চলো"।

সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে ইয়েভা বলল, "পিয়ানো আমার খুব ভালো লাগে।" আমি বললাম, তোমার আছে? মাথা ঝাঁকিয়ে জানাল, না। ওর মিষ্টি মুখটা কেমন করুণ দেখাচ্ছিল। আমার ধারণা ছিল, ঘন ঘন দীর্ঘশ্বাস ফেলা কেবল বাঙালির নিজস্ব ধর্ম। দেখলাম ইয়েভাও একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলে উঠল ও, "আমরা কমিউনাল ফ্ল্যাটে থাকি। (অনেকগুলো পরিবারের জন্য একটা রান্নাঘর ও একটা বাথরুম, টয়লেট থাকে এই ধরনের ফ্ল্যাটে)। বাবা মা আর আমার জন্য একটাই ঘর। নিজেরাই থাকার জায়গা পাই না, পিয়ানো থাকবে কোথায়?"

—কেন একটা ঘরে থাকো তোমরা?

—কী করব? আমাদের এখানে আলাদা ফ্ল্যাট পেতে হলে অনেক ঝামেলা। চাইলেই পাওয়া যায় না।

—তার মানে?

—আলাদা ফ্ল্যাট পেতে হলে তালিকায় নাম তুলতে হয়। এই যে এখন কমিউনাল ফ্ল্যাটে আছি—যাদের টাকা-পয়সা কম তাদের থাকার জন্য সরকার এই ফ্ল্যাটের ব্যবস্থা করেছে। এখান থেকে যদি আলাদা ফ্ল্যাট পেতে হয় তাহলে আগে গাড়ি কেনার মতোই তালিকায় নাম লিখিয়ে নিতে হবে। তারপর ডাক পেলে আলাদা ফ্ল্যাটে যাওয়া যায়। সমস্ত ফ্ল্যাটই সরকারের। কেউ কিনতে পাবে না। সবাই ভাড়াটে। অন্য ফ্ল্যাটে যাওয়ার তালিকায় আমাদেরও নাম তোলা আছে। তালিকায় নাম থাকা সত্ত্বেও রিগার লোকরা

এখন আর ডাক পায় না। রুশিরা সব ফ্ল্যাট দখল করে নিচ্ছে। লাতভিয়ায় বড়ো বড়ো ফ্ল্যাট তৈরি হয়। আর্মির উচ্চপদস্থ কর্মীরা অবসর নেওয়ার পর তাঁদের সরকার থেকে জিজ্ঞেস করা হয়, কোথায় তারা থাকতে চান। সকলেরই নজর প্রিবালতিকার দিকে। ওই বড়ো বড়ো ফ্ল্যাটে আর্মির রিটায়ার্ড অফিসাররা থাকেন এখন।

যেখানেই যাচ্ছি, সেখানেই দেখছি ভয়ংকর রুশ বিরোধিতা। বাইরে থেকে কিচ্ছু বোঝার উপায় নেই। অন্য প্রজাতন্ত্রগুলো যে এতটা খেপে আছে, তা কিন্তু মস্কোয় বসে বোঝা যায় না। তবে এই 'ক্ষিপ্ত হওয়া'র মধ্যে আবার রকমফের আছে।

এন্দির কথা শুনে যেমন রাগ হয়েছিল, ইয়েভার বেলা তেমনটা হল না। এন্দির রুশ-বিদ্বেষকে আমার 'অকারণ' মনে হয়েছিল। ইয়েভার কথা শুনতে শুনতে মনে হচ্ছিল, ওর নিজের তো বটেই, এন্দির কথাগুলোতেও যেন যুক্তি আছে। তবে জর্জিয়ার সঙ্গে লাতভিয়ার অনেক তফাত। বাচ্চা মেয়েটা বলে, "ওরা দক্ষিণের লোক (জর্জিয়ান) তো। উগ্র প্রকৃতির। তাই ওদের প্রতিবাদের ধরনটা ভীষণ তীব্র। আসলে কী জানো, রাশিয়া এতদিন অন্যান্য রিপাবলিককে নিজেদের কলোনির মতো ব্যবহার করত। এখন সবাই একসঙ্গে রুখে দাঁড়িয়েছে। কতদিন আমরা ওদের এই একতরফা অত্যাচার সহ্য করব? আর কেনই-বা? তবে আমাদের প্রতিবাদের ধরনটা হবে অন্যরকম। সেটা তুমি আজই দেখতে পাবে।"

আমায় হোটেলে পৌঁছে দিয়ে ইয়েভা চলে গেল। যাওয়ার সময় নেমন্তন্ন করে গেল—"আজ বিকেলে সেন্ট্রাল স্কোয়ারে চলে এসো। লাতভিয়ার আন্দোলন দেখতে পাবে। আমি বাবা মা-র সঙ্গে যাব। শুধু লাতভিয়া নয়। প্রিবালতিকার আরো দুটো প্রজাতন্ত্রও এই কর্মসূচিতে যোগ দেবে।"

বাল্টিক সাগরের তীরের তিন প্রজাতন্ত্রের বাসিন্দারা হাতে হাত ধরে তৈরি করেছে মানবশৃঙ্খল। ছোটো ছোটো দলে ভাগ হয়ে অনেকগুলো মিটিং হচ্ছিল। কেন্দ্রীয় সমাবেশ হচ্ছিল সেন্ট্রাল স্কোয়ারে। এক বক্তা প্রথমে লাতভিয়ান ভাষায়, তারপর ইংরেজিতে ঘোষণা করলেন, "সোভিয়েত ইউনিয়ন থেকে আমরা এখন নিজেদের বিচ্ছিন্ন করে ফেলেছি। আমরা এখন স্বাধীন। তিন প্রজাতন্ত্রের সীমান্ত ঘিরে মানুষ হাতে হাত ধরে দাঁড়িয়েছে। তিন প্রজাতন্ত্রকে আমরা ঘিরে ফেলেছি, আমাদেরই মানুষ দিয়ে। সোভিয়েতের অন্য অংশের সঙ্গে আমাদের কোনো সম্পর্ক নেই। আমাদের স্বাধীনতা আন্দোলন শুরু হল।"

ভিড়ের মাঝে আমি ইয়েভাকে খোঁজার চেষ্টা করছিলাম। দলে দলে মানুষ আসছে। তারই মধ্যে হয়তো ছোটো মেয়েটা বাবা মা-র হাত ধরে কোথাও দাঁড়িয়ে আছে।

পাঞ্জাবের রুপিন্দর আমার সঙ্গে ছিল। আমাদের দুজনকে দেখে এক বৃদ্ধা জানতে চাইলেন, "তোমরা কোত্থেকে এসেছ?" তিনি লিফলেট বিলি করছিলেন। আমরা ভারতীয় শুনে আনন্দ ও বিস্ময় মেশানো গলায় বললেন, "ই-ন্দি-য়া! আমাদের আন্দোলনকে সমর্থন জানাতে বুঝি। 'আগ্রোমনোয়ে স্পাসিবা' (অনেক ধন্যবাদ)।" বৃদ্ধার উৎসাহ আর আনন্দ দেখে তাঁকে আর বললাম না মস্কো থেকে এক্সকারশনে এসে ঘটনাচক্রে এই মিটিংয়ে হাজির হয়েছি। খুশি ঝলমলে মুখে বৃদ্ধা বলে চললেন, "এর আগে যে ভদ্রলোক

বললেন, উনি লাতভিয়ান হলেও এখন আমেরিকার নাগরিক। কিন্তু জন্মভূমিকে স্বাধীন করার জন্য এই আন্দোলনে সামিল হয়েছেন—"

বৃদ্ধার কথার মাঝেই আরেকজন মঞ্চে উঠলেন। মাইকে কী একটা ঘোষণা করা হল। বৃদ্ধা বললেন, "এর কথাগুলো মন দিয়ে শোন। এ সমস্ত পরিষ্কার করে বলে দেবে।" তারপর লিফলেট দিতে দিতে চলে গেলেন তিনি।

"১৯৪০ সালে লাতভিয়া সোভিয়েত ইউনিয়নের অন্তর্ভুক্ত হয়—"নতুন বক্তা বক্তব্য শুরু করলেন, "নাৎসি জার্মানির হাত থেকে বাঁচার জন্য এ ছাড়া আর কোনো উপায় ছিল না। তখন মস্কো আমাদের সাহায্য করেছে। তা আমরা অস্বীকারও করি না। কিন্তু সাহায্যের বিনিময়ে লাতভিয়া তার সর্বস্ব দিয়ে দেবে মস্কোকে—এটাও ঠিক নয়। মস্কোর অত্যাচার দিনের পর দিন সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছে। আমাদের মাতৃভাষা কেড়ে নিয়ে, ওরা জোর করে ওদের ভাষা চাপিয়ে দিয়েছে। আমাদের দৈনন্দিন জীবনকে নিয়ন্ত্রণ করতে চাইছে। আমাদের নিজস্ব কোনো চিন্তা, মত আমরা প্রকাশ করতে পারি না। এভাবে আমরা সোভিয়েতের শরিক হয়ে থাকতে রাজি নই।"

হাততালিতে ফেটে পড়ল গোটা সেন্ট্রাল স্কোয়ার। বাবার ঘাড়ে বসে মিটিং শুনতে আসা বছর চারেকের একটা শিশুও প্রাণপণে হাততালি দিচ্ছিল।

হোটেলে ফিরে এলাম। তারপর মস্কোতে। দিনকয়েক পরে হাতে একটা পুস্তিকা এল—"স্ত্রানা ই ইয়ো নারোদি' (দেশ ও তার মানুষ)। তাতে বিভিন্ন প্রজাতন্ত্রের সমস্যা আর তার কারণগুলি নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা ছিল।

আমি বেড়াতে যাওয়ার আগে ৮৯ সালের মে-জুন মাসে মস্কোতে সোভিয়েত ইউনিয়নের পিপল্‌স ডেপুটিদের প্রথম কংগ্রেস বসে। সেখানে জাতিগত সমস্যা এবং বিভিন্ন গোষ্ঠীগুলির মধ্যে সম্পর্ক সংক্রান্ত প্রশ্নের দিকে বিশেষ মনযোগ দেওয়া হয়। বলা হয়, সোভিয়েতের জাতি-সংক্রান্ত নীতিটির আমূল পরিবর্তন প্রয়োজন। একইসঙ্গে এমন একটি রাজনৈতিক প্রক্রিয়া গড়ে তোলা দরকার, যা আন্তর্গোষ্ঠী সমস্যা সংক্রান্ত ইস্যুগুলি সমাধানে ফলবতী ও তৎপর হবে।

সোভিয়েত সরকারেও যে টনক নড়েছে তা বুঝলাম। কিন্তু আমার ক্ষুদ্র বিবেচনায় মনে হল, অনেক দেরি হয়ে গেছে। ভাঙনের শব্দ শুনতে পাচ্ছি।

ওরা আর আমরা

আমি আর আমরা—বিদেশি ছাত্রছাত্রীরা, বিশ্বের ১১০টা দেশ থেকে পড়তে গিয়েছিলাম ওদের দেশে—সোভিয়েত ইউনিয়নে।

তথাকথিত 'তৃতীয় বিশ্বের' ছেলেমেয়েরাই পড়তে যেত ওখানে। বিদেশি বলতে তারাই, অর্থাৎ আমরা।

সোভিয়েত ইউনিয়নের জন্মলগ্নে লেনিন রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য যে নীতিগুলি গ্রহণ করেন, তার মধ্যে একটি ছিল—বিশ্বের কলোনি রাষ্ট্র ও অনুন্নত রাষ্ট্রগুলিকে সাংস্কৃতিক সাহায্যপ্রদান। সি পি এস ইউ এবং সোভিয়েত সরকার লেনিনের এই নীতিকে বাস্তবায়িত করার চেষ্টা করেছিল। আটের দশকের গোড়ায় সোভিয়েত ইউনিয়নের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মোট এক লাখ বিদেশি ছাত্রছাত্রী পড়াশোনা করত। তাদের মধ্যে শুধু মস্কোতেই পড়ত ২৫ হাজার বিদেশি। মস্কোর প্যাট্রিস লুমুম্বা পিপলস ফ্রেন্ডশিপ ইউনিভার্সিটিতে পড়ত ৬,৭০০ ছাত্রছাত্রী। তার মধ্যে এশিয়া, আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকার উন্নয়নশীল দেশগুলির ছেলেমেয়ে ছিল ৭৫ শতাংশ। বাকি সোভিয়েত ছেলেমেয়ে। মোট ৪৫০টি জাতির প্রতিনিধি এসে জড়ো হত এই ইউনিভার্সিটি চত্বরে। উপরের পরিসংখ্যানগুলি সবই ৮৩-৮৪ সালের।

'তৃতীয় বিশ্বের' উন্নয়নশীল রাষ্ট্রগুলির জন্য দক্ষ ও পেশাদার স্থপতি, চিকিৎসক, অর্থনীতিবিদ, ঐতিহাসিক, ভাষাবিদ, শিক্ষাবিদ প্রমুখ গড়ে তোলার জন্য ৬০ সালের ৫ ফেব্রুয়ারি সোভিয়েত সরকার একটি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। বলা হয়, পিছিয়ে পড়া রাষ্ট্রগুলিকে সাংস্কৃতিক সাহায্যদানের জন্য মস্কোতে 'উনিভার্সিতেত দ্রুঝবি নারোদভ ইমিনি পাত্রিসা লুমুম্বি' বা সংক্ষেপে 'উ দে এন' (প্যাট্রিস লুমুম্বা পিপলস ফ্রেন্ডশিপ ইউনিভার্সিটি) নামে একটি বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে তোলা হবে। ওই বছরেরই ১ অক্টোবর থেকে ইউনিভার্সিটির ক্লাস শুরু হয়। তখন মোট ছাত্রসংখ্যা ছিল ৫৩৯। এরা ছিল এশিয়া, আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকার ৫৪টি দেশের ছেলেমেয়ে। শিক্ষক ছিলেন ১২০জন। ৮৫ সালে ইউনিভার্সিটির ২৫ বছর পূর্তির সময়, শিক্ষকসংখ্যা বেড়ে দাঁড়ায় ১৪০০।

মোট ছাত্রছাত্রীর এক-তৃতীয়াংশ ছিল সোভিয়েত। এরা প্রায় সকলেই ছিল 'কমসামোল' সদস্য। অনেকের বাবা-মা ছিলেন সি পি এস ইউ-এর প্রভাবশালী সদস্য। পার্টির প্রতি আনুগত্যের ভিতটা পরম্পরাগত ও মজবুত না হলে, অত বিদেশির সংস্পর্শে থাকা বা দিনরাত ওঠাবসা করাটা যথেষ্ট 'নিরাপদ' নয় বলেই হয়তো এমন ব্যবস্থা ছিল। এমনকী, ইউনিভার্সিটির শিক্ষক-শিক্ষিকাদের কেউ কেউ কেজিবি-র প্রাক্তন উচ্চপদস্থ কর্মী বা অন্য কোনোভাবে কেজিবি-র সঙ্গে জড়িত, এমন কথাও কিছু সোভিয়েত ছাত্রছাত্রীর কাছে শুনেছি (গ্লাসনস্তের দৌলতেই হয়তো)!

প্যাট্রিস লুমুম্বা ইউনিভার্সিটির বিদেশি পড়ুয়ারাও অনেকেই ছিল কমিউনিস্ট পরিবারের সন্তান। মা, বাবা, মাসি, জ্যাঠা, কাকাদের কেউ কমিউনিস্ট হলে প্যাট্রিস লুমুম্বাতে ভরতি হওয়ার 'রহস্য'টা সহজে বোঝা যেত। ব্যতিক্রমগুলির ক্ষেত্রে অবিশ্বাস মেশানো গলায় বারবার প্রশ্ন শুনতে হত, "বাড়ির কেউ কখনো কমিউনিস্ট পার্টির সক্রিয় সদস্য ছিল না? তাহলে খোদ মস্কোর প্যাট্রিস লুমুম্বার মতো 'প্রেস্টিজিয়াস' ইউনিভার্সিটিতে সুযোগ পেলে কী করে?" মস্কোতে থাকাকালীন বহুবার এবং ওখান থেকে পাশ করে ফেরার পরেও অনেকবার সেই 'গল্প'টা শোনাতে হয়েছে।

সাপ্তাহিক পত্রিকায় একটি প্রবন্ধ চোখে পড়েছিল। নাম 'সোভিয়েত ইউনিয়নে বিদেশি ছাত্রছাত্রী' বা এই ধরনেরই কিছু একটা। সোভিয়েত শিক্ষাব্যবস্থা ও ওখানকার বিদেশি পড়ুয়াদের সম্পর্কে সেই প্রথম বেশ খানিকটা জানতে পারি। সেটা ৮৫-৮৬ সালের কথা হবে। লাইব্রেরির সুবাদে গোর্কি সদনে আসা-যাওয়া আগে থেকেই ছিল। এ বিষয়ে ওখানে আরো খোঁজ করি।

ভারত ও সোভিয়েত ইউনিয়নের পারস্পরিক সম্পর্ক ভালো করার জন্য সে সময় গোর্কি সদনে বেশ কয়েকটি ক্লাব বা সংগঠন ছিল। সাংস্কৃতিক নানা কার্যকলাপের সঙ্গে এরা সক্রিয়ভাবে যুক্ত থাকত। সোভিয়েত শিল্পীদের নিয়ে অনুষ্ঠান, সেমিনার, চলচ্চিত্র প্রদর্শনী, দাবা প্রতিযোগিতা ইত্যাদি নানা ধরনের সাংস্কৃতিক বিনিময়ের মধ্যেই শুধু এরা নিজেদের সীমাবদ্ধ রাখত না। ছাত্রছাত্রী পাঠানোর ক্ষেত্রেও এদের ভূমিকা ছিল গুরুত্বপূর্ণ। ক্লাবের কোটায় অনেকে যেত। ক্লাবগুলির 'রেকমেন্ডশন' ছিল যথেষ্ট জরুরি। সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙে পড়ার পরে ক্লাবগুলি থাকলেও, তাদের প্রভাব প্রতিপত্তি অনেকটাই কমেছে তা বলাই বাহুল্য।

প্রার্থী বাছাইয়ের সময় আগের পরীক্ষার (উচ্চ মাধ্যমিক বা সমতুল্য) ফলাফলও দেখা হত। নির্দিষ্ট পরিমাণ নম্বর থাকলে তবেই ক্লাবগুলি সুপারিশ করত। আমার পরিবারের কেউ কখনো কমিউনিস্ট পার্টির সক্রিয় সদস্য ছিলেন না। একটি ক্লাবের সদস্য হওয়ার সুবাদে এবং অবশ্যই প্রয়োজনীয় আরো কয়েকটি 'ক্রাইটেরিয়া' মিলে যাওয়াতে প্যাট্রিস লুমুম্বাতে ভরতি হওয়ার সুযোগ পাই আমি। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র, আমার পরিচিত একজনের প্রশ্নের উত্তরে একথা বলাতে মুচকি হেসে সে বলেছিল, "এটা তো লোককে বলার জন্য। যাওয়ার আসল উপায়টা কী, বলো না একটু শুনি!"

তবে শুধু মামা-কাকার দৌলতেই সবসময় নয়। ছাত্রছাত্রীরা নিজেরাও তাদের দেশে অনেক সময় সক্রিয় রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত থাকত। আফগানিস্তানের অনেক ছেলেমেয়ে যুদ্ধ করেছে। আফগান মেয়ে তাখ্‌মিনা বন্দুক হাতে শত্রুদের ঠেকিয়েছে। চোখের সামনে শত্রুর গুলিতে বাবা ভাইকে প্রাণ হারাতে দেখেছে। লেবাননের ভালিদ, নিকারাগুয়ার হাইমে, চিলির আন্তোনিও যুদ্ধক্ষেত্রে নিজেদের অভিজ্ঞতার গল্প শোনাত। ফিলিস্তিনি ছাত্রদের অনেকেই আত্মগোপন করে, অন্য দেশের মধ্য দিয়ে এসে পৌঁছেছিল সোভিয়েত রাজধানীতে। চিলি, ইথিওপিয়া বা কামপুচিয়ায় যখন স্বৈরাচারী শাসনব্যবস্থা চালু হয়েছে, যখন শাসকগোষ্ঠীর রাগ গিয়ে পড়েছে কমিউনিস্টদের উপর, তখন কমিউনিস্ট পার্টির

সদস্যরা বা কমিউনিস্ট পরিবারের সন্তানেরা দলে দলে দেশ ছেড়ে যেতে বাধ্য হয়েছেন। বাড়িছাড়া, দেশছাড়া এমন বহু কমিউনিস্টকে, তাদের ছেলেমেয়েকে মস্কো আশ্রয় দিয়েছে। রাজনৈতিক আশ্রয়। এদের অনেকেই ছিল আমার সহপাঠী।

আমার খুব কাছের বন্ধু ইরিনার বাবা বলিভিয়ার প্রথম সারির কমিউনিস্ট নেতাদের একজন। বলিভিয়ায় যখনই কমিউনিস্ট-বিরোধী কোনো শাসক ক্ষমতা দখল করেছেন, তখনই, কয়েক ঘন্টার নোটিসে, ছোটো ছোটো ছেলেমেয়ে, স্ত্রীকে নিয়ে ইরিনার বাবাকে দেশ ছাড়তে হয়েছে। কখনো আর্জেন্টিনা, কখনো মেক্সিকোর উদ্দেশে। ইরিনা বলত, "কমিউনিস্ট বাবা-মা-রা ছেলেমেয়েদের 'মানুষ' করার জন্য যথেষ্ট সময় দিতে পারেন না। তাদের কথা মাথায় রেখেই আমাদের এই ইউনিভার্সিটিটা তৈরি হয়েছে।"

আমাদের এখানে ইউনিভার্সিটি বলতে যা বুঝি, সোভিয়েত দেশে ঠিক তেমনটি ছিল না। এখানে স্কুল পেরিয়ে কলেজ। বেশ ভালোভাবে কলেজ পেরোতে পারলে তবেই ইউনিভার্সিটি। আর ওখানে স্কুল শেষ করেই ইউনিভার্সিটির পালা শুরু। আমাদের এখানে স্নাতক হতে হয় কলেজে পড়ে। আর ইউনিভার্সিটি শেষ করে মেলে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি। ওখানে এই ৩+২-এর ধাপটা একই সঙ্গে। অর্থাৎ স্নাতক ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রি একসঙ্গে যে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে পাওয়া যায়, তা-ই ইউনিভার্সিটি। কলেজের কোনো অস্তিত্ব ছিল না সোভিয়েত শিক্ষাব্যবস্থায়। ইউনিভার্সিটিতে ভরতি হলে ৫ বছরের কোর্স শেষ করতে হত। ৩ বছর পড়ার পর কেউ স্নাতক হতে পারত না। ৫ বছর পড়ে একবারে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি নিতে হত। অর্থাৎ ৩+২-এর হিসাবটা আমাদের দেশের উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে চালু থাকলেও সোভিয়েত ইউনিয়নে ছিল না। তবে বিষয় অনুসারে আমাদের ইউনিভার্সিটিতে কোর্সের মেয়াদ কম-বেশি হত।

প্রথম বছর প্রিপারেটরি কোর্স। এই সময়টাতে বিদেশি ছাত্রছাত্রী রুশ ভাষা শিখত। ইংরেজি, ফরাসি, স্প্যানিশ, আরবি, সোয়াহিলি ইত্যাদির মধ্যে কোনো একটা ভাষা শিখত সোভিয়েত ছাত্রছাত্রী। প্রিপারেটরিতে এক বছর ভাষা শেখার পর শুরু হত মূল কোর্স। রুশ ভাষা ও সাহিত্য, আন্তর্জাতিক সাংবাদিকতা, আইন, ফিজিক্স, অঙ্ক, স্থাপত্যবিদ্যা ইত্যাদি বিষয়ের জন্য বরাদ্দ ছিল ৫ বছর। অর্থাৎ ১+৫ বা মোট ৬ বছরের কোর্স। ইতিহাস, অর্থনীতি, কৃষিবিদ্যার মূল কোর্সটা ছিল ৪ বছর ৬ মাসের। এই বিভাগগুলির ছাত্রছাত্রী স্নাতকোত্তর ডিগ্রি পেত ইউনিভার্সিটিতে ভরতির সাড়ে পাঁচ বছর পরে। আর ডাক্তারি পড়তে সময় লাগত ১+৬ বা মোট ৭ বছর।

যেসব বিদেশি ছাত্রছাত্রী নিজেদের দেশে পার্ট ওয়ান বা পার্ট টু পরীক্ষার পর ওখানে যেত, তাদেরও অন্য সকলের মতো প্রথম থেকেই পড়তে হত। অনার্স বা পাস গ্র্যাজুয়েট হলেও সেই প্রিপারেটরি থেকে শুরু করতে হত। এন্দি স্কুল শেষ করেই ইউনিভার্সিটিতে ভরতি হয়েছিল। ইরিনাও তাই। আবার পাকিস্তানের ইমতিয়াজ, লেবাননের ভালিদ, প্যালেস্টাইনের নাসের নিজেদের দেশে সাংবাদিক হিসেবে বেশ কয়েক বছর কাজ করার পর পড়তে গিয়েছিল মস্কোতে। সদ্য স্কুল পাশ ১৬-১৭-র ইরিনা বা এন্দি আর ৩৫-৩৬ বছরের কাঁচাপাকা চুলের ইমতিয়াজ, ভালিদ বা নাসের হল একই ক্লাসের পড়ুয়া।

... আমরা সার্টিফিকেট হাতে পেলাম। সোভিয়েত ইউনিয়ন তখন পৃথিবীর মানচিত্র থেকে হারিয়ে গেছে। রদবদল হয়েছে সোভিয়েত শিক্ষাব্যবস্থারও। এখন নতুন রাশিয়ায় নতুন রীতি। ৩+২-এর নিয়ম চালু এখন ওখানে। গ্র্যাজুয়েশনে ভালো নম্বর পেলে তবেই পোস্ট গ্র্যাজুয়েশন স্তরে ভরতি হওয়া যায়।

আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলির সঙ্গো ওখানকার ইউনিভার্সিটির আরো একটা মৌলিক তফাত আছে। আমাদের এখানে উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে সব পরীক্ষা লিখিত। এককেটা বিষয়ের পূর্ণমান ১০০ বা ২০০। পর পর কয়েকদিন ৩-৪ ঘন্টা টানা লিখে পরীক্ষা দিয়ে রেজাল্টের জন্য অপেক্ষা করতে হয় অনেকগুলো মাস। কখনো-বা বছরখানেক। সেই খাতা দেখতে গিয়ে বা রেজাল্ট বের করতে গিয়ে কতরকমের ভূতুড়ে কাণ্ডকারখানা হয়, তা আমরা সবাই জানি। রেজাল্ট বেরোবার আগেই পরীক্ষার খাতা ঠোঙা হয়ে বাজারে ঘোরে। পরীক্ষার আগে প্রশ্নপত্র ফাঁস হয়ে যায়। খবরের কাগজে প্রথম পাতায় সেই প্রশ্নপত্রের অংশবিশেষের ছবি ছাপানো হয়। সপ্তাহখানেক ধরে সাংবাদিকদের 'অন্তর্তদন্তমূলক রিপোর্ট' পেশ করা হয়। তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম শ্রেণির কোনো চুনোপুঁটি জালে ধরা পড়ে। রাঘব বোয়ালরা যথারীতি বহাল তবিয়তেই থাকে। পরীক্ষা ব্যবস্থা একইরকম থাকে। কোনো রদবদল হয় না। আবার প্রশ্নপত্র দিয়ে ঠোঙা বানানো হয় (পরীক্ষার আগেই)। খাতার বাণ্ডিল রাস্তায় বা ধানখেতে গড়াগড়ি যায়। বিভিন্ন 'দাদা', 'দিদি'-র কোচিং সেন্টার খবরের কাগজে 'বোল্ড হেডিং'-এ দাম্ভিক বিজ্ঞাপন দিয়ে 'গ্যারান্টিসহ বিভিন্ন পরীক্ষায় পাশ করিয়ে দেওয়ার দায়িত্ব' নিজেদের 'শক্ত কাঁধের' উপর তুলে নেয়!

এসব জানলেও কারোরই বিশেষ কিছু যায় আসে না। কী-বা আমরা করতে পারি! বড়ো হওয়ার সঙ্গো সঙ্গো আমাদের এখানকার ছেলেমেয়েরা শিখে নেয় অন্তহীন, প্রশ্নহীন ধৈর্য না থাকলে এদেশে কেউ বেঁচে থাকতে পারে না। ধৈর্যহারা হলে বা 'অকারণ' কী, কেন নিয়ে মাথা ঘামালে আমাদের এদেশে কেউ 'বড়ো' হতে পারে না। তাই এই 'অপরিহার্য' ধৈর্যের প্রথম পাঠ দেওয়ার দায়িত্বও আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলি নিজেদের ঘাড়ে তুলে নিয়েছে!

সোভিয়েত দেশের সব পরীক্ষা মৌখিক। অঙ্ক বা এঞ্জিনিয়ারিং-এর আঁকাজোকার কথা বাদ দিয়ে অন্যান্য বিষয়ের কথা বলছি। পরীক্ষার আগে পুরো সিলেবাস থেকে ৬০-৭০টা প্রশ্ন দিয়ে দেওয়া হত। পরীক্ষার দিন প্রফেসরের টেবিলের উপর প্রশ্নপত্রগুলি উলটো করে রাখা থাকত। ছাত্রছাত্রী গিয়ে এককেটা 'বিলেত' (প্রশ্নপত্র) তুলে নিত। প্রত্যেক 'বিলেত'-এ দুটো করে প্রশ্ন থাকত। আগে যে ৬০-৭০টা প্রশ্ন দেওয়া হত তার থেকেই যে কোনো দুটো। প্রত্যেক প্রশ্নপত্রে আলাদা আলাদা প্রশ্ন থাকত। ব্যাপারটা যেহেতু লটারির মতো (কোন দুটো প্রশ্ন ভাগ্যে পড়বে, আগে থেকে জানার উপায় থাকত না), তাই পরীক্ষার আগে দেওয়া সব কটা প্রশ্নেরই উত্তর একেবারে 'রেডি' রাখতে হত। 'বিলেত' তোলার পর প্রশ্নগুলোর উত্তর ভাবার জন্য প্রত্যেক ছাত্রছাত্রীকে ৩০-৪০ মিনিট সময় দেওয়া হত। ওই সময়ের মধ্যে উত্তর দেওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় পয়েন্টগুলো লিখে

নিত সকলে। তারপর উত্তর দেওয়ার পালা। কোনো কোনো প্রফেসর পয়েন্ট লেখা কাগজটা নিয়ে নিতেন। ভালোভাবে, আত্মবিশ্বাসের সঙ্গো উত্তর দিতে শুরু করলে কিছুটা বলার পরেই থামিয়ে দিয়ে দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তরটা শুনতে চাইতেন প্রফেসর। আর ভালো করে উত্তর দিতে না পারলে প্রশ্নপত্রের বাইরে সিলেবাস থেকে অন্যান্য প্রশ্ন জিজ্ঞেস করতেন। উত্তর দেওয়া শেষ হলে রিপোর্ট বুক-এ সঙ্গো সঙ্গো গ্রেড দেওয়া হত। নম্বরের বদলে। হিসেবটা ছিল এরকম : '৫' বা 'একসিলেন্ট'-এর মানে ৭৫% বা তার উপরে, '৪' বা 'গুড'-র মানে ৬০-৭০%, '৩' বা 'স্যাটিসফ্যাকটরি'-র মানে ৬০%-র নিচে। '২' পেলে ফেল। পরীক্ষা হল থেকে একেবারে রেজাল্ট হাতে নিয়ে বেরোনো!

বছরে দু-বার পরীক্ষা হত। প্রথম সেমিস্টারের শেষে শীতকালে একবার। গরমকালে দ্বিতীয় সেমিস্টারের শেষে আর একবার। সেমিস্টারে যে কটি বিষয় পড়ানো হত, সবগুলোরই পরীক্ষা হত। তবে 'মার্কিং' হত দু-ভাবে। কয়েকটি বিষয়ে শুধু 'পাশ' অথবা 'ফেল'। বাকিগুলোতে গ্রেড দেওয়া হত।

পরীক্ষার গ্রেড নিয়ে যদি কোনো ছাত্রছাত্রীর মনে অসন্তোষ দেখা দিত, যদি মনে হত প্রফেসর নিরপেক্ষভাবে গ্রেড বসাতে পারেননি, তাহলে তার ব্যবস্থা ছিল। ফ্যাকাল্টির 'ডিন'-কে এ ব্যাপারে জানাতে হবে। 'ডিন' তখন ৩-৪ জন প্রফেসরকে নিয়ে একটি কমিশন গঠন করতেন। ওই কমিশনের সামনে ছাত্রটি আবার পরীক্ষা দিত। তবে এ ধরনের ঘটনা খুব কমই ঘটত।

যে সব ছাত্রছাত্রী সবকটা পরীক্ষাতে '৫' বা 'একসিলেন্ট' পেত, তাদের 'আত্লিচ্নিক' (একসিলেন্ট স্টুডেন্ট) বলা হত। স্টাইপেন্ড হিসেবেও তারা ১০ রুবল বেশি পেত। অন্যান্য সকলে পেত ১০০ রুবল। 'আত্লিচ্নিক'-রা পেত ১১০ রুবল।

ওদেশের ইউনিভার্সিটির স্টুডেন্টস ইউনিয়নগুলোর ধরন আমাদের কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্টুডেন্টস ইউনিয়ন থেকে অনেক অন্যরকম।

সোভিয়েত ইউনিয়নে সে সময় বহুদলীয় ব্যবস্থা চালু হয়নি। সব জায়গায়, সব সংস্থা বা সংগঠনে একটাই পার্টি—সি পি এস ইউ।

মস্কোয় আমাদের ইউনিভার্সিটিতে ছাত্র সংগঠনের মোট সংখ্যা ছিল ১০০-রও বেশি। এই সংগঠনগুলি দু-ধরনের হত। যেসব দেশ থেকে ছাত্রছাত্রী ইউনিভার্সিটিতে পড়তে আসত, তারা হয় নিজেদের দেশের ছাত্রছাত্রীকে নিয়ে তৈরি করত 'জাতীয় সংগঠন' অথবা বিভিন্ন দেশের ছেলেমেয়ে মিলেমিশে তৈরি করত 'আন্তর্জাতিক সংগঠন'।

'আন্তর্জাতিক সংগঠন'-এর মধ্যে ছিল 'সোভিয়েত অব ফ্যাকাল্টিজ', 'সোভিয়েত অব হস্টেলস', 'ঝেনস্কি কমিতিয়েত' (উইমেনস কমিটি), ইউনিভার্সিটির ইন্টারক্লাব ও স্পোর্টস ক্লাব 'দ্রুঝবা'-র দায়িত্বপ্রাপ্ত বিশেষ ছাত্রসংগঠন ইত্যাদি। আর 'জাতীয় সংগঠন' বলতে বোঝাত 'জিমলিয়াচেস্তভা'গুলি। একেক দেশের ছাত্রছাত্রীরা একত্রিত হয়ে গঠন করত একেকটি 'জিমলিয়াচেস্তভা'। কোনো একটি দেশের বা অঞ্চলের বাসিন্দারা কোনো সংগঠন গড়ে তুললে, রুশিতে তাকে 'জিমলিয়াচেস্তভা' বলে।

দেশ অনুসারে জিমলিয়াচেস্তভাগুলির নাম হত একেক রকম। ভারতীয় ছাত্রছাত্রীর

সংগঠনটির নাম ছিল 'হিন্দস্কোয়ে জিমলিয়াচেস্তভা'। পাকিস্তানেরটি 'পাকিস্তানস্কোয়ে জিমলিয়াচেস্তভা'। বলিভিয়ার ছাত্রছাত্রীর সংগঠন 'বলিভিয়ানস্কোয়ে জিমলিয়াচেস্তভা'। মাদাগাস্কারের 'মাদাগারস্কোয়ে জিমলিয়াচেস্তভা'। ১৯৮৫-৮৬ সালে এইরকম প্রায় ৮০টি জাতীয় সংগঠন বা জিমলিয়াচেস্তভা ছিল আমাদের ইউনিভার্সিটিতে।

জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সংগঠনগুলি ইউনিভার্সিটি কর্তৃপক্ষ ও ছাত্রছাত্রীর মধ্যে সেতুর মতো কাজ করবে, ছাত্রছাত্রীর সুবিধা-অসুবিধার কথা তৎপরতার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কানে তুলবে, ১১০টা দেশের প্রায় ৭ হাজার পড়ুয়ার প্রতিনিধিত্ব করবে—কাগজে কলমে সংগঠনগুলি গড়ে তোলার পেছনে উদ্দেশ্য ছিল এমনটাই।

আন্তর্জাতিক সংগঠনগুলির অন্যতম ছিল 'স্টুডেন্টস সোভিয়েত অব ফ্যাকাল্টিজ'। এক বছরের জন্য ফ্যাকাল্টির ছাত্রছাত্রীর ভোটে নির্বাচিত প্রতিনিধি হিসেবে কিছু ছেলেমেয়ে এই সোভিয়েতের সদস্য হতে পারত। সব ফ্যাকাল্টির, সব ছাত্রছাত্রীর এই ভোটাধিকার ছিল।

স্টুডেন্টদের এই 'সোভিয়েত' পড়াশোনা সংক্রান্ত বিষয় বা সমস্যাগুলি নিয়েই মূলত কাজ করবে, এমন কথা ছিল। কথা ছিল, স্টাডি সার্কেল বা সেমিনারের আয়োজন করতে বিভিন্ন ডিপার্টমেন্টকে সাহায্য করবে এই 'সোভিয়েত'। কথা ছিল, 'সোভিয়েত অব ফ্যাকাল্টিজ' ছাত্রছাত্রীর মধ্যে সুসম্পর্ক ও বন্ধুত্বপূর্ণ মনোভাব গড়ে তোলার ক্ষেত্রে সক্রিয় ভূমিকা নেবে। কথা ছিল, এই 'সোভিয়েত' শুধু পড়াশোনা সংক্রান্ত বিষয়ে মনযোগ না দিয়ে ছাত্রজীবনের সবকটি দিক—সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড, খেলাধুলা, অবসর সময় বা ছুটি কাটানো ইত্যাদি সমস্ত বিষয়ে সজাগ থাকবে। এজন্য ক্রমাগত বিভিন্ন 'কমিশন' গঠন করারও কথা ছিল এই 'সোভিয়েত'-এর।

'কথা ছিল' লিখলাম, কারণ ১৯৮৭-৯৩ সাল পর্যন্ত 'হিস্ট্রি অ্যান্ড ফিলোলজি' ফ্যাকাল্টির ইন্টারন্যাশনাল জার্নালিজম ডিপার্টমেন্টের ছাত্রী থাকার সময়ে, এই ধরনের কোনো 'স্টুডেন্টস সোভিয়েত অব ফ্যাকাল্টিজ'-এর অস্তিত্বের কথাই আমার জানা ছিল না। এই ধরনের কোনো 'সোভিয়েত'-এর প্রতিনিধি নির্বাচনের জন্য ৬ বছরের মধ্যে আমি অন্তত একবারও ভোট দিইনি।

মস্কোতে থাকাকালীন এবং প্যাট্রিস লুমুম্বা ইউনিভার্সিটির ছাত্রী থাকাকালীন এই 'সোভিয়েত'-এর খবর আমার অজানা থাকলেও, এ বিষয়ে বিশদ জানতে পারলাম একটি বই থেকে। বইটির নাম 'উনিভার্সিতেত ভা ইমিয়া মিরা ই দ্রুঝবি (শান্তি ও বন্ধুত্বের নামে ইউনিভার্সিটি)। বইটির লেখক আমাদের ইউনিভার্সিটির রেক্টর ভি এফ স্তানিস। প্যাট্রিস লুমুম্বা পিপলস ফ্রেন্ডশিপ ইউনিভার্সিটি সম্পর্কে বিশদভাবে এই তথ্যে ভরা বইটি লিখেছেন তিনি।

ইউনিভার্সিটির উৎপত্তি, বিবর্তন, পরিকাঠামো, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ইউনিভার্সিটির অবদান ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ আছে বইটিতে। আমাদের ইউনিভার্সিটির হিউম্যানিটারিয়ান ক্যাম্পাসের ভেতর দুটি স্থায়ী কিয়স্ক ছিল। সেখানে বই বিক্রি হত। নেহাত কৌতূহলবশত ওই কিয়স্ক থেকে বইটি কিনেছিলাম।

মস্কো থেকে দেশে ফেরার পর একেক সময় ইউনিভার্সিটির কথা মনে পড়লে, বন্ধুদের, প্রফেসরদের কথা মনে পড়লে, রঙিন ছবিতে ভরা, রেক্টরের লেখা ওই বইটি নেড়েচেড়ে দেখি। এরকমই একদিন পাতা উলটাতে গিয়ে হঠাৎ চোখে পড়ল 'স্টুডেন্টস সোভিয়েত অব ফ্যাকাল্টিজ'-এর কথা। অবাক লাগল। 'সোভিয়েত'-এর কর্মকাণ্ডের লম্বা ফিরিস্তি আছে বইয়ের পাতায়। অথচ মস্কোতে থাকার সময় এই 'সোভিয়েত'-এর খবরই জানতাম না আমি। জানতে পারলাম এতদিন পরে, এই কলকাতায় বসে, ইউনিভার্সিটি সম্পর্কে লেখা একটা বই থেকে! অন্যান্য ফ্যাকাল্টির ছাত্রছাত্রীরাও কি আমারই মতো বইটি থেকে (যদি পড়ে) জানতে পারবে 'সোভিয়েত অব ফ্যাকাল্টিজ'-এর কথা! আমার পরিচিত অন্যান্য ফ্যাকাল্টির ছাত্রছাত্রীর মুখেও তো কখনো এই ধরনের কোনো 'সোভিয়েত'-এর কথা শুনিনি!

কত কিছু করারই হয়তো এমন 'কথা ছিল'! যা করতে পারলে অনেক কিছু অন্যরকম হত। শুধু আমাদের ইউনিভার্সিটির চত্বরের মধ্যেই নয়, তার বাইরে, পুরো সমাজব্যবস্থাতে, গোটা দেশটাতে, 'কথা মতো কিছু কাজ' করা গেলে হয়তো... ; হয়তো কেন, এমনভাবে সোভিয়েত ইউনিয়নটা ভেঙে টুকরো টুকরো হত না, লেনিনের মূর্তি ভেঙে ফেলার স্পর্ধা হত না, ইয়েলৎসিন, ঝিরিনোভ্স্কির মতো 'ভুঁইফোড়' নেতাদের এত আস্ফালনও শুনতে হত না। মার্কসবাদের প্রয়োজনীয়তা নিয়ে এত প্রশ্ন উঠত না। যা করার কথা ছিল, তা হয়নি। এর জন্য মার্কসবাদ দায়ি নয়। লেনিনবাদও দায়ি নয়। যাঁরা ক্ষমতায় ছিলেন, বিপ্লবোত্তর সোভিয়েত ইউনিয়নে যে সমস্ত কাজ করার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল, তা তাঁরা করেননি। মার্কসবাদ কোনো সংস্কার নয়। কিছু লোককে কিছু 'পাইয়ে দেওয়ার' নাম মার্কসবাদ নয়। বিপ্লবের পর একটা আমূল পরিবর্তনের পর, মার্কসবাদের নামে এক 'পাইয়ে দেওয়ার' সংস্কার চলেছিল সোভিয়েত ইউনিয়নে। এরই পরিণতিতে ইয়েলৎসিনের জন্ম।

ইউনিভার্সিটির চত্বর ছেড়ে অনেক বিস্তৃত আলোচনায় চলে গিয়েছি। আবার ইউনিভার্সিটিতেই ফেরা যাক। ১৯৮৫ সালে রেক্টরের লেখা বই প্রকাশিত হয়েছিল, যে বইয়ের কথা আমি আগেই উল্লেখ করেছি, তা নিয়ে আমার মস্কো থাকাকালীন ৬ বছরের মধ্যে একদিনও কোনো আলোচনা শুনিনি। এক প্রফেসরকে একবার জিজ্ঞেস করেছিলাম, বইটিতে যে নানারকম সেমিনারের কথা বলা আছে, তা হয় না কেন, স্যার? তিনি আমার দিকে তাকিয়ে অর্থপূর্ণভাবে হেসেছিলেন।

তবে সবকটি সংগঠনের অস্তিত্বই যে নেহাত 'কাগজে-কলমে' ছিল, তা ভাবা ভুল হবে।

হস্টেলগুলি দেখাশোনা করার জন্য কয়েকজন নির্বাচিত প্রতিনিধিকে (ছাত্রছাত্রী) নিয়ে তৈরি হত 'সোভিয়েত অব হস্টেলস'। হস্টেলের ঘর, করিডর, রান্নাঘর পরিষ্কার করার জন্য দায়িত্ব ভাগ করে দেওয়া থেকে শুরু করে রুমমেটের সঙ্গে মনোমালিন্য বা ঘর নিয়ে অন্য কোনো অসুবিধার কথা এই 'সোভিয়েত'কে জানানো যেত। প্রত্যেক তলার দায়িত্বে থাকত একেকজন 'দিঝুরনি এতাঝা' (ফ্লোর-মনিটর)।

প্রথম বছর এন্দি, ইথিওপিয়ার এথি আর আমি ন-নম্বর ব্লকের তেরোতলার একটি থ্রি-সিটেড রুমে থাকতাম। আমাদের ফ্লোরের 'দিঝুরনি' ছিল রুশি মেয়ে লেনা। মাঝেমধ্যেই আমাদের ঘরে হঠাৎ হানা দিতে সে। এন্দির যেখানে সেখানে জিনিসপত্র ছড়িয়ে রাখা দেখে বলত, "তুই সোভিয়েত মেয়ে হয়ে যদি এমন ভাবে থাকিস, তাহলে বিদেশিদের আর কী বলব?" এথি আর আমাকে বলত "ঘর পরিষ্কার করে সাজিয়ে গুছিয়ে রাখবে। একটা কম্পিটিশন হবে। এই ফ্লোরের মধ্যে যাদের ঘর সব থেকে সুন্দর করে গোছানো, তাদের প্রাইজ দেওয়া হবে।"

ঘর গোছানোর জন্য কোনো প্রশংসাপত্র আমরা কখনো পাইনি। তবে লেনা একটা কথা বিনা দ্বিধায় স্বীকার করত। বলত, "আমি তেরোতলার সবার কাছে তোমাদের ১৩-০৬ ঘরটার কথা বলি। এত সুন্দর মিলেমিশে আছ তোমরা। তিন দেশের তিনটি মেয়ে। মনে হয় যেন তিন বোন। কক্ষনো ঝগড়াঝাঁটি বা কথা কাটাকাটিও করো না। সবার কাছে তোমাদের বন্ধুত্বের উদাহরণ দিই আমি।" লেনা বেরিয়ে যাওয়ার পরই এন্দি আমাকে আর এথিকে বলত, "বাঁদিকে ঘাড় ঘুরিয়ে তাড়াতাড়ি তিনবার থু থু থু কর। না হলে 'নজর' লেগে যাবে। দেখবি আমাদের মধ্যেও ঝগড়া শুরু হয়ে যাবে।"

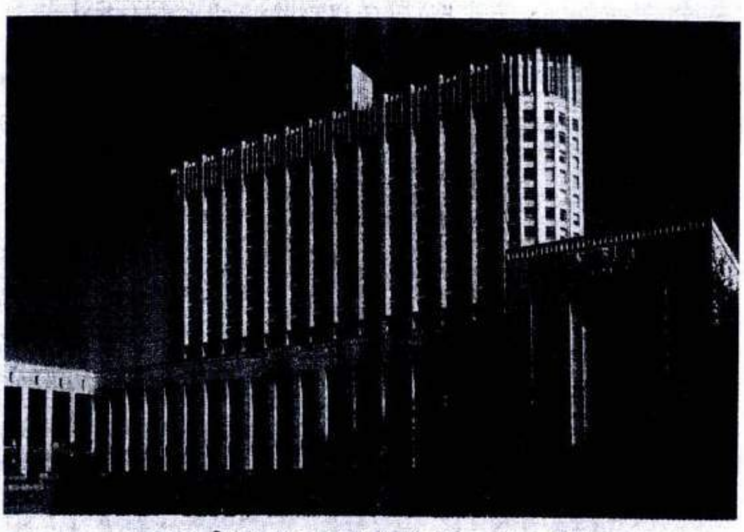
আর ছিল ইউনিভার্সিটির স্পোর্টস ক্লাব 'দ্রুঝবা' ও ইন্টারক্লাবের দায়িত্বপ্রাপ্ত বিশেষ ছাত্র সংগঠন। স্পোর্টস ক্লাবের উদ্যোগে প্রায়ই আন্তর্দেশীয় ফুটবল, বাস্কেটবল, দাবা প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হত। লাতিন আমেরিকা ও আফ্রিকার কোনো দেশের মধ্যে যেদিন ফুটবল খেলা হত, সেদিন আমাদের মেয়েদের হস্টেলেও উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ত। খেলোয়াড়রা এসে আগেভাগে আমাদের বলে যেত, "খেলা দেখতে অবশ্যই আসিস। যখনই দেখবি গোলপোস্টের কাছাকাছি বল গেছে, প্রাণপণে শুধু চেঁচাবি। দেখবি খেলা তাহলে একেবারে জমে যাবে।"

ইউনিভার্সিটির চত্বরেই একটি ইন্টারক্লাব ছিল। প্রতি শনিবার সন্ধ্যাবেলায় সেখানে নাচগান, ডিস্কোথেক-এর আয়োজন হত। উৎসাহী আরব বা আফ্রিকান ছাত্রদের ভিড়ই জমত বেশি। ইউনিভার্সিটির মেয়েরা খুব কমই যেত শনিবারের ওই সান্ধ্য জমায়েতে। ১৬-১৭ বছরের রুশি মেয়েরা বাইরে থেকে আসত। বিদেশি ছাত্রদের সঙ্গে আলাপ করতে, আমোদ-আহ্লাদ করতে।

তবে ব্যাপারটা সবসময় 'আমোদ আহ্লাদেই' সীমাবদ্ধ থাকত না। নারীকে 'দখল' করা নিয়ে পুরুষের 'আদিম প্রবৃত্তি' মাঝেমধ্যে মাথাচাড়া দিয়ে উঠত। শনিবার সন্ধ্যার পর আমরা সাধারণত ইন্টারক্লাবের সামনের রাস্তাটা দিয়ে যাওয়া-আসা না করারই চেষ্টা করতাম।

ইন্টারক্লাবের বড়োসড়ো হলঘরটাতে কখনোসখনো অন্যান্য অনুষ্ঠানও হত।

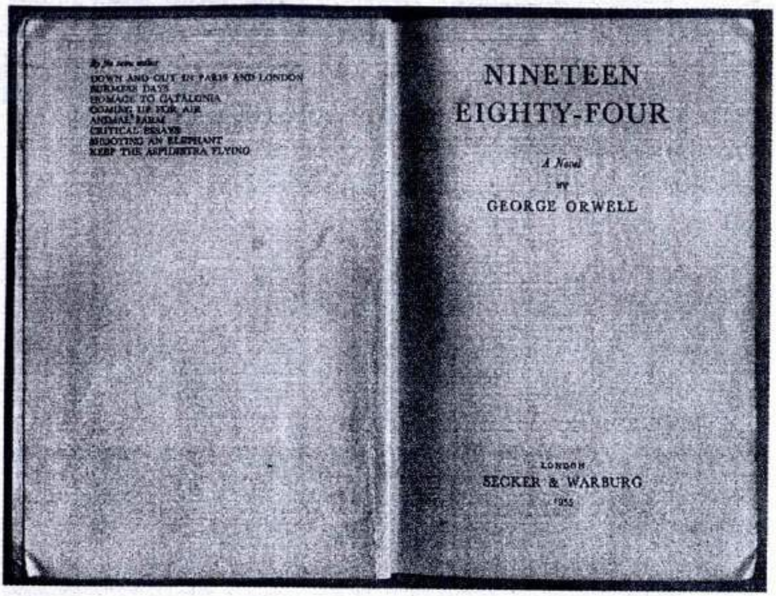
আরেকটি আন্তর্জাতিক সংগঠনের কথা বলা দরকার। সেটি হল 'ঝেনস্কি কমিতিয়েত' (উইমেনস কমিটি)। আটের দশকের মাঝামাঝি আমাদের ইউনিভার্সিটির ছাত্রীসংখ্যা ছিল প্রায় ১৫০০। এই ছাত্রীদের প্রতিনিধিত্ব করত 'ঝেনস্কি কমিতিয়েত'-এর নির্বাচিত ছাত্রীরা। মেয়েরা তাদের যে কোনো সমস্যার কথা এই 'কমিতিয়েত'কে জানাতে পারত।



মস্কোর বেলি দোম (হোয়াইট হাউস)। ইয়েলৎসিনের গদিঘর

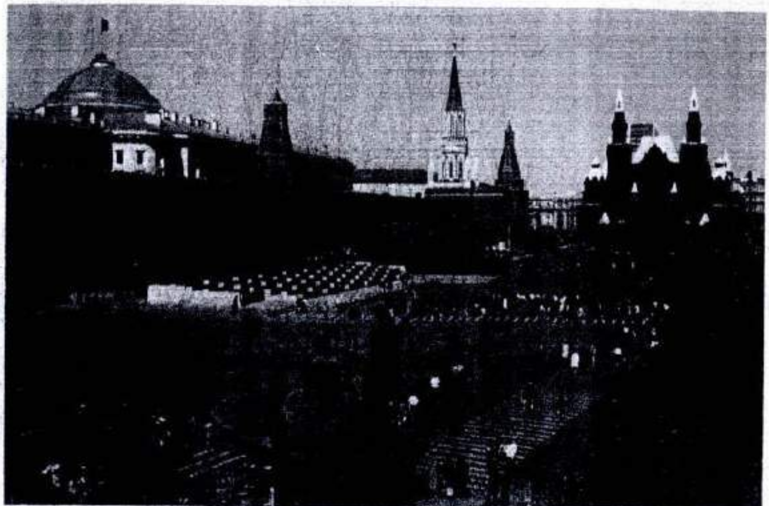


গির্জায় গির্জায় রুশ নাগরিকের জমায়েত। মস্কো তখন ধর্মভাবে গদগদ

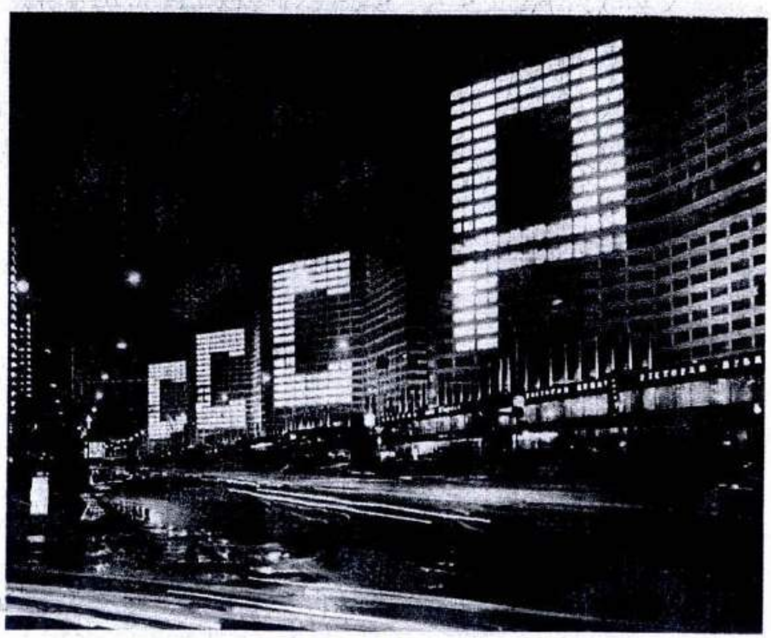




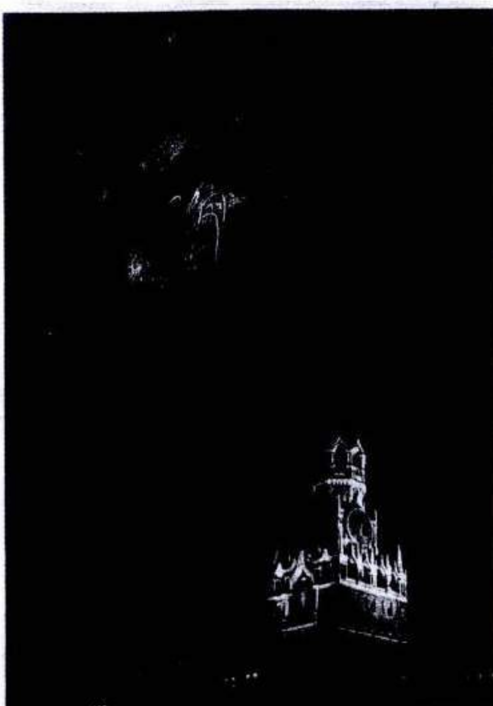
অধ্যাপক স্মারোদিনভ অরওয়েলের নাইনটিন এইটি ফোর পড়তে দিলেন



ধীরে ধীরে ম্রিয়মাণ হয়ে এল রেড স্কোয়ার। চূড়োর লাল তারাটাও কেমন যেন মলিন



তবুও রাতে মস্কোর চৌরঙ্গি কালিনিন প্রসপেক্তে এস-এস-এস-এর
(ইউ এস এস আর) বাতিতে জ্বলে



আমি মস্কোতে
এসেছি, তখনও রেড
স্কোয়ারের চূড়োয়
জ্বলজ্বলে লাল তারা



মার্কিনিরা মানলে তবেই সোভিয়েত ইউনিয়ন সুপার পাওয়ার। আমাদের অধ্যাপিকা বাজানোভা (লাল জামা গায়ে) ক্লাসে বললেন একদিন

'কমিটি অব সোভিয়েত উইমেন' যার নেতৃত্বে ছিলেন প্রথম মহিলা মহাকাশচারী ভালেন্তিনা ভ্লাদিমিরোভ্না তেরেশকোভা, সেই কমিটির সঙ্গে আমাদের ইউনিভার্সিটির 'ঝেনস্কি কমিতিয়েত'-এর ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। আন্তর্জাতিক নারী দিবসে বিশেষ অনুষ্ঠান এবং বছরের অন্যান্য সময়ে বিভিন্ন আলোচনাচক্রের আয়োজন করত এই 'কমিতিয়েত'।

উন্নয়নশীল দেশের 'দ্বিতীয় শ্রেণির' নাগরিক, 'ঝেনস্কি কমিতিয়েত'-এর সদস্যরা, 'কমিটি অব সোভিয়েত উইমেন'-এর দৃঢ়চেতা, নিজেদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন ও পুরুষের সঙ্গে সমমর্যাদাভোগী নারী-সদস্যদের খুব কাছ থেকে দেখার সুযোগ পাবে। অনুপ্রাণিত হবে তাঁদের কর্মকাণ্ডের দ্বারা। ফলে এশিয়া, আফ্রিকা, ও লাতিন আমেরিকার 'বঞ্চিত' মেয়েরা নিজেদের ব্যক্তিত্ব গঠনে ও বিকাশে প্রয়াসী হবে—আমাদের ইউনিভার্সিটির রেক্টরের লেখা বইটিতে 'ঝেনস্কি কমিতিয়েত' গঠনের মূল উদ্দেশ্য প্রসঙ্গে উপরের কথাগুলি পড়তে পড়তে একটি ঘটনা মনে পড়ে গেল।

'ঝেনস্কি কমিতিয়েত'-এর হোমরাচোমরা এক সদস্য, আমার পরিচিত, মরোক্কর মেয়ে সাবাহ্ একদিন বলে, "মেয়েদের লেখাপড়া শেখানোর কোনো মানে হয় না। ঘরসংসার করাই হচ্ছে মেয়েদের আসল কাজ। প্রত্যেক বাবা-মা-র উচিত ১৭-১৮ বছরের মধ্যে মেয়ের বিয়ে দিয়ে দেওয়া।" অবাক হয়ে বললাম, তুই একথা বলছিস? ঝেনস্কি কমিতিয়েত-এর মিটিংয়ে মেয়েদের স্বনির্ভরতা কত জরুরি, তা নিয়ে অহরহ আলোচনা করিস তোরা। কত নামীদামি লোকের বক্তৃতা শুনিস এ বিষয়ে। তুই কোথায় অন্য মেয়েদের 'মানুষ' হতে বলবি, আর তুই-ই কিনা মেয়েদের লেখাপড়া শেখারও বিরোধী?

আমার কথা শুনে সাবাহ্ একেবারে হেসে গড়িয়ে পড়ল। বলল, "আমরা ওই মিটিংয়ে যা বলি, তা সব সত্যি নাকি? তুই তা-ই ভাবিস? কেন আমি 'কমিতিয়েত'-এর মেম্বার হয়েছি জানিস? অনেক সুযোগ পাওয়া যায়। হস্টেলে পছন্দমতো ভালো ঘর, ভালো রুমমেট পাওয়া যায়। 'ফ্রি'তে অনেক জায়গায় বেড়ানো যায়। এই তো কয়েক বছর আগে ইন্টারন্যাশনাল ইয়ুথ ফেস্টিভালে যোগ দিতে কমিতিয়েত-এর অনেকে সাউথ কোরিয়া গিয়েছিলাম। নিজের পকেট থেকে এক কোপেকও দিতে হয়নি। তাছাড়া পরীক্ষার সময়ও সুবিধা হয়। সমাজসেবামূলক কোনো কাজ বা সংগঠনের সঙ্গে জড়িত থাকলে অনেক টিচার নম্বর দেওয়ার সময় একটু 'কনসিডার' করেন। সাজিয়েগুছিয়ে 'ওদের' মনমতো কটা কথা বলতে পারলে যদি এত সুবিধা পাওয়া যায়, তাহলে বলতে ক্ষতি কী?"

আগেই বলেছি, এই 'আন্তর্জাতিক সংগঠন'গুলির পাশাপাশি আমাদের ইউনিভার্সিটিতে প্রায় ৮০টি 'জাতীয় সংগঠন' বা 'জিমলিয়াচেস্তভা' ছিল। বিদেশি ছাত্রছাত্রী নিজেদের দেশের ছেলেমেয়েকে নিয়ে তৈরি করত 'জিমলিয়াচেস্তভা।' এক বছরের জন্য এই সংগঠনের প্রেসিডেন্ট, জেনারেল সেক্রেটারি ইত্যাদি নির্বাচন করা হত। এডুকেশন সেক্রেটারি, স্পোর্টস সেক্রেটারি, কালচারাল সেক্রেটারি প্রভৃতি পদেও প্রার্থী বাছাই হত ওই এক বছরের জন্য।

আটের দশকের শেষপর্যন্ত প্যাট্রিস লুমুম্বায় পড়তে যাওয়া বিদেশি ছাত্রছাত্রীর মধ্যে

ভারতীয় ছেলেমেয়ের সংখ্যাই ছিল সব থেকে বেশি। যেহেতু সব ভারতীয় ছাত্রছাত্রীই ছিল 'ইন্দিস্কোয়ে জিমলিয়াচেস্তভা' (ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন)-র সদস্য, তাই এটিই ছিল আকারে সবচেয়ে বড়ো। সাধারণ সদস্যপদ গ্রহণের জন্য কিছু করতে হত না। মস্কোর পিপলস ফ্রেন্ডশিপ ইউনিভার্সিটিতে যে ভারতীয় ছেলেমেয়ে ভরতি হত, তারা আপনা-আপনিই 'ইন্দিস্কোয়ে জিমলিয়াচেস্তভা'-র সদস্য হয়ে যেত।

৮৭ সালের ৩১ আগস্ট। মস্কোয় আমার দ্বিতীয় দিন। সকালবেলায় নতুন ছাত্রছাত্রীরা হস্টেলের একতলায় একটা বড়ো হলঘরে বসেছিলাম। স্যুট পরা গম্ভীর চেহারার একজন সিনিয়র ছাত্র এসে ঢুকল। "ভারতীয় ছাত্রছাত্রী কারা আছে"—বলে আমাদের দিকে এগিয়ে এল। "আমি ইন্দিস্কোয়ে জিমলিয়াচেস্তভার প্রেসিডেন্ট"—নিজের পরিচয় দিল ছাত্রটি। সেই তখনই প্রথম শুনেছিলাম জিমলিয়াচেস্তভার কথা।

আমাদের কোনো অসুবিধা হচ্ছে নাকি, জানতে এসেছিল সেই 'প্রেসিডেন্ট'। নতুনদের কারো কাছেই এক রুবলও ছিল না। ভারত সরকার শুধু কুড়ি ডলার সঙ্গে নিয়ে যাওয়ার অনুমতি দিয়েছিল, সঙ্গে ছিল সেটাই। 'প্রেসিডেন্ট' বলল, "ডলারটা এখনই পালটিও না। ওটা এখন নিজেদের কাছেই রেখে দাও। রুবল দরকার হলে আমার কাছ থেকে ধার হিসেবে নিতে পার। স্টাইপেন্ড পেলে পরে শোধ দিও।"

একথা শুনে একটি মেয়ে বলল, "একজন সিনিয়র ভারতীয় ছাত্র কিছুক্ষণ আগে এসেছিল। কুড়ি ডলার পালটে আমাকে পঁচিশ রুবল দিয়েছে। বলল, ডলারের 'অফিসিয়াল রেট' নাকি ৬৫ কোপেক (১০০ কোপেকে এক রুবল)। আমার কাছে এক রুবলও নেই বলে নিজের লোকসান করে, একটু বেশি দাম দিয়েই আমার ডলারটা কিনে নিল ছেলেটি।"

জিমলিয়াচেস্তভার প্রেসিডেন্টের মুখটা কেমন থমথমে হয়ে গেল। চাপা গলায় বলল, "এরই মধ্যে শুরু হয়ে গেছে!"

তখন ব্যাপারটা বুঝিনি। পরে জেনেছিলাম। সেসময় সোভিয়েত ইউনিয়নে মার্কিন ডলারের 'অফিসিয়াল রেট' ৬৫ কোপেক ছিল ঠিকই, কিন্তু কালোবাজারে এক ডলার বিকোত চার রুবলের বিনিময়ে। ইউনিভার্সিটির ছাত্রদের মধ্যে অনেকেই ডলার কেনাবেচার কারবার করত। নতুন ছাত্রছাত্রীর অনেকে ডলার ও রুবলের এই আলোছায়ার খেলার খবর জানত না। তাদের এই অজ্ঞতার সুযোগ নিত কিছু নীচ ও বিবেকহীন সিনিয়র 'দাদাদিদি'।

নতুনদের পেছন পেছন ঘুরে, "তোমাদের যে কোনো অসুবিধার কথা আমাদের নিঃসঙ্কোচে বোলো", এমন ভরসা দিয়ে নতুনদের ওই সামান্য কটা ডলার পকেটস্থ করার এক ন্যক্কারজনক কারবারে মেতে উঠত সিনিয়র ছেলেমেয়ের একাংশ। সবসময় শুধু প্যাট্রিস লুমুম্বার 'বড়ো'রাই নয়, অন্যান্য শহরে পড়তে যাওয়া কোনো কোনো ভারতীয় ছাত্রছাত্রীও মস্কোতে ছুটি কাটাতে এসে নতুনদের সঙ্গে আলাপ জমিয়ে 'কাজ' হাসিল করতে চাইত।

সিনিয়র এক 'দিদি'র কথা মনে পড়ে গেল। আমরা যাওয়ার পর আলাপ করতে এল।

খুব আগ্রহের সঙ্গে আমাদের দোকান বাজার চেনাতে নিয়ে গেল 'দিদি'। একে আমরা তখনও একবর্ণ ভাষা জানি না, তার উপর রাস্তাঘাটও একটুও চিনি না। 'দিদি'-র বদান্যতায় ধন্য হয়ে সদ্য হাতে পাওয়া প্রথম স্টাইপেন্ডের রুবল নিয়ে বাজার করতে বেরোলাম। বিরাট ডিপার্টমেন্টাল স্টোরে ট্রলি নিয়ে ঘুরে ঘুরে দরকার মতো জিনিসপত্র তুলে নিলাম। 'দিদি'-ও আরেকটা ট্রলিতে নিজের জিনিস নিল। রুমমেটের কাছ থেকে কী সব ধার নিয়েছিল, শোধ করতে হবে, 'দিদি'-র ট্রলি তাই প্রায় ভরে উঠল। 'ক্যাশ'-এ দাম দেওয়ার সময় 'দিদি' হঠাৎ আঁতকে উঠে বলল, "এমা, মানিব্যাগটাই আনতে ভুলে গেছি।" তাড়াতাড়ি বললাম, তাতে কী হয়েছে! এই তো আমার কাছে আছে।

মানুষমাত্রই ভুল হয়। তাই এমন একটা 'ভুল'-এর কথা এতদিন ধরে মনে রাখার কারণও ঘটত না, যদি না পরপর বেশ কয়েকবার ওই 'দিদি' একইভাবে দোকানে মানিব্যাগ নিয়ে যেতে 'ভুলে যেত'।

মস্কো পৌঁছোনোর কয়েকদিনের মধ্যে এই ধরনের কিছু 'দাদাদিদি'-কে চেনাজানার সুবাদে, 'দাদাদিদি'-র সংগঠন 'জিমলিয়াচেস্তভা'-র প্রতি একটা বিরূপ মনোভাব গড়ে উঠেছিল। তবে একথাও সত্যি, সবাই এই ধরনের জঘন্য, নীচ প্রকৃতির ছিল না। স্বাভাবিক, সুস্থ মানুষের মতো ভদ্রতা, সভ্যতাবোধও ছিল অনেকের মধ্যে। সেই হাতে গোনা কয়েকজন না থাকলে অবস্থা যে কী ভয়াবহ হত, তা বলাই বাহুল্য। কেননা আমি দেখেছি, সেই সমস্ত জঘন্য 'দাদাদিদি'দের সঙ্গে পাল্লা দিয়েই সদ্য আসা বেশ কিছু ভারতীয় ছাত্রছাত্রী কীভাবে 'কাজের লোক' হয়ে উঠত। মাঝেমধ্যে মনে হত, যেন কেউ এসেছে শুধু টাকা করতে, কেউ এসেছে ইনিয়েবিনিয়ে বিভিন্ন দেশের মেয়েদের 'ম্যানেজ' করে তাদের শরীর পরখ করতে। এসব প্রসঙ্গে পরে আসব। জিমলিয়াচেস্তভার কথা বলি।

জিমলিয়াচেস্তভার প্রেসিডেন্ট ও অন্যান্য প্রথম সারির সদস্যদের সঙ্গে ইউনিভার্সিটি কর্তৃপক্ষের নিয়মিত যোগাযোগ থাকত। খাতায়-কলমে এই সংগঠন গড়ে তোলার পেছনে মূল উদ্দেশ্যই ছিল, বিভিন্ন বিভাগে পারদর্শী ছাত্রছাত্রী ও বিশেষজ্ঞ গঠনে ইউনিভার্সিটিকে পূর্ণ সহযোগিতা করা।

বিভিন্ন জিমলিয়াচেস্তভার প্রেসিডেন্ট ও সেক্রেটারিরা যথেষ্ট সুযোগসুবিধা ও ক্ষমতা ভোগ করত। জিমলিয়াচেস্তভার প্রেসিডেন্টের কাছে ছাত্রছাত্রী প্রায়ই নানারকম সমস্যার কথা বলতে আসবে, এত 'ভিজিটর' এলে রুমমেটের অসুবিধা হবে, এই যুক্তিতে অনেক প্রেসিডেন্টকে টু-সিটেড রুমে একা থাকতে দেখেছি। তবে এটা কোনো 'অনুমোদিত নিয়ম' ছিল, না 'বিশেষ সুবিধা'-র পর্যায়ে পড়ত, এ নিয়ে কোনো প্রেসিডেন্টকে প্রশ্ন করা হয়নি। হস্টেলে একটা পছন্দমতো ঘর, মনের মতো রুমমেট খুঁজে পাওয়া ছিল একটা বিরাট ব্যাপার। আর রুমমেট ছাড়া, একার ঘর হলে তো একেবারে সোনায় সোহাগা।

চোখে দেখতে পাওয়া সুযোগ সুবিধার মধ্যে 'ঘরের সুখ'টাই নজরে পড়ত। তাছাড়াও প্রেসিডেন্টের সঙ্গে ইউনিভার্সিটির বিভিন্ন বিভাগের কর্তাব্যক্তিদের সরাসরি যোগাযোগ থাকত। হয়তো সোভিয়েতের কোনো ছোটো শহরের অখ্যাত এক ইন্সটিটিউটে ভরতির

[illegible] কোনো বিদেশি ছাত্র। তার খুব ইচ্ছা মস্কোর প্যাট্রিস লুমুম্বাতে ভরতি হওয়ার। সুযোগ পেলেই মস্কো এসে, জিমলিয়াচেস্তভার প্রেসিডেন্টকে অনুরোধ-উপরোধ করে, তাকে একেবারে 'তৈলাক্ত' করে ফেলতে হবে। প্রেসিডেন্টের মর্জি হলে, ইউনিভার্সিটির হোমরাচোমরা দুচারজনের কাছে একটু ঘোরাঘুরি করে ছাত্রটিকে প্যাট্রিস লুমুম্বাতে ভরতি করে দেওয়াটা ছিল 'কয়েক ঘন্টার ব্যাপার'।

শুধু ক্ষমতাসীন প্রেসিডেন্টরাই এতটা প্রভাবশালী ছিল না। প্রাক্তন প্রেসিডেন্টরাও ইউনিভার্সিটিতে ভরতি বা কারোর ফ্যাকাল্টি পরিবর্তনের ক্ষেত্রে, ইচ্ছা করলে, অনেকের সঙ্গে চেনাজানার সূত্রটা কাজে লাগাতে পারত।

ইউনিভার্সিটির রেক্টর সহ অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ পদাধিকারীদের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ, 'সামাজিক কাজকর্ম' করার জন্য একটা 'গুডউইল' তৈরি হয়ে থাকা, ওজনদার কিছু ক্ষমতা ভোগ করার সুবাদে নিজেদের দেশের অন্যান্য ছেলেমেয়ের কাছে 'হিরো' বনবার একটা প্রবল সম্ভাবনা ইত্যাদি ইত্যাদি নানাধরনের ছোটোবড়ো প্রলোভন মেশানো জিমলিয়াচেস্তভার 'প্রেসিডেন্ট' পদটি নিঃসন্দেহে যথেষ্ট আকর্ষণীয় ছিল। মোটামুটি একই কারণে জেনারেল সেক্রেটারি, স্পোর্টস সেক্রেটারি, এডুকেশন বা কালচারাল সেক্রেটারি পদের মোহও কিছু কম ছিল না।

প্যাট্রিস লুমুম্বা পিপলস ফ্রেন্ডশিপ ইউনিভার্সিটিতে পড়াশোনা করার সময় এখানকার ভারতীয় ছাত্রছাত্রীর সংগঠনটিকে যথেষ্ট কাছ থেকে দেখার সুযোগ পেয়েছি। জিমলিয়াচেস্তভা সম্পর্কে আমার অধিকাংশ ধ্যানধারণা তাই ভারতীয় সংগঠনটিকে ভিত্তি করেই।

আগেই বলেছি, 'ইন্দিস্কোয়ে জিমলিয়াচেস্তভা'-র বিভিন্ন পদে প্রার্থী নির্বাচনের মেয়াদ ছিল এক বছর। লড়াইটা হত মুখোমুখি দুপক্ষের মধ্যে; অর্থাৎ অনেক ধরনের মনোভাবসম্পন্ন প্রার্থী থাকলেও ভোটের লড়াইয়ে তাদের নির্দিষ্ট দুটি দলে ভাগ হয়ে যেতে হত। ভোটের লড়াই হত সেই দু-দলের মধ্যে। সোভিয়েত ইউনিভার্সিটিতে বহুদলীয় নির্বাচন বা বহুদলীয় রাজনৈতিক কোনো ব্যবস্থা আমি দেখিনি। সোভিয়েত সমাজে তো দ্বিদলীয় রাজনৈতিক ব্যবস্থাও চোখে পড়েনি। একদলীয় শাসন কায়েম ছিল। ফলে ভোটাভুটির ব্যাপারটা আপামর সোভিয়েত মানুষের কাছে একপ্রকার অজানাই থেকে গিয়েছিল। আমাদের ইউনিভার্সিটিতে ছাত্র সংগঠনগুলির নির্বাচনে ব্যালটের মারফত ভোটাভুটি সোভিয়েত ছাত্রছাত্রীর মধ্যে যে কী পরিমাণ উত্তেজনা ছড়াত, তা টের পেতাম।

ভোটের আগে দু-দল প্রার্থীই দল বেঁধে যেত। একসঙ্গে নয়। একদল চলে যাওয়ার পর অন্যরা। সব ভারতীয় ছাত্রছাত্রীর হস্টেলের ঘরে গিয়ে কোন পদে কে দাঁড়াচ্ছে, তার নামের তালিকাটা জানিয়ে যেত।

রাজনৈতিক কোনো নীতি বা আদর্শের উপর ভিত্তি করে প্রার্থী তালিকা ঠিক হত না। ভোট দেওয়ার সময়ও তাই, রাজনৈতিক মতবাদের কোনো প্রশ্ন উঠত না। ব্যক্তিগত পছন্দ-অপছন্দ ও আঞ্চলিকতাভিত্তিক মনোভাব প্রাধান্য পেত।

আমি যে বছর মস্কো গেলাম, তখন ইন্দিস্কোয়ে জিমলিয়াচেস্তভার প্রেসিডেন্টসহ অধিকাংশ কর্তাব্যক্তিরা ছিল বাঙালি। পরে জেনেছিলাম, ইউনিভার্সিটির ভারতীয় ছাত্রছাত্রীর

মধ্যে বাঙালির সংখ্যা খুব কম হলেও পুরো দক্ষিণ ভারতের সমর্থন ছিল বাঙালি ছেলেমেয়ের দিকে।

আমাদের ইউনিভার্সিটিতে কাশ্মীরি ছাত্রছাত্রীও ছিল, ছিল মানে নেহাত কম নয়। তাদের অনেকেই বলত, "আমরা আজাদ কাশ্মীরের নাগরিক।" আশ্চর্যের বিষয়, বোধহয় গবেষণারও বিষয় এই যে, কাশ্মীরি যে হিন্দুদের জঙ্গিরা কাশ্মীর থেকে উচ্ছেদ করেছে, দিল্লি বা উত্তর ভারতের বিভিন্ন জায়গায় বসতি স্থাপনে বাধ্য সেইসব হিন্দু পরিবারের যেসব ছেলেমেয়েরা মস্কোতে পড়াশোনা করত, তাদের অনেকেও নিজেদের 'আজাদ কাশ্মীরের' নাগরিক বলে পরিচয় দিত। ৯২-এ জিমলিয়াচেস্তভার ভোটে 'হিন্দু-মুসলিম' কাশ্মীরিরা একটা প্যানেল করল। যদিও তার আগে পর্যন্ত তারা ভারতীয় ছাত্রসংগঠনের মধ্যেই ছিল, কিন্তু আলাদা করে কোনো প্যানেল করেনি। সে বছর তারা আলাদা প্যানেল করল ইন্দিস্কোয়ে জিমলিয়াচেস্তভার মধ্যে থেকেই। 'আজাদ কাশ্মীরের' আদলে কোনো 'আজাদ' জিমলিয়াচেস্তভাতে নয়। কাশ্মীরিরা আলাদা প্যানেল করায় উত্তর ভারত 'এক' হয়ে গেল দিল্লির নেতৃত্বে। দক্ষিণ ভারত দিল্লির নেতৃত্বে এই জোটে আসেনি। ভোটে সেবার কাশ্মীরিরাই জিতল।

ভোটের আগে একটা মিটিং ডাকা হত। দু-তরফের প্রার্থীরা তাদের ভবিষ্যৎ কর্মসূচি, পরিকল্পনা ইত্যাদি ঘোষণা করবে, এমনটা ভেবেই মিটিংয়ের বন্দোবস্ত করা হত। কিন্তু অধিকাংশ সময় আসল কাজ কিছুই হত না। মিটিংয়ে একটা হইচই বাধানোর জন্যই একদল বিশেষ করে যেত। পরস্পর দোষারোপ, ব্যক্তিগত প্রসঙ্গ নিয়ে টানাটানি, চিৎকার, চেঁচামেচির মধ্যে অধিকাংশ মিটিং মাঝপথেই বন্ধ হয়ে যেত। এমনকী, একেক সময় প্রায় হাতাহাতি পর্যন্তও গড়াত।

বছরে বেশ কয়েকবার ইন্দিস্কোয়ে জিমলিয়াচেস্তভা কিছু অনুষ্ঠানের আয়োজন করত। নতুন ছাত্রছাত্রী এলে 'ওয়েলকাম পার্টি', মাঝেমধ্যে ফুটবল বা ক্রিকেট ম্যাচ, আন্তর্জাতিক নারী দিবসে একটি ছোটোখাটো অনুষ্ঠান ইত্যাদি। বেশ বড়োসড়ো করে হোলি উপলক্ষে একটি অনুষ্ঠান হত। নাচগান, আবিরের রঙে এই উৎসব রুশিদের মধ্যেও বেশ জনপ্রিয় ছিল।

আর ছিল ১ মে। আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবসে বিশেষ অনুষ্ঠান। ওই দিনটাতে সকালবেলা আমাদের ইউনিভার্সিটির একদল ছাত্রছাত্রী মিছিল করে যেত রেড স্কোয়ারে। মস্কোর নানাপ্রান্ত থেকে শ্রমজীবী মানুষ সাধারণ মানুষ এসে জড়ো হত রেড স্কোয়ারের বিশাল চত্বরে। পতাকা, ফেস্টুন, বেলুন, প্ল্যাকার্ড আর নানা রঙের পোশাকে ঢাকা মানুষের দল—যেন এক বিশাল মেলা। আর ওই দিন বিকেলে মেলা বসত আমাদের ইউনিভার্সিটি চত্বরে। ইউনিভার্সিটির সামনের রাস্তাটা দিয়ে একবেলার জন্য বাস, গাড়ি চলাচল বন্ধ করে দেওয়া হত। 'উলিৎসা মিকলুখা মাকলায়া' (মিকলুখা মাকলায়া স্ট্রিট) সেদিন সাত-আট ঘন্টার জন্য পুরোপুরি চলে আসত আমাদের 'দখলে'। ইউনিভার্সিটির ৮০টি জিমলিয়াচেস্তভার তরফ থেকে এক বিশাল আন্তর্জাতিক প্রদর্শনী, নাচগানের আসরের আয়োজন করা হত। সব দেশের ছেলেমেয়েরা, নিজেদের দেশে তৈরি নানারকম

জিনিসপত্র নিয়ে হাজির হত সেই প্রদর্শনীতে। একেকটা টেবিলের উপর সাজানো থাকত একেক দেশের জিনিস। বিদেশি ছেলেমেয়েরা নিজেদের জাতীয় পোশাক পরত। মঞ্চে চলত নানা দেশের জাতীয় নৃত্য সংগীত। গোটা পৃথিবীটা যেন সেদিন হাজির হত প্যাট্রিস লুমুম্বা ইউনিভার্সিটির সামনের লম্বা রাস্তাটায়। মস্কোর সব প্রান্ত থেকে লোকেরা ভিড় করে এই 'ইউনিক' মেলায় সামিল হত।

নয়ের দশকের গোড়ার দিক থেকে এই মেলার আয়তন একটু ছোটো হয়ে যায়। রাস্তা থেকে উঠে এসে প্রদর্শনী ঠাঁই নেয় ইউনিভার্সিটি বিল্ডিংয়ের সামনের বাঁধানো প্রশস্ত চত্বরে।

নাচগান, অনুষ্ঠানের আয়োজন, খেলাধুলো ইত্যাদি ছাত্রসংগঠন-সুলভ কাজকর্মের পাশাপাশি কোনো কোনো জিমলিয়াচেস্তভা আবার কিছু 'গুরুদায়িত্ব'-ও পালন করত।

মস্কোতে থাকাকালীন অনেক ছাত্রছাত্রীই বিয়ে করত। এদের কথা ভেবে বিশেষ ফ্যামিলি হস্টেলেরও ব্যবস্থা ছিল। ইউনিভার্সিটি চত্বরে লাতিন কনে আর আরব বরের বিয়ে ছিল অতি স্বাভাবিক ব্যাপার। এসব নিয়ে কেউ কোনো প্রশ্ন তুলত না। একটুও অবাক হত না। কিন্তু অবাক হয়েছিলাম ইমতিয়াজ আর রুবিনার বিয়ের বৃত্তান্ত শুনে।

পাকিস্তানের মেয়ে রুবিনা। ইমতিয়াজও পাকিস্তানেরই। লাহোরে কিছুদিন সাংবাদিক হিসেবে কাজ করার পর সোভিয়েত ইউনিয়নে পড়তে যাওয়ার সুযোগ পায় ইমতিয়াজ। মোলদাভিয়ার রাজধানী কিশিনিয়োভে ভরতি হয় সে। গোটা সোভিয়েতে পাকিস্তানি ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা ছিল হাতে গোনা। সকলেই প্রায় একে অন্যকে চিনত। আরো অনেকের মতোই ছুটি কাটাতে মস্কোতে এসেছিল ইমতিয়াজ। প্যাট্রিস লুমুম্বার পাক ছাত্রছাত্রীর সংগঠন 'পাকিস্তানস্কোয়ে জিমলিয়াচেস্তভা' তখন একটি সিদ্ধান্ত নেয়, লুমুম্বার ছাত্রী রুবিনার সঙ্গে ইমতিয়াজের বিয়ে দেওয়া হবে। দুজনেই বিবাহযোগ্য, কাজেই...। জিমলিয়াচেস্তভার এই 'আজ্ঞা' রুবিনা ও ইমতিয়াজ মাথা পেতে নেয়। কিশিনিয়োভ থেকে আনিয়ে ইমতিয়াজকে প্যাট্রিস লুমুম্বাতে ভরতি করার দায়িত্বও নিজের উপর নেয় পাক জিমলিয়াচেস্তভা। এক্ষেত্রে জিমলিয়াচেস্তভা একেবারে 'লোকাল গার্জেন'-এরও বাড়া। তবে মস্কোয়, আমার ছ-বছরের জীবনে, এহেন অভিনব অভিজ্ঞতা একবারই হয়েছে।

নিজেদের মধ্যে ঝগড়াঝাঁটি, মতপার্থক্যের কারণে পাক ছাত্রসংগঠনটি এখন আর নেই। তবে রুবিনা ও ইমতিয়াজ ভালোই আছে। ওদের একটি মেয়ে হয়েছে।

এভাবেই রাজনৈতিক আদর্শ বা কোনো ধরনের ধারণাবর্জিত আমোদ আহ্লাদের ছাত্রসংগঠনগুলি সক্রিয় ছিল ইউনিভার্সিটিতে। 'বিয়ে দেওয়া'-র ঘটনা খুব বেশি না ঘটলেও অনেক ক্ষেত্রেই কোন মেয়ে কোন ছেলের সঙ্গে কথা বলবে, সে ব্যাপারে অতিরিক্ত পরিমাণে নাক গলাত ছাত্রসংগঠনগুলি। বিশেষ করে একেক দেশের ছাত্রসংগঠন নিজের নিজের দেশের মেয়েদের সম্পর্কে খুবই রক্ষণশীল ছিল। তা এতটাই যে, গতিবিধি পর্যন্ত নির্ধারণ করত তারা। অন্তত করতে তো চাইতই।

বাদামি চামড়ার ভারতীয়রা সাদা চামড়ার কাছ থেকে 'ডার্টি কালো' শুনেছে, এ অভিজ্ঞতা এদেশের বহু লোকের আছে। অথচ, মজার কথা হল, মস্কোয় কোনো কালো

চামড়ার ছেলের সঙ্গো ভারতীয় কোনো মেয়ের বন্ধুত্ব হলে জ্বলে উঠত বাদামিরা! ধিক্কার, টীকা-টিপ্পনী তো ছিলই। এমনকী, নিজেদের বাদামি পৌরুষের অহংকারে সেই মেয়েটির বাড়িতে বেনামে চিঠি পাঠাতেও পিছপা হত না।

এসবই ছিল ছাত্র সংগঠনগুলির মোটামুটি 'কাজকর্ম'। ছ-বছর ছিলাম, এমনকী সোভিয়েতের পতনের সময়টাতেও কোনো ছাত্রসংগঠনকে দেখিনি উদ্যোগী হয়ে কোনো আলোচনা বা কোনো বিতর্কের বন্দোবস্ত করতে। বরং বেশি আগ্রহ ছিল, কী করে পয়সা করা যায়, চোরাচালানের সঙ্গো যুক্ত হওয়া যায়, দূরবীন দিয়ে মেয়েদের হস্টেলের ঘরে দৃষ্টি চালান করা যায়, সেসব দিকে।

আমাদের ইউনিভার্সিটির এক শিক্ষিকা বলতেন, "তোমরা তো ট্যুরিস্ট। ছ-বছরের জন্য ট্যুরিস্ট। তবে থাকা খাওয়া বিনা পয়সায়।" লুমুম্বার বিদেশি ছাত্রছাত্রী সম্পর্কে একটা স্বচ্ছ ধারণা তৈরি করার জন্য এর থেকে ভালো কোনো মন্তব্যের প্রয়োজন হয় না।

প্রথমবার মস্কো পৌঁছানোর ক-দিন পরেই শুনলাম, এক ভারতীয় ছাত্র খুন হয়েছে। পাট্রিস লুমুম্বারই, সিনিয়র কোর্সের ছাত্র। অন্যান্য ভারতীয় ছেলেমেয়ের মধ্যে শুধু গুজগুজ, ফিসফিসে গলায় আলোচনা।

মস্কোতে পা দিয়েই একটা বড়োসড়ো ধাক্কা খেয়েছিলাম। আমার স্বপ্নের মস্কোকে কোথাও খুঁজে পাইনি। চারপাশের বাস্তব মস্কোটাকে তখনও পুরোপুরি মেনে নিতে পারিনি। তার আগেই এমন একটা খবর। পড়তে এসে ছাত্র খুন হয়ে যায়! অবাক হয়ে ভাবছি, এ কোথায় এসে পড়লাম! যে কোনো ভাবে বাড়িতে, চেনা কলকাতায় যদি ফেরা যেত এক্ষুনি, এই মুহূর্তে! পৃথিবীর সবথেকে নিরাপদ শহরগুলির অন্যতম, মস্কোতে, দিনে দুপুরে একটা বিদেশি ছাত্র খুন হয়ে যায়! কী করে এটা সম্ভব? অদ্ভুত একটা ভয়, নিরাপত্তাহীনতা আর অনিশ্চয়তা যেন চারপাশ থেকে চেপে ধরছিল আমাকে।

কিছুই বুঝতে পারছিলাম না। সিনিয়র ছেলেমেয়েদের বারবার প্রশ্ন করছিলাম। এর-তার মুখ থেকে টুকরো টুকরো খবর জুড়ে একটা উত্তর খাড়া করা গেল। ভারতীয় ছাত্রটি হস্টেলে থাকত না। থাকত একটি ফ্ল্যাটে। ব্যবসা করত। ব্যবসার ভাগ-বাটোয়ারা নিয়ে পার্টনারদের সঙ্গো মন কষাকষি। মাংস কাটার ধারালো ছুরি দিয়ে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে ক্ষতবিক্ষত করে 'শোধ' তুলেছে পার্টনাররা।

কোনো হিসাব মিলল না। ছাত্র, তাহলে হস্টেলে না থেকে ফ্ল্যাটে থাকত কেন ভারতীয় ছেলেটি? ছাত্র, তাহলে ব্যবসা করত কীভাবে ছেলেটি? কীসের ব্যবসা? কীসের পার্টনার?

নির্বিকার মুখে একজন সিনিয়র ছাত্র বলল, "কীসের আবার? ব্যবসা মানে স্মাগলিং।" চোরাচালান!!! ব্যাপরটা সত্যিই তখন বুঝিনি। পুরোপুরি বুঝতে লেগে গিয়েছিল প্রায় দু-তিন বছর।

শুধু ভারতীয় নয়, প্যাট্রিস লুমুম্বার বিদেশি ছাত্রছাত্রীর বড়ো একটা অংশ যুক্ত ছিল চোরাচালানের সঙ্গো। এদের কাছে সোভিয়েত ইউনিয়নে পড়তে যাওয়ার সুযোগ পাওয়া ছিল লটারিতে প্রথম পুরস্কার পাওয়ার শামিল। বলাই বাহুল্য, সেটা কোনো সমাজতান্ত্রিক

রাষ্ট্রে সুবিন্যস্ত শিক্ষাব্যবস্থার আওতায়, শিক্ষিত হয়ে ওঠার সুযোগকে কাজে লাগানোর জন্য নয়। বিরাট সোভিয়েত বাজারকে কাজে লাগিয়ে, 'ছাত্র' পরিচয়ের নিরাপদ তক্‌মার আড়ালে থেকে রাতারাতি 'ভাগ্য ফেরানো'র সুযোগ পাওয়ার জন্য। উন্নয়নশীল দেশের, খুব সাধারণ মধ্যবিত্ত পরিবারের এই ছেলেমেয়েরা সোভিয়েত দেশে পা দেওয়ার পর থেকেই গাড়ি, ফ্ল্যাট, প্রাচুর্য ও 'শক্তপোক্ত' ডলারের মোহে ছুটে বেড়াত। সিনিয়র 'দাদা'রা তাদের অভিজ্ঞতা ও নির্ভুল 'গাইডেন্স' বিতরণ করত অকৃপণ হাতে।

আটের দশকের শেষ ভাগ। পেরিস্ত্রোইকা, গ্লাসনস্তের দৌলতে আঁটোসাটো সোভিয়েত সমাজব্যবস্থায় তখন ঢিলেঢালা ভাব। খোলা হাওয়ার আনাগোনা। ক্রেমলিনের উপরওয়ালাদের সঙ্গে সাধারণ সোভিয়েত নাগরিকের সীমাহীন দূরত্বটাও যেন এক ধাক্কায় অনেকটা কমে গেল। গর্বাচভ যে সরকারের নেতৃত্বে ছিলেন, তা যেন প্রকৃত অর্থেই 'জনগণের সরকার, সরকারের জনগণ' হয়ে ওঠার চেষ্টায় রত। সাধারণ মানুষের মনে অন্তত এধরনের একটা বিশ্বাস তৈরি হল।

সোভিয়েত দেশে পড়াশোনা করতে যাওয়া বিদেশি ছেলেমেয়েরা গোটা সমাজব্যবস্থার সঙ্গে জড়িয়ে পড়ত। সমাজজীবনের ওঠানামা, রদবদলের ছাপ পড়ত তাদের জীবনযাত্রাতেও। স্বাভাবিকভাবেই আটের দশকের শেষ ভাগের 'ঢিলেঢালা' সোভিয়েত সমাজ তাদের জীবনধারাতেও পরিবর্তন আনল। কর্তৃপক্ষের 'অদৃশ্য ও সব-টের-পাওয়া অন্তর্ভেদী দৃষ্টিশক্তি'-র তীব্রতা যেন কতক পরিমাণে হ্রাস পেল। অধিকাংশ বিদেশি পড়ুয়ার মনে কে জি বি সম্পর্কে যে একটা রহস্যজনক, অন্ধকার ভয় ছিল, তা-ও হঠাৎ আলগা হতে শুরু করল। আটের দশকের শুরুতেও বিদেশি ছাত্রছাত্রীর সদা-সতর্ক ও সাবধানী যে মনোভাব ছিল, পেরিস্ত্রোইকা- গ্লাসনস্তের হঠাৎ ঝাপটা তা যেন বেশ খানিকটা দূরে হটিয়ে দিল। এই ঢিলেঢালা, খোলামেলা, কিছুটা সাহস সঞ্চয়কারী, নতুন সময়ের উপযোগী হয়ে উঠতে পরিবর্তনমুখী এক ছাত্রসমাজের দেখা মিলল মস্কোর প্যাট্রিস লুমুম্বা ইউনিভার্সিটিতে।

চোরাচালানের মতো গোলমেলে ব্যাপার-স্যাপার আগেও ছিল, তবে খুব সন্তর্পণে, ভয়ে ভয়ে। কিন্তু আটের দশকের শেষভাগে যেমন হল, মুড়ি-মিছরি দুধ-দই-ঘোল সব মিলেমিশে একাকার হয়ে গেল, এই সুযোগটাকেই পুরোপুরি কাজে লাগাল ছাত্ররা। সব ছাত্র নয়, তা বলাই বাহুল্য। লুমুম্বার স্টুডেন্টস হস্টেলগুলি রাতারাতি একেকটা ব্যবসাকেন্দ্রে পরিণত হল।

বিদেশি ছাত্রছাত্রীর একটা অংশের 'বোধোদয়' হল। পরিশ্রম করে পড়াশোনা শেষ করে দেশে ফিরে চাকরি পাওয়া গেলেও দুমদাম করে বড়লোক হওয়ার সম্ভাবনা নেই বললেই চলে। অথচ চোরাপথে আমদানি-রপ্তানির কারবারে জড়িয়ে পড়তে পারলে একেবারে হিন্দি সিনেমার নায়কের আদলে চোখের পলকে কোটিপতি হওয়ার প্রবল সম্ভাবনা। শুরুর রাস্তাটা বাতলে দেওয়ার জন্য অভিজ্ঞ 'দাদা'রা তো সর্বদাই প্রস্তুত।

হাতেখড়ির জন্য সহজ একটা কাজ। সিঙ্গাপুরে গিয়ে একটা কম্পিউটর কিনে আনতে হবে। আসা যাওয়ার টিকিটের খরচ, হোটেল খরচ এবং অবশ্যই কম্পিউটর কেনার খরচ দেবে 'দাদা'। কাজের মধ্যে শুধু মালটা কিনে এনে 'দাদা'র হাতে তুলে দেওয়া। ঠিকভাবে

কাজ উদ্ধার করতে পারলে সঙ্গো সঙ্গো করকরে ডলারে নগদ 'পেমেন্ট'। দু-তিনবার এরকম 'ট্রিপ' দিতে পারলে (সঙ্গো একটু এদিক-ওদিক) কয়েকদিন পরে নিজেই 'দাদা' বনে অন্য লোককে এজেন্ট হিসেবে সিঙ্গাপুরে পাঠানো যাবে। তখন কাজ হবে মস্কোয় বসে নিজের ব্যবসা কন্ট্রোল করা।

কম্পিউটর কেনাবেচার ব্যবসা করে বহু বিদেশি ছাত্র একেবারে রাতারাতি বড়লোক হয়ে গেছে আমাদের চোখের সামনে। ব্যবসা ছড়িয়েছে ধীরে ধীরে। আরো, আরো ছাত্র ভোগসর্বস্ব জীবন আর ঐশ্বর্যের লালসায় ক্রমশ জড়িয়ে পড়েছে ওই বিস্তৃত জালে।

সাহেবসুবোদের দেশ থেকে বাদামি চামড়ার কেউ ঘুরে এলে, আমাদের সমাজে তার কদর একলাফে বেড়ে যায়। সোভিয়েত দেশে পড়তে যাওয়া বিদেশি ছাত্রসমাজের কাছে সিঙ্গাপুর ফেরত 'করিৎকর্মা'রাও প্রায় সেই ধরনের সমাদরই পেত।

কম্পিউটর দিয়ে শুরু করে ব্যবসা ফুলে ফেঁপে উঠত। এদিকে মস্কোর দোকান থেকে ধীরে ধীরে নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র উধাও হতে শুরু করল। টুথপেস্ট থেকে আরম্ভ করে চিনি, সাবান, মোজা, ব্লেড, চাল, রান্নার তেল, বাসনপত্র—যে কোনো জিনিস, যে কোনো সময়ে, বিনা নোটিসে, দোকানে অমিল হতে লাগল। বিশাল বড়ো বড়ো দোকানের সারি সারি কাচের শোকেস ফাঁকা হয়ে গেল। ফাঁকা শোকেসে থরে থরে প্লাস্টিকের ক্যারি ব্যাগ ভাঁজ করে রেখে নিষ্প্রভ চোখে সেলসগার্লরা বসে থাকত। একটু মাখন, চিজ, সসেজ, ডিম, মাংস, কাপড়কাচা সাবান বা জুতো জামার খোঁজে সকাল থেকে একের পর এক দোকানে উদ্‌ভ্রান্তের মতো ঘুরে বেড়াত মস্কোবাসী। কোথাও কিছুর সন্ধান পেলে যেন রাজ্য জয়ের আনন্দ। তবে কিনতে চাইলেই পাওয়ার উপায় ছিল না। লম্বা লাইনে দাঁড়িয়ে, ধৈর্যের পরীক্ষা দিয়ে, বরাতে থাকলে তবেই জুটত এক টুকরো মাংস বা মাখন।

১৯৯০-এর গরমকালে 'জারুবেঝোম' নামে একটি জনপ্রিয় সাপ্তাহিক পত্রিকায় একটি কার্টুন বেরিয়েছিল। বাবা-মা ছেলেকে চিড়িয়াখানায় নিয়ে গিয়েছেন। বাঘ দেখাতে নয়। বাঘের খাঁচায় মাংসের টুকরো দেখাতে। মা ছেলেকে বলছেন, "ওই দ্যাখ খোকা, ওটাকে মাংস বলে।"

সাধারণ মস্কোবাসী তখন বলত, "সব জিনিসের অভাব আমাদের, শুধু রুবল ছাড়া।" পকেট ভরতি রুবল, অথচ বাজারে সব কিছু অমিল। এই 'সুযোগ'কে পুরোপুরি কাজে লাগাল কিছু বিদেশি ছাত্র।

দেশ থেকে টি-শার্ট, চামড়ার জ্যাকেট, ঝুটা মুক্তোর গয়না, জুতো নিয়ে গিয়ে বিক্রি করে রাশি রাশি রুবল রোজগার করল বহু ভারতীয় ছাত্র। এখানে তারা টি-শার্টগুলো কিনত ২৫-৩০ টাকায়। মার্কিন ডলারের হিসাবে যার দাম পড়ে এক ডলার বা তারও কম। ওখানে একেকটা বিক্রি হত তিন ডলারে। এখানে যে সোয়েটারের দাম পড়ত পাঁচ ডলারের কাছাকাছি, ওখানে তা ডবল বা তারও বেশি দামে বিক্রি হত। লেদার জ্যাকেটের ব্যবসা ছিল খুব লাভজনক। একেকবারে ২০টা পর্যন্ত জ্যাকেট নিয়ে যেত অনেকে। দিল্লির পালিকা বাজারে নির্দিষ্ট কয়েকটা দোকান থেকে ১০০০—১২০০ টাকায় (৩৫-৪০ ডলার) জ্যাকেট কিনত ওই ছাত্ররা। মস্কোতে একেকটা বিক্রি হত, ১২০—১৫০ মার্কিন ডলারের

বিনিময়ে। অনেক সোভিয়েত শহরে তার থেকেও বেশি দামে।

চাহিদা অনুযায়ী একেক অঞ্চলের ছাত্ররা একেক ধরনের জিনিস নিয়ে যেত। মধ্য এশিয়ার বাসিন্দারা মশলাদার খাবার খেতে খুব পছন্দ করে। উজবেকিস্তানে লঙ্কা, ধনে, জিরে পাওয়া গেলেও হলুদ পাওয়া যেত না। ভারত, বাংলাদেশের ছাত্ররা দেশ থেকে হলুদগুঁড়ো নিয়ে গিয়ে অনেক বেশি দামে বিক্রি করত। এক কেজি হলুদ সাত-আট ডলারে বিক্রি হত বলে শুনেছি। কোনো কোনো ব্যবসাদার ছাত্র একেকবারে ২০ কেজি পর্যন্ত হলুদগুঁড়ো সঙ্গে নিয়ে যেত।

জর্জিয়ায় পড়াশোনা করতে যাওয়া এক ভারতীয় ছাত্র বাড়ি থেকে দুটো বড়ো স্যুটকেস ভরতি কনডোম আর কনট্রাসেপটিভ পিল নিয়ে গিয়েছিল। সেটা ৮৮ সালের কথা। ওখানকার ছোটোখাটো শহরে সে সময় কনট্রাসেপটিভ পিল পাওয়া যেত না। সোভিয়েত ইউনিয়নে গর্ভপাতের অনুপাত খুব বেশি হওয়ার এটাও একটা কারণ বলে মনে করা হয়। জর্জিয়ার ওই ভারতীয় 'ছাত্র'টি এ খবর জানত। চাহিদা প্রচুর, অথচ মাল নেই। ব্যবসা জমিয়ে তোলার এমন সুবর্ণ সুযোগ হাতছাড়া করেনি সে। ছুটির পর বাড়ি থেকে ফেরার সময় আর কোনো লাগেজ সঙ্গে না নিয়ে দুটো স্যুটকেস ভরে নিয়েছিল জন্ম নিয়ন্ত্রণের হাতিয়ার। পকেট ভরতি ডলারই তখন জীবনের মূল কথা। কীভাবে সেই ডলার পকেটে এল, তা নিয়ে ভাববার সময় কোথায় তখন?

শুধু ভারতীয় নয়, শুধু বাংলাদেশি নয়, অন্যান্য দেশের ছেলেমেয়েরাও এমন বহু জিনিস নিয়ে গিয়ে, খাঁ খাঁ সোভিয়েত বাজারে, হন্যে হয়ে সব কিছু খুঁজে বেড়ানো, উদ্‌ভ্রান্ত মানুষের হাতে তুলে দিতে লাগল—সোভিয়েত মানুষের কথা ভেবে নয়, নিজেদের স্বার্থে। 'ছাত্র' পরিচয়কে ঠেলে সরিয়ে 'ব্যবসাদার ছাত্র' হতে, সবুজ মার্কিন ডলারের বেষ্টনে বিলাসবহুল জীবনের স্বাদ তারিয়ে তারিয়ে উপভোগ করতে।

রুবলের ততদিনে বেশ নড়বড়ে অবস্থা। ৮৭-তে গিয়ে দেখেছিলাম, কালো বাজারে এক মার্কিন ডলারের বদলে চার রুবল পাওয়া যেত। দু-তিন বছরে রুবলের দাম এক ধাক্কায় অনেক কমে গেল। এক ডলারের দাম উঠল লাফিয়ে লাফিয়ে—ষোলো, কুড়ি, পঁচিশ, তিরিশ, পঞ্চাশ রুবল। মুদ্রাস্ফীতির এই হারে 'নিরাপদ' থাকার জন্য বাবসায়ী ছাত্ররা হাতে রুবল এলেই ডলার কিনে রাখত। রুবলের নাম তখন 'দিরিভিয়ান্নি' (কেঠো মুদ্রা বা ফালতু)। 'শক্তপোক্ত' ডলারই তখন একমাত্র ভরসা। মস্কোর অধিকাংশ লোকের মুখে তখন একটাই কথা ঘুরেফিরে বেড়াচ্ছে, ইষ্টদেবতার নাম জপার কায়দায়—ডলার, ডলার, ডলার।

অনেক রুশির ধারণা হল, বিদেশি ছাত্রছাত্রী মানেই ডলারের পাহাড়ের উপর বসে আছে। মস্কোর অনেক ট্যাক্সি ড্রাইভার তাই বিদেশি ছেলেমেয়েকে সওয়ার করে ভাড়া দাবি করত ডলারে। রুবলের নাম শুনলেই চটে যেত।

ব্যবসাদার ছাত্ররা একটু-আধটু ডলারের মুখ দেখলেই হস্টেলে আর থাকত না। ফ্ল্যাটে চলে যেত। সাধারণ ছাত্রছাত্রীর কথা মাথায় রেখে হস্টেলগুলো তৈরি করা হয়েছিল। রান্নাঘর, বাথরুম, টয়লেট ইত্যাদি সব ধরনের সুযোগসুবিধাই ছিল। কিন্তু ডলারওয়ালারা

এক ধরনের নিরাপত্তাহীনতায় ভুগত। ঘরে না থাকার সময় যদি ডলার চুরি হয়ে যায়! পাছে রুমমেট বা আশপাশের ছেলেরা সমস্ত গতিবিধি আঁচ করতে পারে! হস্টেলের ঘরে বসে 'বিজনেস টক'-এ অসুবিধা আছে। অতএব সব থেকে নিরাপদ একটা ফ্ল্যাট খুঁজে বের করা। আরো একটা সুবিধা আছে ফ্ল্যাটে। টেলিফোন। মস্কোর সব ফ্ল্যাটেই টেলিফোন আছে। ব্যবসার কাজ ফোন ছাড়া চলে না। আমাদের হস্টেলের ঘরে ঘরে ফোন ছিল না। এছাড়া ফার্নিশড ফ্ল্যাট, নিজের মতো করে থাকার সুবিধা, নিজের একটা আলাদা ঘর—এগুলো তো ছিলই। মোটা অঙ্কের ডলারওয়ালা 'দাদা'রা সেপারেট ফ্ল্যাট ভাড়া নিত, মাসে ১০০-১৫০ ডলার ভাড়াতে। 'চুনোপুঁটিরা' পেয়িং গেস্ট থাকত। কোনো রিটায়ার্ড রুশির ফ্ল্যাটে, একটা কামরায়। রান্না খাবার মুখের সমানে পাওয়ার সুবিধাটাও থাকত। অবসরপ্রাপ্ত রুশিরা সামান্য যা পেনশন পেতেন তাতে মাস চালানো দায় ছিল। পেয়িং গেস্ট রেখে মাসান্তে কিছু ডলার, তাঁরাও হাঁফ ছেড়ে বাঁচতেন।

তবে ফ্ল্যাটে থাকার 'রিস্ক'-ও ছিল। বিজনেস পার্টনারদের সঙ্গে ঝামেলা হলে ভাড়া করা গুন্ডা দিয়ে বা নিজেরাই একেবারে সাবাড় করে দিত। যেমন হয়েছিল সেই ভারতীয় ছাত্রটির, যার কথা মস্কো পৌঁছানোর পরই শুনেছিলাম। হস্টেলে, অত ছেলের মাঝে, এত সহজে 'বেইমানি'র উপযুক্ত শাস্তি দেওয়া যেত না। প্রাণের ভয়ে তাই অনেক 'শেঠ' দাদাকেও হস্টেলে থাকতে দেখেছি। এই 'শেঠ'দের ঘর থেকে মাঝেমধ্যে ডলার, দামি বিদেশি জিনিসপত্র চুরি যেত। এছাড়াও নানা ধরনের ভয়, আশঙ্কা ছিল।

একটা চালু 'গল্প' ছিল লুমুম্বার হস্টেলগুলোয়। এক ব্যবসাদার বাংলাদেশি ছাত্র হস্টেলেই থাকত। নিজের ধনসম্পদ নির্বিঘ্নে সুরক্ষার জন্য হস্টেলের ঘরের সাদামাটা কাঠের দরজার উপর রেক্সিনের পুরু আস্তরণ লাগায় সে। সোভিয়েত ইউনিয়নে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি পেতে হলে একটা থিসিস 'ডিফেন্ড' করতে হত। সেদিনটা ছিল ওই বাংলাদেশি ছাত্রের ডিফেন্ডের পালা। সাতসকালে কে যেন ডাকাডাকি করল। দরজা খুলে ছাত্রটি দেখে কয়েকজন উর্দিধারী গম্ভীর মুখের লোক। বলল, 'কেজিবি'। ঘরে ঢুকে তন্নতন্ন করে 'সার্চ' করল সব কিছু। বেরোবার আগে দরজায় আটকানো রেক্সিনের গদিতে লম্বালম্বি ব্লেড চালাল। ঝরঝর করে সবুজ মার্কিন ডলারের তাড়া তাড়া নোট মেঝেতে ছড়িয়ে পড়ল। 'ছাত্র'টিকে অ্যারেস্ট করা হল। 'ডিফেন্ড' আর করতে পারল না সে। একটুর জন্য স্নাতকোত্তর ডিগ্রিটা তার হাতছাড়া হয়ে গেল। যদিও স্নাতকোত্তর ডিগ্রি পাওয়া নিয়ে তার কতটা মাথাব্যাথা ছিল, এ প্রশ্নটা থেকেই যায়।

ছাত্রদের মুখে মুখে ফিরত এই ধরনের আরো অনেক 'গল্প।' গল্পের মতো শুনতে লাগলেও সেগুলো আসলে সত্যি। ঘটেছে প্যাট্রিস লুমুম্বা বা সোভিয়েত দেশের অন্য কোনো ইউনিভার্সিটি বা ইন্সটিটিউটের স্টুডেন্টস হস্টেলে।

এরকমই একটি গল্পের মতো হলেও সত্যি ঘটনার কথা বলি। প্রিপারেটরি কোর্স শেষে গরমের ছুটিতে বাড়ি আসছিল এক ছাত্র। ভারতীয়। দিল্লিতে বাড়ি। প্রথম ছুটিতে প্রথমবার বাড়ি আসা। দিল্লিরই এক সিনিয়র দাদা ছেলেটিকে অনুরোধ করল তার সামান্য কয়েকটা জিনিস সঙ্গে নিয়ে আসতে। "আমার দিদির ছেলেমেয়ের জন্য দুচারটে খেলনা

পাঠাব। তোমার অসুবিধা না হলে যদি নিয়ে যাও তো ভালো হয়। আমি কয়েকদিন পর বাড়ি যাব। তখন তোমার কাছ থেকে জিনিসগুলো নিয়ে নেব।" 'দাদা'র প্রস্তাবে রাজি হয়ে যায় ছেলেটি। প্লেনের ইকনমি ক্লসের যাত্রীদের ২০ কেজি পর্যন্ত মালপত্রের জন্য কোনো চার্জ দিতে হয় না। খেলনার আর কত ওজন হবে! অসুবিধা হবে না কিছু। বাড়ি আসার দিন জিনিসগুলো ছেলেটির হস্টেলে পৌঁছে দেবে বলেছিল 'দাদা'। অনেকক্ষণ অপেক্ষা করার পরেও সে এল না। অগত্যা ছেলেটি এয়ারপোর্টের দিকে রওনা হয়ে গেল।

মস্কোর শিরিমেতাভা এয়ারপোর্টে। ছেলেটি তার মালপত্র সব 'ব্যাগেজ'-এ পাঠিয়ে দিল। হঠাৎ সেই দাদা প্রচণ্ড ঘামতে ঘামতে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে এসে হাজির হল।

—সরি, ভীষণ দেরি হয়ে গেল। তোমার ঘরে গিয়ে দেখলাম বেরিয়ে পড়েছ। ও, লাগেজ পাঠিয়ে দিয়েছ? ঠিক আছে, আমার ব্যাগটা হাতেই নিয়ে নাও। নিচে খেলনাগুলো আছে। উপরে কয়েকটা জামাকাপড়। আমি এক সপ্তাহের মধ্যে দিল্লিতে পৌঁছে যাব। তারপর তোমার বাড়ি থেকে নিয়ে নেব।

দাদার হাত থেকে ব্যাগটি নিল ছেলেটি। ভারী হ্যান্ডব্যাগটা নিয়ে ভেতরে ঢুকে গেল। যেতে যেতে ভাবছিল, খেলনা আর জামাকাপড়ের ওজন এত বেশি কেন? এয়ারপোর্টে, অনেকটা ভেতরে গিয়ে হ্যান্ডব্যাগ স্ক্যান করাতে হয়। দাদার ব্যাগ স্ক্যান মেশিন পার হওয়ার পর বৃদ্ধা এয়ারপোর্ট কর্মী ব্যাগটি খুলতে বললেন ছেলেটিকে। খুলল সে। উপরে পর পর কয়েকটি শার্ট ভাঁজ করে রাখা। সেগুলো সরাতেই ছেলেটি হতবাক হয়ে গেল। ব্যাগ ভরতি প্রায় ৩০০টি স্টপ ওয়াচ। এয়ারপোর্টের কর্মীও অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "কী করবে এগুলো নিয়ে?"

ছেলেটি তার হাতেপায়ে ধরে, একটু আগে 'ডিউটি ফ্রি শপ'-এ কেনা বিদেশি মদের বোতল আর মার্লবোরো সিগারেটের কার্টন ঘুষ দিয়ে কোনোরকমে সেই বৃদ্ধাকে 'ম্যানেজ' করল। মস্কোর কোনো দোকানে তখন সিগারেট পাওয়া যেত না। অত দামি সিগারেটের লোভ সামলাতে পারেননি বৃদ্ধা। ওগুলো চট করে সরিয়ে রেখে ছেলেটিকে বললেন, "আমি ছেড়ে দিচ্ছি। কিন্তু দিল্লি এয়ারপোর্টে তো ধরা পড়বেই। তখন কী করবে?"

ছেলেটির চিন্তাশক্তি তখন প্রায় লোপ পেয়েছে। প্রাণের দায়ে জীবনে প্রথমবার ঘুষ দিয়ে হাত-পা তখনও থরথর করে কাঁপছে। প্রথম ছুটিতে বাড়ি যাওয়া, এক বছর পর বাড়ির সকলকে দেখতে পাওয়া—সব আনন্দ যেন উবে গেল মুহূর্তে। টাইম বোমা তৈরির কাজে স্টপ ওয়াচ দরকার হয়। দিল্লি এয়ারপোর্টে স্টপ ওয়াচ নিয়ে ঢুকতে অনুমতি দেওয়া হয় না। অন্যান্য ছাত্রদের মুখে এসব কথা শুনেছে সে। এখন কী করবে? ওই 'দাদা' তার সরল বিশ্বাসের সুযোগ এভাবে নিল? তার তো জেল হয়ে যেতে পারে। বাড়ির লোকদের কী বলবে সে? কেউ কি বিশ্বাস করবে যে, এই ব্যাগটা তার নিজের নয়? কেন এমন করল 'দাদা'?

মস্কো থেকে দিল্লি পৌঁছোতে ছ-ঘন্টা সময় যে কীভাবে কাটল, তা ছেলেটিই জানে! মাথা ঝিমঝিম করছিল তার। চোখের কোণ জ্বালা করছিল। কপালের রগ দপদপ করছিল। হাত পায়ের তালু ঘামছিল।

দিল্লি এয়ারপোর্টে নেমে চারদিকটা ঝাপসা মনে হচ্ছিল। ঘড়িতে তখন ভোর চারটে। নিজের স্যুটকেসগুলো 'কনভেইয়ার বেল্ট' থেকে তুলে নিয়ে ট্রলিতে বসাল সে। যাদের সঙ্গে 'ডিক্লেয়ার' করার মতো কোনো জিনিস নেই, সেইসব যাত্রীরা 'গ্রিন চ্যানেল' দিয়ে বেরিয়ে যেতে পারে। ট্রলিটা ঠেলতে ঠেলতে মরীয়া হয়ে ছেলেটিও চলল গ্রিন চ্যানেলের দিকে। ভাবল, যা থাকে কপালে। সামনের যাত্রীদের অনুসরণ করে ধীর পায়ে ট্রলি ঠেলে এগিয়ে গেল সে। কোনোদিকে তাকাল না। না, কেউ তাকে সন্দেহ করেনি। সে এখন বিমানবন্দরের বাইরে।

পরে খোঁজ নিয়ে ছেলেটি জেনেছিল, মস্কোতে এক-একটি স্টপ ওয়াচের দাম ২০-২৫ রুবল। দিল্লির পালিকা বাজারে নির্দিষ্ট কয়েকটি দোকানে এই স্টপ ওয়াচ বিক্রি করা যেত। এককেটা ৭৫-৮০ টাকায়।

৯০ সালের গরমের ছুটিতে এই ঘটনা ঘটার পর ছেলেটি আবার মস্কো ফিরে গিয়েছিল। সিনিয়র সেই দাদার সঙ্গে দেখাও হয়েছিল। দাদা নির্বিকার মুখে তার সঙ্গে কুশল বিনিময়ও করত।

এরা দুজনেই আমার পরিচিত। ঘটনাটি আমায় বলেছে নির্বিঘ্নে 'মাল' পৌঁছে দেওয়া দিল্লির সেই ছেলেটি। মস্কোয় ফিরে গিয়ে আমাকে ঘটনাটি বলার সময় সে যত হম্বিতম্বি করছিল, ওই দাদার মুখোমুখি হওয়ার পর কিন্তু তাকে ততটাই ন্যাকা ন্যাকা লাগছিল। এবং আমি জানি, সে ওই দাদাকে এজন্য বিন্দুমাত্র গালাগাল দেয়নি। এটা আমার কাছে এখনও একটা রহস্য।

সেই ৯০-৯১ সাল নাগাদ মস্কোর ভারতীয় ছাত্রদের মধ্যে আরো একটা ব্যবসা খুব জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। লোক চালান।

ভারতের বহু লোক ইউরোপ বা আমেরিকায় 'সেটল' করতে চাইত। অথচ প্রয়োজনীয় কাগজপত্র বা ভিসা থাকত না তাদের হাতে। ভারতে সক্রিয় এজেন্টদের সঙ্গে তখন তারা যোগাযোগ করত। এই এজেন্টরা কোনোরকমে মস্কোর ভিসা জোগাড় করে বিদেশগামী দলে দলে লোককে মস্কোতে পাঠিয়ে দিত। মস্কো এয়ারপোর্টে এদের 'সংগ্রহ' করে নিত আরেকদল এজেন্ট। ভারতের এজেন্টদেরই মস্কোর 'প্রতিনিধিরা'। মস্কোর এজেন্ট হিসেবে কাজ করত ওখানকার ভারতীয় ছাত্ররা। তাদের কাজ ছিল মস্কো থেকে ওই লোকগুলোকে অস্ট্রেলিয়া, কানাডায় পাঠিয়ে দেওয়া।

বলাই বাহুল্য, 'পাচারেচ্ছুরা' একবর্ণ রুশ ভাষা জানত না। এদের এয়ারপোর্ট থেকে সঙ্গে নিয়ে যেত ভারতীয় ছাত্র-এজেন্টরা। জাল পাসপোর্ট, ভিসা করার 'অফিস' ছিল মস্কোতে। মোটা অঙ্কের ডলারের বিনিময়ে ওই জাল পাসপোর্ট, ভিসা করানো হত। দু-একদিন মস্কোতে রেখে, এইসব কাজগুলো করার পর এজেন্টরা তাদের তুলে দিত কানাডা বা অস্ট্রেলিয়ার প্লেনে। মস্কো এয়ারপোর্টে এজেন্টদের 'চেনাজানা' লোক থাকত, তাই জাল পাসপোর্ট, ভিসা নিয়ে কোনো অসুবিধায় পড়তে হত না। মস্কোকে 'ট্রানজিট' হিসেবে ব্যবহার করে ওই ভারতীয়রা ছড়িয়ে পড়ত পৃথিবীর নানাদিকে। এদের মধ্যে পাঞ্জাব, দিল্লির বাসিন্দার সংখ্যা ছিল বেশি। এজেন্টরা এদের প্লেনে তুলে দেওয়ার আগে

পাসপোর্ট, ভিসা, সমস্ত ডকুমেন্ট প্লেনের টয়লেটের গর্তে ফেলে ফ্লাশ টেনে দিতে হবে। এজেন্টদের নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করত সকলে। তারপর কানাডা বা অন্যান্য দেশের এয়ারপোর্টে এরা বলত, প্লেনেই এদের সমস্ত ডকুমেন্ট খোয়া গিয়েছে।

খোঁজ নিলে দেখা যাবে, ৯০-৯১ সাল নাগাদ কানাডা, অস্ট্রেলিয়া বা ইউরোপের অনেক দেশে 'এমিগ্রেট' করা অনেক ভারতীয়, ভায়া মস্কো ওখানে গিয়ে পৌঁছেছে আন্তর্জাতিক বিধিনিষেধকে কাঁচকলা দেখিয়ে। ভারতের এজেন্ট ও মস্কোর ভারতীয় ছাত্র-এজেন্টদের সহযোগিতায় এবং অবশ্যই প্রভাবশালী একটা শ্রেণির পৃষ্ঠপোষকতায় বিরাট একটা 'চক্র' পুরো ব্যাপারটা পরিচালনা করত। হাজার হাজার ডলারের লেনদেন হত এখানে। লুমুম্বার এরকম কিছু ছাত্র-এজেন্টকে চোখের সামনে, অল্প সময়ের মধ্যে, একেবারে ফুলেফেঁপে উঠতে দেখেছি।

৯১ সাল। গরমের ছুটির এক সকাল। মস্কোর হস্টেলে আমার ঘরেই ছিলাম। দরজায় খটখট শুনে দেখি একটি আফগান ছেলে দাঁড়িয়ে। সঙ্গে মলিন মুখে জীর্ণ পোশাকের একজন। চেহারা দেখে ভারতীয় মনে হচ্ছিল। আফগান ছেলেটি বলল, মেট্রো রেলে করে সে আসছিল। ভারতীয় ওই লোকটি তাকে দেখতে পেয়ে এগিয়ে আসে। জল ভরতি চোখে তাকে কী সব বলে। হিন্দি ছবি দেখার দৌলতে যতটুকু হিন্দি শিখেছে আফগান ছেলেটি, তার সাহায্যেও খুব একটা কিছু বুঝে উঠতে পারে না সে। শুধু বোঝে, দিল্লি থেকে এসেছে লোকটি। একবর্ণ রুশি জানে না। দলছুট হয়ে গেছে, পথ হারিয়েছে। তাই আমার কাছে সে নিয়ে এসেছে লোকটিকে। আমি নিশ্চয় ওর ভাষা বুঝব এবং নিজের দেশের লোককে সাহায্যও করব নিশ্চয়।

ক্লান্ত, বিধ্বস্ত, ভীত, উদ্‌ভ্রান্ত লোকটিকে আমার জিম্মায় রেখে আফগান ছেলেটি চলে গেল। সকল ভারতবাসীর পক্ষ থেকে ধন্যবাদ জানালাম ছেলেটিকে!

কোনো প্রশ্ন করার আগেই লোকটি কাতর গলায় বলল, 'পানি'। এক চুমুকে জলটা খেয়ে লোকটি গড়গড় করে অনেক কিছু বলে গেল। শেষে কেঁদে ফেলল। সবটা বুঝলাম না। ভাষাটা হিন্দি ছিল না, ছিল পাঞ্জাবি। আমার হিন্দি জ্ঞান ও লোকটির ভাঙা ভাঙা পাঞ্জাবি অ্যাকসেন্টে হিন্দি জোড়াতালি দিয়ে বুঝলাম, একটা বিরাট দলের সঙ্গে গতকাল মস্কো এসে পৌঁছেছে সে। কোথায় উঠেছে বলতে পারল না। শুধু বলে, সেখানে একটা সেলুন আছে। মস্কোর শত শত সেলুনের মধ্যে কোন সেলুনটার কথা সে বলছে, আন্দাজ করতে পারলাম না। কোনো উপায় না দেখে বললাম, ভারতীয় এমব্যাসীতে যেতে চাইলে পৌঁছে দিতে পারি। রাজি হল না লোকটি। যে এজেন্টের উপর তাদের দলটির 'দায়িত্ব' তার নামও বলতে পারল না বেচারি। কী করব বুঝতে পারছিলাম না। অগত্যা লোকটিকে নিয়ে গেলাম পাশের হস্টেলে, ১০ নম্বর ব্লকে। ওখানে অনেক ভারতীয় ছেলে থাকত। প্রথম যার সঙ্গে দেখা হল, তাকে সব বললাম। সে আবার ভাগ্যক্রমে পাঞ্জাবি ভাষাটা জানত। লোকটির সঙ্গে কথা বলল কিছুক্ষণ। আমাকে হস্টেলে ফিরে যেতে বলল। লোকটিকে সে পৌঁছে দেবে কিয়েভ্‌স্কি ভাগজালে (কিয়েভ্‌স্কি স্টেশনে)। ওই স্টেশনের

আশেপাশে বিভিন্ন ফ্ল্যাটে নাকি এসব 'পাচারেচ্ছু' ভারতীয়রা দু-একদিনের জন্য ঠাঁই নিয়েছে।

অচেনা শহরে, একবর্ণ ভাষা না জানা, বৈধ কাগজপত্র সঙ্গে না থাকা, জীর্ণ চেহারার ওই ভারতীয় নাগরিকের মতোই শয়ে শয়ে লোক তখন পাচার হয়েছে। যে কোনো ভাবে কয়েক হাজার ডলার জোগাড় করে পাচার-চক্রের সঙ্গে যোগাযোগ করত তারা। তারপর আর বিশেষ কিছু করতে হত না তাদের। বাকি সব দায়িত্ব এজেন্টদের।

শুধু ভারতীয়ই নয়, আফগানিস্তান, বাংলাদেশ, পাকিস্তানের কিছু ছাত্রও এই ধরনের লোকপাচারের সঙ্গে জড়িত ছিল। বাংলাদেশের কিছু রিকশাচালকও সেসময় ওইসব 'ছাত্র-এজেন্টদের' মাধ্যমে, মস্কো হয়ে অস্ট্রেলিয়া বা ইউরোপের অন্য দেশে চলে গিয়েছিল বলে শুনেছি। বাংলাদেশের ছেলেমেয়ের মুখেই। যুদ্ধ ও রাজনৈতিক অস্থিরতা আফগানিস্তানের বহু নাগরিককে দেশ ছাড়তে বাধ্য করেছিল। এদের অনেকেই মস্কোতে আশ্রয় নিয়েছিলেন। যাঁদের সামর্থ্য বেশি ছিল তাঁরা এজেন্টদের 'মসৃণ সহযোগিতায়' আরো পশ্চিমদিকে পাড়ি জমাতেন।

ছাত্র-এজেন্টরা নিজেদের ব্যবসার 'উজ্জ্বল ভাবমূর্তি' বজায় রাখতে যথেষ্ট তৎপর ছিল। পেশাদারী মনোভাব এবং সাদা কালোর খেলায় তারা ছিল সিদ্ধহস্ত। কিন্তু মাঝেমধ্যে দু-চারজন উটকো 'উপদ্রব' তাদের কিছুটা অসুবিধায় ফেলে দিত।

এমনই এক উটকো 'উপদ্রব', নাম ধরা যাক 'ম'। পাকিস্তানি। লুমুম্বারই ছাত্র। 'পাচারেচ্ছুরা' মস্কোর বিভিন্ন ফ্ল্যাটে সাময়িক আশ্রয় নিতেন। আমাদের ওই 'ম' একদিন এমনই একটা ফ্ল্যাটে গেল। তার পরিচিত একজনের পাকিস্তান থেকে আসার কথা ছিল। তিনি পৌঁছেছেন কিনা দেখতে। পরিচিতের সঙ্গে দেখা না হলেও এক পাকিস্তানি মহিলার সঙ্গে আলাপ হল 'ম'-র। মায়ের বয়সি মহিলা। বহুদিন আগে তাঁর স্বামী কানাডায় চলে গিয়েছিলেন। তারপর তাঁর আর কোনো খোঁজখবর নেই। এতদিন পরে ডলার জমিয়ে সেই হারানো স্বামীকে খুঁজতে যেতে চান মহিলা। ছেলেমেয়ে নেই তাই দেশে কোনো পিছুটানও রইল না।

মধ্যবয়সি এক মহিলা আজন্ম পরিচিত পরিবেশ ছেড়ে চলেছেন সম্পূর্ণ অচেনা এক দেশে। অনিশ্চিত এক ভবিষ্যতের দিকে। কয়েক ঘন্টার মধ্যেই 'ম' সেই মহিলার সঙ্গে 'মা-ছেলে' সম্পর্ক পাতাল। "মা, এই ফ্ল্যাটে বসে থেকে কী করবেন ? চলুন, আপনাকে মস্কো ঘুরিয়ে নিয়ে আসি।" হঠাৎ-পাওয়া সেই 'ছেলে' সারাদিন 'মা'কে নিয়ে ঘুরল। ভালো রেস্টুরেন্টে খাওয়াল। 'মা'-র দুঃখভরা জীবনের গল্প ধৈর্য ধরে মন দিয়ে শুনল। সন্ধ্যাবেলা 'মা'-কে ফ্ল্যাটে পৌঁছিয়ে দিয়ে পরদিন আবার আসার প্রতিশ্রুতি দিল 'ছেলে।'

পরদিন সকাল হতে না হতেই 'ছেলে' এসে হাজির। "মা, আজ আপনাকে আমার হস্টেলে নিয়ে যাব। আমি নিজের হাতে রান্না করব, আপনাকে খেতে হবে।" হঠাৎ পাওয়া 'ছেলে'-র কথা শুনে আনন্দে, কৃতজ্ঞতায় 'মা'-র চোখে জল এসে গেল।

'ম' তার পাতানো 'মা'-কে নিয়ে এল হস্টেলে। পরম আত্মীয়ের মতো যত্ন-আত্তি করল। এমনকী, ফ্ল্যাটে যদি কোনো অসুবিধা হয়, তাহলে হস্টেলে এসে মা থাকতে

পারেন, এমন প্রস্তাবও দিল। কানাডার ভিসা টিকিট করে দিতে এজেন্টরা কত ডলার নিচ্ছে, জানতে চাইল। পরিমাণ জেনে বিস্ময় প্রকাশ করল। ওর থেকে অনেক কমে সে সব ব্যবস্থা করে দিতে পারে, তা-ও সবিনয়ে জানাল। 'মা' এককথায় রাজি। কানাডায় গিয়ে তাঁর কত ডলার দরকার হবে, কে জানে! এখন যদি কিছু বাঁচানো যায়, পরে কাজে লাগবে।

'ম'-র কথামতো 'মা' হস্টেলেই চলে এলেন। দু-একদিনের তো ব্যাপার। 'ম' বলেছে, ওর এখানে অনেকের সঙ্গে জানাশোনা। খুব তাড়াতাড়ি সব ব্যবস্থা করে দিতে পারবে। সঙ্গে আনা ডলারগুলো নিয়ে 'মা' খুব চিন্তায় ছিলেন। ফ্ল্যাটে অচেনা লোকেদের সঙ্গে থাকতে হচ্ছিল। আলমারি ছিল না। এখানে 'ম' নিজের আলমারিতে চাবি বন্ধ করে তাঁর সমস্ত ডলার যত্ন করে রেখে দিয়েছে। 'ম'-কে দেখেন আর 'মা' ভাবেন, উপরওয়ালাই তাঁকে সাহায্য করেছেন। না হলে, মস্কোতে কী করে এমন একটা 'ছেলে' খুঁজে পেলেন তিনি!

সেদিন সন্ধ্যাবেলায় 'ম' ফিরে এসে বলল, "সব কিছু ঠিকঠাক করতে আরো কয়েকদিন লাগবে। কিন্তু মা সারাদিন ছেলেদের হস্টেলে থাকলে আপনার অসুবিধা হবে। এখানে অ্যাটাচড বাথও নেই। আপনি বরং মেয়েদের ব্লকে গিয়ে থাকুন। আমি সব ব্যবস্থা করে এসেছি। মেয়েদের হস্টেলটা অনেক ভালো।" মা একটু ইতস্তত করলেও শেষপর্যন্ত মেয়েদের হস্টেলেই একটা ফাঁকা ঘরে ঠাঁই নিলেন। 'ছেলে' বাজার-টাজার সব করে দিল। তাছাড়া, দু-বেলা এসে দেখা তো করবেই, কথা দিল।

পরদিন সন্ধ্যাবেলা ছেলে এসে বলল, "সারাদিন আপনার ভিসা আর টিকিটের জন্য ছোটাছুটি করেছি। চিন্তার কিছু নেই। সব হয়ে যাবে।" মা রান্না করে রেখেছিলেন। যত্ন করে 'ছেলে'কে খেতে দিলেন। বেচারির উপর দিয়ে সারাদিন কী ধকলটাই না গিয়েছে!

পরদিন 'ম' এল না। মহিলা ভাবলেন, নিশ্চয় সময় পায়নি। তার পরদিনও 'ছেলে'র দেখা নেই। 'মা' তখন একটু চিন্তায় পড়লেন। 'ছেলে' আবার অসুস্থ হয়ে পড়ল না তো! একবার খোঁজ করা দরকার। কিন্তু কী করে করবেন? তিনি তো জানেন না, 'ছেলে' কোন হস্টেলে থাকে! ঘরের নম্বরও জানেন না। এখানের সব হস্টেলগুলোই যে একরকম দেখতে। তার উপর ভাষাটা অজানা।

পরের দুদিনও 'ম' এল না। মহিলা তখন মরীয়া হয়ে পাশের ঘরের আফ্রিকান মেয়ে দুটিকে হাত-পা নেড়ে ইশারা করে অনেক কিছু বোঝানোর চেষ্টা করলেন। 'ছেলে'-র নাম আর 'পাকিস্তান'—দুটি শব্দ ওরা বুঝল। ডেকে আনল একটি ভারতীয় মেয়েকে। তাকে আবার সবকিছু বললেন। বললেন, 'ছেলে'-র উপর তাঁর পুরো ভরসা আছে। শুধু এতদিন কোনো খোঁজ না পেয়ে চিন্তায় পড়েছেন। হয়তো সে বেচারি কোনো অসুখে পড়েছে।

ভারতীয় মেয়েটি খোঁজপত্তর করে 'ম'-এর হস্টেলের ঘরে নিয়ে গেল মহিলাকে। কিন্তু ঘরে কাউকে পাওয়া গেল না। গরমের ছুটির সময়। হস্টেল প্রায় ফাঁকা। একে-তাকে জিজ্ঞেস করেও কিছু বোঝা গেল না। 'মা' বললেন, "তাহলে হয়তো আমার টিকিটের জন্যই দৌড়াদৌড়ি করছে।"

আরো দু-তিন কেটে গেল। 'ম' এল না। তার হস্টেলের ঘরে রোজ দুবেলা গিয়েও মহিলা তাকে দেখতে পেলেন না। ওই ফ্লোরের আরেকটি ছেলে বলল, সম্ভবত মস্কোতে নেই 'ম'। অন্য কোথাও গেছে। মহিলা কিছুই বুঝতে পারছিলেন না। গেলেন সেই ভারতীয় মেয়েটির কাছে। 'ম' যেই ফ্যাকাল্টির ছাত্র, ভারতীয় মেয়েটি পাকিস্তানের সেই মহিলাকে নিয়ে সেখানে গেল। সব কথা শুনে ফ্যাকাল্টির এক সিনিয়র টিচার বললেন, "যতক্ষণ না 'ম'-এর দেখা পাচ্ছি, ততক্ষণ তো কিছু করতে পারব না।"

'ম' মস্কোতে ফিরেছিল। দু-সপ্তাহ পরে। সিনিয়র টিচার তাকে ডেকে পাঠালেন। সব কথা শুনে আকাশ থেকে পড়ল সে। ওই ধরনের এক মহিলাকে সে সাহায্য করেছিল। থাকার জায়গা ছিল না বলে নিজের ঘরে থাকতেও দিয়েছিল। কিন্তু ডলারের কথা কী বলছেন উনি? সব মিথ্যে, বানানো। মহিলার দিকে স্থির চোখে তাকিয়ে বলল, "আপনি কোনো প্রমাণ ছাড়াই আমার কাছে অতগুলো ডলার গচ্ছিত রাখলেন? এ কথা বললেই হল? আমি আপনার কেউ হই না। তাহলে আমাকে এতটা বিশ্বাস করলেনই বা কী করে? আপনি আমাকে ব্ল্যাকমেল করতে চাইলেও 'গল্প'টা ভালো করে ফাঁদতে পারেননি।"

'ম'-র কথা শুনে মহিলা কেমন যেন গুম মেরে গেলেন। ভারতীয় মেয়েটিকে বললেন, "আমি তো সর্বস্ব খুইয়েছি। থাকার মধ্যে হাতের এই চারটে সোনার চুড়ি। এগুলো বিক্রি করে যেভাবেই হোক আমার পাকিস্তানে ফেরার ব্যবস্থা করে দাও। না হলে আত্মহত্যা করা ছাড়া উপায় থাকবে না।"

সমস্ত জীবনের সঞ্চয়, বহু বছর আগে নিখোঁজ হয়ে যাওয়া স্বামীকে খুঁজে বের করার আশা, স্বপ্ন, আকাঙ্ক্ষা—সবকিছু কয়েকদিনের মধ্যে মস্কোতে হারিয়ে, অন্ধকার ও দুর্গন্ধময় এক অভিজ্ঞতাকে সম্বল করে সেই মহিলা ফিরে গেলেন নিজের দেশে।

মনে রাখবেন, 'ম' কিন্তু একজন 'ছাত্র'। মস্কোয় পড়তে গিয়েছিল সে।

ছাত্ররা নিজের উদ্যোগে ক্রমশ 'স্টুডেন্ট' থেকে স্মাগলারে 'উন্নীত' হলেও, তাদের এই উদ্যোগের পেছনে সক্রিয়ভাবে একটা মদত ছিল। এই মদতটাই তাদের উদ্যমী করত চোরাচালানের কাজে। মস্কোর নির্দিষ্ট কয়েকটি অবস্থান থেকে মদত আসত। বিভিন্ন দেশের দূতাবাসের এক শ্রেণির অসৎ ধান্দাবাজ উচ্চপদস্থ কর্মচারী, কূটনীতিকদের একাংশ, প্রতিষ্ঠিত কিছু ব্যবসায়ী, সিপিএসইউ-এর প্রভাবশালী কিছু সদস্য, বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের বেশ কিছু প্রশাসক ও 'শিক্ষক'-রাই এই মদত জোগাত। বলা ভালো, এরাও চোরাচালান চক্রের অন্তর্গত ছিল। যে বিশাল আকারে চোরাচালান চলত, তা মূলত টিকে ছিল এই শক্তিশালী মদতের ভিত্তিতেই।

ব্যবসার কাজে ডলার পাচার করতে গিয়ে শুল্ক বিভাগ বা আন্তর্জাতিক আইন কানুনের ফাঁদে অনেক সময় জড়িয়ে পড়ত ব্যবসাদার ছাত্ররা। তখন তাদের 'উদ্ধার' করত এক শ্রেণির ডিপ্লোম্যাট। নিজেদের প্রভাব প্রতিপত্তি ও ডিপ্লোম্যাট-কোটার নানা সুযোগ সুবিধা ইস্তেমাল করে। বিনা পারিশ্রমিকে নয়, নির্দিষ্ট পরিমাণ 'কমিশন'-এর বিনিময়ে। রুবল-ডলারের লেনদেনের সঙ্গেও অনেক ডিপ্লোম্যাট প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে জড়িত ছিল।

আগেই একটি ঘটনার উল্লেখ করেছি। মস্কো থেকে এক ভারতীয় ছাত্রের স্টপ ওয়াচ নিয়ে আসার কথা। বিদেশি ছাত্রছাত্রীরা এরকম বহু জিনিস নিজেদের দেশে নিয়ে যেত। নিজেদের ব্যবহারের জন্য কোনো জিনিস বা আত্মীয়, বন্ধুবান্ধবকে উপহার দেওয়ার জন্য কোনো স্যুভেনির বিদেশি ছাত্রছাত্রীরা দেশে নিয়ে আসবে, এতে অস্বাভাবিক কিছু নেই। এদের কথা এখানে বলা হচ্ছে না। বলছি, 'ছাত্র' নামধারী তাদের কথা, যারা সোভিয়েত ইউনিয়নের নানা প্রান্ত থেকে প্রচুর জিনিস কিনে নিয়ে যেত নিজেদের দেশে। বিক্রি করত ডবল দামে। সেই টাকাতে আবার দেশ থেকে জিনিস কিনে নিয়ে যেত মস্কো বা অন্যান্য সোভিয়েত শহরে।

অনেক ভারতীয় ছাত্র এয়ারকন্ডিশনার নিয়ে আসত। ঢাউস চেহারার একেকটা মেশিনের ওজন হত প্রায় ২০-২৫ কেজি। ইকনমি ক্লাসের টিকিটে প্লেনে যাতায়াতের সময় মালপত্রের ওজন ২০ কেজির বেশি হলে 'এক্সট্রা' প্রতি কেজির জন্য 'চার্জ' দিতে হত। তাছাড়া এয়ারপোর্টে কিছু ঘুষ দেওয়ার ব্যাপারও ছিল। এসবের পরেও ভারতে মেশিনটি যে দামে বিক্রি হত তাতে ছাত্রদের অনেক লাভ থাকত।

এক সময়ে ভারতীয় ছাত্রদের মধ্যে কুকুরের ব্যবসা খুব জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। কুকুরের ছোটো বাচ্চা কিনে, তাকে ঘুমের ওষুধ খাইয়ে হ্যান্ডব্যাগে পুরে নিত ওরা। ঘুমের মধ্যে ছোট্ট ছানাটা এক মহাদেশ থেকে আরেক মহাদেশে পৌঁছে যেত। দিল্লিতে ওই কুকুর প্রায় চারগুণ দামে বিকোত বলে শুনেছি।

দিল্লির পালিকা বাজারে গিয়ে অবাক হতে হয়। বহু দোকানে সোভিয়েত জিনিসপত্রের ছড়াছড়ি। ইলেকট্রিক রেজর, ইলেকট্রিক কেটলি, হাতঘড়ি, ফারের টুপি, মিউজিক সিস্টেম—সব 'মেড ইন ইউএসএসআর'। এমনকী, ওখানকার অনেক দোকানদারও ভাঙা ভাঙা রুশ ভাষায় কথা বলতে পারে। ব্যবসার প্রয়োজনেই।

এই ধরনেরই এক বাজারের গল্প শুনেছিলাম। এথির মুখে। আমার রুমমেট ছিল এথি। ইথিওপিয়ার মেয়ে। ওদের আডিস আবাবায় একটা বাজার ছিল। সেখানে শুধু সোভিয়েত জিনিসপত্র পাওয়া যেত। বাসনপত্র, টিভি, টেবিলফ্যান, জামাকাপড়, হেয়ার ড্রায়ার, এমনকী হ্যাঙার—কী না বিকোত সেখানে। সবই সোভিয়েত। নিয়ে যেত সোভিয়েত দেশে পড়াশোনা করতে যাওয়া ইথিওপিয়ান ছাত্রছাত্রী। অনেক ছাত্রছাত্রী আবার নিজেরাই সেই বাজারে জিনিস বিক্রি করত বলে এথির মুখে শুনেছি।

মস্কোতে একবার একটা অনুষ্ঠান দেখেছিলাম। টিভিতে। ক্যামেরার চোখ ঘুরছে একটি বাজারে। দোকানে উপচে পড়ছে জিনিস। নানা ধরনের জিনিস। ইলেকট্রনিক গুড্স, জামাকাপড়, খেলনা, বাসনপত্র। পরদায় শুধু ছবি, কোনো কথা নেই। ভাবছি সোভিয়েত কোনো বাজার, কারণ সব জিনিসই সোভিয়েত। তবে বিক্রেতাদের চেহারা দেখে একটু অবাক লাগছে। সোভিয়েত কোনো প্রজাতন্ত্রের বাসিন্দার সঙ্গে মিলছে না। অবাক লাগছে আরো একটা কারণে। মস্কোর কোনো সরকারি দোকানে তো এ ধরনের জিনিসপত্র বহুদিন থেকে অমিল। শুনি, সাপ্লাই নেই। তাহলে এ কোন বাজার? কোথাও কি এমন চোরাগোপ্তা বাজার আছে? জানি না তো!

এসব ভাবতে ভাবতেই মিনিটখানেক পরে পরদায় মাইক্রোফোন হাতে খুশি সাংবাদিকের মুখ। বললেন, "নিশ্চয় ভাবছেন, কোনো সোভিয়েত শহরের এক বাজারের ছবি দেখাচ্ছি আপনাদের। ভুল করছেন। এতক্ষণ আপনারা ভিয়েতনামের রাজধানী হ্যানয়ের এক বাজারে ঘুরছিলেন। জিনিসগুলো সোভিয়েত ইউনিয়নে তৈরি। সেটা ঠিকই চিনেছেন। এখন আপনাদের নিশ্চয় জানতে ইচ্ছা করছে, কী করে এগুলো এখানে এল ? উত্তরটা শোনা যাক ওদের মুখ থেকেই—"

সাংবাদিক এবার বেশ কয়েকজন বিক্রেতাকে প্রশ্ন করলেন। সবাই একই কথা বলল। সোভিয়েত ইউনিয়নে পড়তে যাওয়া ছাত্রছাত্রীর কাছ থেকে জিনিসগুলো কিনেছে। তাছাড়া, সোভিয়েত দেশে যেসব ভিয়েতনামী শ্রমিক কাজ করতে গিয়েছিল, তারাও প্রচুর পরিমাণে ওখানকার জিনিসপত্র সঙ্গে নিয়ে আসে।

সেদিনের ওই অনুষ্ঠানের শেষে সাংবাদিক ভদ্রলোক একটি প্রশ্ন রেখেছিলেন। "বিশ্বের সব সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের নাগরিকরা যদি ভাবে, তাদের ভরণপোষণ, বিলাসব্যসনের ভার সোভিয়েত ইউনিয়নের উপর, তাহলে সোভিয়েতরা নিরুপায়। আমরা যা উৎপাদন করি, তা আমাদের নিজেদের জন্যই যথেষ্ট নয়। এখন সেই উৎপাদনে ভাগ বসিয়েছে অন্য রাষ্ট্রের নাগরিকরাও। এর পরেও কি মস্কো তথা সোভিয়েত ইউনিয়নের অন্যান্য শহরের দোকানগুলির ফাঁকা তাক দেখে আমরা অবাক হব ?"

এই যে এত বিদেশি ছাত্রছাত্রী নিয়মিত চোরাই মাল নিয়ে অন্য দেশ থেকে মস্কোয় আসত এবং মস্কো থেকে স্ব স্ব দেশে নির্বিঘ্নে নিরাপদে চলে যেত, এদের মধ্যে ধরা পড়ত কিন্তু খুব সামান্য কয়েকজন ; বিমানবন্দরে। ধরা পড়ত না কেউ—বরং একথাটাই বলা ভালো। ধরা কেউ কখনো পড়েছে বলে আমি শুনিনি। তবুও বিষয়টি অবিশ্বাস্য বলে আমি লিখে দিলাম, 'খুব সামান্য কয়েকজন ধরা পড়ত।'

এই নিয়মিত চোরাই মাল চালান এবং ধরা না পড়া—এর মধ্যে যে রহস্য লুকিয়ে আছে, তা সম্পূর্ণ উদ্‌ঘাটন করার সামর্থ্য বা শক্তি আমার নেই। তবে আমি আগে যে 'মদত'-এর কথা বলেছি, এই রহস্যের ভেতর সেই 'মদত'টা লুকিয়ে আছে, যার সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত সোভিয়েত ইউনিয়নে কমিউনিজমের পতন।

আমাদের ইউনিভার্সিটির কোনো অনুষ্ঠানে বা সমাবেশে রেক্টর যখন ভাষণ দিতেন, তখন প্রায়ই আমাদের একটা কথা বলতেন। "বিশ্বের ১১০টা দেশ থেকে তোমরা এসেছ। এখন তোমাদের একটাই ঠিকানা। মস্কোর প্যাট্রিস লুমুম্বা পিপল্‌স ফ্রেন্ডশিপ ইউনিভার্সিটি। তোমরা এখানে একটি আন্তর্জাতিক পরিবারের সদস্য। এই পরিবারের একটিই মূলমন্ত্র—বন্ধুত্ব। এই ইউনিভার্সিটিতে পড়াশোনার সঙ্গে সঙ্গে আন্তর্জাতিকবোধের দীক্ষাও গ্রহণ করো তোমরা—এই প্রার্থনা করি।"

রেক্টরের এই কথাগুলি সত্যি হয়ে উঠত আমাদের হস্টেলের ঘরগুলিতে, ইউনিভার্সিটির ক্লাসরুমে, ক্যান্টিনে, খেলার মাঠে। সত্যিই যেন এক আন্তর্জাতিক পরিবারের সদস্য ছিলাম আমরা সকলে। অন্তত একনজরে দেখলে তেমনই মনে হত। কিন্তু ছাত্র-সমাজের মানসিকতার আমূল পরিবর্তন ঘটে গেল আটের দশকের শেষভাগে। সেই ধাক্কা লাগল

ইউনিভার্সিটির ছাত্রছাত্রীর আন্তর্জাতিকতাবোধেও। ব্যবসার স্বার্থে ছাত্রছাত্রী বিভিন্ন ব্লকে ভাগ হয়ে গেল।

আমি যখন প্রথম মস্কো গেলাম, তখন মস্কোর লুমুম্বা চত্বরে ব্যবসা নিয়ন্ত্রণ করছে আফ্রিকান ছাত্ররা। তারপর 'ক্ষমতা' গেল বাংলাদেশি ছাত্রদের হাতে। তখন কম্পিউটরের রমরমা বাজার। বাংলাদেশিরা সিঙ্গাপুরে যাচ্ছে, কম্পিউটর নিয়ে আসছে, চুটিয়ে ব্যবসা করছে। সিঙ্গাপুরে যেতে বাংলাদেশিদের ভিসা লাগে না। তাই যাওয়ার কোনো সমস্যা ছিল না। কম্পিউটর ব্যবসায় সবাইকে 'টেক্কা' দিল বাংলাদেশিরা। বাংলাদেশিদের পর এল আরব ছাত্রদের পালা। পেট্রো ডলারের পুঁজি নিয়ে লুমুম্বা চত্বরে আরবি খাবরের একাধিক রেস্টুরেন্ট, কাফে খুলল আরবরা। তার সঙ্গো চলল আমদানি-রপ্তানির চোরাই ব্যবসা। অধিকাংশ আরব ছাত্র তখন নিজের গাড়ি চড়ে ঘুড়ে বেড়ায়, থাকে ফ্ল্যাটে। ধীরে ধীরে তাদের সময়ও ফুরলো। 'চার্জ' বুঝে নিল আফগান ছাত্ররা। মার্কিন ডলারের ব্ল্যাক মার্কেট তখন নিয়ন্ত্রণ করতে শুরু করল তারা।

লুমুম্বা চত্বরে, ব্যবসাক্ষেত্রে মালিকানা বদলের সঙ্গো সঙ্গো ছাত্রদের মধ্যে রেষারেষি বেড়ে গেল। কোথায় গেল সেই আন্তর্জাতিকতাবোধ! কোথায়ই-বা গেল আন্তর্জাতিকতাবাদ! যে লুমুম্বার চত্বর বিশ্বভ্রাতৃত্ব, বিশ্বমৈত্রী, আন্তর্জাতিক সহনাগরিকত্বের পীঠস্থান ছিল এককালে; আন্তর্জাতিক সৌভ্রাতৃত্বের জন্য সোভিয়েত সরকারের তরফ থেকে সর্বোচ্চ পদক 'অরদেন দ্রুঝ্‌বি নারোদভ' লাভ করেছিল যে ইউনিভার্সিটি, তা-ই কিনা ভেঙে গেল, খানখান হয়ে গেল বিভিন্ন ব্লকে। ব্যবসায়ী ব্লক। স্মাগলারদের ব্লক। লুমুম্বার নামে গণমৈত্রী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে 'মৈত্রী' আর 'বিদ্যা' এই দুটি শব্দ হারিয়ে গেল। তার জায়গা দখল করল নতুন দুটো শব্দ—'স্মাগলিং' আর 'ডলার'। ওদেশের বাজার, সমাজ, সংস্কৃতিটাকে খুবলে খেয়েছে 'ছাত্র' বিশেষণধারী একদল স্মাগলার।

এত কিছুর পরেও কিন্তু এরা ছাত্র। বছরের পর বছর হস্টেলে না থেকে, ক্লাস করতে না এসেও এরা দিব্যি পাশ করে যেত। এবং বেশ ভালোভাবেই। তা-ও ওই চোরাচালানেরই গুণে। আমি একথা বলতে বাধ্য হচ্ছি, লুমুম্বার অনেক 'শিক্ষক'কে বিদেশি চোরাই মাল বা মহার্ঘ ইউএস ডলার ঘুষ দিয়ে অনেক ছাত্র (?) ভালো রেজাল্ট হাতিয়ে নিয়েছে। লুমুম্বায় তো ডিগ্রি বিক্রি হত বলেও শুনেছি। ৯০-৯১ সালে ৫০০ মার্কিন ডলারের বিনিময়ে নাকি 'রেড ডিপ্লোমা' কিনতে পাওয়া যেত। 'রেড ডিপ্লোমা' ছিল সোভিয়েতের শিক্ষাব্যবস্থার সব থেকে সম্মানজনক স্নাতকোত্তর ডিগ্রি। স্নাতক ও স্নাতকোত্তর স্তরে মোট যে কটি বিষয়ে পরীক্ষা নেওয়া হত, সেই বিষয়গুলির মধ্যে ৭৫ শতাংশের বেশি বিষয়ে গ্রেড '৫' বা 'একসিলেন্ট' পেলে একজন ছাত্র বা ছাত্রী 'রেড ডিপ্লোমা' পাওয়ার যোগ্য বলে বিবেচিত হত। কমিউনিস্ট সোভিয়েতের এই রেড ডিপ্লোমাই কিনা মার্কিন ডলারে বিকোত! বোঝাই যাচ্ছিল যে, লেনিনের দেশে ইয়েলৎসিন ও তাঁর বাহিনীর আবির্ভাব আসন্ন!

'ছাত্র' নামধারী ওই ব্যবসায়ীকূল বিনা আয়াসে পরীক্ষায় পাশ করার নানা ধরনের রাস্তা খুঁজে বের করেছিল। আগেই বলেছি, ওদেশে সব পরীক্ষা ছিল মৌখিক। শিক্ষকের

মুখোমুখি বসে একে একে ছাত্ররা উত্তর দিত। উত্তর দিতে শুরু করার আগে নিজের 'রিপোর্ট বুক'-টা শিক্ষকের হাতে দিতে হত। 'কারসাজি'-টা করতে হত এই সময়েই। 'রিপোর্ট বুক'-এ কুড়ি-তিরিশ-চল্লিশ বা পঞ্চাশ মার্কিন ডলারের ভাঁজ করা নোট গুঁজে দিত একশ্রেণির 'ছাত্র'। কোন 'শিক্ষক'-কে কেনা যাবে আর কেনা গেলেও কত দামে, তার খোঁজ আগে থেকেই রাখতে হত।

এরকম খোলাখুলি, নির্লজ্জভাবে ঘুষ না দিয়ে কিছু 'শিক্ষক'কে কেনার অন্য উপায়ও ছিল। বিদেশে কোথাও বেড়াতে গিয়ে দামি দামি উপহার এনে দিত অনেকে। তার মধ্যে দামি বিদেশি মদ থেকে শুরু করে সিগারেট, লেদার জ্যাকেট, সোয়েটার ইত্যাদি নানা ধরনের জিনিস থাকত। শিক্ষককে সম্মান করে বা ভালোবেসে 'স্যুভেনির' হিসেবে এসব উপহার আনত না ওই ছাত্ররা। তাই এগুলিকে গুরুদক্ষিণার পর্যায়ে ফেলতে পারলাম না।

এছাড়া, হস্টেলের ঘরে ডেকে কোনো কোনো 'শিক্ষক'কে নেমন্তন্ন করে ভরপেট মদ খাইয়ে সন্তুষ্ট করার সরল ও তরল পথও অনেক ছাত্র অবলম্বন করত। পরীক্ষা শুরুর ঠিক আগে এ ধরনের নেমন্তন্নের বেশ হিড়িক পড়ে যেত।

আমাদের ইউনিভার্সিটির যে শিক্ষিকা বিদেশি ছাত্রছাত্রীকে 'ট্যুরিস্ট' বলেছিলেন, তাঁর নিশ্চয় এইসব ঘটনা জানা ছিল। 'স্টুডেন্ট' থেকে 'টুরিস্ট' হয়ে তারা যে স্মাগলার, সর্বোপরি প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী এবং এই 'উত্তরণের' জন্য একেকজন একেকটা দাগি ক্রিমিনাল বনে গেছে, তা হয়তো তিনি আন্দাজও করতে পারেননি।

ব্যবসার কাজে নানাদিকে দৌড়াদৌড়ি, নানা ধরনের লোকের সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ করা, ছকমাফিক সময়মতো কাজকর্ম করা, ব্যবসার ওঠানামা ও প্রতিযোগিতার সঙ্গে তাল রেখে চলা—সব মিলিয়ে ব্যবসাদার ছাত্রদের নিশ্বাস ফেলার সময় থাকত না। এছাড়া বেআইনি কাজকর্ম, ঘুষ দিয়ে সবাইকে 'ম্যানেজ' করে রাখা, ধরা না পড়া ইত্যাদি সংক্রান্ত টেনশন তো ছিলই। এত সবকিছুর পর, খুব স্বাভাবিকভাবেই, পড়াশোনা করে 'নষ্ট' করার মতো সময় এদের হাতে ছিল না। রোজ ইউনিভার্সিটিতে ক্লাস করার জন্য ছ-সাত ঘন্টা সময়ই-বা কী করে দেবে এরা! আর ক্লাস করতে গেলে হস্টেলের ঘরে বা ফ্ল্যাটে রাখা ডলার, দামি জিনিসপত্র, ভিসিপি ইত্যাদি পাহারাই-বা দেবে কে? অতএব, এরা ক্লাসে আসত না। গোটা সেমিস্টারে একবারও ক্লাস করতে না যাওয়া বহু ছাত্রছাত্রীকে আমি চিনতাম। এদের বেশ কয়েকজন আমার সহপাঠীও ছিল। ক্লাসে না যাওয়ার জন্য কোনোরকম সংকোচবোধে এরা ভুগত না। বরং হাবেভাবে বোঝাত যে, ক্লাস করে নষ্ট করার মতো ফালতু সময় তাদের হাতে নেই।

ইউনিভার্সিটির সঙ্গে এদের যোগাযোগ এত ক্ষীণ ছিল যে, শিক্ষক-শিক্ষিকাদের অনেকে এদের প্রায় চিনতেনই না। পরীক্ষার আগে হঠাৎ ন-মাসে ছ-মাসে ক্লাসে হাজিরা দেওয়ার কারণ বুঝে উঠতে পারতেন না। পারলেও, তাদের এই স্বেচ্ছাচারিতাকে মেনে নিতে বেগ পেতেন। কড়া ধাতের এই ধরনের শিক্ষকদের পাল্লায় পড়লে পরীক্ষার আগের কয়েকদিন এদের ব্যবসা মাথায় উঠত। হস্টেলে সহপাঠীদের ঘরে ঘরে ঘুরে বইয়ের নাম, সিলেবাস, ক্লাস নোটস জোগাড় করতে বাধ্য হত এরা। সহপাঠী সোভিয়েত ছেলেমেয়েকে

তোয়াজ করে, উপহারের প্রলেপে মাখো মাখো করে গোটা সেমিস্টারের পড়া কয়েক ঘন্টায় বুঝে নেওয়ার চেষ্টা করত। ভাবখানা এমন যেন, অত হাজার হাজার ডলারের কারবার সামলাতে পারি, আর এই সামান্য একটু লেখাপড়া সামাল দিতে পারব না!

পাশও করে যেত ওরা। যে সব 'শিক্ষক'কে কেনা যেত, তাদের হাতে খুব সহজেই। আর ব্যক্তিত্বসম্পন্ন, দৃঢ়চেতা, কড়া ধাতের শিক্ষকরা 'হঠাৎ গজিয়ে ওঠা এই ছাত্রদের' বলতেন, "তোমরা এই ক্লাসের নাকি? আগে তো কখনো দেখিনি। আমার সৌভাগ্য যে অবশেষে দেখা হল। বেটার লেট দ্যান নেভার!"

পছন্দমতো উত্তর দিতে না পারলে ফেরত পাঠাতেন। একবারে না পারলে দু-তিনবারের চেষ্টায় পেরিয়ে যেত এরা। আমাদের প্রফেসররা একটা কথা প্রায়ই বলতেন, "সোভিয়েত ইউনিয়নে ভালো নম্বর (গ্রেড) পাওয়া কঠিন ঠিকই, কিন্তু ফেল করা আরো কঠিন।"

কোনোরকমে পাশ করার পর, আবার ব্যবসার কাজ পুরোদমে শুরু করার আগে এরা টিটকিরি দিত। টিটকিরি দিত সেইসব ছাত্রছাত্রীকে, যারা পড়াশোনা করতেই গিয়েছিল ওদেশে। যারা রোজ না পারলেও মোটামুটি নিয়ম করেই ক্লাসে যেত। টিটকিরি দিয়ে বলত, "রোজ ক্লাসে এসে, রেগুলার পড়াশোনা করে তোরা '৫' পেলি। আমরা একদিনও ক্লাসে না এসে দু-চারদিন পড়ে '৩' পেয়েছি।" (আগেই বলেছি, শতকরা হিসেবে গ্রেড '৫' বা 'একসিলেন্ট' মানে ৭৫ শতাংশের উপর নম্বর, গ্রেড '৩' বা 'স্যাটিসফ্যাক্টরি' মানে ৬০ শতাংশের নিচে, 'পাস অ্যাট দ্য লোয়েস্ট লেভেল')।

দিল্লির একটি ছেলে আমাদের সঙ্গে ৮৭ সালে মস্কো গিয়েছিল। চোরাচালান করে, দিল্লি থেকে টি-শার্ট, লেদার জ্যাকেট, জুতো ইত্যাদি নানারকম জিনিস মস্কোতে নিয়ে গিয়ে তিনগুণ, চারগুণ দামে বিক্রি করে, আরো নানা ধরনের কারবারের সঙ্গে যুক্ত হয়ে বছর তিনেকের মধ্যে প্রচুর ডলারের মালিক হয় সে। মস্কোতে একাধিক ফ্ল্যাট ভাড়া নেয় সে, গাড়িও কেনে। ওখানে পড়তে যাওয়া একটি ভারতীয় মেয়েকে বিয়েও করে। সেই মেয়ে একদিন তার স্বামী সম্পর্কে বলেছিল, "অনেকে ওর কার্যকলাপ নিয়ে অনেক বাঁকা কথা বলে। তারা বুঝতে চায় না, ইউরোপ, আমেরিকার অন্য যে কোনো দেশে ছাত্ররা কাজ করে নিজের হাতখরচটা তুলে নেয়। সোভিয়েত ইউনিয়নে স্টুডেন্টদের সেরকম কোনো সুযোগ নেই। তাই বাধ্য হয়েই নিজেদের দেশ থেকে কিছু জিনিসপত্র এনে বিক্রি করতে হয়, একটু-আধটু ব্যবসা করতে হয়। পকেটমানির জন্যই। এতে দোষের কী আছে, বুঝি না!"

মধ্যবিত্ত মূল্যবোধ কোন চড়ায় গিয়ে ঠেকেছে, তা দেখতাম বুঝতাম। পকেটমানির জন্য স্মাগলিং, পকেটমানির জন্য ঘুষ, পকেটমানির জন্য খুন—সবই পকেটমানির জন্য। আন্তর্জাতিকতাবাদী আপ্তবাক্য আউড়ে মার্কস, লেনিন, কমিউনিজমের নামে, মস্কোয় পড়তে গিয়ে ছ্যাঁচড়ামো—তা-ও পকেটমানির জন্য!

পকেটমানি দরকার হত ঠিকই। এই ধরনের পরিস্থিতিতে দরকার আছেও, থাকবেও। তার জোগান আসবে কোন পথে—প্রশ্ন এটাই। প্রথমত, ওখানে স্কলারশিপের ভালো

বন্দোবস্ত ছিল। ডামাডোলের আগে আমরা ১০০ রুবল করে পেতাম। ভারতীয় টাকায় যার মূল্য ছিল প্রায় দু-হাজার। থাকা বিনে পয়সায়। খাওয়াও নামমাত্র খরচে। এবং গবেট, মূর্খ, ভালো ছাত্রছাত্রী নির্বিশেষে স্কলারশিপের বন্দোবস্ত ছিল। তাতেও যদি পকেটমানির ব্যবস্থা না হয়, অগত্যা চোরাচালান।

দ্বিতীয়ত, প্রায় সকলের বাড়ি থেকে ডলার পাঠানো হত। এমন কাউকে দেখিনি, যার বাড়ি থেকে বছরে অন্তত একবার ডলার যেত না। এবং এর পরিমাণ নিছকই কম ছিল না। তবুও পকেটমানির সংকুলান না হলে কী আর করা! চোরাচালান। এতেই-বা দোষের কী, যেমন ওই মেয়েটি বলে।

একটা ব্যাপার নিয়ে গবেষণার সুযোগ রয়ে গেছে। ছাত্রছাত্রী দলে দলে কেন এই চোরাচালানের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়ল। এমনটা তো গোড়া থেকেই ছিল না। আমি যতটা জেনেছি বুঝেছি তা উল্লেখ করি।

আগেই বলেছি, কমিউনিস্ট পরিবারের ছেলেমেয়েরাই সাধারণত ওখানে পড়তে যাওয়ার সুযোগ পেত। এবং তাদের মধ্যে অধিকাংশই ছিল আবার মধ্যবিত্ত পরিবারের। ছোটোবেলা থেকে বিলাসবহুল জীবনযাপনে এরা অভ্যস্ত ছিল না। ছোটো থেকে বড়ো হয়ে ওঠার পথে খুব সচেনতভাবে কোনো আদর্শের প্রতি এদের কোনো দায়বদ্ধতা তৈরি হয়নি। বলা ভালো, বাড়ির পরিবেশ একাজে কোনোরকম সাহায্যও করেনি। অনেক কিছুই এদের অবদমিত থেকে গেছে। উপর থেকে চাপিয়ে দেওয়া একটি কল্পিত মূল্যবোধের ভারে এদের বড়ো হয়ে ওঠার পথে কোনো স্বাধীন চিন্তাশক্তি তৈরি হয়নি। কোনো দায়বদ্ধতাকে স্বীকার না করেও একটা আদর্শবোধের তাড়নায় নিজেকে গড়ে তোলার কোনো রেওয়াজ এদের ছিল না। যা কিছু ছিল সবই ফাঁপা, মেকি, ঠুনকো। আর ছিল যে করেই হোক পয়সা করে মা-বাবার 'বোকামির' প্রায়শ্চিত্ত করা। সাদা বাংলায়, টাকা কামানো। এরা একটু বেশি সাহসী, তাই এরা ডলারের পিয়াসী। মার্কিন ডলারের। চিনামাটি চীনে পাওয়া যায় না, সর্বত্রই পাওয়া যায়। এদের পক্ষেও মার্কিন ডলার মার্কিন মুলুকে গিয়ে কামানোয় অসুবিধা ছিল। এ ডলারও সর্বত্রই পাওয়া যায়। রাশিয়া খুব ভালো জায়গা। ওদেরও ছিল কিছু জিনিসের দরকার, এদেরও ছিল ডলারের প্রয়োজন। দুইয়ে মিলে যে কী অপরূপ রাজযোটক হল, তা দেখলাম মস্কোয়। মস্কো যেন ছিল ওইসব কমিউনিস্ট পরিবারের সন্তানদের অবাধ বিচরণভূমি। তাদের এমন একটা হাবভাব লক্ষ করতাম যেন সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট সরকার তারাই তৈরি করেছে; যেহেতু তাদের বাবা-কাকারা বোধহয় কমিউনিস্ট। অতএব, সোভিয়েতের কমিউনিস্ট সরকার আমাদের একটু 'দ্যাখো'—আমরা করে খাই, তোমরা সুযোগ করে দাও।

এইভাবেই ছাত্রদল হাজির হল মস্কোয়। মুহূর্তে সামনে হাজির হল বিশাল ঐশ্বর্য অর্জনের সহজ সুযোগ।

অনেকদিন অভুক্ত থাকার পর নানান স্বাদের হরেকরকম খাবার তড়িঘড়ি খেলে যেমন হয়, তেমনটাই হল এদের—সবটাই বদহজম হল।

এত অফুরান সময়, এত স্বাধীনতা, এত একাকিত্ব, এ যে কল্পনার অতীত সুযোগ

... না। তবে সবটা হজম করা সবার সাধ্যের মধ্যে থাকে না। ফল যা হওয়ার তা-ই হল। সেই চিরাচরিত হারাধনের দশ ছেলের গল্প। কোনোটা মরল, কোনোটা বখে গেল, কোনোটা স্মাগলার হল, মনের দুঃখে কোনোটা আবার আকণ্ঠ মদ গিলে কবিতা লিখতে বসল।

ঘটনাটা অনেকটা এরকম। অ্যাকোয়ারিয়ামে এক মাছ ছিল। সঙ্গী আরো তিন মাছের সঙ্গে সেখানে ছোট্ট জায়গা। ঘোরাঘুরির পরিসর নেই। উথালপাথাল জল নেই। যখন খুশি পর্যাপ্ত খাবার নেই। নির্দিষ্ট সময়ে খাবার মেলে। তা নিয়ে অনিশ্চয়তা নেই। নিয়ম করে জল পালটানো হয়। মোটর লাগিয়ে জলের মধ্যে বুদ্‌বুদ্ তোলা হয়। সেই অ্যাকোরিয়ামের মাছই কিনা একদিন গিয়ে পড়ল এক মহাসাগরে। সেখানে অথই জল। সেখানে হাজার, লাখো মাছ। সেখানে দম নেওয়ার জন্য অনেক অনেক হাওয়া, অনেক খাবার, সবাই নিজের মতো ঘুরছে, ফিরছে। বিপদের কাছে না গেলে কোনো বিপদ নেই। ছোটো মাছ সেই সমুদ্রে ঘুরতে ঘুরতে একদিন বিপদের কাছাকাছি হারিয়ে যায়। চারিদিকে এত পথ, সে পথ হারিয়ে ফেলে।

মস্কোয় যেন এমনটাই দেখেছিলাম। নির্দিষ্ট জায়গাটুকু চিনতে না পেরে কত ছেলেমেয়ে হারিয়ে গেল বিরাট, বিশাল ব্যাপ্তির কাছে। মস্কোয় আমি বুঝেছি, স্বাধীনতা উপভোগ করতে- কী কঠোর, কঠিন সংযমের কাছে পরাধীন থাকতে হয়।

ছাত্রদের হস্টেল, বিশ্ববিদ্যালয় চত্বর, ক্যান্টিন বলতে যে ধরনের উত্তপ্ত বাকবিতণ্ডা, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক রাজনীতি নিয়ে তর্কাতর্কির ছবি স্বাভাবিকভাবে মনে আসতে পারে, তা খুঁজতে গেলে মাথা ঠুকে মরতে হত লুমুম্বায়। শুধু দীর্ঘশ্বাস! সেখানে এর বিপরীতে ছিল কেবল ডলারের রেট নিয়ে মাথাব্যথা, ব্যবসার নতুন নতুন ফন্দিফিকির খুঁজে বের করা। আর হিসাবের খাতা লেখা।

লুমুম্বার একটা সাপ্তাহিক পত্রিকা ছিল। নাম 'দ্রুঝবা' (ফ্রেন্ডশিপ)। জার্নালিজম ডিপার্টমেন্টের কয়েকজন ছাত্রছাত্রীকে নিয়ে ছিল পত্রিকাটির সম্পাদকীয় বিভাগ। ইউনিভার্সিটিতে ঢোকার মুখে একটা টেবিলের উপর কাগজগুলো রাখা থাকত। পাশে একটা প্লেট। কাগজের দাম ছিল ৫ কোপেক, ওই প্লেটের উপর তা রাখতে হত।

ছাত্রছাত্রীরা যে খুব উৎসাহের সঙ্গে কাগজে লেখা দিত, এমন কথা বলা যায় না। ফোর্থ কোর্সের জার্নালিজমের ছাত্রছাত্রীকে 'প্রাকটিক্যাল' হিসেবে কমপক্ষে তিনটি নিবন্ধ লিখে জমা দিতে হত। যে কোনো কাগজেই লেখার অনুমতি ছিল। বিদেশি ছাত্রছাত্রীরা বেশিরভাগ 'দ্রুঝবা'-তেই লিখত। বছরে ওই একটা সময়েই ছাত্রছাত্রীরা প্রচণ্ড একটা তাগিদের বশে 'দ্রুঝবা'তে লিখত। বাকি সময়টাতে সোভিয়েত ছেলেমেয়েরাই লেখা দিত। বিদেশিদের লেখা থাকত অনুপাতে অনেক কম। তবে এ নিয়ে মাথা ঘামানোর মতো সময় অধিকাংশ বিদেশিরই ছিল না।

আসলে সৃষ্টিশীল কোনো কাজ করার মতো পরিবেশ আর ছিল না লুমুম্বা-চত্বরে। যদিও 'রিত্‌মি দ্রুঝবি (রিদম অফ ফ্রেন্ডশিপ) নামে একটি এনসাম্বেল ছিল। আমাদের ইউনিভার্সিটির নানাদেশের ছাত্রছাত্রীকে নিয়ে ছিল এই আন্তর্জাতিক 'এনসাম্বেল'। নানাদেশের

নাচগানের সঙ্গে রুশ লোকনৃত্য ও লোকসংগীত পরিবেশন করত এরা। তবে ইউনিভার্সিটি চত্বরের সার্বিক পরিবেশের পরিপ্রেক্ষিতে এই ধরনের সংগঠনের কার্যকলাপকে 'ব্যতিক্রমী' বলেই চিহ্নিত করতে হয়। অন্তত আটের দশকের শেষভাগে পৌঁছে তো বটেই। 'রিত্‌মি দ্রুঝবি'-র সংগঠিত 'রিদম্‌' লুমুম্বার ছাত্রসমষ্টিকে কোনোভাবে ছন্দোবদ্ধ করতে পারেনি। কোনো কিছু সৃষ্টির উন্মাদনা, যা কিনা সবদেশের, সব বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীর মধ্যেই কমবেশি চোখে পড়ে, লুমুম্বার পড়ুয়াদের মধ্যে তার কোনো চিহ্ন প্রায় ছিল না বললেই চলে।

লাতিন ছেলেমেয়েরা মাঝেমধ্যে হস্টেলের করিডরে অনেক রাত অবধি বসে গিটার বাজিয়ে গান করত। স্প্যানিশ গানের অচেনা সুর মাঝরাতে ছড়িয়ে পড়ত হস্টেলময়। ডলার-রুবলের জটিল হিসাবকে পাশ কাটিয়ে, সেই সুরের হাত ধরে, লুমুম্বার হস্টেলে যেন সত্যিকারের 'স্টুডেন্টস হস্টেল' হয়ে উঠত, ওই মুহূর্ত কটার জন্য।

কবিতাও অবশ্য লিখত কেউ কেউ। বিশেষত, বাঙালি ছাত্রছাত্রী যখন ছিল। অক্ষরজ্ঞান আছে অথচ জীবনে একটাও কবিতা লেখেনি, এমন বাঙালি নাকি খুঁজে বের করাই দায়। এ আমার কথা নয়, পন্ডিতেরা বলে থাকেন। তো, লুমুম্বার বাঙালিরাও কবিতা লিখত। বাংলার জন্য, বাড়ির জন্য মন-কেমন-করা ছাড়াও সেই কবিতা লেখার পেছনে একটা 'গূঢ় উদ্দেশ্য' কাজ করত।

খান তিন-চার কবিতা লিখে, কয়েক পেগ ভোদকা খেয়ে (মনের জোর বাড়ানোর জন্য) মেয়েদের হস্টেলে যেতে হবে। একটু রাত্তির হলেও ক্ষতি নেই। রাত একটা পর্যন্ত মেয়েদের হস্টেলের দরজা খোলা থাকে। তারপর বাঙালি মেয়েদের ঘরে যাওয়া দরকার। "কয়েকটা নতুন কবিতা লিখেছি, শুনবে?" মেয়েটিকে 'হ্যাঁ' বা 'না' বলার সুযোগ না দিয়ে গলা কাঁপিয়ে কাঁপিয়ে পড়ে যেতে হবে কবিতাগুলি।

নতুন কোনো ছাত্রী গেলে, তাকে 'ইমপ্রেস' করতে কবিতা লেখার ধুম পড়ে যেত। উপরে বর্ণিত 'হুক'টি বহু ব্যবহৃত, বহু বঙ্গসন্তান কর্তৃক। পরিকল্পনামাফিক এগিয়ে অনেকেই 'সাফল্যের' মুখ প্রায় দেখেই ফেলত!

নারীকে দেখে কবি প্রেরণা পাবেন, কবিতা লিখবেন। এ তো জল পড়া পাতা নড়ার মতোই সহজ, স্বাভাবিক ব্যাপার। কিন্তু লুমুম্বার বঙ্গসমাজে কবিতাকে ব্যবহার করা হত পণ্য হিসেবে।

'মেটিরিয়ালিস্ট' বলে সোভিয়েত মেয়েদের বদনাম ছিল। একটা জিন্‌স, একটা লিপস্টিক দিয়ে তাদের নাকি 'হাত করা' যেত। আর 'আইডিয়ালিস্ট' হিসেবে অধিকাংশ বাঙালি মেয়ে আত্মতুষ্টিতে ভোগে। এদের 'ম্যানেজ' করতে তাই জিনস বা লিপস্টিক নয়, তার বদলে ব্যবহৃত হত 'কবিতা'।

লুমুম্বার বাঙালি ছাত্রদের মধ্যে কবিতার এহেন ব্যবহারকে হয়তো অনেকেই স্বাভাবিক বলে ভাববেন, যদি না একটু খোলসা করে বলা হয়। কবিতা মারফত প্রেম নিবেদন বোধহয় কালিদাস আমাদের শিখিয়েছেন। সেই আমল থেকেই চলে আসছে হালফিলের জয় গোস্বামী পর্যন্ত। কবিতা এখানে যদি পণ্য, তো তার বিনিময়মূল্য প্রেম। লুমুম্বায়ও পণ্য,

তার কাঙ্ক্ষিত বিনিময়মূল্য শরীর।

শুধু কি কবিতা লেখা, দু-চার লাইন কবিতা আওড়ানো, গদ্যের বিরুদ্ধে জেহাদ, গদ্যসর্বস্বতাকে ছুঁড়ে ফেলা দরকার ইত্যাদি ইত্যাদি নানা ধরনের কথা শোনা যেত লুমুম্বায়। 'কবি'রা অকবিদের দিকে তির্যক দৃষ্টি হেনে তাচ্ছিল্যের হাসি হাসত। সমাজের রক্তমাংসে, হাড়মজ্জায়, গাঁটেগাঁটে কবিতা ঢুকিয়ে দেওয়ার অভিযান নাকি শুরু হয়ে গেছে, এমন বলত বজ্জাত 'কবি'রা। তবে বেছে বেছে শুধু মেয়েদের কাছে বলত। একদিন এক 'কবি' বলল, 'অন্য কোনো কাজ তো আর পারি না, তাই কবিতা লিখি।' তারপর সে গদগদ হয়ে ঘোষণা করল, "পাস্তেরনাক বাঙালি ছিলেন, না হলে অমন কবিতা লিখতে পারতেন না মাইরি।"

মস্কোতে যাওয়ার আগে শুনেছিলাম, কোনো বিদেশিকে সোভিয়েত নাগরিকত্ব দেওয়া হয় না। বিভিন্ন দেশ থেকে ছেলেমেয়েরা ওখানে পড়তে গিয়ে নানারকম ছুতোনাতায় একেবারে থেকে যেতে পারে না। যেমনটি পারে অন্য অনেক দেশে। বিদেশে ছেলেমেয়েকে পড়াশোনা করতে পাঠিয়ে অধিকাংশ মা-বাবার মনে চিন্তা ঢোকে—যদি ফিরে না আসে, চিরকাল যদি বাইরেই থেকে যায়! সোভিয়েত দেশে সে 'ভয়' ছিল না। পড়াশোনা শেষ করে সবাইকে ফিরে আসতেই হত। এখানে বসে অন্তত এমনটাই জানতাম। গিয়ে দেখলাম, অন্যরকম ব্যাপার। বেশ কিছু 'ছাত্র', ছাত্রাবস্থা কেটে যাওয়ার পরও দিব্যি মস্কোতে আছে। একেকজনকে দেখলাম, ১৪/১৫ বছর ধরে মস্কোর বাসিন্দা। চলনে-বলনে, আচার-আচরণে রুশিদেরই মতো।

মস্কোতে থেকে যাওয়ার কারণেই শুধু নয়, চামড়ার রংটা বাদ দিয়ে বাকি আর সবদিকে এদের 'প্রায়-রুশি' হয়ে ওঠার আরো একটা কারণ ছিল। প্রায় সকলেরই ছিল রুশি স্ত্রী। বিয়ের কিছুদিন পর মেম বউকে নিয়ে অনেকে দেশেও ফিরত। কিন্তু অধিকাংশ বউ মানিয়ে নিতে পারত না—নতুন পরিবেশ, নতুন আবহাওয়া, নতুন আত্মীয়পরিজন, নতুন নিয়মকানুন, নতুন দেশ, অচেনা সমাজব্যবস্থার সঙ্গে। স্বামীকে নিয়ে ফিরে যেত নিজের দেশে, নিজের শহরে।

অনেকক্ষেত্রে আবার মোহভঙ্গও হত। কাপুরদের আর মিঠুনের ছবি দেখে ওখানকার অনেকেই ভাবত, ভারতের সকলেই অমন থামওয়ালা প্রসাদে থাকে। একটা হাঁক দিলে দশজন খানসামা এসে হাজির হয়। যখন তখন গাড়িতে চেপে হুসহাস বেরিয়ে পড়লেই দোরগোড়ায় ডাল লেক, হিমালয় বা সবুজের ছড়াছড়ি। ধারণা হত, ভারতীয় মেয়েদের একমাত্র কাজ সেজেগুজে, গাছের ফাঁকে ফাঁকে দৌড়ে গান গাওয়া, কোমর দোলানো আর মাঝেমধ্যেই নায়কের কথায় ঠোঁট ফুলিয়ে অভিমান করা। তারই মধ্যে সময় করে দিনে চোদ্দোবার পোশাক পালটানো। ভারত মানে তারা বুঝত, রাজারাজড়ার দেশ। হাতিশালে হাতি, ঘোড়াশালে ঘোড়া, গ্যারেজ-ভরতি গাড়ি, ধনরত্ন, সুখ, সম্পদ আর বৈভব। মুম্বইয়ের ছবি দেখে ভারতকে জেনেছিল এক শ্রেণির রুশি মেয়ে। ভারত ছিল তাদের কাছে স্বপ্নের দেশ। রূপকথার দেশ।

মস্কোতে পড়তে যাওয়া ভারতীয় ছাত্রদের মধ্যে তারা খুঁজে পেত অনিল কাপুর,

মিঠুনকে। ছাত্ররাও এমন সুযোগ হাতছাড়া করত না। স্বপ্নের দেশের রাজপুত্র সেজে রাজ্যপাটের কহানি শোনাত।

দিল্লির কোনো এক বাদশাহি প্রাসাদের ছবি দেখিয়েছিল এক ভারতীয় ছাত্র। বলেছিল, তাদের বাড়ি ওটা। জলজ্যান্ত 'রাজপুত্র'-কে হাতের কাছে পেয়ে রুশি মেয়ে ব্যস্ত হয়ে আংটি বদল করে নিয়েছিল। কিন্তু হায়! শ্বশুরবাড়িতে এসে তো তার চক্ষু চড়কগাছ। কোথায় সেই সাতমহলা প্রাসাদ, আর কোথায়ই-বা সেই থরে থরে সাজানো ধনসম্পদ! এ হেন 'আঘাত' সইতে পারেনি সেই মেয়ে। এত বড়ো প্রবঞ্চনা! কোনোরকমে নিজের দেশে ফিরে সঙ্গে সঙ্গে সে ডিভোর্স করল ছেলেটিকে।

এই ধরনের ছোটোবড়ো প্রবঞ্চনার শাস্তিও হত রকমারি। অতি সাধারণ, নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবারের একমাত্র সন্তান। ওদেশে পড়তে গিয়েছিল। বছরখানেকের মধ্যেই বিয়ে করল নীলনয়না এক সুন্দরীকে। নানারঙের স্বপ্নও নিশ্চয় তাকে দেখিয়েছিল সেই ছেলে। বিয়ের পরে স্বামীর দেশে আসার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠল নীলনয়না। এল। পতিগৃহ দেখল। অতি ছা-পোষা শ্বশুর-শাশুড়িকে দেখল। হতশ্রী পরিবেশ, হতশ্রী বাড়ি, হতশ্রী লোকজন তাকে ক্ষিপ্ত করে তুলল। একমাত্র প্রবাসী সন্তানকে ঘিরে ভারতীয় মা-বাবার স্নেহাধিক্য নীলনয়নাকে আরো খেপিয়ে দিল।

সকাল থেকে বেরিয়ে রাশি রাশি জিনিস কিনল সে। ব্যাগ, স্যুটকেস উপচে পড়ল। এই একটা ব্যাপারই এদেশে সহ্য করা যায়। দোকানের ছড়াছড়ি। জিনিসেরও। স্বামীর কল্যাণে, পয়সারও। এসব ওদেশে রোজগার করা। নীলনয়নার দাবি তাই ২০০ শতাংশ। স্বামীকে নিয়ে এক সপ্তাহ পরেই দেশে ফিরে যাবে সে। এর মধ্যেই শাশুড়ির সঙ্গে হয়ে গেল একচোট। তারই সামনে তার বরের সঙ্গে, ওই অদ্ভুত পোশাক পরা মহিলা ('শাশুড়ি' বলে মেনে নিতে তার রুচিতে বাধে) অদ্ভুত ভাষায় কথা বলে যাচ্ছিল। একটা কথাও বুঝতে পারছিল না সে। শুনতে শুনতে আর ধৈর্য রইল না। এক ঝুড়ি আঙুর খাচ্ছিল সে। ঝুড়িসুদ্ধ ছুঁড়ে ফেলে দিল। ঘরময় ছিটিয়ে পড়ল আঙুরগুলো। 'বুড়ি' হকচকিয়ে গেল। বর ভয় পেয়ে গেল। নীলনয়না চিৎকার করে উঠল, "এই অসভ্যদের সঙ্গে আর এক মুহূর্ত থাকব না আমি!" বর একটু মিনমিন করে বলতে চেয়েছিল, "নি ক্তো নি পাস্তুপাল প্লোখা স্তাবোয়। তুত্ ফসিয়ে তিবিয়া লুব্যাত। তি ভিদিয়োশ সিবিয়া কাক তিবয়ে—" (কেউ তো তোমার সঙ্গে একটুও খারাপ ব্যবহার করেনি। সবাই মাথায় করে রেখেছে। তুমি যেভাবে চাইছ—)। আরেক চিৎকারে থামল সে।

দু-দিনের মধ্যে বরসমেত দেশে ফিরল নীলনয়না। শাস্তির ব্যবস্থাও করল। বরকে দিয়ে প্রতিজ্ঞা করিয়ে নিল, বাড়ির সঙ্গে, বাবা-মার সঙ্গে কোনো যোগাযোগ রাখবে না সে।

'ইমপোর্টেড বর'-এর মোহও একসময় কেটে যেত। অনেক প্রত্যাশা, অনেক স্বপ্ন অপূর্ণ রয়ে যেত। অতএব তড়িঘড়ি সিদ্ধান্ত—ডিভোর্স। এখন এই 'ইন্সট্যান্ট সোসাইটি'-তে ইন্সট্যান্ট কফিতে চুমুক দিতে দিতে ইন্সট্যান্ট বিয়ে, ইন্সট্যান্ট ডিভোর্স।

খানিক প্রেম, খানিক বিদেশে যাওয়ার লোভ মেশানো এই ধরনের 'মিশ্র বিয়ে'

সোভিয়েত সমাজে নতুন কিছু ছিল না। ছয়ের দশকের গোড়াতে, আমাদের ইউনিভার্সিটি প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর মস্কোতে বিদেশি ছাত্রের সংখ্যা বেড়ে যায়। এদের অনেকেই ওদেশে বিয়ে করে। ইউনিভার্সিটির প্রথম দিকের বিদেশি ছাত্র ও তার সোভিয়েত স্ত্রীর সন্তানরাও অনেকে লুমুম্বায় পড়তে আসত। লুমুম্বার এমন 'দ্বিতীয় প্রজন্মের' একজন ছিল আমিনাতা। কয়েক মাসের জন্য এন্দি আর আমার রুমমেট ছিল। আমিনাতার বাবা সিয়েরা লিওনের। মা ইউক্রেনের। আফ্রিকা ও ইউরোপের দুই দেশের দুই নাগরিকের সন্তান আমিনাতার চেহারায় দুই মহাদেশই নিজস্বতা নিয়ে হাজির ছিল।

আমার এক শিক্ষিকা ইসলান্দা ফ্রাঙ্কোভনার কথা আগেই বলেছি। তিনিও ছিলেন 'মিউল্যাট্টা'। ইসলান্দার বাবা ছিলেন আফ্রো-আমেরিকান, পল রবসনের শ্যালক। আর মা রুশি গোর্কি শহরের বাসিন্দা। পাঁচের দশকে ছোট্ট গোর্কি শহরে ইসলান্দার বাবাই ছিলেন একমাত্র নিগ্রো 'জামাতা'। সুতরাং একজন 'দ্রষ্টব্য বস্তু'। ইসলান্দার বাবার কথা আগেও বলেছি। এখানে প্রসঙ্গত আরেকবার উল্লেখ করলাম।

আমিনাতার বাবা ছিলেন ইউক্রেনের লভভের নিগ্রো জামাতা। ছয়ের দশকে তিনি যখন বিয়ে করেন, তখন এমন 'মিশ্র বিয়ের' সংখ্যা অগুনতি না হলেও নিতান্তই বিরল ছিল, এমন কথা বলা চলে না। তা সত্ত্বেও আমিনাতার মা যখন শ্বশুরবাড়ি থেকে নিজের দেশে যেতেন, তখন এক অদ্ভুত পরিস্থিতির সম্মুখীন হতেন। শুরু হত মস্কোর ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্ট থেকে। এয়ারপোর্টের সোভিয়েত কর্মীরা যেই দেখত, তাদের দেশের এই মেয়ে আফ্রিকার এক দেশের 'বধূ', অমনি তাদের মুখের চেহারা পালটে যেত। ভুরু কুঁচকে, বিরক্তির সঙ্গে, সেই মেয়ের যাতে চূড়ান্ত ভোগান্তি হয়, সে চেষ্টা করত তারা।

"মার্কিন সমাজে সাদা কালোয় ভেদাভেদ আছে, এটা সকলে জানে। সোভিয়েত সমাজেও যে ব্যাপারটা আছে তা স্বীকার করে না ওরা। ওদের এই ভণ্ডামিটাই সব থেকে অসহ্য লাগে আমার—" উগ্র স্বভাবের আমিনাতা একদিন চোয়াল শক্ত করে কথাগুলো বলেছিল। উদাহরণ হিসেবে নিজের মায়ের অভিজ্ঞতার কথা শুনিয়েছিল সে।

কথা প্রসঙ্গে আমিনাতা একদিন ওর বাবা-মায়ের জটিল সম্পর্কের কথাও বলেছিল। "মার ওপর ভীষণ অত্যাচার করত আমার বাবা। এমনকী, মারধোরও করত। আমরা তখন একেবারে ছোটো। ভাই আর আমি খাটের তলায় ঢুকে ভয়ে কাঁপতাম, কাঁদতাম। সব অত্যাচার মুখ বন্ধ করে সহ্য করতে হত আমার মাকে। নিজের দেশে ফিরে আসার কোনো রাস্তা ছিল না। আফ্রিকানকে বিয়ে করেছেন বলে সবাই হেয় চোখে দেখবে। তাছাড়া 'রঙিন বাচ্চা' দুটো নিয়েই-বা মা কী করে এই সমাজে টিকতে পারতেন?"

বিদেশি ছাত্রদের বিয়ে করে যেসব রুশি মেয়েরা দেশ ছাড়ত, তাদের কয়েকজনের কথা এখানে উল্লেখ করলাম। মাত্র এই সামান্য কয়েকজনই কি সোভিয়েত ইউনিয়নের যাবতীয় মেয়ে! এরকম প্রশ্ন আমার মনেও এসেছে। বিদেশিদের বিয়ে করে খুব সুখে আছে, এমন রুশি মেয়েকেও আমি চিনি। তবে লুমুম্বায় আমার অভিজ্ঞতা বলে, তাদের সংখ্যা একশোয় একেরও কম।

যাদের বৈবাহিক সম্পর্ক টিকে যেত তাদের অনেকেরই অবস্থা হত আমিনাতার মায়ের মতো।

আমিনাতার মায়ের বিয়ের পর সোভিয়েত ইউনিয়নের তিন প্রেসিডেন্ট পালটে চতুর্থ প্রেসিডেন্ট হিসেবে এলেন গর্বাচভ। পেরিস্ত্রোইকার নীতি ঘোষিত হল। সমাজের সব ক্ষেত্রেই তখন খোলা হাওয়া। তার ঝাপটা লাগল নারী-পুরুষের পারস্পরিক সম্পর্কের ক্ষেত্রেও।

সোভিয়েত বাজারে, বিদেশিদের জন্য, এক হাজার মার্কিন ডলারের বিনিময়ে ওদেশের মেয়েরা 'বউ' হিসেবে বিক্রি হতে লাগল। সেটা ৯০-৯১ সালের কথা। বিক্রির ব্যবস্থা হত আড়কাঠি মারফত।

যেসব বিদেশি ছাত্র চোরাচালানের সঙ্গে যুক্ত ছিল, তারা বারবার নিজেদের দেশে যেত। অনেকে মাসে একবার। জিনিসপত্র লেনদেনের জন্যই এই আসা-যাওয়া। প্লেনের টিকিটের দাম ছিল বেশ সস্তা। মস্কো-দিল্লি-মস্কো টিকিটের (টু অ্যান্ড ফ্রো) দাম ছিল ৬০০ রুবল। মার্কিনি হিসেবে মাত্র ২০ ডলার। ব্যবসাদার ছাত্রদের কাছে ট্রাম ভাড়ার সামিল! ভিসা পাওয়াও ছিল বেশ সহজ। কিছু ভারতীয় ছাত্র এত ঘন ঘন দেশে আসত যে মনে হত, বনগাঁ লোকালের ডেইলি প্যাসেঞ্জার।

৯০ সাল নাগাদ আন্তর্জাতিক ফ্লাইটের টিকিটের দাম হঠাৎ বেড়ে গেল। এক লাফে প্রায় ২০ গুণ। অনেক নতুন নিয়মকানুন হল। বিদেশিদের জন্য টিকিটের দাম একরকম, সোভিয়েত নাগরিকের জন্য আরেকরকম। আরো নিয়ম হল, বিদেশি ছাত্রছাত্রী নিজের দেশ ছাড়া অন্য কোনো দেশে যেতে চাইলে ডলারে টিকিটের দাম দিতে হবে।

এই অবস্থাতেও দমে গেল না ব্যবসাদার ছাত্ররা। নতুন এক 'পথ' আবিষ্কার করল তারা। সোভিয়েত ছেলেমেয়েকে মাল পাচারের কাজে লাগাল। সোভিয়েতরা টিকিটের দাম রুবলেই দিত। দামও ছিল অপেক্ষাকৃত কম। বিদেশ যাওয়া আর সহজে কিছু ডলার রোজগারের এমন সুযোগ হাতছাড়া করল না এক শ্রেণির ওদেশি ছেলেমেয়ে। ভিসা পাওয়া নিয়ে কিছুটা সমস্যা দেখা দিল। তারও একটা সোজা সমাধান বেরোল। সোভিয়েত মেয়েদের বিয়ে করলে স্বামীর দেশে যাওয়ার ভিসা তারা সহজেই পাবে। তাছাড়া ব্যবসার কাজে বিশ্বাসী লোক চাই। স্ত্রী স্বামীকে ঠকাবে না। পারিশ্রমিকও আলাদা করে দেওয়ার দরকার নেই। ব্যবসাদার ছাত্ররা তাই সোভিয়েত মেয়ে বিয়ে করার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠল। 'ডিম্যান্ড' বুঝে তড়িঘড়ি একটা ব্যবস্থা হয়ে গেল। আড়কাঠিরা সক্রিয় হয়ে উঠল। তাদের হাতে এক হাজার ডলার তুলে দিলেই হত। উপযুক্ত 'কনে' জোগাড়, 'কমিশন' বাবদ 'কনে'কে কিছু ডলার দেওয়া, বিয়ের বন্দোবস্ত করা—সব দায়িত্ব আড়কাঠির।

ছাত্রদের ব্যবসা চলতে লাগল পুরোদমে। সাহায্য করতে এগিয়েও এল ওদেশি মেয়েরা। দুপক্ষেরই মার্কিন ডলারের খুব প্রয়োজন। বন্দোবস্তও পাকা হল। মাঝখানে থাকল একটা বিয়ে-বিয়ে খেলা। খেলাই। খেলা ছাড়া আর কী?

আমাদের ইউনিভার্সিটির বার্ষিক উৎসবে রেক্টর একবার বলেছিলেন, "ছাত্রছাত্রী অনেক সময় অনেক ভুল করে। তাদের শোধরানোর জন্য কখনো উপদেশ, কখনো

একটা অপরাধের কোনো ক্ষমা নেই। তা হল, বর্ণবৈষম্যবাদী আচরণ। কোনো ছাত্র বা ছাত্রী যদি বর্ণবৈষম্যমূলক মন্তব্য বা কাজ করে তাকে সঙ্গে সঙ্গে ইউনিভার্সিটি থেকে বের করে দেওয়া হবে।"

রেক্টরের এই ঘোষণা যে আমাদের পিপল্‌স ফ্রেন্ডশিপ ইউনিভার্সিটির মূল নীতিরই পরিপূরক, তা প্রায় সকলেই জানত। তাও গাঢ় বাদামিদের সঙ্গে হালকা বাদামি, বার্নিশ করা কালো বনাম ছাইরঙা বা ফ্যাকাশে হলদে আর কফি-রঙাদের মধ্যে মাঝেমধ্যে গোষ্ঠীতন্ত্র মাথাচাড়া দিয়ে উঠত। টীকা-টিপ্পনী, ঠাট্টা বা 'জাত' তুলে গালাগাল দিয়ে কথা কাটাকাটি বা ঝগড়া হত কখনো। কখনো হাতাহাতিও হত। তবে এই ধরনের মতান্তর স্থায়ী কোনো চেহারা নিতে পারেনি আমাদের ইউনিভার্সিটি চত্বরে।

এবার ইউনিভার্সিটি চত্বরের বাইরে বেরোনো যাক। মস্কোর সাধারণ মানুষ কী চোখে দেখত বিদেশি ছাত্রছাত্রীকে? দক্ষিণ আফ্রিকার বর্ণবৈষম্যবাদী নীতির কঠোর সমালোচক সোভিয়েত ইউনিয়ন। মার্কিন দেশের কৃষ্ণকায় নাগরিক রডনি কিং-এর উপর সাদা চামড়ার পুলিশের অকথ্য নির্যাতনের তীব্র নিন্দাকারী সোভিয়েত ইউনিয়ন। সেই সোভিয়েত ইউনিয়নের সাধারণ লোকজন কেমন মনোভাব পোষণ করত? কালো চামড়ার লোকদের ঘেন্না করত তারা?

তানজানিয়ার এক ছেলে। লুমুম্বার ছাত্র। মেট্রো রেলে চেপে কোথায় যেন যাচ্ছিল। ট্রেনের কামরায় এক দিদিমার কাছে তার নাতি কী যেন এক বায়না ধরেছে। দিদিমা অনেক বুঝিয়েও নাতিকে শান্ত করতে পারছেন না। শেষে সামনে দাঁড়ানো তানজানিয়ার ছাত্রটির দিকে ইশারা করে নাতিকে ভয় দেখালেন, "এক্ষুণি চুপ না করলে ওই 'চোরনি দিয়াদিয়া' (কালো কাকা)-কে বলে দেব, তোমাকে খেয়ে ফেলবে একেবারে।" তানজানিয়ার ছেলেটি খুব ঠান্ডা গলায় বলল 'সরি বাবুশ্‌কা (দিদিমা), আমি মুসলমান, শুয়োর খাই না।"

তানজানিয়ার ওই ছেলে সেদিন মেট্রোতে প্রথম এ ধরনের মন্তব্য শোনেনি। সে বা তার মতো কালো চামড়ার আরো অনেকে মস্কোর পথেঘাটে প্রায়ই চামড়ার রং, চেহারা নিয়ে নানা কথা শুনত। পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় হঠাৎ কেউ বলে উঠত 'আবেজিয়ান' (বাঁদর) বা 'ওদের গায়ে কেমন জন্তুর মতো গন্ধ'। আফ্রিকান ছেলের সঙ্গে রুশি এক ভদ্রলোক (?) হ্যান্ডশেক করে, রুমাল দিয়ে হাতটা মুছে নিলেন। অ্যাটেনবরোর 'গান্ধি' ছবিতে নেহরু যেমন গান্ধির ছাগলকে খাইয়ে চট করে রুমাল দিয়ে হাত মুছেছিলেন, ঠিক সেই কায়দায়। আফ্রিকান ছেলেটি বলল, "ভালো করে মুছে নিন। হাতে আবার রং লেগে যায়নি তো?"

মস্কোর অনেক ট্যাক্সিচালককে গন্তব্য হিসেবে 'মিকলুখা মাকলায়া' (আমাদের ইউনিভার্সিটির সামনের রাস্তাটার নাম) বললে, তারা হেসে বলত, 'ও, জাপার্ক (চিড়িয়াখানা)!" রঙিন চামড়ার ছাত্রছাত্রীকে চিড়িয়াখানার বাসিন্দা বলে মনে হত তাদের।

শীতকালের এক সকাল। মস্কোতে তাপমাত্রা শূন্যেরও কুড়ি ডিগ্রি নিচে। আমার সহপাঠী, নাইজিরিয়ার ফিলিপ ট্যাকসি ধরার জন্য দাঁড়িয়ে আছে। বাড়ি যাওয়ার টিকিটের

জন্য এরোফ্লোতের আফসে যাবে সে। তাড়াতাড় যাওয়া দরকার, অথচ একটা ট্যাক্সিও থামছে না। মিনিট পনেরো হতে চলল। হাত-পা জমে যাচ্ছে। অগত্যা হস্টেলে ফিরে যাওয়ার কথা যখন ভাবতে শুরু করেছে ফিলিপ, তখনই একটা ট্যাক্সি গতি কমাল। 'যাক বাবা', বলে হন্তদন্ত পায়ে ফিলিপ এগিয়ে গেল। লালমুখো চালক জানলার কাচ নামিয়ে মুখ বাড়ালেন! ফিলিপ তার গন্তব্য জানানোর জন্য মুখ খোলার আগেই রুশি ট্যাক্সিচালক প্রশ্ন করলেন—'শীত করছে?' 'কুদা'-র (কোথায়) বদলে অদ্ভুত প্রশ্ন শুনে একটু অবাক গলায় ফিলিপ বলল, 'ভীষণ'। সোনা দিয়ে বাঁধানো হলুদ দাঁত বের করে বিশ্রীভাবে হেসে চালক মহোদয় বললেন, 'তোদের আরো শাস্তি হওয়া উচিত।' হতবাক ফিলিপকে মিকলুখা মাকলায়াতে দাঁড় করিয়ে খালি ট্যাক্সি হুশ করে পাশ দিয়ে বেরিয়ে গেল।

সিনেমা হলে এক দজ্জাল রুশি কিশোরী বসে। তাদের পাশের দুটো সিটে বসল দুই আফ্রিকান যুবক। টিকিটের সঙ্গে সিটের নম্বর মিলিয়েই। তারা বসামাত্রই সাদা কিশোরীরা উঠে দাঁড়াল। প্রায় ফাঁকা হলের পেছনদিকে গিয়ে বসল। যাওয়ার আগে দুই যুবকের দিকে তাকিয়ে 'চোরনিয়ে আবেজিয়ানি' (কালো বাঁদররা) বলে একে অন্যের গায়ে হেসে ঢলে পড়ল। অপমানিত দুই যুবক উঠে দাঁড়াল। মেয়েগুলির কাছে গেল। পকেট থেকে সবুজ মার্কিন ডলারের এক গোছা নোট বের করে দেখাল। বলল, 'এরকম আরো আছে। হস্টেলের ঘরের নম্বর চাইলে বলো, দিচ্ছি। রাত্রে এসো। ইচ্ছা করলে সবাই মিলেও আসতে পার। আমরা কালো হলেও আমাদের ডলারের রং কিন্তু সবুজ। এখন যদি না-ও আসো, দু-চার বছর পর থেকে তো আসতেই হবে। দেরি করে লাভ কী?"

অপমানের শোধ তুলতে ছেলে দুটি মিথ্যে কিছু বলেনি। ওরা আসত। ১৬-৪৮ বছরের অনেক সোভিয়েত নারী আসত। বিদেশি ছাত্রদের হস্টেলে। চামড়ার রঙের কারণে দিনের আলোয় রাস্তায় টীকা-টিপ্পনী দিয়ে, রাতের অন্ধকারে সেই 'কালো বাঁদর'দের কাছেই আসত তারা। নীল জিন্স, লাল-নীল-হলুদ মেকআপ আর সবুজ ডলারের মোহে।

আর তারপর? তারপর তারা ধর্ষিত হত। গণধর্ষিত হত। ভীষণভাবে অত্যাচারিত হত। একদল 'পড়তে আসা' ছাত্রের হাতে। এবং গোটা কাণ্ডটাই চলত স্টুডেন্টস হস্টেলের ঘরগুলোয়। প্রচুর মদ গিলিয়ে, সমস্ত জামাকাপড় কেড়ে নিয়ে, ওই মেয়েদের কাউকে জানলা দিয়ে ছুঁড়ে রাস্তার পাশে জমে থাকা বরফের স্তূপের উপর ফেলে দিত কোনো আফ্রিকান ছেলে। বিকৃত কাম চরিতার্থ করত। সব সাদার অবজ্ঞা, ফাঁপা অহমিকা, অবহেলা আর অন্যায় ব্যবহারের 'প্রতিকার' হত আরেক অন্যায়ের মাধ্যমে। সাদা চামড়ার নারীর লালসা, অর্থলোলুপতা, বিকৃতি তাকে নিয়ে আসত কালো চামড়ার ডলারওয়ালা ছাত্রের কাছে। তার মনুষ্যত্বের, তার নারীত্বের লাঞ্ছনা করে সেই কালো ছেলে অদ্ভুত এক 'স্যাডিস্টিক প্লেজার' খুঁজে পেত হয়তো।

লুমুম্বার হস্টেলগুলোতে যে নারকীয় কাণ্ডকারখানা চলত, তার সবটাই যে রাস্তাঘাটের অপমান, অবজ্ঞার জের, এমন ভাবলে ভুল হবে। শুধু আফ্রিকান ছেলেরাই কি সোভিয়েত

মেয়েদের ব্যবহার করত? শুধু তারাই সাদা চামড়ার নারীকে হাতের নাগালে পেয়ে পাশবিক হিংস্রতায় মেতে উঠত? বিকৃতির নজির সৃষ্টি করত?

ওখানকার হস্টেলে প্রত্যেক 'ফ্লোর'-এ একটা করে বড়োসড়ো রান্নাঘর ছিল। একদিন বেশ রাতে হইহট্টগোল শোনা গেল। ওই ফ্লোরের কয়েকটি ছেলে ঘর থেকে বেরিয়ে এল। রান্নাঘরের দিক থেকেই চেঁচামেচির আওয়াজটা আসছিল। ওরা গিয়ে দেখল, প্রায় ১৫টা ছেলে গোল হয়ে দাঁড়িয়ে। সবাই আরব। তাদের মাঝখানে এক রুশি মেয়ে। সম্পূর্ণ উলঙ্গ। পুরোপুরি মত্ত অবস্থায় বিশ্রী অঙ্গভঙ্গি করে নাচছে। ছেলেগুলো বীভৎস আনন্দে হাততালি মেরে চেঁচাচ্ছে।

এই আরব ছেলেদের অনেকেই সর্বক্ষণ 'তস্‌বি' হাতে ঘুরত। আল্লার নাম জপ করত। কেউ কেউ নামাজ পড়ত। রমজান মাসে রোজাও রাখত অনেকে। কিন্তু তাতে কী? তসবি জপলে যে মেয়েদের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি পালটাবে, এমন 'গ্যারান্টি' কে দিতে পারে। ধর্মের দোহাই দিয়ে গোলাম আজম যে সমস্ত কথা বলে বেড়ান চারিদিকে, তার মধ্যে ধর্মই থাকে, মহিলাদের প্রতি স্বাভাবিক মানুষসুলভ কোনো দৃষ্টিভঙ্গি থাকে কী? তাহলে আর ওই কয়েকটা আরব ছাত্র নিজেদের সচেতন, সংযমী বা 'মানুষ' করে ধরে রাখে কী করে? উলঙ্গ মেয়ের শরীর। ডলার-লোভী উলঙ্গ মেয়ের নাচ। তার কাছে তসবির জোর হারিয়ে যায়। ভেসে যায়।

আমার স্বদেশ ভারতও পিছিয়ে ছিল না। এবার আসি ভারতীয় বীরপুঙ্গবদের প্রসঙ্গে। লুমুম্বার ভারতীয় ছাত্ররা কোনো সোভিয়েত মেয়ের সমস্ত জামাকাপড় খুলে নিয়ে ঘর থেকে বের করে দিয়েছে বলে শুনিনি। তবে শুনেছি, বিয়ের মিথ্যে আশ্বাস দিয়ে সোভিয়েত মেয়েকে সেবাদাসীর মতো খাটিয়ে নিয়েছে কোনো এক ভারত সন্তান। রান্না করিয়েছে, বাসন পরিষ্কার করিয়েছে, কাপড় কাচিয়েছে, জৈব খিদে মিটিয়েছে। শুনেছি, নিজেদের 'গুড়ি গুড়ি ইমেজ'কে কাজে লাগিয়ে কীভাবে তারা স্বার্থসিদ্ধি করেছে। (ভারতীয়দের সম্পর্কে প্রায় সব প্রজন্মের সোভিয়েত নাগরিকের মনেই একটা দুর্বলতা কাজ করত। সে রাজকাপুর, কিপলিংয়ের মুগলি, রবীন্দ্রনাথ, মিঠুন, ইন্দিরা গান্ধি, এল সুব্রামনিয়ম—যার দৌলতেই হোক না কেন।)

ভারত সন্তানদের অনেকেই আবার স্বাধীনচেতা মেয়েদের পছন্দ করে না। মেয়েদের উপর লাঠি ঘোরাতে না পারলে তারা পুরুষ জন্মের সার্থকতা বুঝে উঠতে পারে না। সেই 'প্রতাপশালী'রা তুলনামূলকভাবে স্বাধীনচেতা, সচেতন, ব্যক্তিত্বসম্পন্ন সোভিয়েত মেয়েদের তুলনায়, 'পতি পরম গুরু'-মার্কা ভারতীয় কোমললতাদের বেশি পছন্দ করত।

ভারতীয় ছাত্রীরা স্টাইপেন্ডের রুবল নিয়ে নিজেরা সামাল দিতে পারে না। অতএব 'সাহায্যের হাত' বাড়াত কোনো দেশওয়ালি ভাই। 'প্রভু'র হাতে স্টাইপেন্ডের পুরোটা। এদিকে মাসের মাঝখানে তেনার আর দেখা নেই। অগত্যা অবলা ভারতনারী কী আর করবে? ইউনিভার্সিটির ক্যান্টিনে শুকনো মুখে বসে আছে সে। এক কোপেকও সঙ্গে নেই। দয়াপরবশ সহপাঠীরা দু-চার রুবল ধার দিল। খেতে পেল মেয়েটি।

ঘরোয়া, পরজীবী, পরনির্ভর ভারতীয় নারী! তারা কী করে স্বাধীনভাবে, নিজের মতো

করে বাঁচবে? লুমুম্বার ভারতীয় ছাত্রীরা বিদেশে পড়তে গিয়েছিল। কিন্তু তাতে কী? যাওয়ার সব বন্দোবস্ত করেছেন অভিভাবকরা। 'দাদা', 'মামা', 'কাকা'দের ধরাধরিও করেছেন তাঁরাই। সমস্ত ফর্মও পূরণ করেছেন তাঁরাই। মেয়ে শুধু 'ক্যান্ডিডেটস সিগনেচার'-এর জায়গায় কাঁপা কাঁপা হাতে সই করেছে। অবশেষে আত্মীয়পরিজনের এক বিশাল বাহিনী বিদেশগামী ক্রন্দসী কন্যাকে বিদায় জানাতে এসেছে বিমানবন্দরে। অভিভাবকরা কিছুতেই নিশ্চিন্ত হতে পারেন না। ওই প্লেনেই যাবে এমন কোনো যুবককে কাতর অনুরোধ, "এই যে আমার মেয়ে। একটু দেখো। দরকারে সাহায্য কোরো। কখনো আমাদের ছেড়ে থাকেনি তো!" সঁপে দিয়ে একটু স্বস্তি! সেই যুবকটি, যে ক্রন্দসীরই সমবয়সী, সেও এই প্রথম বাইরে যাচ্ছে। সে-ও ওখানে কাউকে চেনে না। তবু পুরুষ তো!

বাবা মাকে ছেড়ে অতদূরে যাওয়া, অচেনা-অজানা বিদেশ বিভূঁইয়ে, বাবা-মায়ের সেই মেয়ে স্বাধীনভাবে থাকবে? নিজের মতো করে বাঁচবে? স্বাধীনভাবে চিন্তা করতে পারবে? নিজের সিদ্ধান্ত নিজে নেবে? এ তো, 'অন্যায় আবদার'!

ভারতীয় ছাত্রীরা, ওদেশে পৌঁছেই, একজন অভিভাবকের (লোকাল গার্জেন, আরকী) অভাবে আকুল হয়ে উঠত। বেচারিদের 'উদ্ধার' করতে তৎপর দেশজ বীরের দল আশপাশেই থাকত। 'দায়িত্ব' নিত অসহায় রমণীকুলের। সরলা নারী। প্রথমেই স্টাইপেন্ডটা হাতে নিতে হবে। কীভাবে খরচ করতে হয়, শেখাতে হবে তো! সংসার ছাড়া বাঁচতে পারে না ভারতমাতারা। বিদেশে পড়াশোনা করতে গেলেও, জীবনের মূল সার্থকতা নিত্যনতুন রান্না করে, মা বোন ছেড়ে আসা 'ভাইয়া'দের চমকে দেওয়া—এ কথা ভুললে তো চলবে না।

আগেও, প্রতিটি ক্ষেত্রে যেমন বলেছি, এবারও বলব, ব্যতিক্রম অবশ্যই ছিল। লুমুম্বার সব ভারতীয় ছাত্রীই নিশ্চয় এরকম ছিল না। হাতে গোনা দু-জন বা তিনজন হলেও অন্য ধরনের মেয়েও ছিল। এখানে তাদের কথা বলছি না। বাকি ৯৮ শতাংশের কথাই বলছি। ছাত্রদের ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। সুস্থ, স্বাভাবিক, মানুষসুলভ আচরণকারী ভারতীয় ছাত্রও কয়েকজন ছিল আমাদের ইউনিভার্সিটিতে। তাদের আমি এই আলোচনার মধ্যে টেনে আনছি না।

যে কথা বলছিলাম। একদিকে, 'লোকাল গার্জেন' খুঁজে পেয়ে, তার হাতে নিজের সর্বস্ব সঁপে দিয়ে নিশ্চিন্ত আমাদের যুবতীরা। অন্যদিকে, দায়িত্বপ্রাপ্ত, অভিজ্ঞ (সর্বক্ষেত্রেই), চতুর আমাদের যুবকরা। দু-পক্ষই লুমুম্বার চত্বরে। দু-পক্ষই পড়াশোনা করবে বলে গিয়েছে। কেউ পার্টির বিশেষ কোটায়, কেউ স্কলারশিপ পেয়ে।

'ঘরোয়া' ওই ভারতীয় ছাত্রীরা দোকানে যেত। লম্বা লাইনে ঘন্টার পর ঘন্টা দাঁড়িয়ে, বহু কসরৎ করে চাল, মাংস, রুটি, তেল, ডিম কিনে আনত। ভারতীয় পদ্ধতিতে, বাড়ির মতো করে, রান্না করত। 'লোকাল গার্জেন'-রা সন্ধ্যাবেলা এসে সেই রান্না খাবার খেত। তাদের আবার রাত জেগে পরীক্ষার পড়া তৈরি করতে হবে। তখন ফের খিদে পেয়ে যাবে। তাই টিফিনবক্সে খাবার দিয়ে দিত মেয়েটি। রুমমেটের সামনে একা একা খেতে

সংকোচ হয়। তাকেও দিয়ে খেতে হবে। দুজনের জন্যই খাবার দিয়ে দিত মেয়েটি। বলাই বাহুল্য বাজার খরচ সব মেয়েটির। (পরিশ্রমের কথা আলাদা করে উল্লেখযোগ্য নয়। সে তো সেবাদাসী। সেবাতেই আনন্দ। তাই পরিশ্রম নয়, 'সেবা'।) স্টাইপেন্ডের রুবলে না কুলালে মেয়েটি বাড়িতে চিঠি লিখত। বিদেশে, অসহায় মেয়েকে, অভিভাবকরা তড়িঘড়ি ডলার পাঠানোর ব্যবস্থা করতেন।

ভারতীয় সেই ছেলে, সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েতের এক ইউনিভার্সিটির ক্লাসরুমে বসে, সোভিয়েত শিক্ষকের মুখে শুনত, "সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থাই হচ্ছে একমাত্র শাসনব্যবস্থা, যেখানে মানুষ কর্তৃক মানুষের শোষণ দণ্ডনীয় অপরাধ।" ক্লাস থেকে হস্টেলের অগোছালো ঘরে ফিরে সেই ছেলে বলত, ঘর পরিষ্কার করা, কাপড় কাচা, রান্না করা তো মেয়েদের কাজ।"

দেশের মেয়েদের 'পছন্দ' করার আরো একটা গুরুতর কারণ ছিল। রুশি মেয়েরা 'ফ্রি সেক্স-এ বিশ্বাসী। (আর ভারতীয়রা নাকি ঘোমটা বা বন্ধ দরজার আড়ালে।) রুশিদের সঙ্গো মাখামাখি তাই বেশ বিপজ্জনক। এইডস-এর ভয়। দেশের মেয়েরা সেদিক থেকে নিরাপদ।

কাজেই বিয়ে মারফত পাকাপাকি থাকাথাকিটা ভারতীয় মেয়েদের সঙ্গোই। সেটা 'লিভ টুগেদার' মারফতও হতে পারত। পাশাপাশি, মেডিকেল সায়েন্সের নিয়মমতো, সাবধানতা অবলম্বন করে, সোভিয়েত মেয়েদের সঙ্গো কখনো প্রেমের নামে, কখনো ডলার বা অন্যান্য উপহারের লোভ দেখিয়ে শরীরের সম্পর্ক করত বা ধর্ষণ করত।

সিনেমা হলে, থিয়েটারে, রাস্তাঘাটে বা রেস্তোরায় সে সময়, আমি বলছি ৮৮-৮৯-এর কথা, সোভিয়েত মেয়েরা একটা লেদার জ্যাকেট, একটা জিনস, একটা জামা, এক জোড়া জুতো আর সর্বোপরি মার্কিন ডলারের জন্য ওত পেতে থাকত ; কী করে বিদেশি ছাত্রদের ধরে ওসব আদায় করা যায়, সেই আশায়। অন্যান্য দেশের ছাত্রছাত্রীর মতো ভারতীয়রাও ব্যাপারটা বুঝে গেল। এরপর ইউনিভার্সিটি চত্বরে, ক্যান্টিনে মাঝেমধ্যেই ভারতীয় ছেলেদের আলোচনা শোনা যেত-

—সব সময় পকেটে কনডোম রাখতে হবে। কখন দরকার হয়!

—ডলার চাই। ডলার। রুশি মেয়েরা বসে আছে—

—জুনিয়র তোরা। তোদের সঙ্গো নিয়ে ঘুরতে হবে কদিন।

—দীক্ষা দেওয়া হবে তারপর।

—বিয়ে করছি না রুশি মেয়েকে।

—মাথা খারাপ ? ওজন্য দেশের মেয়ে।

—রুশি মেয়েগুলোর সঙ্গো কথা বলা যায় না।

—ভীষণ মাথা মোটা।

—শরীরটা ভালো।

—খাটতে পারে।

—সেবা করবে।

—ওহ্, ডলার চাই।

—জিনস। টি-শার্ট।

—মালাও চলে।

—ইস্, যদি এখানে আসার আগে এসব জানতাম তাহলে বেশি করে সঙ্গে নিয়ে আসতাম।

—আরে ডলার তো এনেছিস। তাহলে আর চিন্তা কীসের!

—যেমন চাস, তেমনই রেডি আছে।

ওদেশে দেখেছি, নাচটা ছিল একটা স্বাভাবিক সৌজন্যের প্রকাশ। যেমন, সম্ভাষণে ও বিদায়ে গালে চুমু খাওয়ার রেওয়াজ। ওখানে থাকতে থাকতে ভারতীয়রাও কায়দাগুলো শিখেছিল। ছোটোখাটো 'পার্টি' জন্মদিনের অনুষ্ঠান বা বিয়েতে স্থবির হয়ে বসে পরনিন্দা, পরচর্চা না করে নাচের ব্যবস্থা থাকত। নিমন্ত্রিতদের সকলের সঙ্গে সকলের আলাপ হওয়ার সুযোগ ঘটত। গান-সুর-নাচ-আনন্দ মেশানো অনুষ্ঠান প্রাণময় হয়ে উঠত।

বলিভিয়ার মেয়ে ইরিনা, আমার সহপাঠী ও বন্ধু, অবাক হয়ে প্রশ্ন করত, 'তোদের দেশে যে কোনো অনুষ্ঠানে সবাই মিলে নাচ করিস না? তাহলে পার্টিতে তোদের সময় কাটে কীভাবে? শুধু খাওয়াদাওয়া আর বসে বসে গল্প? আমরা লাতিনরা এমনটা চিন্তাও করতে পারি না।"

আমাদের বাংলায়, শহুরে জীবনধারায়, 'নাচ' মানে মঞ্চে এক বা একাধিক শিল্পীর নৃত্যানুষ্ঠান। পাঞ্জাবিরা ওদের বিয়ে উপলক্ষে রাস্তায় ভাংড়া নাচে। তাতে কখনোসখনো হয়তো ট্রাফিক জ্যাম হয়। তা হোক। তবুও ওই সময়টার জন্য নাচ একটা সর্বজনীন রূপ পায়। কিন্তু বাঙালিরা এক্ষেত্রে বড়ো 'গরিব'। আমাদের হতাশা-ভরা, ক্লান্ত দৈনন্দিন জীবনযাপনে নাচ অপরিহার্য নয়। পাড়ায় পাড়ায় শ-য়ে-শ-য়ে নাচের স্কুল গজিয়ে উঠেছে। কিশোরীরা দল বেঁধে নাচ শিখতে যাচ্ছে। কিন্তু সে নাচ তো কেবল হাত-পা ছোঁড়া। 'প্রাণে গান নাই'-এর মতোই 'প্রাণে নাচ নাই'। অধুনা শুনতে পাই সাহেবি কায়দায় আমাদের এই কলকাতায় বঙ্গসমাজের একাংশ কতিপয় অভিজাত ক্লাবঘরে সান্ধ্যবাসরে মৃদুমন্দ নাচানাচি করে থাকে। তবে তা এখনও খবর। খবরের কাগজে নিবন্ধাকারে প্রকাশিত হয়। হাজার হাজার মধ্যবিত্ত সংবাদপত্র পাঠক, পাঠিকা সেই ছবি দেখে নিবন্ধ পড়ে লোলুপ মনে দীর্ঘশ্বাস চাপে। কোমর বাঁকানো নারী-পুরুষের 'সৌভাগ্যে' ঈর্ষান্বিত হয়। এরা থাকা সত্ত্বেও স্পষ্টভাবে বলা চলে, বাঙালির সমাজজীবনে নাচ নেই। বলা চলে, ভারতের শহরে আমজনতার সমাজজীবনেও নাচ তেমন অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িয়ে নেই।

তবে এই ভারতীয়রা যখন ইউরোপ বা আমেরিকায় থাকে, তখন অন্য ব্যাপার। তারাও তখন নাচে।

মস্কোতে, আমাদের হস্টেলের ঘরে, কারোর জন্মদিন, নববর্ষ বা অন্য কোনো অনুষ্ঠান উপলক্ষে নানা দেশের ছেলেমেয়েরা জড়ো হত। খাওয়াদাওয়া, নাচগানের আয়োজন থাকত।

এরকমই এক 'পার্টি'তে নিমন্ত্রিত ছিল বেশ কয়েকজন রুশি মেয়ে। বাকিরা অধিকাংশই

[illegible] জায়গা। সেখানেই ছেলেমেয়েরা নাচছে। রুশি মেয়ে লেনাকে নাচে আমন্ত্রণ জানাল এক বিহার সন্তান। প্রায় পাঁচ জোড়া ছেলেমেয়ে নাচছে। নাচের মাঝখানে লেনা হঠাৎ ছিটকে বেরিয়ে গেল। আর ফিরল না। কেউ ব্যাপারটা বুঝে উঠতে পারল না।

যে ভারতীয় মেয়ের ঘরে 'পার্টি' ছিল, সে পরদিন গেল লেনার কাছে। জানতে চাইল, কী হয়েছে। কেন সে কাল ওভাবে চলে এল। লেনার মুখটা টকটকে লাল হয়ে গেল। বলল, 'তুই আমার বন্ধু বলেই কাল গিয়েছিলাম। কিন্তু তোদের দেশের ওই ছেলেটা ভীষণ বাজে। নাচতে নাচতে ও আমার সঙ্গে অসভ্যতা করছিল। আজেবাজে কথা বলছিল। এমনকী, ওর ঘরেও যেতে বলছিল। তখনই ওর গালে ঠাস করে একটা চড় বসাতে ইচ্ছা করছিল। কিন্তু পুরো অনুষ্ঠানটা ভেস্তে যাক, 'পার্টি'র মেজাজ নষ্ট হয়ে যাক, সেটা চাইনি। তোর কথা ভেবেই আমি কিছু না বলে চুপচাপ বেরিয়ে এসেছি।" অপমানে লেনার চোখে জল এসে গেল। আর দেশওয়ালি 'ভাই'য়ের কীর্তিকাহিনি শুনে লজ্জায় ভারতীয় সেই মেয়ে কোথায় মুখ লুকোবে, ভেবে পেল না।

সব রুশি মেয়েকেই ডলারের লোভ দেখিয়ে বিছানায় নিয়ে যাওয়া যেত না। এটাও সত্যি ছিল মস্কোয়। বেশ কিছু 'লেনা' বা তার মতো ছেলেমেয়ে আছে বলেই সবটা বেনো জলে ভেসে যেতে পারেনি।

ভারতীয় সেই মেয়ে সেদিন লেনাকে অনেক কথা বলতে পারেনি। বলতে পারেনি যে, ওই ছেলেটা আর তার মতো আরো অনেকে, তার দেশের ভিড় ট্রাম বাসে উঠে, মেয়েদের ঘাড়ের উপর কারণে-অকারণে হুমড়ি খেয়ে পড়ে। ভিড়ের সুযোগ নিয়ে অসভ্যতা করে। কোনো মেয়ে প্রতিবাদ করলে আবার সেই দুপেয়ে কৃমিগুলো উলটে চোখ রাঙিয়ে বলে, "অতই যদি, ট্যাক্সি করে যান। বাসে চেপেছেন কেন?" অর্থাৎ, ট্রামে বাসে যাচ্ছ, আবার মানসম্ভ্রম নিয়ে এত মাথাব্যথা! ভারতীয় সেই মেয়ে কথাগুলো লেনাকে বলতে পারেনি। কারণ, মস্কোতে ভিড় ট্রাম, বাস, মেট্রোতে সে চড়েছে। কোনোদিন কেউ ন্যাকা ন্যাকা মুখ করে গায়ের উপর ঢলে পড়েনি। কিছু বুঝি না, জানি না মুখ করে, মহিলাযাত্রীদের হেনস্থা করার চেষ্টা করেনি। প্রথমদিকে, মস্কোর ভিড় ট্রাম বাসে চেপে যেতে যেতে সব পুরুষ সহযাত্রীকে মানুষসুলভ আচরণ করতে দেখে সে অবাক হয়ে যেত। একথাও ভারতীয় মেয়েটি সেদিন লেনাকে বলতে পারেনি। সংকোচ আর লজ্জায় তার গলা বুজে আসছিল। অনেক কথাই সে বলতে পারেনি।

লেনাকে সে বলতে পারেনি, অনেক ভারতীয় পুরুষ মনেপ্রাণে বিশ্বাস করে, রাস্তাঘাটে অফিস কাছারিতে যেসব মেয়েদের দেখা যায়, সেইসব মেয়েদের একটু 'অন্য চোখে' দেখার অধিকার আছে তাদের। তারা তো 'পুরুষ'! এসব তো তাঁদের পৌরুষেরই অঙ্গ। যে মেয়েরা এর প্রতিবাদ করে, তাদের তাহলে বাড়ির বাইরে পা দেওয়াই উচিত নয়। এই 'পুরুষসিংহ' ও তাদের মনোবৃত্তির কথা সেই ভারতীয় মেয়ে জানত। তা-ও লেনাকে সে কথাগুলো বলতে পারেনি। এমনিতেই, নাচের আসরে সেই বিহার সন্তানের অদ্ভুত

খেয়েছে। তারপর আবার বাকি সব কথা শুনলে লেনা কী ভাববে ? ভারতের লোকজনকে খুব নীচ ভাববে সে। তা সহ্য করতে পারবে না ভারতীয় মেয়েটি।

সে জানে, গালাগাল দেওয়ার সময় আমরা প্রায় সকলেই গোটা জাত তুলে দিই। রুশিদের মধ্যে অনেক 'লেনা' থাকলেও এন্দি তাই বলেছিল, 'সব রুশি মেয়ে বেশ্যা।' আমরা বাঙালিরাও সদম্ভে সব পাঞ্জাবিকেই 'পাঁইয়া' বলে 'মাথা মোটা' আখ্যায় আখ্যায়িত করে নিজেদের বুদ্ধি বিবেচনার বড়াই করি। বিহারিদের 'খোট্টা' বলে তৃপ্ত হই। এসব বহু পুরোনো বিষয়। বহুদিন ধরেই চলে আসছে। এরকমই লেনারও মনে হবে, ভারতের সব পুরুষই বুঝি নীচ। সব পুরুষই নারীমাংস লোভী। সেটা সহ্য করা কষ্টকর। তাই সেদিন সেই ভারতীয় মেয়ে চুপ করে ছিল। লেনার কথার কোনো উত্তর না দিয়ে।

অপমানিত লেনা সেদিন 'পার্টি' থেকে বেরিয়ে গিয়েছিল। 'পার্টি' চলেছিল অনেক রাত পর্যন্ত । নাচের আসরের সব বিরক্তি, ক্ষোভ, অভদ্রতা কিন্তু সবসময় এত সহজে মিটে যেত না। অনেক সময় হাতাহাতি, মারামারি শুরু হয়ে যেত। 'পার্টনার' মেয়েটি নাচতে নাচতে অন্য যুবকের দিকে তাকিয়েছিল। ব্যস, শুরু হয়ে গেল 'ডুয়েলের' কায়দায় ঘুষোঘুষি। বা একজনের 'পার্টনার'কে আরেকজন ছিনিয়ে নিয়েছে। মারামারি। 'পার্টি' গেল ভেস্তে।

লুমুম্বায় কিছু 'চরিত্র' ছিল, যাদের কাজই ছিল, যে কোনো ছুতোয় মারপিট শুরু করে যে কোনো সমাবেশ বা অনুষ্ঠান ভন্ডুল করে দেওয়া। না ডাকলেও এরা হাজির হত। মস্কোর নিস্তরঙ্গ হস্টেল জীবনে আমরা বিদেশি ছাত্রছাত্রীরা (এখানে ব্যবসাদার ছাত্রদের কথা বলছি না, কারণ তাদের জীবনে ছোটোবড়ো বহু তরঙ্গ খেলত সর্বদা) উৎসব বা অনুষ্ঠানের জন্য মুখিয়ে থাকতাম। জন্মদিনে বা নববর্ষে কয়েকজন মিলেমিশে হইচই, খাওয়াদাওয়া করে, রোজকার থোড়-বড়ি-খাড়া, খাড়া-বড়ি-থোড় জীবনধারায় একটা বৈচিত্রের জন্য ব্যাকুল হতাম। দোকানে জিনিস নেই, ঠান্ডার চোটে নড়াচড়া করা দায়, রুমমেটের গম্ভীর মুখ—এ সমস্ত এড়িয়েও আমরা হস্টেলের অপরিসর ঘরেই ছোটোখাটো 'পার্টির' আয়োজন করতাম প্রায়ই। সেখানেও উটকোরা এসে জুটে যেত। ভরপেট খেয়েদেয়ে, নাচের অছিলায় নিজেদের বিকৃতি চরিতার্থ করার চেষ্টা করত। মেয়েদের আজেবাজে কথা বলত। অসভ্য আচরণ করত। 'পার্টি' ঠিকমতো জমে ওঠার আগেই মারামারি, বাসনকোসন ভাঙাভাঙি শুরু হয়ে যেত। দৈনন্দিন জীবনের নিশ্চিন্ত, বাঁধাধরা ছকে ফিরে যাওয়াই তখন শ্রেয় বলে মনে হত।

নাচের আসরে কোনো সদ্য পরিচিত মেয়েকে যেমন অনেক ছেলে সরাসরি ঘরে (বিছানায়) আমন্ত্রণ জানাত, তেমন উলটোটাও ঘটত। একদিনের ঘটনা। হোলি উপলক্ষে 'ইন্দিস্কোয়ে জিমলিয়াচেস্তভা'-র তরফ থেকে এক বড়োসড়ো 'পার্টি'র আয়োজন করা হয়েছে। আমাদের ইউনিভার্সিটির ইন্টারক্লাবে। ক্লাবের বিরাট হলঘরে নাচগান হচ্ছে। ভারতীয় ছাত্রছাত্রীর পাশাপাশি প্রচুর রুশি মেয়েও হাজির আছে সেখানে। হিন্দি গানের সুরে সকলে নাচছে। রুশি মেয়েদের সঙ্গে ভারতীয় ছেলেরা জোড়ায় জোড়ায়। নাচতে

দিয়ে দিল। নাচতে নাচতেই। তার হস্টেলের ঘরের চাবি। ঘরে আসার সরাসরি আমন্ত্রণ। ছেলেটা বিনীতভাবে 'স্পাস্বিবা' (ধন্যবাদ) বলে চাবিটি আবার তার মালকিনের হাতে ফেরত দিয়ে দিল। বিরল প্রজাতির প্যাঙ্গোলিনের মতো এরকম দু-চারজন ভারতীয় সন্তানও ছিল আমাদের লুমুম্বায়।

সেই ছেলেটি একদিন তার এই অভিজ্ঞতার কথা আমাদের শোনাচ্ছিল। আমাদের মধ্যে সাশাও ছিল। রুশি ছেলে সাশা। শুনে বলল, 'আহা, বেচারিকে ওইভাবে হতাশ করলি! কত আশা করে তোর হাতে চাবিটা গুঁজে দিয়েছিল! কোন ব্লকে কত নম্বর ঘরে থাকে আমায় বলিস তো। দরকার হতে পারে।'

সাশা তার নিজের দেশের ওই মেয়ের কাছে কখনো গিয়েছিল কিনা জানি না তবে অনেকেই যেত। ওই মেয়ের কাছে নয়। অন্য রুশি মেয়েদের কাছে। একা না। যেত বিদেশি বন্ধুদের সঙ্গে নিয়ে। যেমন, দিমা। আমাদের ইউনিভার্সিটিতেই পড়ত। মাঝেমধ্যেই এক বোতল ভোদকা আর বিদেশি কোনো বন্ধুকে সঙ্গে নিয়ে যেত মেয়েদের হস্টেলে। দুজনে মিলে ঢুকত রুশি মেয়েদের ঘরে। একার বোতল কেনার সামর্থ্য ছিল না বলে আরেকজনকে সঙ্গে নিতে দিমা বাধ্য হত, এমনটা ভাবা ভুল হবে। রুবলের অভাব নয়, সাহসের অভাবে সে সঙ্গে নিত কোনো বিদেশিকে। নিজের সাহস, বিদেশি বন্ধুর সাহস ও সঙ্গে নেওয়া বোতলের আগাম তেজ—সব একজোট করে তবেই দিমা পা বাড়াত স্বল্প পরিচিত কোনো রুশি মেয়ের ঘরের দিকে।

এখানে একটা কথা বলা দরকার। আমাদের দেশের মেয়েদের হস্টেলের সঙ্গে ওদেশের মেয়েদের হস্টেলগুলির অনেক ফারাক আছে। ওখানে, আমাদের ১১ নম্বর ব্লকে (লুমুম্বার মেয়েদের হস্টেল) রাত একটা পর্যন্ত গেট খোলা থাকত। ছেলেমেয়ে সকলেই ঢুকতে পারত। মাঝেমধ্যে নিয়মের কড়াকড়ি হলে দারোয়ানকে নিজেদের 'স্টুডেন্টস কার্ড' দেখাতে হত। ইউনিভার্সিটি কর্তৃপক্ষের নির্দেশ অনুযায়ী রাত একটা পর্যন্ত গেট খোলা থাকত ঠিকই, কিন্তু দারোয়ানের সঙ্গে 'ভালো' সম্পর্কের ভিত ছিল সেই সবুজ ডলার। শুধু যখন খুশি তখন ঢোকা নয়, অনেক ছেলে আমাদের ব্লকে থাকতও, পাকাপাকি ভাবে। হস্টেল সুপারকে ঘুষ দিলেই আর কোনো ঝামেলা হত না। ৯২ সালে ১০০ডলার ঘুষ দিলে ১১ নম্বর ব্লকে একদম 'সেপারেট' একটা ঘর পাওয়া যেত। পি এইচডি-র ছাত্রীদের জন্য 'টু-সিটেড' ওই ঘরগুলো ছিল বেশ আরামদায়ক। ১০০ ডলার সুপারের হাতে গছিয়ে অনেক মেয়ে সেই ঘরে হবু 'বর'কে নিয়ে জমিয়ে সংসার পাতত। যদিও বিবাহিত ছাত্রছাত্রীর জন্য লুমুম্বায় ফ্যামিলি হস্টেলের আলাদা ব্যবস্থা ছিল। কিন্তু ফ্যামিলি হস্টেলে থাকতে হলে বিয়ে করাটা জরুরি ছিল। ১১ নম্বর ব্লকে যা দরকার হত না। কড়কড়ে সবুজ মার্কিন ডলারই ছিল সেখানে শেষ কথা!

দিমা আর তার বিদেশি বন্ধু নির্বিঘ্নে মেয়েদের হস্টেলে যেত। কখনো-সখনো রাত্রে থেকেও যেত। প্রথম দিকে আমার ভারী অবাক লাগত। রুশি মেয়েরা বিদেশি ছাত্রদের ঘরে যায়। কী উদ্দেশ্যে যায়, তা-ও পরিষ্কার। কিন্তু কোনো রুশি ছাত্র বা রুশি দারোয়ান,

ব্যাপারটা তারা বোঝে, দেখে। একই ঘরে, একটা বিছানায় বিদেশি ছাত্র রুশি মেয়েকে নিয়ে আমোদ আহ্লাদ করছে আর অন্য বিছানায় রুশি রুমমেট ভোঁস ভোঁস করে ঘুমুচ্ছে, এমনও শুনেছি। একেকসময় মনে হত, হয়তো 'ব্যক্তিগত ব্যাপার' বলে কেউ কাউকে নিয়ে মাথা ঘামায় না। ডলারের দরকার, তাই রুশি মেয়ে বিদেশি ছাত্রদের কাছে এসেছে। এটা তার ব্যক্তিগত ব্যাপার। বিদেশি ছাত্রের নারীসঙ্গ প্রয়োজন। তাই সে রুশি মেয়েকে এক রাতের জন্য ডলার দিয়ে কিনেছে। এটা তার ব্যক্তিগত ব্যাপার। আবার রুশি ছেলেটির ঘুম পেয়েছে, তাই সে মন দিয়ে ঘুমুচ্ছে। এটাও তার ব্যক্তিগত বাপার। এন্দি অবশ্য জোর দিয়ে বলত, "রুশি পুরুষগুলো সব এরকম। একেবারে মেরুদণ্ডহীন। আর সেইজন্যই ওদের মেয়েদের এত সাহস। যা খুশি তাই করে।"

অনেক রুশি মেয়ের মুখেও এই ধরনের কথা শুনেছি। ওরা বলত, "শুধু বিদেশ যাওয়ার লোভে নয়, শুধু ধনসম্পদের লোভেও নয়। বিদেশি ছেলেদের স্বামী হিসেবে আমরা বেশি পছন্দ করি আরো একটা কারণে। আমাদের দেশের অধিকাংশ পুরুষই বড্ড মিনমিনে, একঘেয়ে আর নির্জীব। বিদেশিরা এরকম নয়।"

হয়তো এই একই কারণে বিদেশি ছাত্রীরাও রুশি ছেলেদের পছন্দ করত না। ওদেশে পড়তে যাওয়া বহু বিদেশি ছাত্র রুশি মেয়ে বিয়ে করে। কিন্তু বিদেশি ছাত্রী রুশি ছেলেকে বিয়ে করেছে, এমনটা খুব কম। হাতে গোনা কয়েকজন মাত্র। এর কারণ ছিল। বিদেশিদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা, কমসামোল তথা সি পি এস ইউ-এর প্রতি নিশ্ছিদ্র আনুগত্যে ফাটল ধরাতে পারে। এ আশঙ্কা সোভিয়েত সমাজে বহুদিন পর্যন্ত সত্য ছিল। কেজিবি-র সর্বশক্তিমান 'নজরদারি' কুঁকড়ে রেখেছিল একাধিক সোভিয়েত প্রজন্মকে। তা সত্ত্বেও বিদেশিদের সঙ্গে অতিরিক্ত মাখামাখি করলে জীবিকাস্থলে ওপরওয়ালা থেকে শুরু করে পাড়ার আঞ্চলিক কমিটি পর্যন্ত বিভিন্ন পর্যায়ে দফায় দফায় জবাবদিহি করতে হত। এই বজ্র-আঁটুনি থেকে সোভিয়েত মেয়েরা বেরিয়ে আসত, বিদেশি ছেলেদের হাত ধরে। দেশ ছেড়ে যাওয়ার তাগিদ তাদের সেই সাহস জোগাত।

রুশি ছেলেরা এতটা সাহস সঞ্চয় করতে পারত না। বিদেশি মেয়েকে বিয়ে করলেও তাদের 'মুক্তি' মিলত না অত সহজে। তাদের থেকে যেতে হত নিজের দেশেই। উপরন্তু গায়ে পড়ত বিশ্বাসঘাতকতার একটা ছাপ। পার্টির প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা। দেশের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা। একটা অনিশ্চিত ভবিষ্যতের আতঙ্ক তাদের সরিয়ে রাখত বিদেশি মেয়েদের কাছ থেকে। অধিকাংশ রুশি ছেলে, এমনকী আমার সহপাঠীদের মধ্যেও একটা অদ্ভুত জড়তা লক্ষ করেছি। ক্লাসের বিদেশি মেয়েদের সঙ্গে তারা স্বাভাবিকভাবে মিশত না। আটের দশকের শেষ ভাগেও।

রুশি মেয়েদের পরিপ্রেক্ষিতে রুশি ছেলেদের এই অকল্পনীয় আচরণ একটা প্রশ্ন সামনে হাজির করে। ছেলেরা কি সত্যিই কমসামোল তথা পার্টির প্রতি এতটাই অনুগত ছিল? তারা এতটাই কমিউনিস্ট আদর্শে নিজেদের গড়ে তুলেছিল যে, চারিদিকের এই ডামাডোল, নারীমাংস নিয়ে এই খেলা তাদের স্পর্শ করত না? বিষয়টা নিয়ে ভাবতে বসলে একটু

লুমুম্বার ছেলেদের হস্টেলগুলোয় বিদেশিরা যে বাইরে থেকে ডলার দিয়ে রুশি মেয়েদের নিয়ে আসত, বা ডলারের জন্য রুশি মেয়েরা যে তাদের ঘরে বিদেশি ছেলেদের নিয়ে যেত, তা পার্টির প্রতি 'অনুগত' রুশি ছেলেরা খুব ভালো ভাবেই জানত। কমিউনিস্ট জীবনদর্শন কীভাবে এই ঘটনাটাকে মেনে নিত, তা আমার অজানা। সে সময় লুমুম্বার হস্টেলগুলো প্রায় 'ব্রথেল' হয়ে উঠেছিল। হস্টেল থেকে ব্রথেলে এই রূপান্তর মস্কোবাসীর চোখের সামনে হয়েছে। এ নিয়ে রুশি কমসামোল সদস্য তথা লুমুম্বার জনাকয় ছাত্রের প্রতিক্রিয়া ছিল এরকম—আলেগ বলত, "কমসামোল সেক্রেটারি হয়েছি নিজের জন্য। প্রচুর সুযোগ সুবিধা তো পাওয়া যায়ই, তার সঙ্গো একধরনের নিরাপত্তারও গ্যারান্টি পাওয়া যায়। আমাদের মেয়েরা ক-জন বিদেশি ছাত্রের সঙ্গো কী করল, তা দেখার সময় নেই, ইচ্ছা নেই, আগ্রহও নেই।"

মধ্যে যে মার্কিন ডলার থেকে যাচ্ছে। মার্কিন ডলারে সোভিয়েত মেয়ের মাংস বিক্রি হবে? উত্তরে কমসামোলের আর এক হোমরাচোমরা সদস্য ভিক্তর বলেছিল, "দিনকাল পালটেছে। এখন ডলারের প্রয়োজন। ডলার তো লাগবেই। এখানে নীতি দেখালে চলবে না। মেয়েরা যেভাবে ডলার রোজগার করছে, তাতে দোষের কিছু নেই। রাষ্ট্র তাদের সব চাহিদা মেটাতে পারছে না। অগত্যা তারা নিজেরাই পথ খুঁজে নিয়েছে।".

ছেলেদের হস্টেলে ঈষৎ মত্ত অবস্থায় একদিন এক রুশি মেয়ে ঢুকেছিল। মেয়েটি ছিল মস্কো স্টেট ইউনিভার্সিটির ছাত্রী। তারই বন্ধু এক রুশ ছাত্রের খোঁজে এসেছিল সে। ব্লক নম্বরটা মনে রাখলেও বন্ধুর ঘরের নম্বরটা ভুলে গিয়েছিল সেই মেয়ে। গেট দিয়ে ঢোকার মুখে দারোয়ান জানতে চাইল, সে কত নম্বর ঘরে যেতে চায়। মেয়েটি বলতে পারল না। শুধু বলল, লুমুম্বারই আর এক ছাত্রের জন্মদিনের 'পার্টি'তে এসেছিল সে। মাঝপথে বেরিয়ে এসেছে। এই ব্লকে যে বন্ধু থাকে, তার সঙ্গো দেখা করতে চায়। মেয়েটি টলছিল। শুরু হল টিটকিরি। মুহূর্তে তাকে ঘিরে জড়ো হল জনা-পনেরো বিদেশি ছাত্র। কুৎসিত প্রস্তাব আর বিচ্ছিরি অঙ্গাভঙ্গি শুরু হল। রুশি দারোয়ানও তাতে অংশ নিল। (লুমুম্বার হস্টেলের অধিকাংশ দারোয়ান ছিল আমাদের ইউনিভার্সিটিরই ছাত্র এবং কমসামোল সদস্য। অবসর সময়ে দারোয়ানি করে তারা কিছু উপার্জন করত।)

ধারেকাছেই ছিল এক রুশি ছাত্র, যে একজন কমসামোল সদস্যও বটে। তারই সঙ্গো এক বিদেশি ছাত্রও ছিল। সেই বিদেশি ছেলেটি, 'ইয়ং কমিউনিস্ট' রুশি ছেলেটিকে অবাক হয়ে বলল, "কী রে, তোর সামনে এসব হচ্ছে। তুই কিছু বলবি না?" ইয়ং কমিউনিস্টের চটপট জবাব : "আমি কী বলব? 'কমসামোলেৎস' বলে কি সবই আমাকে দেখতে হবে!"

আসলে যে সুযোগসুবিধা বরাদ্দ ছিল তারই লোভে এ ধরনের রুশি ছেলেরা কমসামোলের সদস্যপদ নিত। এর মধ্যে আদর্শের কোনো জায়গা ছিল না। যেমন আমাদের এক শিক্ষক, তারাসভ বলেছিলেন, "সি পি এস ইউ-এর সদস্যপদ পাওয়ার সঙ্গো সঙ্গো অনেকগুলো বন্ধ দরজা মুখের সামনে পটাপট খুলে যায়। প্রচুর সুবিধে

কমসামোলের সদস্য হওয়া।"

বলা প্রয়োজন, তারাসভ মধ্যবয়সে সিপিএসইউ-এর সদস্য হয়েছিলেন। কারণ জিজ্ঞেস করাতে তিনি এই অভিমত ব্যক্ত করেছিলেন।

লুমুম্বা ইউনিভার্সিটির জন্মের পরে-পরেই আফ্রিকার একদল ছাত্র রেক্টরের কাছে আবেদন জানিয়েছিল, হস্টেলের ধারেকাছে একটা 'ব্রথেল' করে দেওয়া হোক। সেসময় এ নিয়ে বেশ তোলপাড় হয়েছিল। আমি ৮৭-তে পড়তে গিয়ে, আমাদের ইউনিভার্সিটির রুশ ভাষার এক শিক্ষিকার কাছে একথা শুনেছিলাম। ৯০-৯১-এ মনে হতে 'ব্রথেল'টা করে দিলেই বোধহয় ভালো হত। অন্তত হস্টেলগুলো বাঁচত।

যারা অন্যভাবে থাকার চেষ্টা করত, যেহেতু সকলেই ব্যবসা বা নারীমাংসের লোভে মস্কোয় যায়নি, পড়াশোনাও করতে গিয়েছিল কেউ কেউ, তারাও আক্রান্ত হত।

একদিনের কথা। ক্লাস থেকে ফিরছি। এন্দি আর আমি একসঙ্গেই। দুজনেরই ভীষণ খিদে পেয়েছে অথচ ঘরে কোনো খাবার নেই। দোকানে গিয়ে লাইনে দাঁড়িয়ে খাবার কেনারও শক্তি নেই কারোর। এসব ক্ষেত্রে আমরা সাধারণত 'তোতিয়া গালিয়া' (গালিনা আন্টি)-র বুফেতে যেতাম। বিশালদেহী 'তোতিয়া' ৯ নম্বরে ব্লকের বুফেতে সসেজ, পাঁউরুটি ইত্যাদি বিক্রি করত। সে বুফেও ক-দিন থেকে বন্ধ। সারাইয়ের কাজ চলছে ভেতরে। অগত্যা ভাবনাচিন্তা করে এন্দিকে বললাম, চল, ৭ নম্বরে যাই। ওই ব্লকেও একটা বুফে আছে। শুনেই এন্দি খিঁচিয়ে উঠল, "৭ নম্বর ব্লক? মানে ছেলেদের হস্টেল? তুই তে জানিস, আমি ওদিকে যাই না। তার উপর আবার সন্ধ্যা হয়ে আসছে। জিজ্ঞেস করলাম, ৯ নম্বরেও তো এখন ছেলেরা থাকে। ওখানে যাস কী করে? বিরক্ত হয়ে এন্দি বলল, "৯ নম্বরের কথা আলাদা। এখন ওখানে ছেলেরা থাকে ঠিকই, কিন্তু আগে তো ওটা আমাদের ব্লক ছিল। প্রায় দেড় বছর ওখানে থেকেছি।" এই তো একপায়ের রাস্তা। দুজনে একসঙ্গে গেলে কী আর হবে! অনেক বুঝিয়ে-সুঝিয়ে এন্দিকে শেষে রাজি করালাম। অন্য সময় হলে ও কিছুতেই যেত না। নেহাত খিদের চোটে এন্দি সেদিন আমার সঙ্গে গেল ছেলেদের হস্টেলের বুফেতে।

খেয়েদেয়ে ফিরছি ১১ নম্বর ব্লকে। দুপাশে ছাইরঙা, পাঁচতলা হস্টেলের সারি। ৮ নম্বরের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় উপর থেকে কে যেন শিস দিল। এন্দি চাপা গলায় বলল, "একদম তাকাস না।" শিসের তীব্রতা বেড়ে চলেছে। আমরা বড়ো-বড়ো পা ফেলে এগোচ্ছি। হঠাৎ দুম করে একটা শব্দ। ঠিক আমাদের সামনে একটা বোতল পড়ল। শ্যাম্পেনের খালি বোতল। পড়ার সঙ্গে সঙ্গে চুরমার হয়ে ভেঙে গেল। উপর থেকে হো হো হাসির শব্দ। এবার উপরদিকে তাকাতেই হল। পাঁচতলার খোলা জানলায় মুখ বাড়িয়ে দাঁড়িয়ে আছে দুটো আফ্রিকান ছেলে। তাদের এতক্ষণের চেষ্টা সফল হয়েছে। তারা চাইছিল, যাতে আমরা উপর দিকে তাকাই। তাই শিস। কাজ না হওয়ায় খালি বোতল। একটু এদিক-ওদিক হলে ওই বোতলটা এন্দি বা আমার মাথার উপর পড়ত। উপরদিকে তাকিয়ে একথা বলব ভাবছি, ছেলেদুটো বিশ্রী অঙ্গভঙ্গি করে এন্দি আর

আমাকে হাতছানি দিয়ে ডাকল। কিছু বলা হল না। রাগে কান্না পেয়ে গেল। ভাঙা বোতলের পাশ দিয়ে এন্দি আর আমি এগোলাম নিজেদের ব্লকের দিকে।

আর একদিন। সেদিন আমার সঙ্গী ছিল অ্যানা। করাচির মেয়ে অ্যানা। ভীষণ প্রাণবন্ত আর ছটফটে। অন্তত শখানেক 'জোক্‌স্‌' সবসময় ওর মুখে মুখে ঘুরত। আমরা সমবয়সি হলেও ইউনিভার্সিটির কোর্সের হিসেবে অ্যানা দু-বছরের 'সিনিয়র' ছিল। তবে এজন্য আমাদের বন্ধুত্বে কোনো অসুবিধা হয়নি। সেদিন আমরা দু-জনে সিনেমায় গিয়েছিলাম। শীতকাল। হস্টেল থেকে সাড়ে চারটে নাগাদ যখন বেরোলাম তখনই বাইরেটা অন্ধকার।

ছবি শেষ হতে সাড়ে সাতটা বাজল। বাইরে ঝিরঝির করে বরফ পড়ছে। হস্টেল থেকে হলটা বেশি দূরে নয়। বাসে করে খানিক গিয়ে তারপর মেট্রোতে মোটে একটা স্টেশন। ফেরার পথে আমাদের স্টেশন 'ইয়ুগো-জাপাদনায়া' থেকে বেরিয়ে বাসস্টপে এসে দাঁড়ালাম। ওখান থেকে আমাদের ব্লক, বাসে চারটে স্টপেজ। বেশ খানিকক্ষণ বাসের জন্য অপেক্ষা করছি আমরা। রাস্তাটা প্রায় ফাঁকা। আবহাওয়া সুবিধের নয়, তাছাড়া রাতও হয়েছে।

এতক্ষণ বাস স্টপের শেডের নিচে শুধু অ্যানা আর আমি দাঁড়িয়েছিলাম। দুজনে মন দিয়ে বকবক করলেও গাটা একটু ছমছম করছিল। হঠাৎ দেখলাম মেট্রো স্টেশন থেকে বেরিয়ে একটি ছেলে বাসস্টপে এসে দাঁড়াল। আফ্রিকান। আমাদের ইউনিভার্সিটিরই হবে হয়তো। একটু যেন স্বস্তি পেলাম। মিনিট পনেরো হতে চলল, বাসের আর দেখা নেই। কারণটা কী হতে পারে তা নিয়ে যখন জল্পনা-কল্পনা করছি, ছেলেটি হঠাৎ আমাদের গা ঘেঁষে দাঁড়াল। চাপা গলায় বলল, 'স্কোলকা' (কত) ? ভীষণ ঘাবড়ে গেলাম। অন্ধকার আর তুষারপাতের মিশ্রণে চারপাশটা বড়ো ঘোলাটে হয়ে আছে। অ্যানাও প্রথমে খুব হকচকিয়ে গিয়ে তাড়াতাড়ি সামাল দিল। ছেলেটিকে স্পষ্টভাবে জিজ্ঞেস করল, 'আমাদের কিছু বলছ ?' একটু যেন থমকে গেল ছেলেটি। খেয়াল করে আমাদের দেখার চেষ্টা করল (সেই সামান্য আলোয় যতটুকু সম্ভব)। অপ্রস্তুত গলায় প্রশ্ন করল, "লুমুম্বা ?" আমরা দুজনেই একসঙ্গে বলে উঠলাম, "দা, ই তি ?" (হ্যাঁ, আর তুমি ?) আমাদের প্রশ্নের কোনো জবাব না দিয়ে সে 'এক্সকুজে মোয়া, এক্সকুজে মোয়া' (এক্সকিউজ মি) বলতে বলতে উলটো মুখে হাঁটা লাগাল। লম্বা লম্বা পা ফেলে আবার ঢুকে গেল মেট্রো স্টেশনে।

মুহূর্তে আমার কাছে মস্কো আর কলকাতা এক হয়ে গেল, অ্যানার কাছে করাচি। এরকম সময়ই মনে হয় পৃথিবীটা বড্ড সংকীর্ণ, ছোট্ট। আর সবদেশেই একই রকমের বেশ কিছু পুরুষ আছে। সন্ধ্যাবেলা, রাত্রিবেলা কোনো মেয়ে, একজন হোক বা দু-জন, বাসস্ট্যান্ডে দাঁড়ালে, রাস্তায় দাঁড়ালে, ওই একই রকমের পুরষরা জিভ দিয়ে ঠোঁট চাটতে শুরু করে। তাদের শরীরের যাবতীয় গ্রন্থি সক্রিয় হয়ে ওঠে। মনে হয় এরা সবাই যেন পাভলভের সেই কুকর। সবই প্রতিবর্ত ক্রিয়া। বিজ্ঞান, বিজ্ঞান হে! বাপ ঠাকুরদার আমল থেকে চলে আসা অভ্যেস, শরীরে মনে একেবারে গেঁথে বসেছে। তাতে কলকাতা মস্কোয় ফারাক নেই।

৯১ সালের এই ঘটনার পর অ্যানা, বা আমি পারতপক্ষে আর কখনো সন্ধ্যার পর বেরোতাম না। অথচ মস্কো আগাগোড়া এমনটা ছিল না। ৮৫-তে অ্যানা যখন প্রথম মস্কো গিয়েছিল, তখন রাত একটা পর্যন্ত নিশ্চিন্তে ওখানকার রাস্তাঘাটে ঘোরা যেত। দু-বছর পরে আমি গিয়েও এমনটা দেখেছি। তখনও লুমুম্বার অনেক বিদেশি ছাত্রছাত্রীকে বলতে শুনেছি, পৃথিবীর বেশ কয়েকটি নিরাপদ শহরের মধ্যে অন্যতম মস্কো।

তারপর কয়েক বছরের মধ্যে মস্কো গেল পালটে। চারিদিকে তখন সবুজ মার্কিন ডলার মোহজাল বিস্তার করেছে। সেই জালে জড়িয়ে পড়ল মস্কোর সমাজতন্ত্র। এর প্রত্যক্ষ প্রভাব পড়ল লুমুম্বার হস্টেলের ঘরে ঘরে। তবে ৬টা বছর যেহেতু একটা দেশ বা একটা শহর বা একটা ভাঙন বোঝার পক্ষে খুবই সামান্য, তাই আমার মধ্যে কতকগুলো সন্দেহ আজও বড়ো-বড়ো প্রশ্নচিহ্ন নিয়ে রয়ে গেছে। মস্কো ভাঙল বলেই কি আমাদের ইউনিভার্সিটির হস্টেলের ঘরগুলো কুৎসিত নরকে পরিণত হল? না কি, মস্কো ভাঙার পেছনে অনেক অনেক কারণের মধ্যে আমাদের ইউনিভার্সিটির হস্টেলের ঘরগুলো, বিদেশি ছাত্রছাত্রী আর তাদের আগ্রাসী লোভও 'সেতুবন্ধে কাঠবিড়ালির ভূমিকা' পালন করেছে! এই জটিল পরিপূরক বিষয়টি আলাদা করে গবেষণার দাবি করে।

'ইন্টারদেবোচ্‌কা' নামে একটি ছবি দেখেছিলাম মস্কোতে। সেটা ৯১ সাল। 'ইন্টারদেবোচ্‌কা' শব্দটা আধা-ইংরেজি, আধা-রুশি। 'ইন্টারন্যাশনাল'-এর 'ইন্টার'। আর রুশি শব্দ 'দেবোচ্‌কা' মানে মেয়ে। দুটো মিলিয়ে অর্থ দাঁড়াচ্ছে 'আন্তর্জাতিক মেয়ে'। শব্দটা এল কীভাবে, তার পেছনেও কিছু ঘটনা আছে। সেই ঘটনাগুলোই এই ছবিটির কাহিনি এবং আমার দেখা ও শোনা কিছু সত্যি, যা আমি ইতিমধ্যেই আপনাদের জানিয়েছি।

'ইনট্যুরিস্ট' নামে সোভিয়েত দেশের সর্বত্রই ছড়িয়েছিল বেশ কিছু হোটেল। সব বড়ো শহরে একটি করে এই হোটেল মিলবে। সবই সরকারি এবং তারকাখচিত। মস্কোর সেন্ট্রাল টেলিগ্রাফ অফিসের পাশে ছিল এমনই একটি বহুতল 'ইনট্যুরিস্ট' হোটেল। হোটেলগুলিতে বিদেশিদের সংখ্যাই থাকত বেশি।

মস্কোর টেলিগ্রাফ অফিসের পাশে, ইনট্যুরিস্টের সামনে দেখা যেত ডলারলোভী একদল সোভিয়েত মেয়েকে। শীতকালেও হাড় কাঁপানো ঠান্ডায় তারা অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত পোশাকে শরীর ঢেকে হোটেলের সামনে ঘোরাঘুরি করত শিকার ধরার অপেক্ষায়। আমাদের পশ্চিমবঙ্গের গ্রামের যাত্রার মহিলা চরিত্রদেরও লজ্জা পাইয়ে দেবে, এমন চড়া মেকআপ করত তারা। চোখে থাকতে একটা অদ্ভুত ইঙ্গিত—ডলার দাও, শরীর নাও।

'ইন্টারদেবোচ্‌কা'-তে এমনই এক মেয়ের গল্প ছিল। ইরা নামের সেই মেয়ে ছিল একজন নার্স। এছাড়া তার আরো একটা পরিচয় ছিল। সেই পরিচয়ের কথা কেউ জানত না। নাইট ডিউটির নাম করে সে হোটেলে গিয়ে বিদেশিদের সঙ্গে রাত কাটাত। ডলারের বিনিময়ে নিজের শরীর বিক্রি করত সে। রাতের ঝলমলে পোশাক খুলে সাদামাটা সাজে বাড়ি ফিরত। তাদের মা আর মেয়ের ছা-পোষা সংসারে কোনো ছন্দপতন ঘটত না।

দিনে রোগীর সেবা আর রাতে 'ক্লায়েন্ট'দের মনোরঞ্জন—এইভাবেই বেশ কেটে যাচ্ছিল ইরার। ইরার মতো আরো অনেক রুশি মেয়েরও। ইরার দামি ফারের কোট দেখে

তার এক সহকর্মী প্রলুব্ধ হল। একদিন তাকেও সঙ্গে নিয়ে গেল ইরা। গোছা গোছা ডলার রোজগারের 'সহজ' রাস্তা শিখিয়ে দিল তাকে। অনেক ইরা, অনেক লেনা, অনেক আন্না, অনেক গালিয়া তখন চাকুরিস্থলে সাধারণ চাকুরে, বাড়িতে মেয়ে, মা বা স্ত্রী আর হোটেলে লাস্যময়ী, ডলারওয়ালা বিদেশির শয্যাসঙ্গিনী, 'ইন্টারদেবোচ্‌কা'।

'ইন্টারদেবোচ্‌কা' ইরাকে মাঝেমধ্যেই পুলিশ ধরে নিয়ে যেত, নিয়মমাফিক, আরো অনেক মেয়ের সঙ্গে। মেকআপ ছাপিয়ে রাত জাগার ক্লান্তি আর উচ্ছৃঙ্খল জীবনযাপনের চিহ্ন তাদের চোখেমুখে। রগরগে ঠাট্টা, একটু-আধটু হুমকি এবং অবশেষে 'তোলা' আদায়ের পর এই মেয়েরা থানা থেকে ছাড়া পেত। তারপর সেদিন সন্ধ্যাতে আবার তারা এসে দাঁড়াত হোটেলের সামনে।

তবে ইরার গল্প অন্যদের থেকে আলাদা। তাই সে কাহিনির মূল চরিত্র। এক সুইডিশ নাগরিক তাকে বিয়ের প্রস্তাব দিল। দুজনের আলাপ হয়েছিল হোটেলের ঘরে। ইরার মা তা জানলেন না। তিনি শুধু 'পাত্র'কে দেখলেন। মেয়ের সৌভাগ্যে খুশি হলেন।

সবাই কিন্তু খুশি হল না। পলিক্লিনিকে, যেখানে ইরা চাকরি করত, ভর্ৎসিত হল সে। ওপরওয়ালা কিছুতেই বুঝে উঠতে পারলেন না, একজন দায়িত্বশীল সোভিয়েত নাগরিক হয়েও বিদেশিকে বিয়ে করার সিদ্ধান্ত কী করে নিল সে!

বিয়ে করে বরের সঙ্গে সুইডেনে চলে যাবে ইরা। কাগজপত্র সব ঠিক করতে হবে। প্রতিটি জায়গায় জেরা, জবাবদিহি। বিদেশ যাওয়ার আবেদনপত্রে বাবার সই দরকার। ইরা বলে, তার মায়ের সঙ্গে বাবার কোনো সম্পর্ক নেই। বহুদিন আগে ছাড়াছাড়ি হয়ে গেছে। মা-ই তার সব। এ কথাতেও কোনো কাজ হয় না। জন্মদাতা জীবিত থাকলে তার সই চাই-ই। সে আর 'বাবা' থাকুক বা না-থাকুক। ইরা অনেক খুঁজেপেতে বের করল তার জন্মদাতার ঠিকানা। নতুন সংসারের ঠিকানা।

ছোট্ট যে শিশুকে ফেলে বেরিয়ে এসেছিল 'বাবা', ২০-২১ বছর পর সামনে এসে দাঁড়াল সেই মেয়ে। সে এখন পূর্ণ যুবতী। বিয়ে করে স্বামীর সঙ্গে বিদেশে পাকাপাকিভাবে চলে যাবে বলে জন্মদাতার একটি সইপ্রার্থী সে। সংসারের জাঁতাকলে ল্যাজেগোবরে অভাবী সেই 'বাবা' সই দিতে রাজি হল বটে, তবে ডলারের বিনিময়ে। "বিদেশি স্বামী হবে, বিদেশে যাবি, থাকবি। তোর আর চিন্তা কিসের? আমার খুব প্রয়োজন। ডলার না দিলে সই করতে তো পারব না," নির্দ্বিধায় ইরাকে বলল তার জন্মদাতা। বলতে গিয়ে তার গলা একটুও কাঁপল না। অর্থের বিনিময়ে ইরা তার জন্মদাতার সই কিনল। যে অর্থ সে নিজের শরীর বিক্রি করে রোজগার করেছে। সইটা তার দরকার। এই কেনাবেচা, এই শরীর-শরীর খেলা থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য। জীবনে একটু স্থিতির জন্য।

ইরার বিয়ে হল। স্টকহলমে গেল সে। বড়োলোক বরের দৌলতে বিলাসবহুল জীবনের স্বাদও পেল। তা সত্ত্বেও মস্কোর জন্য, মায়ের জন্য, বাড়ির জন্য তার বড়ো অস্থির লাগত। তার এই অস্থিরতার কথা ছবির অনেকটা জুড়ে। ডলার, পাউন্ড, মার্ক, ফ্রাঙ্ক, ক্রোনা, দিনারের ছড়াছড়ি মানুষের জীবনের সব অভাব মেটাতে পারে না, তা বোঝাতেই হয়তো। জীবনের ঠিক কোন বিন্দুতে আমি অবস্থান করছি, এই ভাবনা

বোধহয় সব মানুষকেই কোনো না কোনো সময় ঘিরে ধরে।

রুশি মেয়ের ওই দল। বাড়িতে ওরা ইরা, লেনা, আন্না, জোয়া, গালিয়া, লারিসা, মারিয়া। মা, বোন, স্ত্রী, প্রেমিকা, চেনা প্রতিবেশী। আর হোটেলে, 'বার'-এ, রেস্তোরাঁয় ওরা মোহিনী, ওরা মদের 'চাট', ওরা আনন্দদায়িনী, ওরা পণ্য। বাড়ি আর হোটেলের মাঝখানের রাস্তাটায়, এই গিরগিটির খেলায়, কখনো কী কোনো বাধা হাজির হত না? কোনো প্রতিবন্ধকতা মুহূর্তের জন্যও থমকে দিত না ওদের? সব রুশি পুরুষ নির্বিকার থাকত? সব রুশি 'বাবা' ডলারের বিনিময়ে নিজের মেয়েকে সই বিক্রি করত?

নিজের প্রেমিকাকে, বোনকে 'ডলার' নামের এক সোনার হরিণের পেছনে ছুটতে দেখেছে রুশি যুবকরা। দেখে যন্ত্রণায় কুঁকড়ে গেছে। সবাই যদি না-ও হয়, অনেকেই। সবাই বলতে পারেনি, "এটা ওদের ব্যাপার, ওরাই বুঝুক।" যন্ত্রণায় ছটফট করা এমন এক যুবকের কথা লিখেছেন আলেগ গাজমানভ। প্রখ্যাত রুশ গীতিকার, সুরকার, গায়ক। লিখেছেন 'পুতানা' নামের একটি গানে। গানটি নিজের সুরে গেয়েছেনও তিনি নিজেই, তাঁর অনন্য গায়কীতে।

'পুতানা' শব্দটির অর্থ ভ্রষ্টা। গানটিতে এক রুশ যুবক তার প্রাক্তন প্রেমিকাকে বলছে, "তুই এখন হোটেলের টেবিলে অলংকার হিসেবে শোভা পাস। বিয়ারের সঙ্গে চাটের মতো তোকে পরিবেশন করা হয়। যে কেউ তোকে দখল করে নিতে পারে। তোর সবটার উপর তার অধিকার কায়েম করতে পারে। 'রাশিয়া', 'কস্‌মস্‌', 'কন্টিনেন্টাল' (মস্কোর বড়ো-বড়ো কয়েকটি হোটেল) হচ্ছে তোর পুরুষ-শিকারের প্রিয় জায়গা। শ্যাম্পেন, ক্যাভিয়ার, পশ্চিমি সিগারেট—সব কিছু দিতে তৈরি তোর পরবর্তী ক্লায়েন্ট। পুতানা, পুতানা, পুতানা, তুই এখন রাতের প্রজাপতি। হোটেলের আলোগুলো এমন বেইমানের মতো জ্বলছে—কিন্তু এসব কিছুর জন্য কে দায়ী?

"আর স্কুলের কথা মনে পড়ে? ডেস্কে ব্লেড দিয়ে আমি তোর নাম লিখেছিলাম? আর তোকে যেদিন প্রথম চুমু খেয়েছিলাম? তোকে নিয়ে কবিতা লিখেছিলাম। রোজ লুকিয়ে লুকিয়ে দেখা করতাম। দুজনেই জানতাম না পরে কী হবে!

"পরে আমাকে আফগানিস্থানে পাঠাল, আর তোকে পাঠাল 'হার্ড কারেন্সি বার'-এ। আমি দুশমনের গুলির মোকাবিলা করতাম। আর তুই তখন অপেক্ষার বছরগুলোর বদলে বেছে নিলি 'নৈশ-শিল্প'। পুতানা, পুতানা, পুতানা, তুই এখন রাতের প্রজাপতি। কিন্তু এসব কিছুর জন্য কে দায়ী?

"যখন ভাবি, আর কখনো আমরা এক হতে পারব না, আমার বুকের ভেতর বড্ড যন্ত্রণা হয়। কিংবা হয়তো প্রচুর ডলার জমিয়ে তোর দিকে একদিন ছুঁড়ে দেব? কিনে নেব তোর একটা রাত? কিন্তু তারপর? তারপর কী নিয়ে বাঁচব? এখন তুই টেবিলের অলংকার। তোর প্রসাধনের দাম হাজার হাজার। যে কেউ তোকে দখল করে নিতে পারে। তোর সবটার উপর তার অধিকার কায়েম করতে পারে। তোর সঙ্গে আমার দেখা করার আর কোনো মানে হয় না পুতানা, পুতানা, পুতানা। গহীন কুয়াশার মধ্যে ক্ষতের মতো হোটেলের বেইমান আলোগুলো জ্বলছে।"

আফগানিস্থানে দুশমনদের ঠেকাতে গিয়েছিল ছেলেটি। সোভিয়েত 'কনটিনজেন্ট ফোর্স'-এর একজন হিসেবে। স্বেচ্ছায় প্রেমিকাকে ফেলে, নিজের শহর ছেড়ে, বাবা-মা, ভাইবোনকে ছেড়ে সে যায়নি। সব সুস্থ, সবল সোভিয়েত যুবকদের মতো তাকেও, ১৮ বছর পূর্ণ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে, সেনাবাহিনীতে যোগ দিতে হয়েছিল। দু-বছর ট্রেনিং নিতে হয়েছিল। ওই ট্রেনিং পর্বেই অনেক যুবককে আফগানিস্থানে পাঠানো হত।

৭৯ সালে সোভিয়েত ইউনিয়ন আফগানিস্থানে সৈন্য পাঠায়। আদর্শগত কারণে (সরকারের বক্তব্য অনুসারে)। এক দশক ধরে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ চলে। বহু লোক প্রাণ হারায়। প্রতিবন্ধী হয় আরও বেশি। তাদের মধ্যে অনেক সোভিয়েত যুবকও ছিল। 'আন্তর্জাতিক মৈত্রী ও সৌভ্রাতৃত্ব বৃদ্ধি' গোছের ফাঁপা কিছু বুলি, অস্পষ্ট বা না-বোঝা কিছু কারণের জেরে বহু মা তাদের সন্তান হারান, বহু যুবক হাত পা হারিয়ে পঙ্গু হয়ে বাড়ি ফেরে। আফগানিস্থানে সোভিয়েত সেনাবাহিনী পাঠানোর সিদ্ধান্ত ঘরে বাইরে তীব্র সমালোচনার সম্মুখীন হয়। ৮৯ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে সোভিয়েত সেনাবাহিনী আফগানিস্থান ছেড়ে নিজের দেশে ফিরে যায়।

সেনাবাহিনী পাঠানোর যে সিদ্ধান্ত ওপরমহলে নেওয়া হয়েছিল, তার যৌক্তিকতা খোঁজার মতো মানসিকতা সাধারণ সোভিয়েত নাগরিকের ছিল কি? তারা শুধু একটা প্রশ্নেরই উত্তর খুঁজতে তখন ব্যস্ত। তুঘলকি এক সিদ্ধান্তের মাশুল গুনতে হল যাদের, জীবন দিয়ে বা অমূল্য কতকগুলি বছর নষ্ট করে বা আরো কিছু খুইয়ে, তাদের কথা কে ভাববে?

যেমন 'পুতানা' গানের নায়ক হারিয়েছিল তার প্রেমিকাকে। আফগানিস্থানে সে যখন দুশমনের গুলি থেকে আত্মরক্ষা করতে ব্যস্ত, মস্কোতে তার প্রেমিকা তখন পৌঁছে গেছে 'হার্ড-কারেন্সি বার'-এ। 'রাশিয়া', 'কস্‌মস্', 'কন্টিনেন্টাল' বা 'ইনট্যুরিস্ট' হোটেলের পানশালায়। যেখানে ডলার, পাউন্ড, মার্ক-এ বিকিকিনি চলে। রুবল যেখানে অচল। খদ্দেররা বেশিরভাগ বিদেশি। আর যারা স্বদেশি, তাদের পকেট ভরতি বিদেশি মুদ্রা। শক্তপোক্ত মুদ্রা। হার্ড কারেন্সি। ওই ছেলের প্রেমিকা, স্কুলে যার সঙ্গে এক ক্লাসে পড়ত সে, যার নাম ডেস্কে ব্লেড দিয়ে লিখেছিল, যাকে নিয়ে কবিতা লিখেছিল, সেই প্রেমিকা ততদিনে শক্তপোক্ত মুদ্রার পানশালার রাতের প্রজাপতি, পুতানা। তার রাতগুলো সে তখন ডলার, পাউন্ড, মার্ক, ফ্রাঙ্কের বদলে বিক্রি করে।

বিদেশি মুদ্রার অপেক্ষায় মস্কোর রেস্তোরাঁ, হোটেলে, পানশালাতে বসে না থেকে অনেক সোভিয়েত মেয়ে নিজেরোই বিদেশে পাড়ি জমাতে শুরু করল। খুব সস্তায় সোভিয়েত মেয়েদের দেহ ও 'মাংস' বিক্রি হতে লাগল পৃথিবী জুড়ে। আটের দশকের শেষভাগ থেকে আন্তর্জাতিক সৌন্দর্য প্রতিযোগিতায় সোভিয়েত মেয়েরাও যোগ দিতে শুরু করল। খেতাবও জিতল।

সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েতের মেয়েরা হঠাৎ যেন মদনের পঞ্চশরে বিদ্ধ হল। যেন রবীন্দ্রনাথের চিত্রাঙ্গদার কুরূপা। 'নিরস্ত্র নারীর অস্ত্র, অবলার বল' কামনায় অধীর হল সোভিয়েতের একদল কিশোরী আর যুবতী। তাদের জীবনে মূল লক্ষ্য হয়ে উঠল, 'পুষ্প

লাবণ্যে মোর দেহ পাক তব স্বর্গের মূল্য, মর্ত্যে অতুল্য।'

মস্কো তখন 'মুদ্রারূপে অপেয় জলে পরিপূরিতা হইয়াছে।' আর ওদেশের মেয়েরা তাদের 'সমাজতান্ত্রিক মানুষ' হওয়ার সাধনা থেকে বিরত হয়ে শুধু 'সুতনুকা' হয়ে ওঠার খেলায় মেতে উঠল। তাদের দরকার ডলার। তাদের আছে জেল্লাদার দেহসম্পদ। অবলারা সেটাই মূলধন করল—দেহ হয়ে উঠল নিরস্ত্র নারীর অস্ত্র, তার বল। বিনিময়মূল্য নির্দিষ্ট হল। বাজার ঠিক করে দিল শরীরের দাম। মস্কোর বাইরে, ধীরে ধীরে ছড়িয়ে যেতে লাগল বেচাকেনার এই বাজার। লেনিন দেখলেন, পাথরের মূর্তি, পাথরের লেনিন ঠায় দাঁড়িয়ে দেখলেন সেসব। ওদেশের মেয়েদের তখন অনেকরকম পরিচয়। ক্যাবারে ডান্সার, মার্কিন 'প্লেবয়' ম্যাগাজিনের মডেল, 'পুতানা'। নয়ের দশকের শুরুতে পশ্চিমি দেশগুলির নাইটক্লাব, পানশালা, রেস্তোরাঁ 'সস্তা' সোভিয়েত মেয়েতে ভরে গেল।

এমনকী, পরিচারিকা হিসেবেও অনেক সোভিয়েত মেয়ে রওনা দিল আরব দেশগুলির দিকে। মস্কোর টিভি, খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়ে বাড়ির কাজের জন্য মহিলা চাওয়া হত। বয়স এবং চেহারা সম্পর্কেও সবিস্তারে বিবরণ থাকত। "২৫-৩৫ বছরের সুন্দরী, ব্লন্ড, ৫'৫", স্লিম, খুশি মহিলা চাই।" প্রার্থীর চোখের কাঙ্খিত রং-ও অনেক সময় বলে দেওয়া থাকত। সংসারের কাজে পরিচারিকার চুলের বা চোখের রং, দেহের মাপ, বিদেশি মালিকের কী দরকারে লাগতে পারে, বোঝা না গেলেও আন্দাজ করা কষ্টকর নয়।

মস্কো থেকে প্রকাশিত 'আর্গুমেন্তি ই ফাক্তি' (আর্গুমেন্টস অ্যান্ড ফ্যাক্টস) নামে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকার 'চিঠিপত্র' বিভাগে একটি চিঠি চোখে পড়েছিল। জনৈক পাঠিকার লেখা। "হোটেলে নর্তকী হতে চান? দক্ষ প্রশিক্ষকের তত্ত্বাবধানে তিন মাসের প্রশিক্ষণ শেষে বিদেশে চাকরির গ্যারান্টি।" খবরের কাগজে এই বিজ্ঞাপন দেখে আবেদন করেন ওই পাঠিকা। মনোনীত হন। প্রশিক্ষণ নেন। চাকরিরও ব্যবস্থা হয়। চীনে। ১৫টি মেয়ের একটি দল রওনা দেয় পেইচিংয়ের উদ্দেশে। যাওয়ার আগে 'সিকিওরিটি মানি' হিসেবে সবাইকে ২০০ ডলার জমা দিতে হয়। মাসান্তে মোটা ডলার মাইনে পাওয়ার আশায় প্রত্যেকে তা জোগাড়ও করে। পেইচিংয়ে বেশ কয়েকটি হোটেলে ওই মেয়েদের ছড়িয়ে ছিটিয়ে কাজ করতে দেওয়া হয়। প্রথম মাসটা ঠিকভাবেই কাটে। তবে মাইনে দেওয়ার সময় বলা হয়, যে 'এজেন্ট' তাদের নিয়ে এসেছে, চুক্তিমতো তাকে অর্ধেক দিতে হবে। আরো নানা কারণ দেখিয়ে কেটেকুটে নামমাত্র ডলার হাতে পান ওই পত্রলেখিকা। পরের মাস থেকে মাইনের পুরো ডলার হাতে পাবেন, এমন আশ্বাস অবশ্য দেওয়া হয়।

পরের মাস থেকে শুরু হল অন্য খেলা। হোটেলেই ছিল নর্তকীদের থাকার ব্যবস্থা। ছোটো ছোটো খুপরিতে। রাতে নাচ। সারাদিন বিশ্রাম। সেই সময়টাও কাজে লাগাতে হবে। খুপরিতে 'ক্লায়েন্ট' পাঠাতে শুরু করল হোটেলের ম্যানেজার। চুক্তিতে তো একথা বলা ছিল না। তাতে কী হয়েছে? হাতের মুঠোয় সুঠাম, সুন্দর, তরুণী নর্তকী। পালানোর কোনো রাস্তা নেই। যা করতে বলা হবে তাই করতে সে বাধ্য।

ওই পাঠিকা মাস দুয়েক এই নরকের মধ্যে কাটালেন। তারপর কোনোরকমে বেরিয়ে পালালেন। ফিরে গেলেন মস্কোতে। খবরের কাগজে নিজের অভিজ্ঞতা সবিস্তারে লিখে

জানালেন। আর কেউ যাতে ওই ধরনের মেয়ে পাচারকারী কোনো চক্রের খপ্পরে না পড়ে। এটা ৯২ সালের কথা।

৯৫-এর গোড়াতে কলকাতার পার্ক সার্কাস ময়দানে গেলাম সার্কাস দেখতে। এদেশি সার্কাস হলেও রাশিয়া থেকে অনেকে খেলা দেখাতে এসেছেন বলে বিজ্ঞাপনের ভাষায়, 'রাশিয়ান সার্কাস।' ভাবলাম, মস্কোয় দেখা সার্কাসের মতো না হলেও রাশিয়ান সার্কাসের কিছু ছাপ, রুশ খেলোয়াড়দের কিছু কেরামতি পার্ক সার্কাসে বসেই দেখা যাবে। দেখলাম সার্কাস। দেশি খেলোয়াড়দের বিভিন্ন 'আইটেমের' মাঝেমধ্যে বিদেশি তরুণ-তরুণীদের কিছু কসরৎ। রুশি নন, ওরা এসেছিলেন উজবেকিস্তান থেকে। সবসুদ্ধ জনা কুড়ি। তরুণীরা অতি অল্প, প্রায় স্বচ্ছ পোশাকে নিজেদের ঢেকে রাখার ভান করে এরেনাতে এলেন। উদ্দাম মিউজিকের সঙ্গে অঙ্গভঙ্গি করে নাচ গোছের কিছু একটা করার চেষ্টা করলেন। সাদা চামড়ার ওই রমণীরা সার্কাসে দেখা যায়, এমন কোনো খেলা দেখালেন না। বিদেশি পুরুষ খেলোয়াড়রা কয়েকটি খেলা দেখালেন।

ভারী ওজন তোলা, পেশি প্রদর্শন, ভারী লোহার বল নিয়ে ছোঁড়াছুঁড়ি ইত্যাদি। রাশিয়ান সার্কাসের কোনো দূরতম প্রভাব বা প্রশিক্ষণের ছাপ খুঁজে পাওয়া গেল না। ডলার রোজগারের জন্য পূর্বতন সোভিয়েতের নারী-পুরুষ পৃথিবীর নানা প্রান্তে ছড়িয়ে পড়েছে। উচ্চস্তরের দক্ষ ব্যালেরিনা, সংগীতজ্ঞ বা অন্যান্য পেশাদাররা যাচ্ছেন পশ্চিমি দেশগুলিতে। তলায় পড়ে থাকারা আসছেন পূর্বদিকে।

এর আগে থেকেই অবশ্য রুশি মেয়েরা ভারতে আসছে। বিভিন্ন ভাবে বিভিন্ন কারণে। ৯৩-এর মাঝামাঝি আমাদের ইউনিভার্সিটির এক ভারতীয় ছাত্রের মুখে শুনেছিলাম, দিল্লিতে রুশি মেয়েরা ২০০-৩০০ টাকায় নিজেদের বিকিয়ে দেয়। তারা আসে কিন্তু অন্য কারণেই ; এদেশ থেকে যতটা মাল আইনিভাবে নিয়ে যাওয়া সম্ভব, তা নিয়ে যায়—নিজের দেশে বিক্রির জন্য। মালের জন্য নিজের দেশে চড়া দাম মেলে আর এসব জিনিসপত্রও সেখানে দুষ্প্রাপ্য। এরই মাঝে যাতায়াত ভাড়া তোলার জন্য তারা শরীর বিকোয়। সস্তা দরেই। ভারতীয়দের কাছেই। রুশ-ভারত মৈত্রী দীর্ঘজীবী হয় এভাবেই। হতে থাকে।

খুব পুরোনো একটা চালু কথা আছে। অনেকটা আপ্তবাক্যের মতো শোনায় কথাটা। তবুও কোথাও কোথাও তা বেশ ভালোভাবে খেটে যায়। কথাটা হল—ব্যতিক্রমই নিয়মটা প্রতিষ্ঠিত করে। সোভিয়েত সাধারণতন্ত্রেও একটা নিয়ম ছিল। সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের মানুষ নারী-পুরুষ নির্বিশেষে, সেই নিয়ম মেনেই চলত। চলার চেষ্টা করত অন্তত। তারপর সব কীরকম যেন হয়ে গেল। পশ্চিমি ঝঞ্ঝাবার্তা এক নিমেষে ওদের সংযম আর আব্রু উড়িয়ে দিল। নিয়মগুলো গেল তলিয়ে। এক অস্বস্তিকর বেসামাল অবস্থা। সর্বত্র কেবল একটা 'চাই চাই, খাই খাই' পরিবেশ। বিশ্ববিপ্লবের অগ্রপথিক, শোষণমুক্তির লড়াইয়ের কর্ণধার কমরেড লেনিনের সোভিয়েত ইউনিয়ন তখন যেন একটা নোংরা, কুৎসিত, অবদমিত ক্ষুধা নিবৃত্তির অবাধ বিচরণভূমি। এরই মাঝে আমি দেখেছি ওলগাকে। জলজ্যান্ত এক ব্যতিক্রম হিসেবে।

ওলগা ছিল আমারই সহপাঠী। থাকত আমাদের হস্টেলেই। ওলগা বিয়ে করেছিল লুমুম্বারই এক রুশি ছাত্রকে। ওদের একটা মেয়ে ছিল। তিনজনে একসঙ্গে হস্টেলে থাকত।

মেয়ের জন্মের পর ওদের সংসারের খরচ গেল বেড়ে। স্টাইপেন্ডের রুবলে কুলায় না। অনেক রুবল দরকার। আয় করার অনেক সহজ রাস্তা তখন সামনে খোলা। চাইলেই ওলগার বর পারত 'স্মাগলিং' করতে। ওলগাও পারত ডলার নিয়ে শরীর দিতে ; মস্কোয় যা তখন আকছার হচ্ছে।

এরকম সময় ওলগাকে একদিন আবিষ্কার করলাম অন্য এক চেহারায়। হস্টেলের ঘরে বসে আছি। কে যেন দরজা নাড়ল। খুলে দেখি লম্বা বুরুশ, বালতি নিয়ে, হাতে রবারের গ্লাভস পরে ওলগা দাঁড়িয়ে। কিছু বলার আগেই আমায় অবাক করে দিয়ে ও বলল, "তোদের টয়লেটটা পরিষ্কার করব।"

ওলগা আর ওর বর, দুজনেই ছিল কমসামোল সদস্য। ইউনিভার্সিটি কর্তৃপক্ষকে বলে দুজনেই দুটো কাজ জোগাড় করেছিল। ওলগা হল 'সুইপার'। ওর বর হস্টেলের লন্ড্রির ধোপা। আমি দাঁড়িয়ে দেখলাম, নিপুণ হাতে ওলগা আমাদের টয়লেট পরিষ্কার করে দিল।

ওলগা ছিল আন্তর্জাতিক সাংবাদিকতা বিভাগের ছাত্রী। ওর বর ছিল অর্থনীতির ছাত্র। সেদিন যাওয়ার আগে ওলগা বলল, "রুবলের খুব দরকার। অন্য কোনো কাজ তো এখন করা সম্ভব নয়। বাচ্চাটা এখনও ছোটো। ওকে হস্টেলে রেখে বাইরে বেশিক্ষণ থাকতে পারব না। দুজনে তাই এখানেই কাজে লেগে গেলাম। আমার বর সপ্তাহে তিনদিন লন্ড্রিতে জামাকাপড় কাচে।"

তারপরেও ওলগা আমার ঘরে এসেছে, টয়লেট পরিষ্কার করতে। আমার কেমন যেন লাগত। আমি ওকে বারণ করতাম। বলতাম, তোর এসব করতে হবে না। আমি অন্য সুইপার ডেকে আনব। ওলগা আমায় অনেক, অনেক কিছু শিখিয়েছে, চিনিয়েছে। অল্প কথা বলত। আমার কথা শুনে বলত, "অন্য সুইপার এ কাজটা করতে পারলে, আমি পারব না কেন? তোর বন্ধু বলে? এটা তো কাজ!"

ওলগাকে এখন খুব দেখতে ইচ্ছে করে। মাঝে মাঝেই ওর হাসি হাসি মুখটা মনে পড়ে। ওলগা, তোরা ভালো থাকিস।

রবীন্দ্রনাথ, অরওয়েল, শেভচেঙ্কো...রাশিয়া

"রাশিয়ায় অবশেষে আসা গেল। যা দেখছি আশ্চর্য ঠেকছে। অন্য কোনো দেশের মতোই নয়। একেবারে মূলে প্রভেদ। আগাগোড়া সকল মানুষকেই এরা সমান করে জাগিয়ে তুলেছে।"[১]

১৯৩০ সালে রবীন্দ্রনাথ রাশিয়াকে দেখেছিলেন। বিপ্লবোত্তর রাশিয়া। সমাজতন্ত্র তখনও শৈশব অবস্থায়। রবীন্দ্রনাথের মেধায়, ভাবজগতে প্রবল আলোড়ন তুলেছিল সেই রাশিয়া। তিনি লিখলেন, "...রাশিয়ায় এসেছি—না এলে এ জন্মের তীর্থদর্শন অত্যন্ত অসমাপ্ত থাকত।"[২]

একজন কবি, একজন হিউম্যানিস্ট, একজন দার্শনিক রবীন্দ্রনাথ রাশিয়াকে যেমন দেখেছিলেন, তা বিভিন্ন চিঠি মারফত জানিয়ে দিলেন—আমরা পেলাম 'রাশিয়ার চিঠি'।

কেটে গেল আরো ১৮ বছর। আমাদের বাংলাতেই জন্মেছেন ও এখানেই শৈশব কেটেছে এমন এক ব্রিটিশ সাংবাদিক ও লেখক জর্জ অরওয়েল (১৯০৩-১৯৫০) লিখে ফেললেন 'নাইনটিন এইটি ফোর'। আমরা অরওয়েলের এই বই থেকে জানতে পারলাম, তাঁর বিশ্বাস ছিল 'ডেমোক্রাটিক সোস্যালিজম'-এ। তিনি মনে করতেন, আরো এক ধরনের সমাজতন্ত্র সম্ভব। তাঁর বিশ্বাসের বাইরে, তৎকালীন রাশিয়ায় সমাজতন্ত্রের যে 'স্তালিনীয় মডেল' চালু ছিল, তাকে তিনি সমাজতন্ত্রের কুৎসিততম ও বিকৃত রূপ বলে চিহ্নিত করেছিলেন। এই ধরনের সমাজতন্ত্রের কর্ণধারদের তিনি 'মর্ত্যের ভগবান', 'স্বৈরাচারী', 'একনায়কতন্ত্রের পৃষ্ঠপোষক', 'বিপ্লবের হত্যাকারী' বলে আখ্যায়িত করেছিলেন। অরওয়েল মনে করতেন, সমাজতন্ত্রের এই বিকৃত রূপই আসলে নামান্তরে 'গুরুবাদ'। এর ভিত্তি আমলাতন্ত্র। তাঁর বিশ্বাস অনুযায়ী, ফ্রাঙ্কোর স্পেন, হিটলারের জার্মানি এবং স্তালিনের রাশিয়া—তিন দেশেই 'টোটালিটারিয়ান ডিক্টেটরশিপ' বিকাশ লাভ করেছিল এবং বহু যত্নে প্রতিপালিত হয়েছিল।

স্তালিনের আমল থেকে অরওয়েলের 'নাইনটিন এইটি ফোর' রাশিয়ায় নিষিদ্ধ ছিল। ১৯৮৯ সালে বইটির রুশ অনুবাদ বেরোয় রাশিয়া থেকেই, প্রকাশক মস্কোর 'প্রোগ্রেস পাবলিকেশন'।

আমি যখন মস্কো গেলাম, তখনও বইটি রুশ ভাষায় প্রকাশিত হয়নি। মস্কোতে সে সময় শুনতাম, স্তালিনীয় যুগের প্রধান বৈশিষ্ট্য—বলপূর্বক একমুখী চিন্তাধারা। চারিদিকে ভয়ের পরিবেশ, আদর্শহীনতা। আজ যা সাদা, কাল তাকে কালো বলতে বাধ্য করা। আইনকানুনের কোনো বালাই নেই। চারপাশে সন্দেহজনক দৃষ্টির কড়া নজরদারি। যে কোনো স্বাধীন মতামত বা ভাবনাচিন্তাকে দাবিয়ে রাখাই তখন 'নিয়ম'।

সোভিয়েত ইউনিভার্সিটিগুলিতে একটা নিয়ম চালু ছিল। প্রত্যেক ছাত্রছাত্রীকে শিক্ষাবর্ষের শেষে একটা 'পেপার' জমা দিতে হত। যার যা বিষয়, তার সঙ্গে সম্পর্কিত কোনো একটি নির্দিষ্ট বিষয় নিয়ে এই 'পেপার' লিখতে হত। এটা ছিল বাধ্যতামূলক। ফ্যাকাল্টিরই কোনো শিক্ষক 'গাইড' হতেন। আমাদের ইউনিভার্সিটিতেও এই নিয়ম ছিল। এখানে 'পেপার' বলা হত না। বলা হত, 'কোর্স ওয়াক'।

আমার গাইড ছিলেন ভিক্তর পাভ্লোভিচ স্‌মারোদিনভ্। বহুভাষাবিদ স্‌মারোদিনভ্ 'এশীয় সাংবাদিকতা' বিষয়ের অধ্যাপক ছিলেন। তিনি তাঁর ব্যক্তিগত সংগ্রহ থেকে অরওয়েলের 'নাইনটিন এইটি ফোর' বইটির ইংরেজি সংস্করণের একটি জেরক্স কপি আমাকে দিয়েছিলেন। বইটি নিয়ে 'কোর্স ওয়ার্ক' লেখার জন্য। এটা ১৯৮৮ সালের কথা। তখনও বইটি সোভিয়েত ইউনিয়নে পাওয়া যেত না। সেই তখনই 'নাইনটিন এইটি ফোর' পড়া শুরু হল।

কবির রাশিয়া, তারপর সাংবাদিকের রাশিয়া (যদিও অরওয়েল স্পষ্টভাবে 'রাশিয়া' শব্দটি ব্যবহার করেননি) পেরিয়ে পৌঁছালাম এক কূটনীতিকের রাশিয়ায়। 'রাশিয়ার চিঠি', 'নাইনটিন এইটি ফোর'-এর পর হাতে এল 'ব্রেকিং উইথ মস্কো'। মস্কোয় বসে পাইনি বইটি। ১৯৯৩-এ কলকাতায় ফিরে এই বইটি হাতে পাই। এর লেখক আর্কাদি নিকোলায়েভিচ শেভচেঙ্কো। তিনি ছিলেন সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টির উপরতলার একজন প্রভাবশালী সদস্য এবং সোভিয়েত বিদেশমন্ত্রকের এক উচ্চপদস্থ কর্মী। (৭৩ সালে তিনি রাষ্ট্রপুঞ্জের 'আন্ডার সেক্রেটারি জেনারেল ফর পলিটিক্যাল অ্যান্ড সিকিউরিটি কাউন্সিল অ্যাফেয়ার্স' পদাধিকারী হন।)

শেভচেঙ্কো আমেরিকায় রাজনৈতিক আশ্রয় নিয়ে 'নির্ভয়ে' সোভিয়েত কমিউনিস্ট প্রশাসন ও পলিটব্যুরো সম্পর্কে খুবই চাঞ্চল্যকর সব তথ্য, একের পর এক, তাঁর এই ৪৯২ পৃষ্ঠার আত্মজীবনীমূলক বইয়ে হাজির করেছেন।

তিনটি বইয়ে পৃথকভাবে যে তথ্য বা অভিজ্ঞতা সমাবেশিত হয়েছে, অত্যন্ত নির্লিপ্তভাবে তা-ই আমি এখানে মনে করতে চাই। রবীন্দ্রনাথের দর্শন (ফিলসফি), অরওয়েলের দর্শন (দেখা), বা শেভচেঙ্কোর অনুসন্ধান কতটা সঠিক, কতটা বেঠিক, কতটা স্বচ্ছ বা কতটা বালখিল্য, কতটা বস্তুনিষ্ঠ, কতটাই-বা বায়বীয়—এ নিয়ে বিতর্ক আছে। সে বিতর্ককে আরো একটু উসকে দেওয়া বা স্তিমিত করা, কোনোটাই এ লেখার উদ্দেশ্য নয়। তিনটি বইয়ের পূর্বাপর তথ্য মারফত সহজভাবে যে কথাটা মনে আসে তাতে মনে হয়, ইয়েলৎসিনের আবির্ভাব এবং রাশিয়ায় আজকের পরিণতি কোনো আকস্মিক ঘটনা নয়। এ এক চূড়ান্ত পরিণতি। এক অনিবার্য পরিণতি। ধারাবাহিক একটি ঘটনার শেষ পর্যায়। পটভূমি যেন বহুদিন থেকে তৈরি হয়েই ছিল।

১৯৩০-এর সেপ্টেম্বর (১১-২৫ সেপ্টেম্বর) দিন পনেরোর জন্য রবীন্দ্রনাথ মস্কোতে ছিলেন। সেটা স্তালিনের আমল। সংক্ষিপ্ত ওই সফরের অভিজ্ঞতা তাঁকে 'গভীর ভাবে অনেক কথা' ভাবিয়েছিল। বহুচর্চিত সে সমস্ত কথার কিয়দংশ ফের এখানে তুলে ধরা হল

রচনার এই অংশের ভিত্তি সুদৃঢ় করতে।

নতুন রাশিয়ার মানুষ, সেখানকার রীতিনীতি রবীন্দ্রনাথকে অনুপ্রাণিত করেছিল। তিনি লিখলেন, "কয়েক বৎসর পূর্বে ভারতবর্ষের অবস্থার সঙ্গে এদের জনসাধারণের অবস্থার সম্পূর্ণ সাদৃশ্য ছিল—এই অল্পকালের মধ্যে দ্রুতবেগে বদলে গেছে—আমরা পড়ে আছি জড়তার পাঁকের মধ্যে আকণ্ঠ নিমগ্ন।"[৩] তাঁর সারাজীবনের স্বপ্ন তিনি সার্থক হতে দেখেছিলেন রাশিয়ার জমিতে। "আমি যা বহুকাল ধ্যান করেছি রাশিয়ায় দেখলুম এরা তা কাজে খাটিয়েছে ;... ।"[৪] "আমরা শ্রীনিকেতনে যা করতে চেয়েছি এরা সমস্ত দেশ জুড়ে প্রকৃষ্টভাবে তাই করছে।"[৫]

এত মুগ্ধতা, এত প্রেরণার মধ্যেও একটা প্রকট গলদ তাঁর চোখে পড়েছিল। সোভিয়েত সমাজব্যবস্থার সেই প্রথম শৈশবেই তিনি উপলব্ধি করেছিলেন, "এর মধ্যে যে গলদ কিছুই নেই, তা বলি নে—গুরুতর গলদ আছে। সেজন্যে একদিন এদের বিপদ ঘটবে। সংক্ষেপে সে গলদ হচ্ছে, শিক্ষাবিধি দিয়ে এরা ছাঁচ বানিয়েছে—কিন্তু ছাঁচে-ঢালা মনুষ্যত্ব কখনো টেকে না—সজীব মনের তত্ত্বর সঙ্গে বিদ্যার তত্ত্ব যদি না মেলে তা হলে হয় একদিন ছাঁচ হবে ফেটে চুরমার, নয় মানুষের মন যাবে মরে আড়ষ্ট হয়ে, কিম্বা কলের পুতুল হয়ে দাঁড়াবে।"[৬]

নতুন রাষ্ট্রের নতুন শাসন কাঠামোকে রবীন্দ্রনাথ পর্যবেক্ষণ করেছিলেন মুক্ত মনে, খোলা চোখে। রাশিয়াকে তিনি তীর্থক্ষেত্রের সঙ্গে তুলনা করেছেন ঠিকই কিন্তু সেখানকার সমাজব্যবস্থার নানা ফাঁকফোকর তাঁর দৃষ্টি এড়ায়নি। সারাজীবনের স্বপ্নপূরণের উচ্ছ্বাস রবীন্দ্রনাথের বিচক্ষণতাকে ভাসিয়ে নিয়ে যেতে পারেনি। সমাজতন্ত্রের সোভিয়েতিকরণের যে যে অসমাঞ্জস্য তিনি অনুভব করেছিলেন, তা স্পষ্টভাবে লিখে গিয়েছেন তাঁর 'রাশিয়ার চিঠি'-র নানা অংশে। সর্বদা মনে রাখতে হবে, তিনি এই চিঠিগুলি লিখেছিলেন ৩০ সালে। যখন সোভিয়েত সমাজ উত্তরণের পথে, সর্বত্র তার জয়জয়কার। সেই তখন রবীন্দ্রনাথ লিখলেন, "মানুষের ব্যষ্টিগত ও সমষ্টিগত সীমা এরা যে ঠিকমত ধরতে পেরেছে তা আমার বোধ হয় না। সে হিসাবে এরা ফ্যাসিস্টদেরই মতো। এই কারণে সমষ্টির খাতিরে ব্যষ্টির প্রতি পীড়নে এরা কোনো বাধাই মানতে চায় না। ভুলে যায় ব্যষ্টিকে দুর্বল করে সমষ্টিকে সবল করা যায় না, ব্যষ্টি যদি শৃঙ্খলিত হয় তবে সমষ্টি স্বাধীন হতে পারে না। এখানে জবর্দস্ত লোকের একনায়কত্ব চলছে। এইরকম একের হাতে দশের চালনা দৈবাৎ কিছুদিনের মতো ভালো ফল দিতেও পারে, কিন্তু কখনোই চিরদিন পারে না। উপযুক্তমত নায়ক পরম্পরাক্রমে পাওয়া কখনোই সম্ভব নয়।"[৭]

"মনকে এক দিকে স্বাধীন করে অন্য দিকে জুলুমের বশ করা সহজ নয়। ভয়ের প্রভাব কিছুদিন কাজ করবে, কিন্তু সেই ভীরুতাকে ধিক্কার দিয়ে শিক্ষিত মন একদিন আপন চিন্তা-স্বাতন্ত্র্যের অধিকার জোরের সঙ্গে দাবি করবেই।"[৮]

নতুন রাশিয়ার অর্থনীতি প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ লিখলেন—

"সোভিয়েট রাশিয়ায় মার্কসীয় অর্থনীতি সম্বন্ধে সর্বসাধারণের বিচারবুদ্ধিকে এক ছাঁচে

পথ জোর করে অবরুদ্ধ করে দেওয়া হয়েছে। এই অপবাদকে আমি সত্য বলে বিশ্বাস করি। সেদিনকার য়ুরোপীয় যুদ্ধের সময় এইরকম মুখ চাপা দেওয়া এবং গবর্মেন্ট-নীতির বিরুদ্ধবাদীর মতস্বাতন্ত্র্যকে জেলখানায় বা ফাঁসিকাঠে বিলুপ্ত করে দেওয়ার চেষ্টা দেখা গিয়েছিল।

"যেখানে আশু ফললাভের লোভ অতি প্রবল সেখানে রাষ্ট্রনায়কেরা মানুষের মতস্বাতন্ত্র্যের অধিকারকে মানতে চায় না। তারা বলে ও-সব কথা পরে হবে, আপাতত কাজ উদ্ধার করে নিই। রাশিয়ার অবস্থা যুদ্ধকালের অবস্থা ; অন্তরে বাহিরে শত্রু। ওখানকার সমস্ত পরীক্ষাকে পণ্ড করে দেবার জন্যে চারি দিকে নানা ছলবলের কাণ্ড চলছে। তাই ওদের নির্মাণকার্যের ভিতটা যত শীঘ্র পাকা করা চাই, এজন্যে বলপ্রয়োগ করতে ওদের কোনো দ্বিধা নেই। কিন্তু গরজ যত জরুরিই হোক, বল জিনিসটা এক-তরফা জিনিস। ওটাতে ভাঙে, সৃষ্টি করে না। সৃষ্টিকার্যে দুই পক্ষ আছে, উপাদানকে স্বপক্ষে আনা চাই মারধোর ক'রে নয় তার নিয়মকে স্বীকার ক'রে।"[৯]

"যেখানে মানুষ তৈরি নেই, মত তৈরি হয়েছে, সেখানকার উচ্চণ্ড দণ্ডনায়কদের আমি বিশ্বাস করি নে। প্রথম কারণ, নিজের মত সম্বন্ধে আগেভাগে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করা সুবুদ্ধি নয়, সেটাকে কাজে খাটাতে খাটাতে তবে তার পরিচয় হয়। ওদিকে ধর্মতন্ত্রের বেলায় যে জননায়কেরা শাস্ত্রবাক্য মানে না তারাই দেখি অর্থতন্ত্রের দিকে শাস্ত্র মেনে অচল হয়ে বসে আছে ; সেই শাস্ত্রের সঙ্গে যেমন করে হোক মানুষকে টুঁটি চেপে ঝুঁটি ধরে মেলাতে চায়—এ কথাও বোঝে না, জোর করে ঠেসে-ঠুসে যদি কোনো-এক রকমে মেলানো হয় তাতে সত্যের প্রমাণ হয় না। বস্তুত যে পরিমাণেই জোর সেই পরিমাণেই সত্যের অপ্রমাণ।"[১০]

"মানুষের মধ্যে দুটো দিক আছে, এক দিকে সে স্বতন্ত্র আর এক দিকে সে সকলের সঙ্গে যুক্ত। এর একটাকে বাদ দিলে যেটা বাকি থাকে সেটা অবাস্তব। যখন কোনো একটা ঝোঁকে পড়ে মানুষ এক দিকেই একান্ত উধাও হয়ে যায় এবং ওজন হারিয়ে নানাপ্রকার বিপদ ঘটাতে থাকে, তখন পরামর্শদাতা এসে সংকটটাকে সংক্ষেপে করতে চান, বলেন, 'অন্য দিকটাকে একেবারেই ছেঁটে দাও।' ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য যখন উৎকট স্বার্থপরতায় পৌঁছিয়ে সমাজে নানাপ্রকার উৎপাত মথিত করে তখন উপদেষ্টা বলেন, 'স্বার্থ থেকে স্ব'টাকে এক কোপে দাও উড়িয়ে, তা হলেই সমস্ত ঠিক চলবে।' তাতে হয়তো উৎপাত কমতে পারে, কিন্তু চলা বন্ধ হওয়া অসম্ভব নয়।"[১১]

রবীন্দ্রনাথ কোনো মতাদর্শকে আক্রমণ করেননি। তাঁর আক্রমণের লক্ষ্য ছিল মতাদর্শের প্রয়োগপদ্ধতি। মানবপ্রকৃতির বিপন্নতা তাঁকে পীড়িত করেছে সব থেকে বেশি। "য়ুরোপে যখন খৃস্টান শাস্ত্রবাক্যে জবরদস্ত বিশ্বাস ছিল, তখন মানুষের হাড়গোড় ভেঙে, তাকে পুড়িয়ে বিঁধিয়ে, তাকে ঢিলিয়ে, ধর্মের সত্যতা প্রমাণের চেষ্টা দেখা গিয়েছিল। আজ বলশেভিক মতবাদ সম্বন্ধে তার বন্ধু ও শত্রু উভয় পক্ষেরই সেইরকম উদ্দাম গায়ের-জোরী যুক্তিপ্রয়োগ। দুই পক্ষেরই পরস্পরের নামে নালিশ এই যে, মানুষের মতস্বাতন্ত্র্যের

অধিকারকে পীড়িত করা হচ্ছে। মাঝের থেকে পশ্চিম-মহাদেশে আজ মানবপ্রকৃতি দুই তরফ থেকেই ঢেলা খেয়ে মরছে।"[১২]

সমষ্টি ও ব্যষ্টির পারস্পরিক সম্পর্কের মধ্যে ভারসাম্যের অভাব তাঁকে চিন্তিত করেছিল। "...ব্যষ্টিবর্জিত সমষ্টির অবাস্তবতা কখনোই মানুষ চিরদিন সইবে না। সমাজ থেকে লোভের দুর্গগুলোকে জয় করে আয়ত্ত করতে হবে, কিন্তু ব্যক্তিকে বৈতরণী পার করে দিয়ে সমাজরক্ষা করবে কে ? অসম্ভব নয় যে, বর্তমান রুগ্‌ণ যুগে বলশেভিক নীতিই চিকিৎসা ; কিন্তু চিকিৎসা তো নিত্যকালের হতে পারে না, বস্তুত ডাক্তারের শাসন যেদিন ঘুচবে সেই দিনই রোগীর শুভদিন।"[১৩]

বিশ্বনাগরিক রবীন্দ্রনাথ সমগ্র মানবসমাজের হিতাহিত নিয়ে চিন্তিত ছিলেন। ভারতের পরিণতি যেমন তাঁকে ভাবিত করত, রাশিয়ার ভবিষ্যৎ নিয়েও তিনি তেমনই উৎসুক ছিলেন। রোগীকে সুস্থ করতে 'বলশেভিক নীতিই' যে চিকিৎসা পদ্ধতি তা বুঝেও পাশাপাশি রবীন্দ্রনাথের এ ধারণাও বদ্ধমূল ছিল, ডাক্তারিটা একটু 'জবর্দস্ত' হয়ে যাচ্ছে। রোগীর স্বাভাবিক, সুস্থ হয়ে ওঠার জন্য অভ্রান্ত চিকিৎসানীতি সত্ত্বেও ডাক্তারিটা যে গোলমাল হিসেবে দেখা দিচ্ছে, ৩০ সালেই তা টের পেলেন রবীন্দ্রনাথ। প্রয়োগকৌশল ঠিকঠাক না হলে খাঁটি ফর্মুলাতেও যে অঙ্ক মেলে না, রাশিয়ার পরিপ্রেক্ষিতে মার্কসবাদ সম্পর্কে এ ধরনের আলোচনা আমি মস্কোতে থাকাকালীন শুনে এসেছি। ইয়েলৎসিন সে সময় রাষ্ট্রনায়ক, রাশিয়া থেকে মার্কসবাদ অপসারিত, কিন্তু লোকে বুঝতে পারছে, ডাক্তারের দোষেই একটা ঠিকঠাক নীতি রোগীরা প্রত্যাখ্যান করল। ৯০-এর শুরুর দিকে এই জানাবোঝা ৩০-এই বুঝেছিলেন রবীন্দ্রনাথ।

এই 'ডাক্তার'কেই আবার পাওয়া গেল এক সাংবাদিকের লেখায়, অন্য অভিধায়। 'ডাক্তার' সেখানে 'বিগ ব্রাদার'। ৪৯ সালে প্রকাশিত 'নাইনটিন এইটি ফোর'-এ অরওয়েল সমাজতন্ত্রের বিশ্লেষণে ক্ষমতার ভয়াবহতা (টেররস অফ পাওয়ার) তুলে ধরলেন পাঠকের সামনে। কোথাও নাম উল্লেখ না করে সোভিয়েত ইউনিয়নের 'স্তালিনীয় সমাজতন্ত্রের' (অরওয়েলের বই নিয়ে আলোচনায় গবেষকরা এই শব্দটি ব্যবহার করে থাকেন) স্বরূপ উন্মোচন করলেন অরওয়েল।

'রাশিয়ার চিঠি' রবীন্দ্রনাথের লেখা চিঠির সংকলন। 'নাইনটিন এইটি ফোর' একটি উপন্যাস। রবীন্দ্রনাথ রাশিয়ায় গিয়ে যে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেন, তার নিরিখেই এই চিঠিগুলি লিখিত। অরওয়েল কখনো রাশিয়ায় যাননি। রবীন্দ্রনাথ দেখে লিখেছেন, অরওয়েল শুনে লিখেছেন।

৪৮-এর ২২ অক্টোবর প্রকাশক ফ্রেড ওয়ারবার্গকে লেখা একটা চিঠিতে অরওয়েল জানান, 'নাইনটিন এইটি ফোর' উপন্যাসটি লেখার কথা প্রথম তাঁর মাথায় আসে ৪৩ সালে। এই ৪৩-এই তিনি 'অ্যানিমেল ফার্ম' লেখার কথাও ভাবেন। কাছাকাছি সময়ে লেখা এই উপন্যাস দু-টি অরওয়েলের একটি চিন্তারই ফসল, এ নিয়ে সন্দেহ নেই।

অরওয়েল 'নাইনটিন এইটি ফোর' লেখার কাজ শুরু করেন ৪৭-এ। ৪৮-এ লেখা শেষ হয়। ৪৯-এর ৮ জুন লন্ডন থেকে প্রথম প্রকাশিত হয় বইটি। 'নাইনটিন এইটি ফোর'

প্রসঙ্গো অরওয়েল বলেছিলেন, "উপন্যাসটির বিষয়বস্তু হল ভবিষ্যৎ। এটি একধরনের ফ্যানটাসি হলেও ফর্মের দিক থেকে রিয়ালিস্টিক। সমাজতন্ত্রের বিরোধিতা করার উদ্দেশ্যে এই বই আমি লিখিনি। ব্রিটিশ লেবার পার্টির সঙ্গোও আমার কোনো শত্রুতা নেই। (আমি ওদেরই ভোট দিই)। বইটিতে আমি বিকৃত কেন্দ্রীভূত অর্থনীতির বিরোধিতা করতে চেয়েছি। কারণ অনুরূপ বিকৃতি কিয়দংশে কমিউনিজম ও ফ্যাসিজিমের মধ্যে ইতিমধ্যেই দেখা দিয়েছে। আমি নিশ্চিত নই যে, এই ধরনের সমাজব্যবস্থা (যার কথা বইতে বলা হয়েছে) অবশ্যই কোথাও আত্মপ্রকাশ করবে। কিন্তু একইসঙ্গো আমি বিশ্বাস করি, এমন কিছু ঘটতেও পারে। আরো বিশ্বাস করি, একনায়কী ধারণা (টোটালিটারিয়ান আইডিয়া) সব জায়গায় বুদ্ধিজীবীদের চেতনায় বাসা বেঁধে থাকে, এবং এই সত্যটি আমি (লজিক্যাল পদ্ধতিতে) প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করেছি। 'নাইনটিন এইটি ফোর'-এর ঘটনাবলি ইংলন্ডে সংঘটিত হয়েছে। এর মাধ্যমে বোঝাতে চেয়েছি ইংরেজিভাষী জাতিরা অন্যদের তুলনায় কোনো অংশেই উত্তম নয় এবং সময়মতো সতর্ক না হলে একনায়কতন্ত্র সর্বত্র ছেয়ে যেতে পারে।"[১৪]

'নাইনটিন এইটি ফোর' প্রসঙ্গো লিখতে গিয়ে মার্কিন সাহিত্য সমালোচক লায়োনেল ট্রিলিং লিখেছিলেন, "আমরা ভাবতে অভ্যস্ত হয়ে গেছি যে, স্বেচ্ছাতন্ত্রের (টির‍্যানি) জন্ম হয় শুধুমাত্র ব্যক্তিগত সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণের স্বার্থে, বা ধনসম্পদ লাভের লোভই হিংসার একমাত্র কারণ। আমরা বুদ্ধিমত্তা ও ইচ্ছার বাহক হিসেবে নিজেদের ভাবতে অভ্যস্ত হয়ে গেছি। বুদ্ধিমত্তা ও ইচ্ছার মধ্যে আমরা গণতন্ত্রের নির্যাসটুকু লক্ষ করি। কিন্তু অরওয়েল আমাদের অন্য কথা শোনালেন। তাঁর মতে, পৃথিবীর শেষ 'অলিগার্খিকাল রেভোলিউশন' সম্পত্তির মালিকদের দ্বারা সংঘটিত হবে না। এর হোতা হবেন বুদ্ধিজীবীরা—নতুন অভিজাত আমলা, বিশেষজ্ঞ, ট্রেড ইউনিয়নের নেতা, জনমত বিশেষজ্ঞ, সমাজবিজ্ঞানী, শিক্ষক ও পেশাদার রাজনীতিক।"[১৫]

উপন্যাসটির নায়ক উইন্সটন স্মিথ। বয়স ৩৯। তাকে এবং তার মতো আরো সকলকে সবসময় সব জায়গায় চোখে চোখে রাখে 'বিগ ব্রাদার'। পোস্টারের বিগ ব্রাদার। চারিদিকে বিরাট বিরাট রঙিন পোস্টার। তাতে একটা চওড়া মুখ। বছর পঁয়তাল্লিশের এক পুরুষ। কালো চুল, কালো চোখ। মোটা কালো গোঁফ। ধারালো নাক-চোখ। সারা মুখে ক্ষমতা আর রহস্যময় এক দৃঢ়তার মিশেল। নিচে ক্যাপশান—'বিগ ব্রাদার ইজ ওয়াচিং ইউ'। পোস্টারের এক কোণে একটি শব্দ—'ইংসোস'।

'ইংসোস' বলতে অরওয়েল বুঝিয়েছিলেন 'একনায়কী সমাজতন্ত্র' (টোটালিটারিয়ান ভার্সান অব সোস্যালিজম)। অরওয়েল মনে করতেন, সমাজতন্ত্রের দুটি ধরন। প্রথম—যা তিনি দেখেছিলেন বিপ্লবী বার্সিলোনাতে। "এটা ছিল তেমন সমাজ, যেখানে হতাশা বা নির্বিকার মনোভাব নয়, আশাই ছিল স্বাভাবিক। যেখানে 'কমরেড' শব্দটি নকল বন্ধুত্ব বোঝাত না। এটা ছিল সমাজতন্ত্রের আদি পর্বের জীবন্ত উদাহরণ।"[১৬] দ্বিতীয় ধরনটি—'স্তালিনীয় সমাজতন্ত্র', যা ভবিষ্যতে পশ্চিমি দেশগুলিতে 'প্রশাসকগোষ্ঠীর বিপ্লবের' প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। অরওয়েল লিখেছিলেন, "...সমাজতন্ত্র বলতে যদি শুধু কেন্দ্রীভূত শাসন ও পরিকল্পিত

উৎপাদন ব্যবস্থাকে বোঝায়, তাহলে 'এর প্রকৃতিতে গণতন্ত্র বা সাম্যের কোনো বৈশিষ্ট্য নজরে পড়ে না।"[১৭] সমাজতন্ত্র সম্পর্কে নিজের মনোভাব স্পষ্ট ভাষায় ব্যক্ত করেছেন অরওয়েল, "১৯৩৬ সাল থেকে লেখা প্রতিটি ছত্রে আমি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে একনায়কতন্ত্রের বিরোধিতা করেছি এবং ডেমোক্রাটিক সোস্যালিজমের সমর্থন করেছি।"[১৮]

একনায়কী সমাজব্যবস্থায় (টোটালিটারিয়ান সোসাইটি) মুখ্য খলনায়ক হচ্ছে বুদ্ধিজীবী শ্রেণি—এই সিদ্ধান্ত অরওয়েলের। তাঁর সারাজীবনের আত্মিক বিকাশের প্রতিটি স্তরে তিনি এটি প্রতিষ্ঠা করতে বদ্ধপরিকর ছিলেন। 'নাইনটিন এইটি ফোর' প্রসঙ্গে একটি সাক্ষাৎকার দিতে গিয়ে অরওয়েল বলেছিলেন, "একনায়কী ধারণা সব জায়গায় বুদ্ধিজীবীদের চেতনায় বাসা বেঁধে থাকে।" একদিকে, পৃথিবীর যাবতীয় সমস্যা সমাধানে নিজেদের অপরিহার্যতা সম্পর্কে নিঃসন্দেহ মনোভাব, ফ্যানাটিজম, প্রচলিত নিয়মকানুনের প্রতি অন্ধ আনুগত্য, উচ্চাকাঙ্ক্ষা ইত্যাদি বৈশিষ্ট্যের উপস্থিতি। অন্যদিকে, সাধারণ মানুষের আত্মত্যাগ ও ধৈর্যশক্তির অনুপস্থিতি। এই দুইয়ের মিশ্রণে যে পরিস্থিতির সৃষ্টি হয় তার ফলে বুদ্ধিজীবী শ্রেণি একনায়কী ধারণার প্রতি ঝুঁকে পড়ে বলে অরওয়েলের বিশ্বাস ছিল। তিনি আরো মনে করতেন, বুদ্ধিজীবীরা যদি কোনো মতাদর্শের পৃষ্ঠপোষকতা করে, তাহলে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তা স্বৈরতান্ত্রিক শাসনপদ্ধতি, সিক্রেট পুলিশ ও সমাজব্যবস্থার নানা ত্রুটিবিচ্যুতির পৃষ্ঠপোষকতা।

'প্রকৃত বুদ্ধিবৃত্তি' ও 'নিষ্ক্রিয়, হিসেবি, সুযোগসন্ধানী, সময় বিশেষে কার্যকরী বুদ্ধিবৃত্তি'কে পৃথক করে দেখেছিলেন অরওয়েল। "এর কারণ, আমি 'বুদ্ধিজীবী' শব্দটি সম্পর্কে সিরিয়স। উপহাসপ্রিয়, অন্যকে খোঁচা মারতে পারদর্শী বা তোতা পাখির মতো কেবল পুনরাবৃত্তিতে সক্ষম (বুদ্ধিজীবী)-দের সহ্য করতে পারি না।"[১৯]

অরওয়েলের জীবনীকার বি ক্রিকের মতে, অরওয়েলকে বুদ্ধিজীবী-বিরোধী (অ্যান্টি ইন্টেলেকচুয়াল) ভাবলে ভুল হবে। তিনি শুধু সেইসব বুদ্ধিজীবীর সমালোচনা করেছেন, যারা ফ্যাশনের বশবর্তী হয়ে সবধরনের ঐতিহ্যকে নস্যাৎ করতে চায়। অবশ্য সেইসব ট্র্যাডিশনকে সংরক্ষণ করতে চায়, যা তাদের স্বার্থরক্ষার সহায়ক।[২০]

'নাইনটিন এইটি ফোর'-এর লন্ডন। অরওয়েলের লন্ডন। যেখানে স্বাধীন চিন্তাশক্তির অস্তিত্ব সব থেকে বড়ো অপরাধ। যখন স্বাধীনচেতা মানুষের বেঁচে থাকার আর কোনো অধিকার নেই। মানবজীবনের সবকটি দিক, এমনকী যৌনজীবনও নিয়ন্ত্রিত হয় নির্ধারিত মতাদর্শ দ্বারা। সেখানে 'জনগণের শত্রু' ইমানুয়েল গোল্ডস্টাইন। একজন ইহুদি। সে বিগ ব্রাদারের বিরোধিতা করেছিল। পার্টির একনায়কত্বের অবসান চেয়েছিল। বাকস্বাধীনতা, গণমাধ্যমের স্বাধীনতা, চিন্তার স্বাধীনতার পাশাপাশি স্বাধীনভাবে সমাবেশিত হওয়ার অধিকার দাবি করেছিল। হিস্টিরিয়াগ্রস্তের মতো চিৎকার করে বলেছিল, বিপ্লব প্রতারিত হয়েছে। এইসব অপরাধে সে জনগণের শত্রু। বিশ্বাসঘাতক ও পার্টির পবিত্রতা ক্ষুণ্নকারী গোল্ডস্টাইনকে তাই আত্মগোপন করতে হয়েছে। হয় সে পালিয়েছে সীমান্ত পেরিয়ে অন্য কোনো দেশে বা দেশেরই (ওসেনিয়া) কোথাও আত্মগোপন করে আছে। অন্য কেউ যাতে তার থিওরির প্রতি আকৃষ্ট না হয়ে পড়ে তাই রোজ নিয়ম করে 'ঘৃণা পালন' করা হয়।

প্রত্যেক বাড়িতে, রাস্তায়, অফিসে—সর্বত্র ছড়িয়ে থাকা টেলিস্ক্রিনে ভেসে ওঠে গোল্ডস্টাইনের মুখ। তার একমাথা সাদা চুল জ্যোতির্মণ্ডলের মতো ছড়িয়ে থাকে। ছোটো ছাগল দাড়ি। বুদ্ধিদীপ্ত মুখ। লম্বা নাক। চশমায় ঢাকা চোখ। মুখে কেমন একটা ভেড়া-ভেড়া ভাব। গলার আওয়াজেও ভেড়ার সঙ্গে মিল খুঁজে পাওয়া যায়। টেলিস্ক্রিনে এই মুখ ভেসে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে শুরু হয় 'দু মিনিটের ঘৃণা' (টু মিনিটস হেট) পর্ব। সকলে গোল্ডস্টাইনের মতো বিশ্বাসঘাতকের প্রতি ঘৃণা প্রদর্শন করতে বাধ্য। টেলিস্ক্রিনে যেমন অনুষ্ঠান দেখানো হয় তেমন ওই যন্ত্রটির মাধ্যমে সকলের প্রত্যেকটি আচরণের উপর নজরও রাখা হয়। গোল্ডস্টাইনের থিওরিকে নস্যাৎ করার জন্য এত তৎপরতা সত্ত্বেও রোজ তার গুপ্তচররা 'ভাবনারক্ষীদের' (থট পোলিস) হাতে ধরা পড়ে। জানা যায়, গোপনে সে এক সেনাবাহিনী গড়ে তুলেছে। অন্তর্ঘাতমূলক কাজের মাধ্যমে রাষ্ট্রশক্তি দখলের উদ্দেশ্যে। শোনা যায়, 'দ্য বুক' নামের এক ভয়ানক বইয়ের লেখক এই গোল্ডস্টাইন। সেই বই বিভিন্ন জায়গায় গোপনে ছড়িয়ে পড়ছে বলে গুজব।

এত কিছু সত্ত্বেও গোল্ডস্টাইনের মুখ পরদায় ভেসে উঠলে উইন্সটনের ঘৃণা জাগে না। 'নাইনটিন এইটি ফোর'-এর মুখ্যচরিত্র উইন্সটন। যে ঘেন্না হওয়ার কথা গোল্ডস্টাইনের প্রতি, তা উইন্সটন বোধ করে বিগ ব্রাদার, পার্টি ও ভাবনারক্ষীদের প্রতি। বিগ ব্রাদার, পার্টি ও ভাবনারক্ষীদের সে তীব্র ঘৃণা করে। তা-ও সে 'দু মিনিটের ঘৃণা' প্রদর্শনপর্বে অংশ নেয়। নিতে বাধ্য হয়।

কে এই ইমানুয়েল গোল্ডস্টাইন? অধিকাংশ অরওয়েল-বিশেষজ্ঞের মতে চরিত্রটি ট্রটস্কির ধাঁচে তৈরি। অরওয়েল নিজেও তা মেনে নিয়ে বলেছেন, "গোল্ডস্টাইন ট্রটস্কিরই প্যারোডি। একনায়কী শাসনব্যবস্থার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা, যদি তা অসফলও হয়, একজন ইহুদি বুদ্ধিজীবীর পক্ষেই সম্ভব।"[২১] তখন এমন ধারণাও প্রচলিত ছিল, ট্রটস্কিকে কেন্দ্র করে যে গুজব বাজারে ঘুরে বেড়াত, তার প্রয়োজন ছিল। স্তালিনের প্রোপাগান্ডা সার্থক করে তোলার জন্য এই ধরনের গুজব ছিল খুব জরুরি। এই গুজবের জেরে ট্রটস্কি একজন 'শয়তান'-এ পরিণত হয়েছিলেন।

'নাইনটিন এইটি ফোর' লেখার বহু আগে থেকেই অরওয়েল মনে করতেন, একনায়কী শাসনতন্ত্রের সাফল্যের জন্য এমন একজন 'শয়তানের' উপস্থিতি অপরিহার্য। ট্রটস্কির মৃত্যুর তিনদিন পর অরওয়েল নিজের ডাইরিতে লিখেছিলেন, "ট্রটস্কিকে বাদ দিয়ে রাশিয়া এখন কী করবে? সম্ভবত, ট্রটস্কির জায়গায় আর কারো কথা ওদের ভেবে বের করতে হবে।"[২২]

ব্রিগ ব্রাদারের 'সাম্রাজ্যে' একদিকে যেমন ছিল গোল্ডস্টাইনের মতো প্রতারকরা, তেমনই ছিল কমরেড ওগিলভির মতো আদর্শ চরিত্ররাও। একেকদিন এই আদর্শবান পার্টি সদস্যদের স্মৃতির উদ্দেশে শ্রদ্ধা নিবেদিত হত। স্মৃতিচারণ করত স্বয়ং বিগ ব্রাদার। কয়েকদিন আগেই কমরেড ওগিলভি যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ হারিয়েছে। তবে উইন্সটন জানত, ওগিলভি নামে আসলে কেউ কখনো ছিল না। ওটা একটা ভুয়ো চরিত্র। ভুয়ো কয়েকটা ছবির সাহায্যে সকলের সামনে তাকে একটা প্রতিনিধি-চরিত্র হিসেবে খাড়া করার

চেষ্টাতেই স্মৃতিচারণের আয়োজন।

কমরেড ওগিলভির যখন তিন বছর বয়স তখনই সে একটা ড্রাম, একটা সাব-মেশিনগান ও একটা হেলিকপ্টারের মডেল ছাড়া বাকি সব খেলনা ফেলে দেয়। ছ-বছর বয়সে গুপ্তচর বাহিনীতে যোগ দেয় সে। যদিও এক্ষেত্রে ন্যূনতম বয়সসীমা সাত, কিন্তু ওগিলভির জন্য বিশেষ ছাড় দেওয়া হয়। ন-বছরে সে হয় দলপতি। তার যখন এগারো তখন সে তার কাকাকে 'ভাবনারক্ষী'দের হাতে তুলে দেয়। একদিন কাকার কথাবার্তা আড়ি পেতে শুনে সন্দেহজনক মনে হওয়াতে ভাবনারক্ষীদের খবর দিয়েছিলেন সে। সতেরো বছর বয়সে সে জেলায় 'জুনিয়ার অ্যান্টি-সেক্স লিগ' গড়ে তোলে। উনিশে এমন একটা হাত বোমা তৈরি করে যে তা 'শান্তি মন্ত্রক' (মিনিস্ট্রি অব পিস) দ্বারা গৃহীত হয়। ওই হাত বোমার প্রথম পরীক্ষামূলক ব্যবহারে একত্রিশ জন ইউরেশীয় যুদ্ধবন্দী প্রাণ হারায়। (বিগ ব্রাদারের 'সাম্রাজ্য' ওসেনিয়ার সঙ্গে ইউরেশিয়ার বন্ধুত্ব নয়, যুদ্ধত্ব ছিল।) তেইশ বছর বয়সে যুদ্ধ করতে গিয়ে ওগিলভির জীবনাবসান হয়। ভারত মহাসাগরের উপর দিয়ে প্রয়োজনীয় নথিপত্র নিয়ে হেলিকপ্টারে উড়ে যাচ্ছিল ওগিলভি। শত্রুপক্ষের জেট পিছু ধাওয়া করল। ওগিলভি তার মেশিনগানটা ঘাড়ে ঝুলিয়ে নিল। ওজন বেড়ে গেল অনেকটা। গোপনীয় কাগজপত্র সহ সে ঝাঁপ দিল। তলিয়ে গেল মহাসাগরে।

ভক্তিভরে ওগিলভির ঈর্ষণীয় ত্যাগের কথা স্মরণ করার পর বিগ ব্রাদার তার একাগ্রতা ও পবিত্র জীবনধারার কথাও বলল। জীবনে কোনোদিন মদ বা সিগারেট ছুঁয়েও দেখেনি সে। কোনো ধরনের আমোদ-প্রমোদের ঠাঁই ছিল না তার জীবনে। শুধু প্রতিদিন একঘন্টা করে ব্যায়ামাগারে শরীরচর্চা করত সে। বিয়ে না করার শপথ নিয়েছিল। পার্টির প্রতি চব্বিশ ঘন্টা কর্তব্য পালনের পর সংসারের দায়িত্ব নেওয়া সম্ভব নয় বলে সে মনে করত। 'ইংসোস'-এর নীতি ছাড়া আর কোনো বিষয় নিয়ে সে কথা বলত না। তার জীবনের একমাত্র লক্ষ্য ছিল ইউরেশীয় শত্রুদের পরাজিত করা ও চর, অন্তর্ঘাতক, ভাবনা-অপরাধী (থট ক্রিমিনাল) ও বিশ্বাসঘাতকদের খুঁজে বের করা।

আর ছিল ক্যাথরিনের মতো মেয়েরা 'নাইনটিন এইটি ফোর'-এর লন্ডনে। উইন্সটনের প্রাক্তন স্ত্রী ক্যাথরিন। ডিভোর্স হয়নি, সেপারেশন হয়েছে। কারণ পার্টি ডিভোর্সের অনুমতি দেয় না। তবে সেপারেশনে উৎসাহিত করে সেই সব স্বামী-স্ত্রীকে, যাদের কোনো সন্তানসন্ততি থাকে না। বিবাহের একমাত্র স্বীকৃত উদ্দেশ্য ছিল, পার্টির কর্মীবল বাড়ানোর জন্য সন্তান উৎপাদন করা। পার্টি সদস্যরা যখন বিয়ে করতে মনস্থির করত, তখন তাদের একটি বিশেষ কমিটির কাছ থেকে অনুমোদন সংগ্রহ করতে হত। যদি বোঝা যেত বিয়ের এই প্রস্তাবে পরস্পরের প্রতি দৈহিক আকর্ষণের কোনো ঠাঁই আছে, তাহলে সঙ্গে সঙ্গে আবেদন নাকচ হয়ে যেত। বিবাহে ভালোবাসা অপরাধ না হলেও 'এরোটিসিজম' ছিল চূড়ান্ত অপরাধ। পার্টির প্রকৃত উদ্দেশ্য ছিল নারী-পুরুষের পারস্পারিক সম্পর্ককে এমনভাবে নিয়ন্ত্রণ করা যাতে তারা যৌনসংসর্গ থেকে কোনোরকম আনন্দ না পেতে পারে। ক্যাথরিন পার্টির নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে মেনে চলত। উইন্সটনের সঙ্গে দৈহিক মিলনকে সে বলত 'আওয়ার ডিউটি টু দ্য পার্টি'। যে কোনো কর্তব্য পালনের মতো

যান্ত্রিকভাবে সপ্তাহে একবার নিয়ম করে তারা মিলিত হত। তার আগে, সকালবেলা, ক্যাথরিন মনে করিয়ে দিত উইন্সটনকে, সেদিন সন্ধ্যায় তাদের 'ডিউটি' পালনের কথা, উইন্সটন যেন ভুলে না যায়।

শুধু যৌন সম্পর্কের ক্ষেত্রেই নয়, জীবনের সব ব্যাপারে ক্যাথরিন পার্টির হুকুমমতো চলত। বিয়ের পর উইন্সটন যত তাকে দেখত, ততই তার মনে হত, চেনাশোনা সবার মধ্যে ক্যাথরিনই হচ্ছে 'মোস্ট স্টুপিড, ভালগার, এম্পটি মাইন্ড'। পার্টির সব ভালোমন্দ বিনা দ্বিধায়, বিনা প্রশ্নে গলাধঃকরণের এই ক্ষমতা, পার্টির সব স্লোগান, তা যত অর্থহীনই হোক না কেন, আত্মস্থ করার ক্ষমতা এবং স্লোগান ছাড়া মাথায় আর কোনো চিন্তাভাবনা না রাখার এই পারদর্শিতা দেখে উইন্সটন ক্যাথরিনের একটা নাম রেখেছিল—'দ্য হিউম্যান সাউন্ড-ট্র্যাক'। এ নাম অবশ্য সে মনে মনেই রাখত।

তা-ও উইন্সটন তাকে মেনে নিয়েছিল। তার সঙ্গে মানিয়ে চলার চেষ্টা করত সে। কিন্তু তাদের যৌন জীবনের ভয়াবহতা সে কিছুতেই মেনে নিতে পারেনি। পার্টি তার সম্মোহনী ক্ষমতা নিয়ে হাজির হত দু-জনের মাঝে। ক্যাথরিনকে উইন্সটন স্পর্শ করা মাত্র সে শক্ত হয়ে যেত। জড়িয়ে ধরলে মনে হত একটা কেঠো মূর্তি। আলিঙ্গনাবদ্ধ অবস্থায় ক্যাথরিন তার বরফের মতো শীতল সাদা শরীরের সমস্ত পেশি দিয়ে ঠেলা মেরে উইন্সটনকে সরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছে বলে মনে হত তার। দৈহিক মিলনের সময় ক্যাথরিন বাধা দিত না, সহযোগিতাও করত না, নিজেকে সমর্পণ করত। উইন্সটন এটা কিছুতেই সহ্য করতে পারত না। তাও হয়তো তারা একসঙ্গে থেকে যেতে পারত ; একই ছাদের নিচে যে যার মতো থাকতে যদি রাজি হত। কিন্তু তা হল না। পার্টির প্রতি কর্তব্য পালনের জন্য প্রত্যেক সপ্তাহে নিয়ম করে উইন্সটনকে দৈহিক মিলনে প্ররোচিত করত ক্যাথরিন। তবে শেষপর্যন্ত সে তার কর্তব্য পালনে ব্যর্থ হল। পার্টির সেবার জন্য সন্তান উৎপাদন করতে পারল না সে। উইন্সটন ও ক্যাথরিন আলাদা হয়ে গেল। তাদের বিয়ের আয়ু ছিল পনেরো মাস। পার্টির সব মহিলা সদস্যদেরই ক্যাথরিনের মতো মনে হত উইন্সটনের।[২৩]

'ইংসোস'-এর পবিত্র নীতি চারপাশ থেকে ঘিরে রেখেছে ওসেনিয়াকে, লন্ডনকে, উইন্সটনকে, ক্যাথরিনকে। সকলকে, সবকিছুকে। পবিত্র নীতিগুলি হচ্ছে 'নিউস্পিক', 'ডাবলথিঙ্ক', অতীত সম্পর্কে নীরবতা।

'নিউস্পিক' হচ্ছে বিগ ব্রাদারের সাম্রাজ্য ওসেনিয়ার সরকারি ভাষা। পৃথিবীর মধ্যে একমাত্র ভাষা যার শব্দভাণ্ডার প্রতি বছর সীমিত, আরো সীমিত হয়ে পড়ে। ওসেনিয়ার সব বাসিন্দাকে 'নিউস্পিক' ভাষাতে কথা বলতে হবে, লিখতে হবে, ভাবতেও হবে—পার্টির নির্দেশানুসারে। 'ওল্ড স্পিক' বা প্রচলিত ইংরেজি ভাষাকে বর্জন করার চেষ্টায় সকলে উঠে পড়ে লাগল। কারণ বিপ্লবের সার্থকতার জন্য প্রয়োজন নিউস্পিক। "দ্য রেভোলিউশন উইল বি কমপ্লিট হোয়েন দ্য ল্যাঙ্গুয়েজ ইজ পারফেক্ট। নিউস্পিক ইজ ইংসোস অ্যান্ড ইংসোস ইজ নিউস্পিক।"[২৪] নিউস্পিক অভিধানের নতুন নতুন সংস্করণ প্রকাশ করে ভাষাকে সংকীর্ণতর করার চেষ্টা চলল পুরোদমে। নিউস্পিকের লক্ষ্যই ছিল ভাবনাকে

[illegible]। দেয়ার উইল বি নো ওয়ার্ডস ইন হুইচ টু এক্সপ্রেস ইট।"[২৫]

'ওল্ডস্পিক'-এ হাজার হাজার বিশেষ্য বিশেষণ, ক্রিয়া অদরকারি। সেগুলো ধ্বংস করা দরকার। দরকার 'নিউস্পিক'। যেমন 'গুড' শব্দটির বিপরীত 'ব্যাড' কেন? কোন যুক্তিতে? 'গুড'-এর ঠিকঠাক বিপরীত হওয়া উচিত 'আনগুড'। আবার বেশি পরিমাণে 'গুড' বোঝাতে 'একসিলেন্ট' বা 'স্প্লেন্ডিড'-এর মতো অদ্ভুত শব্দাবলি ব্যবহার নিতান্তই অপ্রয়োজনীয়। তার বদলে 'প্লাসগুড', 'ডাবলপ্লাসগুড' ব্যবহারই যুক্তিযুক্ত। নিউস্পিকে এমনই সব 'লজিকাল' শব্দের সমাবেশ। ২০৫০ সাল নাগাদ 'ওল্ডস্পিক' পুরোপুরি লুপ্ত হয়ে যাবে। অতীতের সব সাহিত্যকীর্তি ধ্বংস করে দেওয়া হবে। চসার, শেক্স্‌পিয়র, মিল্টন, বাইরন—সকলের লেখা নিউস্পিকে অনূদিত হবে। এগুলি পরিবর্তন করে আলাদা করা হবে না তবে ওল্ডস্পিকে যা আছে তার সম্পূর্ণ বিপরীত রূপ দেওয়া হবে। এমনকী 'পার্টি লিটারেচার'-ও পালটানো হবে। (বহুল প্রচলিত পার্টি স্লোগানগুলি ছিল—'ওয়ার ইজ পিস', 'ফ্রিডম ইজ স্লেভারি', 'ইগনোরেন্স ইজ স্ট্রেঙ্গথ')। যেমন—'ফ্রিডম ইজ স্লেভারি' স্লোগানটি অকেজো হয়ে পড়বে, যেহেতু 'ফ্রিডম' বলে কোনো ধারণারই আর অস্তিত্ব থাকবে না। "দ্য হোল ক্লাইমেট অব থট উইল বি ডিফারেন্ট। ইন ফ্যাক্ট দেয়ার উইল বি নো থট, অ্যাজ উই আন্ডারস্ট্যান্ড ইট নাউ। অর্থোডক্সি মিনস নট থিঙ্কিং—নট নিডিং টু থিঙ্ক। অর্থোডক্সি ইজ আনকনশাসনেস,—"[২৬] নিউস্পিক সম্পর্কে বলতে গিয়ে উইন্সটনকে বলল সাইম। উইন্সটনের বন্ধু সাইম একজন ভাষাতাত্ত্বিক, নিউস্পিক বিশেষজ্ঞ। নিউস্পিকের অভিধানের একাদশ সংস্করণ নিয়ে কাজ করছে সে। সাইমের সঙ্গে কথা বলে উইন্সটন বুঝল, খুব শিগ্‌গির সাইম গায়েব হয়ে যাবে। কারণ সে অতিরিক্ত বুদ্ধিমান। সবকিছু পরিষ্কার বুঝতে পারে আর সরাসরি স্পষ্ট ভাষায় কথা বলে। পার্টি এ ধরনের লোককে একবারে পছন্দ করে না। সাইমের হঠাৎ নিখোঁজ হয়ে যাওয়ার আভাস যেন তার চোখেমুখে ফুটে উঠেছে।

চারিদিকের এইসব ঘটনা উইন্সটনকে অস্থির করে তোলে। তার মাথার ভেতরের এই গিজগিজে চিন্তা সে লিখে ফেলার কথা ভাবে। ডাইরি লিখতে শুরু করে সে। ডাইরি লেখার তাগিদ অনুভব করে। ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে কিছু সত্য জানানোর জন্য। যে সত্য সে নিজে অনুভব করে। ডাইরি খুলে সে লিখতে শুরু করে, "টু দ্য ফিউচার অর টু দ্য পাস্ট, টু আ টাইম হোয়েন থট ইজ ফ্রি, হোয়েন মেন আর ডিফারেন্ট ফ্রম ওয়ান অ্যানাদার অ্যান্ড ডু নট লিভ অ্যালোন—টু আ টাইম হোয়েন ট্রুথ এক্সিস্টস অ্যান্ড হোয়াট ইজ ডান ক্যাননট বি আনডান।

ফ্রম দ্য এজ অব ইউনিফর্মিটি, ফ্রম দ্য এজ অব সলিচিউড, ফ্রম দ্য এজ অব বিগ ব্রাদার ফ্রম দ্য এজ অব ডাবলথিঙ্ক—গ্রিটিংস!"

এই ডাইরি লিখতে বসেই প্রায় স্বয়ংক্রিয় ভাবে উইন্সটন একদিন লিখল, 'ডাউন উইথ বিগ ব্রাদার'। গোটা গোটা অক্ষরে, ক্যাপিটাল লেটারে, প্রায় আধপাতা জুড়ে বারবার সে লিখল এই কথাগুলো। যেন একটা ঘোরের মধ্যে। তারপর নিজেই আতঙ্কের চোখে

তাকিয়ে থাকল পাতাটার দিকে। যদিও সে জানত ডাইরি লিখতে শুরু করে যতটা অপরাধ সে করেছে, এই কথাগুলো লিখে তার থেকে বেশি কোনো অন্যায় করেনি। ডাইরি লিখতে শুরু করার দিন থেকেই সে 'ভাবনা অপরাধী' (থট ক্রিমিনাল)। আরো একটা বিষয় উইন্সটন ভালো করে জানত। 'ভাবনা অপরাধ' করে কিছুদিন, এমনকী কয়েক বছর, চোখে ধুলো দিয়ে থাকলেও শেষপর্যন্ত ধরা পড়তেই হবে।

উইন্সটনের আশঙ্কাই সত্যি হল। একদিন সে ধরা পড়ল। তারপরে জটিল মনস্তাত্ত্বিক 'থেরাপি' চলল তার উপর। এর বিস্তারিত বিবরণ অরওয়েল দিয়ে গেছেন। আবার তার উল্লেখ এখানে নিষ্কারণ। পাঠক আশা করি তার সঙ্গে পরিচিত আছেন।

কুটিল এই থেরাপির পর অত্যন্ত ভালো মানুষের মতো, ইঞ্জেকশন করা বাধ্য গিনিপিগের মতো উইন্সটন মেনে নিল ২x২ = ৫ এবং তার ভাবনায়, চিন্তায় আর কোনো দৈন্য রইল না। সমস্ত গ্লানি, মালিন্য সে জয় করল। এককথায়, সে যেন থেরাপি-পূর্ব উইন্সটনকেই জয় করল। শেষে, 'হি লাভড বিগ ব্রাদার।' (অরওয়েল ঠিক এই বাক্যটিই লিখেছেন।) 'নাইনটিন এইটি ফোর' এখানেই শেষ।

আমি কোনো নতুন কথা আপনাদের শোনালাম না। অরওয়েলের 'নাইনটিন এইটি ফোর' এবং তৎসংক্রান্ত আলোচনায় আরো যে ক-টা বই রয়েছে, তাতে একটা গোটা লাইব্রেরি ভরে যায়। অরওয়েলের রচনার উল্লেখ করে এবং উদ্ধৃতি দিয়ে কোনো বিশ্লেষণে লিপ্ত হতে চাইনি। ব্যাখ্যার কোনো অবকাশ নেই এখানে। রাশিয়ার এখনকার অবস্থা ও অবস্থান নিয়ে যে সমস্ত জল্পনা-কল্পনা, ধারণা এবং মতামত রয়েছে, নির্লিপ্তভাবে সে সবের মধ্যে একটা ধারাবাহিকতা খোঁজার চেষ্টা করেছি মাত্র।

৯২-এর গ্রীষ্ম। বরফ উধাও। মস্কো সবুজে সবুজ। রাজনৈতিক বাতাবরণে একটা দমবন্ধ, অস্বস্তিকর অবস্থা থাকলেও প্রকৃতি সদয়। বরফ আর হিমেল কুয়াশায় টানা ছ-মাসের শীতকাল কাটিয়ে গ্রীষ্মের আগমনে আমিও বেশ সজীব। পরীক্ষা শেষ। হাতে সময়ও ঢের। খবর পেলাম মস্কোর 'দোম্ কিনো' (একটি সিনেমা হলের নাম)-তে মাত্র একদিনের জন্য 'নাইনটিন এইটি ফোর' দেখানো হবে। অরওয়েলের কাহিনি নিয়ে গ্রেট ব্রিটেনে তৈরি ছবি। গোটা রাশিয়ায় তখন প্রচণ্ড কমিউনিস্ট-বিদ্বেষ। সোভিয়েত ইউনিয়ন আর নেই। 'বিগ ব্রাদার' বা 'সাদ্দাম হুসেনের পূর্বপুরুষ' স্তালিন পাকাপাকিভাবে 'হত্যাকারী' হিসেবে চিহ্নিত। তিনিই যত নষ্টের গোড়া। তাঁর কারণেই সোভিয়েতের এই হাল—এসব তখন বাজারে ঘুরছে। সে সময়েই একদিন 'দোম্ কিনো'-তে দুটো শো চলল 'নাইনটিন এইটি ফোর'-এর। আমিও দেখতে গেলাম।

যেমন লেখা তেমনই তার চিত্রায়ণ। গ্রেট ব্রিটেনের আমব্রেলা-রোজেনব্লুম/ভার্জিন ফিল্মস্-এর ছবি। ৮৪ সালেই তৈরি। পরিচালক—মাইকেল র‍্যাডফোর্ড। অভিনয়ে ছিলেন জন হার্ট, রিচার্ড বার্টন, সুজানা হ্যামিলটন, সিরিল সুজাক, জর্জ ফিশার, জেমস ওয়াকার প্রমুখ। ৮৪-তেই ছবিটির প্রদর্শনী শুরু হয়ে যায়।

গল্প বিশেষ বলার নেই। মূল কাহিনি অনুরূপ। কিন্তু যা দেখলাম, যা দেখছিলাম, সত্যিই সহ্য করার মতো নয়। রুশি দর্শকরা মাঝপথে হল ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন। আমার

সঙ্গো ছিল গালিয়া। বলছিল, "গা গোলাচ্ছে"। খোদ মস্কোতে, বিশ্ববিপ্লবের বিজয়কেতন যেখানে উড়েছে, সেখানে নাইনটিন নাইনটি টু-এর একদিন 'নাইনটিন এইটি ফোর' দেখলাম।

গালিয়া সাধারণত আমার সঙ্গো খুব বেশি রাজনৈতিক আলোচনা করত না। ওদিন রাতেই, প্রায় মাঝরাত পর্যন্ত, অনেক কথা বলল আমায়। বলল, "আমাদের মেনে নিতে কষ্ট হয়, যাতে আমরা মুক্ত হয়েছিলাম, দুনিয়ার লোককে একটা রাস্তা দেখিয়েছিলাম, তা-ই আমাদের ভেঙেচুরে শেষ করল। এ এক 'ত্রাগেদিয়া' (ট্র্যাজেডি)। এর এক ধারাবাহিকতা আছে।"

এই ধারাবাহিকতার আর একটি উপাদান পেলাম ৯৩-এর শেষে কলকাতায় ফিরে। 'ব্রেকিং উইথ মস্কো'। লেখক-আর্কাদি নিকোলায়েভিচ শেভচেঙ্কো। লেখকের পরিচয় আগেই দিয়েছি। আর একটি মার্কিনি উপাদান। তবে ধারাবাহিকতার উপাদান। সে কারণেই তথ্য হিসেবে বিবেচ্য।

৭৮ সালের গোড়ার দিকের কথা। শেভচেঙ্কো তখন রাষ্ট্রপুঞ্জের 'আন্ডার সেক্রেটারি জেনারেল ফর পলিটিকাল অ্যান্ড সিকিউরিটি কাউন্সিল অ্যাফেয়ার্স' পদে আসীন। ৭৩ সাল থেকে তিনি এই দায়িত্বে ছিলেন। এর আগে ৭০-এ গ্রোমিকো তাঁকে ব্যক্তিগত রাজনৈতিক উপদেষ্টা পদে নিযুক্ত করেন। গ্রোমিকোর ছেলের সহপাঠী ছিলেন শেভচেঙ্কো। শেভচেঙ্কোর স্ত্রী আবার শ্রীমতী গ্রোমিকোর ঘনিষ্ঠ। সোভিয়েত এলিট সমাজের এক উল্লেখযোগ্য প্রতিনিধি, আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে সোভিয়েত স্বার্থরক্ষার ক্ষেত্রে এক গুরুত্বপূর্ণ মুখ, এহেন দায়িত্বশীল এক সোভিয়েত নাগরিক শেভচেঙ্কো, ৭৮-এর গোড়াতে, চাকরিসূত্রে নিউ ইয়র্কে বসবাসকালীন আমেরিকার চর বনে গেলেন। এফ বি আই এবং সি আই এ-র দয়াভিক্ষা করে নিজের দেশের গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি পাচার করতে শুরু করলেন। সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গো সব সম্পর্ক ছিন্ন করার সিদ্ধান্ত নিলেন—"ইট হ্যাড অল বিগান সাম উইকস্ বিফোর ইন মাই অফিস অ্যাট দ্য ইউনাইটেড নেশনস। দেয়ার আই মেড মাই ফাইনাল ডিসিশন টু ব্রেক উইথ দ্য সোভিয়েট সিস্টেম।"[২৮]

শেভচেঙ্কোর এই সিদ্ধান্তের কথা বাড়ির লোকরাও আগে থেকে জানত না। স্ত্রী বা দুই ছেলেমেয়েকে কিছু বলেননি তিনি। স্ত্রী তার সঙ্গো থাকলেও ছেলেমেয়ে ছিল মস্কোতে। মেয়ে তখনও নাবালিকা, স্কুল পড়ুয়া। কারোর মতামত না নিয়েই শেভচেঙ্কো 'দলবদলের' সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। জবাবদিহির ভঙ্গিতে স্ত্রীকে একটা চিঠি লিখলেন, মার্কিন শিবিরে পাকাপাকি ভাবে ঠাঁই নেওয়ার ঠিক আগের মুহূর্তে। "...আই ক্যান নাইদার লিভ নর ওয়ার্ক উইথ পিপল আই হেট, ওয়েদার ইন নিউইয়র্ক অর ইন মস্কো।... উই ক্যান বিগিন আ নিউ অ্যান্ড ফ্রি লাইফ অ্যাব্রড হোয়্যার পিপল আর নট পারসিকিউটেড অ্যান্ড অ্যাফ্রেড।"[২৯]

মার্কিন দেশে 'মুক্ত জীবন' যাপনের স্বপ্নে বিভোর শেভচেঙ্কো স্ত্রীকেও তাঁর স্বপ্নের অংশীদার করতে চেয়েছিলেন। তবে তা হয়ে ওঠেনি। তাঁর স্ত্রী আত্মহত্যা করেন। ছেলেমেয়ে মস্কোতেই থেকে যায়। পরে শেভচেঙ্কো এক মার্কিন মহিলাকে বিয়ে করেন।

৮৫ সালে তিনি আত্মজীবনীমূলক 'ব্রেকিং উইথ মস্কো' বইটি লিখতে আরম্ভ করলেন—

"আমার শৈশব আর যৌবনকালে চারপাশের সমাজ ও রাজনৈতিক ব্যবস্থা আমাকে ছাঁচে ফেলে একজন 'সুস্থ স্বাভাবিক সোভিয়েত নাগরিক' হিসেবে গড়ে তুলতে প্রবৃত্ত হল। মাঝেমধ্যে সোভিয়েত জীবনধারার কিছু অন্ধকার দিক আমার মধ্যে বিরক্তির সৃষ্টি করত, কথায় আর কাজের ফারাক আমার মধ্যে এক ঘৃণা মিশ্রিত ক্রোধের উদ্রেক করত। কিন্তু সব গলদের একটা চটজলদি বিশ্লেষণ খাড়া করা হত : সোভিয়েত ইউনিয়ন আদর্শ দেশ যেখানে এক স্বর্ণযুগ গড়ে তোলা হবে খুব শীঘ্রই এবং যেহেতু কোনো নতুনই কঠোর সংগ্রাম বা ভুলত্রুটি ছাড়া জন্ম নিতে পারে না, সেহেতু...ইত্যাদি, ইত্যাদি। আমি এবং আমার সমবয়সীরা একটা নির্ধারিত নকশায় চিন্তা করতে শিখলাম (আমাদের শেখানো হল)। যান্ত্রিকভাবে ফর্মুলায় বাঁধা কথা বলতেও শিখে গেলাম ধীরে ধীরে। কমিউনিস্ট পার্টির সব শিক্ষা, সব সিদ্ধান্ত, সব মতামত প্রশ্নহীন বিশ্বাস করতে এবং অন্ধভাবে অনুসরণ করতেও শেখানো হল আমাদের। আমাদের শিক্ষকরা সবসময় আমাদের বিশ্বাস করতে বাধ্য করতেন যে, সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের নাগরিক হিসেবে বিশ্বের বাকি লোকদের কাছে আমরা মডেল বা উদাহরণরূপে নিজেদের গড়ে তুলতে বাধ্য, যেমন করেছিলেন আমাদের বাবা-মা, আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব প্রমুখ 'বহুজাতিক যৌথ সোভিয়েত সমাজের সদস্যবৃন্দ'।"[৩০]

"১৯৫৬। ২০তম পার্টি কংগ্রেস। গোপন ভাষণে খ্রুশ্চেভ স্তালিনের মুখোশ টেনে খুলে ফেললেন। প্রচণ্ড ধাক্কা খেলাম। সোভিয়েত ব্যবস্থার উপর আমার আস্থা প্রায় হারিয়ে গেল। সব কিছু যেন তাসের ঘরের মতো ভেঙে পড়ল। যা কিছু আমার পবিত্র বলে মনে হত—স্তালিনের মহত্ত্ব, পার্টির নির্ভুল দৃষ্টিভঙ্গি, পার্টির ন্যায়নিষ্ঠা, সাধারণের এবং দেশের ভাগ্য নিয়ে পার্টির সদাসতর্ক মনোভাব—সব যেন নিমেষে মিথ্যা হয়ে গেল। আমার চারপাশের পৃথিবীটা একেবারে ওলোটপালোট হয়ে গেল। স্তালিনের নেতৃত্বে যে নৃশংস ব্যবস্থা কায়েম হয়েছিল তার কোনো কারণ বা ব্যাখ্যা খুঁজে পাওয়া গেল না। ...আমাদের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হল, দোষীদের খুঁজে বের করা হবে এবং ওই ধরনের ঘটনা ভবিষ্যতে আর কখনো ঘটবে না।"[৩১]

গর্বাচভের পেরিস্ত্রোইকার অনেক আগে খ্রুশ্চেভও একবার 'নবনির্মাণ'-এর গল্প শুনিয়েছিলেন সোভিয়েতবাসীকে। শেভচেঙ্কো লিখলেন—"তারপর খ্রুশ্চেভ দৈনন্দিন জীবনের উপর লাগামটা আলগা করে দিলেন—সংস্কৃতি, সাহিত্য, সর্বক্ষেত্রেই। এক স্বর্ণযুগের আগমনীবার্তা শোনালেন। সাধারণ মানুষ এক উজ্জ্বল ভবিষ্যতের স্বপ্নে ডুবে যেতে শুরু করল। সেই কিংকর্তব্যবিমূঢ় অবস্থায় হতভম্ব সকলে খ্রুশ্চেভকে বিশ্বাস করল এবং তাঁর সব প্রতিশ্রুতি অচিরেই পূর্ণ হবে, এমন ধারণার বশবর্তী হল। চারিদিকে যেন একটা খোলা হাওয়ার ঢেউ বইতে শুরু করল ; সোভিয়েত বৈদেশিক নীতির ক্ষেত্রেও। তা সত্ত্বেও, কিছুতেই স্পষ্টভাবে বুঝে উঠতে পারছিলাম না, স্তালিনিজম কীভাবে বাস্তবায়িত হল ! সন্ত্রাসের পুরো খতিয়ান খ্রুশ্চেভ কখনোই দেননি। এমনকী, এক্ষেত্রে পার্টি ও গোটা ব্যবস্থারও যে একটা দায়িত্ব আছে, সে ব্যাপারেও তিনি নীরব থাকেন। কিন্তু তা-ও আমি

একটা ব্যাখ্যার খোঁজে থাকলাম।

"কিন্তু বেশিদিন এই স্বপ্নে রং থাকল না। কিউবা অভিযান, বার্লিনের প্রাচীর, নিরস্ত্রীকরণের জন্য আলোচনার বদলে কেবল প্রোপাগান্ডার ছড়াছড়ি, দেশে অর্থনৈতিক দুরবস্থা, অপূর্ণ প্রতিশ্রুতির বোঝা, পার্সোনালিটি কাল্টের পুনর্জন্ম, পৌত্তলিকতাবাদের পুনরাবির্ভাব (এবার বেদিতে আসীন খ্রুশ্চেভ)—সব কিছু মিলিয়ে শুরু হল এক বিশ্বাসভঙ্গের পালা। খ্রুশ্চেভের জমানা সাধারণের মনে যে উদ্যম, যে আশার ছোঁয়া লাগিয়েছিল, তা মরীচিকার মতো হারিয়ে গেল।

ছয়ের দশকে খ্রুশ্চেভের নেতৃত্ব সম্পর্কে মোহভঙ্গ ও তাঁর পতনের পর আমার মধ্যে একটা সাবধানী আশা জেগে উঠল। তখন নতুন নেতা। তিনি কেমন তখনও জানি না, তবুও আবার ভাবতে শুরু করলাম পজিটিভ একটা পরিবর্তনের কাল আসন্ন।"[৩২]

নেতৃত্বের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে হতাশা মুছে ফেলে আবার নতুন করে স্বপ্ন দেখতে শুরু করত সোভিয়েতের সাধারণ মানুষ। বারবার, প্রজন্মের পর প্রজন্ম। এটা যেন তাদের প্রকৃতিতেই ছিল।

ইতিমধ্যে এসে গেল ৭০ সাল। শেভচেঙ্কো গ্রোমিকোর রাজনৈতিক উপদেষ্টা পদে নিযুক্ত হলেন। এর ফলে পলিটব্যুরো ও সেন্ট্রাল কমিটির একাধিক প্রভাবশালী সদস্যকে খুব কাছ থেকে দেখার সুযোগ পেলেন তিনি। সেই দেখার কথা তিনি লিখেছেন নিজের আত্মজীবনীতে—

"ক্রেমলিনে আসীন নেতাদের সঙ্গে সাধারণ সোভিয়েত নাগরিকের দূরত্ব ছিল অপরিসীম। কাজেই স্বাভাবিকভাবেই তাঁদের পক্ষে সাধারণের সমস্যা বোঝা বা অনুভব করা ছিল অসম্ভব। সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েতের, প্রলেতারীয় রাষ্ট্রের কর্ণধাররা মাটির ছোঁয়া থেকে বহুদূরে সরে গিয়েছিলেন। এক্ষেত্রে তাঁরা ছিলেন পুরোপুরি বুর্জোয়া। ক্ষমতার উত্তাপ তাঁদের বুর্জোয়া বানিয়ে ছেড়েছিল, উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে গ্রোমিকোর কথা। গত চল্লিশ বছরে মস্কোর রাস্তায় তিনি একবারও পা ফেলেননি। মস্কোকে তিনি দেখেছেন ছুটন্ত গাড়ির বন্ধ কাচের ওপার থেকে। অন্য প্রায় সব নেতাও তাঁরই পথানুসারী। গিল্টি করা, পুরোনো, নিশ্চুপ ক্রেমলিনের করিডর যেন একটা জাদুঘর—আইডিয়ার জাদুঘর ; দেখা যাচ্ছে, অথচ অম্বরের (তৈলস্ফটিক) মধ্যে মাছির ফসিলের মতো আটকে আছে।

"সোভিয়েত শাসনধারার অনেক বৈশিষ্ট্যই সর্বজনবিদিত। আমার মতে, এর মধ্যে মূল বৈশিষ্ট্যটা হচ্ছে ক্রেমলিনের শাসকরা ক্ষমতা নিজেদের হাতের মুঠোয় রাখতে সবকিছু করতে প্রস্তুত ছিলেন এবং নিজেদের ব্যক্তিগত জীবনের চাহিদা যত বেশি সম্ভব পূরণেও ছিলেন সীমাহীন আগ্রহী। তাঁদের চাহিদাগুলিও ছিল সমাজের সুবিধাভোগী গোষ্ঠীর চিহ্নবাহী।

"ব্রেজনেভের অহংবোধ ছিল ভয়ানক। নিজের 'কাল্ট অব পার্সোনালিটি' তিনি খুব যত্নসহকারে লালন করতেন। নিজেই নিজেকে অজস্র পদক ও উপাধিতে ভূষিত করেন তিনি। এক্ষেত্রে তিনি খ্রুশ্চেভকেও ছাড়িয়ে গিয়েছিলেন। ব্রেজনেভের অনুচর ও পারিষদদল

তাঁকে 'এক সুদক্ষ পরিশ্রমী কর্মী', 'জীবদ্দশাতেই কিংবদন্তি', ইত্যাদি নামে অভিহিত করতে এতটুকু সংকোচবোধ করেনি। যদিও সকলেই খুব ভালো করে জানত, ব্রেজনেভ ছিলেন একজন সাধারণ মানের কর্মী, অতি সাধারণ মেধাসম্পন্ন।"৩৩

নিজের পড়ুয়া-জীবনের কথাও শেভচেঙ্কোর মনে পড়েছে—

" 'মস্কো স্টেট ইন্সটিটিউট অব ইন্টারন্যাশনাল রিলেশনস' (ম্‌গিমো)-এ যখন পড়তাম, আমাদের প্রফেসররা বারংবার আমাদের মাথায় ঢোকানোর চেষ্টা করতেন যে, সোভিয়েত সমাজ শ্রমিক শ্রেণি কর্তৃক শাসিত (দ্য সো-কল্‌ড ডিক্টেটরশিপ অব দ্য প্রোলেটারিয়াট)। প্রকৃতপক্ষে প্রলেতারিয়েতকে বঞ্চিত করত, ঠকাত (এখনো ঠকায়) 'এলিট' শ্রেণি। দু-একজন প্রলেতারিয়েতকে অবশ্য 'হিরোস অব সোসালিস্ট লেবার' খেতাবে ভূষিত করা হয়, নেহাত-ই প্রোপাগান্ডার স্বার্থে। আমাদের ছায়াছবিতে, নাটকে, সংবাদপত্রে, পত্রিকায়, পাঠ্যপুস্তকে সোভিয়েত সমাজকে শ্রমজীবী শ্রেণির স্বর্গ হিসেবে বর্ণনা করা হত। আসলে যে তা ছিল না, এটা আমি বুঝতাম। সবাই যে এখানে সুখের সাগরে ভাসছে না, এটা না দেখতে পাওয়ার মতো অন্ধ আমি ছিলাম না।

"মার্কস, মার্কসবাদ, লেনিনবাদ ও রুশ বিপ্লব এবং তার নেতাদের সম্পর্কে বহু তথ্য আমাদের কাছে গোপন রাখা হত। ট্রটস্কির কোনো রচনা কোথাও পাওয়া যেত না। বিদেশে গিয়ে প্রথম আমি রুশ কমিউনিস্ট পার্টির বিশ্বাসযোগ্য একটি ইতিহাস পড়ার সুযোগ পাই। তার আগে ট্রটস্কি সম্পর্কে জানতাম, তিনি বিশ্বাসঘাতক ছিলেন। জিনোভিয়েভ, কামেনিয়েভ, বুখারিন প্রমুখ উল্লেখযোগ্য নেতাদের কোনো রচনা পড়ারও সুযোগ পাইনি আমরা। কারণ, এদের নামের আগেও 'বিশ্বাসঘাতক', 'দেশদ্রোহী', 'জনগণের শত্রু' ইত্যাদি তকমা লাগানো হত। একইভাবে আমেরিকায় বসে আমি প্রথম জানতে পারি যে, কার্ল মার্কস ছিলেন সেন্সরশিপের ঘোরতর বিরোধী। তিনি বলেছিলেন, সেন্সরশিপ একটি নৈতিক অপরাধ যা কেবল ক্ষতিকারক ফলাফলই দিতে পারে।

"মার্কসবাদ বিষয়ে আমাদের পড়াশোনার ক্ষেত্র ছিল সংকীর্ণ। সব থেকে বেশি স্তালিনের লেখা পড়তে হত আমাদের। মার্কস ও লেনিনের রচনার অংশবিশেষও আমাদের পাঠ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। এঙ্গেলস ও মাও-সে-তুঙের রচনা নির্বাচনের সময় যথেষ্ট বাছবিচার করা হত।" ৩৪

এই ট্রাডিশন চলেছিল পেরিস্ত্রোইকার আমলেও। সিপিএসইউ-এর জেনারেল সেক্রেটারির লেখা বই (তাঁর নামে বইগুলি প্রকাশিত হত, লেখা তাঁর নিজের কিনা, সে প্রশ্ন স্বতন্ত্র) বা তাঁর ভাষণের অংশবিশেষ, প্যাট্রিস লুমুম্বা ইউনিভার্সিটিতে পড়ার সময়, আমাদেরও পড়তে হয়েছে। মাওয়ের কথা বা চীনের সাংস্কৃতিক বিপ্লবের প্রসঙ্গ কোনোরকমে বুড়ি ছোঁয়ার মতো করে এসেছিল আমাদের পাঠক্রমে। স্তালিন, খ্রুশ্চেভ বা ব্রেজনেভের কোনো রচনা আমাদের পড়তে হয়নি, বলাই বাহুল্য।

আবার ফিরে আসি শেভচেঙ্কোর কথায়—

"সরকারি সোভিয়েত শিক্ষাব্যবস্থা অনুসারে স্বাধীন আচরণ বা চিন্তা বলতে প্রশ্নহীন আজ্ঞা বহনের সর্বশ্রেষ্ঠ পন্থাকেই বোঝানো হত। অর্থাৎ দলে দলে সোভিয়েত ভূমিদাস

গঠনের পাকাপাকি বন্দোবস্ত। একেকসময় আমার মনে হত চারপাশে সকলে যেন চোখ বন্ধ করে আছে। হাতে গোনা কয়েকজন শুধু দুটো চোখ খুলে রাখতে পেরেছে। ১৭-র বিপ্লবে যাঁরা সক্রিয় ভূমিকা নিয়েছিলেন তাঁদের অধিকাংশকেই তিনের দশকে হত্যা করা হয়। যাঁরা জীবিত ছিলেন তাঁরাও এমনভাবে সন্ত্রাস ও দুর্দশার শিকার হয়েছেন যে, স্তালিন বা সোভিয়েত সমাজব্যবস্থার স্বরূপ সম্পর্কে মুখ বন্ধ রাখতে বাধ্য হয়েছেন।

"প্রত্যেক বছর হেমন্তর শুরুতে 'মগিমো'-র ছাত্রছাত্রীরা আলুখেতে কাজ করতে যেত। (প্রায় সব সোভিয়েত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকেই সোভিয়েত ছাত্রছাত্রীকে, যারা কমসামোল সদস্যও ছিল বটে, এরকম খেতে বা জমিতে কাজ করতে যেতে হত)। মস্কোর কাছাকাছি বিভিন্ন যৌথ খামারেও যেতাম, কারণ যৌথ খামারগুলিতে বরাবরই কর্মীর খুব টানাটানি থাকত। কর্মীদের অধিকাংশই ছিল মহিলা। এদের দুরবস্থা ছিল কল্পনাতীত। বেশিরভাগই নোংরা, ঘিঞ্জি,অপরিষ্কার, ভাঙাচোরা কামরায় বাস করত, জলের টানাটানি, বিদ্যুৎ সংযোগ ছিল না। মস্কোর খুব কাছাকাছি ছিল এদের এই বসতি। স্বাভাবিকভাবেই যৌথ খামারের জন্য খাটতে এরা উৎসাহ পেত না। নিজেদের ছোটো এক টুকরো জমিতে সামান্য কিছু ফলিয়ে আশপাশের বাজারে তা বিক্রি করে দু-চার কোপেক রোজগারের চেষ্টা করত। (মস্কোর সরকারি দোকানে সবজি বা ফল যা পাওয়া যেত বাজারে তার থেকে উন্নত মানের আলু পেঁয়াজ ইত্যাদি চাষিরা নিয়ে আসত। নিজেদের জমির ফসল সরকারি দামের তুলনায় অনেক বেশি দামে বিক্রি করত তারা)।

"ছাত্রছাত্রীরা যেত ওইসব যৌথ খামারে কাজ করে কর্মীবলের খামতি পূরণ করতে। তাদের অধিকাংশই চাষবাসের কিছু বুঝত না। তা-ও তাদের প্রত্যেক বছর যেতে হত। তবে এজন্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলিতে ক্লাস বন্ধ থাকত না। ফিরে এসে পড়াশোনা সামাল দিতে অনেকে বেশ অসুবিধায় পড়ত।

" 'মগিমো'-তে পড়াশোনা করার সময় স্তালিনীয় আমলের গণসন্ত্রাসের কথা আমরা কিছুই জানতাম না। স্তালিন ছিলেন আমাদের সামনে একমাত্র আদর্শ। তাঁকে ছাড়া আর কোনো বিকল্পের কল্পনাও ছিল স্বপ্নাতীত। যে কোনো ভুলত্রুটির জন্য আমরা স্তালিন বা গোটা সমাজব্যবস্থাটাকে দায়ি না করে ব্যক্তিবিশেষের ত্রুটি বলে গণ্য করতাম। 'সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসনী' শক্তির চরবৃত্তিও যে আমাদের অনেক ক্ষতির মূলে, এ বিশ্বাস আমাদের যুবসম্প্রদায়ের মধ্যে যথেষ্ট দৃঢ়মূল ছিল।

"তখন চারিদিকে শুধু গুজগুজ, ফুসফুস। সবাই সবাইকে সন্দেহ করে। একে অন্যকে গুপ্তচর বলে মনে করে। ছোটোবড়ো সবক্ষেত্রে শুধু সন্দেহ আর সন্দেহ।

"৫৩-র জানুয়ারির এক সকালে 'প্রাভ্‌দা'তে একটা নিবন্ধ প্রকাশিত হল। নাম—'অন্তর্ঘাতমূলক কাজের সঙ্গে জড়িত চিকিৎসকদল গ্রেপ্তার'। এই 'ডক্টরস প্লট' মূলত স্তালিনের ইহুদি-বিরোধী মনোভাবেরই প্রতিফলন। মস্কো তখন গুজবে একেবারে ঠাসা। অনেকেই বিশ্বাস করতে তৈরি ছিল যে ইহুদি ডাক্তাররা তাদের রোগীদের ক্যান্সারে বা সিফিলিসে সংক্রামিত করতে বিশেষ ইঞ্জেকশন ব্যবহার করছেন। ইহুদি ওষুধ-ব্যবসায়ীরা নাকি আমেরিকার এজেন্ট হিসেবে কাজ করে। সাধারণ মানুষকে কীট থেকে তৈরি বিশেষ

একধরনের ওষুধও নাকি তারা বিক্রি করেছেন বলে রটল।

"নিবন্ধটি পড়ে আমার ধারণা হল, স্বয়ং স্তালিনই এর লেখক। কিন্তু 'প্রাভ্দা'তে এমন গুরুতর অভিযোগ সরাসরি ছাপার কোনো ভিত্তি ছিল কিনা, এ প্রশ্নটা রয়েই গেল।

"সোভিয়েত সমাজে ইহুদি-বিরোধী মনোভাবের একটা প্রকৃষ্ট উদাহরণ হল এই নিবন্ধটি। পরে আরো স্পষ্টভাবে বুঝেছি এই বিদ্বেষের শিকড় কত গভীরে প্রোথিত ছিল! আমাদের ইন্সটিটিউটে (ম্গিমো) ইহুদিদের প্রবেশাধিকার ছিল না। যেমন প্রবেশাধিকার ছিল না মেয়েদেরও। ইহুদি ও মহিলারা ব্রাত্য ছিলেন সোভিয়েত বিদেশমন্ত্রকেও। প্রাভ্দাতে নিবন্ধটি প্রকাশিত হওয়ার পর দু-মাসেরও কম সময়ের মধ্যে স্তালিনের মৃত্যু ওই ইহুদি ডাক্তারদের বাঁচিয়ে দিল।

"৫৩-র মার্চে স্তালিনের মৃত্যু এক ভয়ানক আঘাতের মতো এল। তাঁর শাসনকালে ত্রাণকর্তা হিসেবে স্তালিনকে পূজো করতে শেখানো হয়েছিল আমাদের। আমাদের 'ভোঝদ্' (মহান নেতা)-এর প্রতি আধা-ধার্মিক তোষামোদের কোনো সীমা ছিল না। ইন্সটিটিউটের সকলকে 'দ্য শর্ট বায়োগ্রাফি অব স্তালিন' প্রায় মুখস্থই করতে হত। এই জীবনীর বেশ কিছু অংশ ছিল স্তালিনের নিজেরই লেখা, যেখানে তিনি নিজেকে ক্ষমতা ও সততার আশ্চর্যজনক মিশ্রণে একজন সুপারম্যান হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। আমরা এই অংশগুলি পড়ে বিশ্বাস করতাম এবং তাঁকে ভালোবাসতাম। তবে এর সঙ্গো তুলনাযোগ্য লেনিনের কোনো জীবনী তখন ছিল না।

"পশ্চিমি কিছু বিশেষজ্ঞ তখন স্তালিনের মধ্যে কয়েকটি ত্রুটির কথা বারংবার উল্লেখ করেন। যেমন—লেনিনের স্থান দখল করতে তাঁর অপরিসীম লোভ এবং জর্জিয়ান অ্যাকসেন্টে তাঁর নির্বোধ কথা বলার ধরন। আর আমরা ভাবতাম স্তালিনের মতো সুবক্তা হয় না। সকলে মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে তাঁর কথা শুনত। তাঁর লেখা প্রতিটি ছত্র যেন মহান সাহিত্যকীর্তির মর্যাদা পেত। অন্ধকার রাতে রেড স্কোয়ার চত্বর দিয়ে হেঁটে যাওয়ার সময় ক্রেমলিনের জানলা দিয়ে আলো দেখতে পেয়ে সাধারণ মস্কোবাসী ভালোবাসা মেশানো সুরে প্রশংসা করে বলত, 'স্তালিন আমাদের জন্য অক্লান্তভাবে এখনও পরিশ্রম করে চলেছেন। আমাদের ভালোর জন্য সর্বদা চিন্তা করে চলেছেন তিনি।'

"স্তালিনের মৃত্যু সকলকে দিশেহারা করে তুলল। সাধারণের এই দিশেহারা ভাব বোঝাতে সোভিয়েত কবি ইভগেনি ইভ্তুশেঙ্কো লিখলেন, 'সারা দেশ যেন পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়ে পড়ল। সকলে স্তালিনের হেফাজতে আছি, এমনটা ভাবতেই আমরা অভ্যস্ত হয়ে পড়েছিলাম। হঠাৎ তাঁর অনুপস্থিতিতে সবাই কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়ল। গোটা রাশিয়া কাঁদল। আমরা সত্যিই কাঁদলাম, দুঃখের কান্না—আর সম্ভবত ভবিষ্যতের কথা ভেবে ভয়েরও কান্না।'

"স্তালিনের অন্ত্যেষ্টির দিনটা ছিল ঝোড়ো হিমেল হাওয়ায় ভরা। রেড স্কোয়ারের ভিড়ে গিয়ে দাঁড়ালাম। দূর থেকে দেখলাম সোভিয়েত নেতারা আর স্তালিনের আত্মীয়রা মিছিল করে যাচ্ছেন। তাঁদের মধ্যে স্তালিনের ছেলে ভাসিলি-ও ছিল। (এয়ারফোর্স জেনারেল ছিল ভাসিলি) কফিনটা একটা কামানবাহী গাড়ির উপর রাখা ছিল। মালেঙ্কভ, বেরিয়া,

মোলাতভ প্রয়াত একনায়কের উচ্চপ্রশংসা করে ভাষণ দিলেন। বেরিয়া একটা বিরাট কালো টুপি চোখের উপর নামিয়ে, ভারী একটা ওভারকোট পরে রাসপুটিনের মতো দাঁড়িয়েছিলেন। বেরিয়া যখন ভাষণ দিচ্ছিলেন, স্তালিনের কফিনের কাছে তখন একটা জটলা খেয়াল করলাম। কী হচ্ছে, অতদূর থেকে বুঝতে পারছিলাম না। পরে শুনলাম, ভাসিলি পুরোপুরি মাতাল অবস্থায় বেরিয়াকে যাচ্ছেতাই ভাবে গালাগালি দিচ্ছিল। তার বাবার হত্যাকারী বলে চিহ্নিত করে চেঁচাচ্ছিল।

"স্তালিন যখন জীবিত ছিলেন, তখনও ভাসিলি নানারকম হইহট্টগোল করত আর গোটা মস্কোতে এই নিয়ে গুজব ছড়িয়ে পড়ত। তখন চালু গল্প ছিল যে, ভাসিলি যদিও প্রায় সব সময় মাতাল থাকত, তবু প্রচণ্ড জোরে গাড়ি চালাত। এভাবে সে অনেক দুর্ঘটনাও ঘটিয়েছিল। এমনকী, অনেকের প্রাণও নিয়েছিল। সে বেশ হুল্লোড়ে-জীবন কাটাত, তবে নিজের কোনো ক্ষতি করত না। পরিণামে হালকা শাস্তি বা মৃদু ভর্ৎসনাতে সে পার পেয়ে যেত।

"তবে এবার তেমন হল না। ভাসিলিকে মাশুল গুনতে হল। বেরিয়া তাকে ক্ষমা করলেন না। অপমানের শোধ তুললেন। স্তালিনের অন্ত্যেষ্টির কয়েকদিন পরেই একটা পানশালায় গণ্ডগোলের ঘটনায় জড়িয়ে পড়ল ভাসিলি। প্রেসিডিয়মের প্রভাবশালী সদস্য বেরিয়া এ খবর পেলেন। তার কিছুদিনের মধ্যেই ভাসিলিকে অত্যন্ত অসম্মানজনকভাবে এয়ারফোর্স থেকে বরখাস্ত করা হল আর আট বছরের জন্য জেলেও পাঠানো হল। এরপর তাকে নির্বাসন দিয়ে কাজানে পাঠিয়ে দেওয়া হল। অতিরিক্ত মদ্যপানের ফলে ৬২ সালে সেখানে মারা গেল ভাসিলি।

"গিয়োর্গি এম মালেঙ্কভ যখন পার্টির ফার্স্ট সেক্রেটারি ও প্রধানমন্ত্রী হলেন, তখন আমরা অবাক হইনি। স্তালিনের মৃত্যুর ঠিক আগে মালেঙ্কভের প্রভাব প্রতিপত্তি বেড়ে গিয়েছিল ; যেমন হয়েছিল ভিচিস্লাভ মোলাতভ ও বেরিয়ার ক্ষেত্রেও। গুজব রটেছিল, মালেঙ্কভ লেনিনের আত্মীয়। অবশ্য এমন কথাও শোনা যেত যে, স্তালিনের ন্যায্য উত্তরাধিকারী হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য মালেঙ্কভ নিজেই এমনটা রটিয়েছিলেন। ক্ষমতা পাওয়ার পরই মালেঙ্কভ অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক নীতির ক্ষেত্রে চটজলদি কিছু রদবদল করতে শুরু করলেন। আমার মনে আছে, নাগরিকদের জীবনযাত্রার মান উন্নত করার জন্য এবং কৃষিব্যবস্থার উন্নয়নের জন্যও মালেঙ্কভ বেশ কিছু পদক্ষেপ নিলেন।

"এই রদবদলের জন্য কী ধরনের সার্বিক পরিবর্তন সাধিত হবে সে নিয়ে 'মৃগিমো'র ছাত্রদের মধ্যে জল্পনাকল্পনার অন্ত ছিল না। তাছাড়া পার্টির প্রেসিডিয়ামেও ক্ষমতার লড়াই শুরু হয়েছে বলে শোনা যেতে লাগল। নিকিতা খ্রুশ্চেভকে আমরা ছাত্ররা যতটা প্রভাবশালী বলে ভাবতাম, বাস্তবে দেখা গেল তিনি তার থেকে অনেক বেশি ক্ষমতাবান। পার্টির মধ্যে তিনি নিজের লবিকে কাজে লাগিয়ে দিলেন এবং মালেঙ্কভ ও বেরিয়া, উভয়ের বিরোধিতায় তৎপর হয়ে উঠলেন।

"৫৩-র জুনে আমাদের ক্লাসকে সামরিক শিবিরে পাঠানো হল। একদিন সকালে, আমাদের নিয়মমাফিক রোলকলের সময় হঠাৎ দেখি ফ্ল্যাগের পাশে বেরিয়ার পোর্ট্রেটটা

নেই। প্রেসিডিয়ামের সব সদস্যের ছবি ওখানে টাঙানো থাকত। আমরা অবাক হয়ে গেলাম, কারণ পার্টিতে মালেঙ্কভের পরেই ছিল বেরিয়ার স্থান। সামরিক অফিসাররা এ নিয়ে কোনো মন্তব্য করলেন না। তবে আমরা বুঝলাম, ভয়ানক একটা কিছু ঘটেছে। ১০ জুলাই মস্কোতে ফেরার পর শুনলাম পার্টি ও রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে অপরাধমূলক কার্যকলাপ সম্পাদন করেছেন বেরিয়া। তাঁর স্বরাষ্ট্রমন্ত্রককে তিনি সরকার ও পার্টির উপরে জায়গা দেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন। পার্টি প্রেসিডিয়াম ও কাউন্সিল অব মিনিস্টারস-এর একটা যৌথ বৈঠকের সিদ্ধান্ত অনুসারে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হল। পরে তাঁকে গুলি করে মেরে ফেলা হয়।"[৩৫]

৬০ সালের সেপ্টেম্বরে রাষ্ট্রপুঞ্জের সাধারণ সভায় সোভিয়েত বিশেষজ্ঞদের নিয়ে গঠিত একটি প্রতিনিধিদলের অন্যতম সদস্য হিসেবে নিকিতা সের্গেইভিচ খ্রুশ্চেভকে খুব কাছ থেকে দেখেছিলেন শেভচেঙ্কো।

"বেঁটেখাটো, মোটাসোটা 'এন এস.' (ঘনিষ্ঠরা এবং কূটনীতিকরা খ্রুশ্চেভকে এই নামেই ডাকতেন) ছিলেন সাদাসিধে মানুষ। টাকমাথা, কুতকুতে চোখ, গোলগাল রুশি ধাঁচের মুখ।"[৩৬]

'বাল্টিকা' নামের জাহাজে কালিনিনগ্রাদ থেকে নিউ ইয়র্ক যাচ্ছিলেন খ্রুশ্চেভ ও তাঁর সঙ্গীরা। জাহাজে সকলের সঙ্গে খুব খোলামেলাভাবে মিশতেন খ্রুশ্চেভ। জাহাজের কর্মীদের সঙ্গে কথা বলতেন ; যাদের চিনতেন না, তাদের সঙ্গেও অবলীলায়। যে যখন ছবি তুলতে চাইত, তিনি খুশি হয়ে পোজ দিতেন। অনেক সময় কেজিবি-র নিরাপত্তারক্ষীরা রাজি না হলেও তিনি তাদের কথা কানে তুলতেন না। ডেকের উপর নানাধরনের খেলাধুলা ছিল তাঁর খুব পছন্দের।

'মাঝেমধ্যেই তাঁকে বই হাতে বসে থাকতে দেখা যেত যদিও সাহিত্য সম্পর্কে তাঁর জ্ঞান ছিল আংশিক আর এলোমেলো। পাশ্চাত্য সাহিত্যের সঙ্গে খ্রুশ্চেভের পরিচয় ছিল খুবই সামান্য। তিনি বলতেন, কখনো সময় পেলে এই ফাঁক পূরণ করে নেবেন। খ্রুশ্চেভ কোনো বিদেশি ভাষা জানতেন না। শেখারও কোনো ইচ্ছা ছিল না। বরং তিনি বলতেন, রুশ ভাষাটাকেই ঠিকমতো রপ্ত করা প্রয়োজন তাঁর। শিক্ষার অভাব ছিল তাঁর মধ্যে স্পষ্ট। ভাষণ দেওয়ার সময় প্রায়ই তিনি ব্যাকরণে গোলমাল করে ফেলতেন।

"অন্যান্য সোভিয়েত নেতাদের থেকে খ্রুশ্চেভ সত্যিই আলাদা ছিলেন। গ্রোমিকো বরং ছাঁচে ফেলা সোভিয়েত আমলার বৈশিষ্ট্যে ভরপুর, সাধারণের সংস্পর্শ সযত্নে এড়িয়ে চলার মানসিকতাসম্পন্ন ছিলেন। সোভিয়েতের বিশিষ্ট পদাধিকারীরা বছরের পর বছর, এমনকী সারাজীবন, নিজেদের আসন দখল করে থাকতেন। পশ্চিমি দেশগুলিতে এমনটি ভাবাও যায় না। এর ফলে সাধারণের কাছ থেকে তাঁরা (সোভিয়েত নেতারা) ক্রমশ দূরে সরে যেতেন।

"খ্রুশ্চেভের সঙ্গে জাহাজে একলা কথা বলার সুযোগ বহুবার পেয়েছিলাম। সব বিষয়ে তাঁর প্রবল উৎসাহ ছিল। সবকিছু সম্পর্কে অসংখ্য প্রশ্ন করতেন। বেশিরভাগ প্রশ্নের উত্তরও দিতেন নিজেই। ঢিলেঢালা জামা আর ভাঁজ-ভাঙা প্যান্ট পরে সাদামাটাভাবে

তিনি জাহাজের ডেকে ঘুরে বেড়াতেন। প্রাণশক্তিতে ভরপুর, হইচই আর রসিকতাপ্রিয় খ্রুশ্চেভ আবার মুহূর্তের ব্যবধানে রাগে ফেটে পড়তেও জানতেন। কখনো সখনো, খুব ঘনিষ্ঠদের সঙ্গে থাকার সময় তিনি বিষণ্ণ হয়ে পড়তেন, তবে সে কয়েক সেকেন্ডের জন্য। অধিকাংশ সময় রঙ্গরসিকতার আড়ালে বিষাদ চাপা দিয়ে রাখতেন।"[৩৭]

'বাল্টিকা' জাহাজে নিউইয়র্ক যাওয়ার পথে শেভচেঙ্কোর প্রতিদিনের বিবরণে খ্রুশ্চেভের প্রসঙ্গ বারবার ঘুরেফিরে এসেছে।

"রাতের খাওয়াদাওয়ার পর যাত্রীরা হইহুল্লোড় করে সময় কাটাতেন আর সেক্ষেত্রেও খ্রুশ্চেভ থাকতেন সবার আগে। একা থাকতে একদম পছন্দ করতেন না তিনি। ছায়াছবি দেখতে খুব ভালোবাসতেন। দেশি-বিদেশি, সব ছবি। খুব খুশি হতেন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগে তৈরি পুরোনো সোভিয়েত ছবি দেখতে।

"আর ভালোবাসতেন পান করতে—ভোদ্‌কা, ওয়াইন, কনিয়াক। তবে সহজে মাতাল হতেন না। জাহাজে, কোনো কোনো সন্ধ্যাতে, সারাদিন মদ্যপান করার পর, এর-ওর পিছনে লাগতেন, নানা তামাশা করতেন।

"একদিনের কথা। সন্ধ্যাবেলা। জাহাজের যাত্রীরা সকলে হলঘরে জড়ো হয়েছেন। ছবি দেখার জন্য। খ্রুশ্চেভের মাথায় হঠাৎ একটা মতলব এল। ইউক্রেনের তৎকালীন পার্টি বস্ (খ্রশ্চেভ একসময় এই পদাভিষিক্ত ছিলেন) নিকোলাই পাদ্‌গোরনির দিকে তাকিয়ে খ্রুশ্চেভ হঠাৎ বললেন "একটু 'গোপাক' নাচুন না। ইউক্রেনের নাচগান দেখতে আমার প্রায়ই সাধ জাগে।" (গোপাক এক ধরনের ইউক্রেনীয় নাচ। ইউক্রেনের পুরুষদের জাতীয় নৃত্য। উবু হয়ে বসে খুব দ্রুত একটা পা লাথি মারার ভঙ্গিতে সামনের দিকে ছুঁড়ে দিয়ে গুটিয়ে নিয়ে পরমুহূর্তেই অন্য পা-টাও একইভাবে ছুঁড়তে ও গোটাতে হয়। এভাবে গোল একটা বৃত্তে ঘোরে নর্তকরা।) খ্রুশ্চেভ নিজে ছিলেন ইউক্রেনীয়। কিয়েভের দিনগুলোর কথা প্রায়ই তিনি বলতেন।

"খ্রুশ্চেভের কথা শুনে পাদ্‌গোরনি অবাক হয়ে তাঁর দিকে তাকালেন। ষাটের কোঠার পাদ্‌গোরনির পক্ষে 'গোপাক' নাচা, বয়স বা পদমর্যাদা, কোনো ক্ষেত্রেই সংগত ছিল না।খ্রুশ্চেভ ফের তাঁকে অনুরোধ করলেন। এটা যে ঠাট্টা নয়, বুঝলেন পাদ্‌গোরনি। অনিচ্ছার সঙ্গে তিনি উঠে দাঁড়ালেন। কয়েকবার ওঠবোস করে 'গোপাক' নাচের ধাঁচে কিছু একটা করার চেষ্টা করলেন। স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছিল, 'গোপাক' নাচা তাঁর পক্ষে অসম্ভব। কিন্তু খ্রুশ্চেভ উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলেন। জোরে জোরে হাততালি দিয়ে চেঁচিয়ে উঠলেন, 'খুব ভালো হয়েছে। কিয়েভে আপনি উপযুক্ত পদেই আছেন।" (অর্থাৎ পার্টি-বস্-এর পদে)।"[৩৮]

রাষ্ট্রপুঞ্জের সাধারণ সভা চলাকালীন উত্তেজিত খ্রুশ্চেভ সমস্ত কূটনৈতিক নিয়মকানুন, নিজের পদমর্যাদার কথা ভুলে গিয়ে পায়ের জুতো খুলে টেবিলে আঘাত করেছিলেন। অভূতপূর্ব এই ঘটনার কথা সারা দুনিয়ার লোক জানতে পেরে অবাক হয়ে যায় । এখন, এতদিন পরেও, খ্রুশ্চেভের প্রসঙ্গ উঠলেই অনেকের ওই ঘটনার কথা অনিবার্যভাবে মনে পড়ে যায়। সেদিন সেই সভাকক্ষে উপস্থিত ছিলেন শেভচেঙ্কো, সোভিয়েত প্রতিনিধি

দলের একজন সদস্য হিসেবে ঘটনাটি আগাগোড়া, পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণে, ঠাঁই পেয়েছে তাঁর বইয়ে—

"৬০ সালের ১ অক্টোবর। রাষ্ট্রপুঞ্জে চীনের আইনি অধিকার সংরক্ষণ প্রসঙ্গে ভাষণ দিতে উঠলেন খ্রুশ্চেভ। কিন্তু তিনি স্পেনের জেনারেল ফ্রাঙ্কোকে ব্যক্তিগত আক্রমণ করে বলতে শুরু করলেন। ঘোষণা করলেন, ফ্রাঙ্কো একনায়কতন্ত্রী রক্তক্ষয়ী এক শাসনব্যবস্থা কায়েম করেছেন এবং স্পেনের সুযোগ্য সন্তানদের হত্যা করছেন।

"তখন সাধারণ সভার প্রেসিডেন্ট ছিলেন ফ্রেডেরিক বোল্যান্ড, আয়ারল্যান্ডের নাগরিক। শান্ত ও মার্জিত প্রকৃতির। খ্রুশ্চেভের মন্তব্যে সেই বোল্যান্ডও বিচলিত হয়ে তাঁকে মাঝপথে থামিয়ে দিলেন। রাষ্ট্রপুঞ্জের অন্যান্য সদস্য রাষ্ট্রের কোনো নেতাকে ব্যক্তিগত আক্রমণ করতে মানা করলেন। খ্রুশ্চেভ এতে দমলেন না। ফ্রাঙ্কোকে গালাগালি দিয়ে যেতে লাগলেন।

"তাঁর ভাষণ শেষ হওয়ার পর উত্তর দিতে উঠলেন স্পেনের বিদেশমন্ত্রী ফেরনান্দো কাস্তিয়েল্লা। খ্রুশ্চেভ আক্রোশে ফেটে পড়লেন। স্থান-কাল-পাত্র, সব ভুলে চিৎকার করে স্পেনীয় মন্ত্রীকে অপমানজনক কথা বলতে শুরু করলেন। টেবিলে ঘুষি মারতে মারতে চেঁচিয়ে চললেন তিনি। তাতেও হল না। হঠাৎ নিজের পায়ের জুতো খুলে শব্দ করে টেবিলে পেটাতে লাগলেন। সোভিয়েত প্রতিনিধি দলের অন্যান্য সদস্যরাও চিৎকার করে টেবিল চাপড়াতে শুরু করলেন। তবে তাঁরা নিজেদের জুতো খোলেননি।

"কাস্তিয়েল্লার প্রত্যুত্তর শেষে তিনি নিজের আসনে গিয়ে বসলেন। কাকতালীয় ভাবে তাঁর আসনটি আবার ছিল খ্রুশ্চেভের ঠিক মুখোমুখি। খ্রুশ্চেভ নিজেকে সংযত করতে ব্যর্থ হলেন। চেয়ার থেকে লাফিয়ে উঠে ঘুষি পাকিয়ে, রোগা পাতলা কাস্তিয়েল্লাকে এক ধাক্কা মেরে একেবারে কাবু করে ফেললেন। কাস্তিয়েল্লা আত্মরক্ষা করার চেষ্টা করলেন মাত্র। নিরাপত্তারক্ষীরা ছুটে এসে দুজনকে আলাদা করল।

"খ্রুশ্চেভের আচরণে আমরা হতবাক হয়ে গেলাম। অধিবেশনের শেষে সোভিয়েত মিশনের সবাই তখন অস্থির আর কিংকর্তব্যবিমূঢ়। কঠোর ও নিখুঁত আচরণের জন্য বিশিষ্ট গ্রোমিকো একেবারে থ হয়ে গেলেন। খ্রুশ্চেভ কিন্তু এমনভাবে ঘুরেফিরে বেড়াতে লাগলেন যেন কিছুই ঘটেনি। তিনি অন্যদের সঙ্গে জোরে হাসাহাসি, ঠাট্টা, হইচই করছিলেন। নির্বিকার মুখে তিনি বললেন, 'রাষ্ট্রপুঞ্জের দমবন্ধ করা পরিবেশে একটু প্রাণসঞ্চারের জন্য এমনটা দরকার ছিল।' রাষ্ট্রপুঞ্জের অন্যান্য সদস্যরা তাঁর সম্পর্কে কী ভাববেন, এ নিয়ে তাঁর কোনো মাথাব্যথা ছিল না।"[৩১]

৬৪-র হেমন্তে ককেশাসে ছুটি কাটাতে গেলেন খ্রুশ্চেভ। সিপিএসইউ-এর খ্রুশ্চেভ বিরোধীরা একজোটে তৎপর হয়ে উঠলেন। পার্টি, সেনাবাহিনী ও কেজিবি যে তাঁদের সমর্থন করবে, এ নিয়ে তাঁরা ছিলেন সংশয়হীন। অক্টোবরে খ্রুশ্চেভ সেন্ট্রাল কমিটির ফার্স্ট সেক্রেটারি ও প্রধানমন্ত্রী উভয় পদই হারালেন। ফার্স্ট সেক্রেটারি হলেন লিওনিদ ব্রেজনেভ আর প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব বর্তাল কোসিগিনের উপর। তবে খ্রুশ্চেভকে পার্টির সাধারণ সদস্যপদ রাখার অনুমতি দেওয়া হল।

অমন যে দোর্দণ্ডপ্রতাপ খ্রুশ্চেভ, তাকেও কিনা বহিষ্কৃত হতে হল। ক্ষমতায় আসার পরেই তিনি স্তালিন-বিরোধিতার মনোনিবেশ করেছিলেন। কেজিবি এটা ভালো চোখে দেখেনি। সামরিকবাহিনীও খ্রুশ্চেভকে মেনে নিতে পারেনি। শেভচেঙ্কোর বিশ্লেষণ এরকম—খ্রুশ্চেভ যে পরিবর্তনের হাওয়া আনতে চেয়েছিলেন, তা আসলে ছিল এক ধরনের 'ফ্যানটাসি' এবং তা সোভিয়েতের শক্তিশালী একটি লবিকে খেপিয়ে তোলে ; তাঁর নিজেরই বিরুদ্ধে।

শেভচেঙ্কো লিখেছেন, "খ্রুশ্চেভস স্টাইল অব রুল অ্যান্ড দ্য চেঞ্জেস হি ট্রাইড টু সেট ইন মোশন ফাইনালি টার্নড অল দ্য মেজর ভেস্টেড ইন্টারেস্টস এগেইনস্ট হিম। হিজ রিভিলেশন অব স্ট্যালিনস ক্রাইমস অ্যান্টাগনাইজড দ্য কেজিবি। দ্য মিলিটারি রিসেন্টেড হিজ ডিসিশনস টু রিডিউস এক্সেস ম্যানপাওয়ার ইন দ্য আর্মি, ফোর্সিং লার্জ নাম্বারস অব অফিসারস ইনটু রিটায়ারমেন্ট। হিজ অ্যাডভেঞ্চার ইন কিউবা হ্যাড এন্ডেড ইন ডিসগ্রেস। হিজ ইকনমিক অ্যান্ড এগ্রিকালচারাল এক্সপেরিমেন্টস হ্যাড লার্জলি ফেইলড। হিজ ইন্টারমিটেন্ট এফর্টস টু লুজেন, ইভেন স্লাইটলি, রিস্ট্রেইন্টস অন রাইটার্স অ্যান্ড আর্টিস্টস, টু ওপেন দ্য ইউ এস এস আর টু মোর কনট্যাক্ট উইথ দ্য ওয়েস্ট, নেভার কনসিসটেন্ট, হ্যাড ওনলি ব্রট ট্রাবল, এস্পেশালি ফর দ্য অর্থোডক্স আইডিওলগস্ অ্যান্ড দ্য কেজিবি, হু কুড টলারেট নো রিলাকশেসন অব সেন্সরশিপ।"[২০]

অক্টোবর বিপ্লবের পর কেটে গেছে ৪২টা বছর। ১৯৫৯। খ্রুশ্চেভ তাঁর অতি প্রিয় বিষয় নিরস্ত্রীকরণ নিয়ে আলোচনার জন্য ডাক পেলেন আমেরিকা থেকে। তখন মার্কিন প্রেসিডেন্ট আইজেনহাওয়ার। শেভচেঙ্কো তখন সোভিয়েত বিদেশমন্ত্রকে কর্মরত। এই ঘটনাটি সম্পর্কে তিনি লিখেছেন, "প্রেসিডেন্ট আইজেনহাওয়ারের কাছ থেকে সরকারি আমন্ত্রণ পেয়ে খ্রুশ্চেভ নিঃসন্দেহে আনন্দিত হলেন। এই আমন্ত্রণ ছিল তাঁর কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আন্তর্জাতিক সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে নিজেদের সমকক্ষ হিসেবে স্বীকার করে নিচ্ছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র—আমন্ত্রণের ব্যাখ্যা এভাবে করলেন খ্রুশ্চেভ। (অর্থাৎ, অবশেষে সোভিয়েত ইউনিয়নকে 'সুপার পাওয়ার' হিসেবে স্বীকৃতি দিল মার্কিনিরা।) এই স্বীকৃতির জন্য সোভিয়েত ইউনিয়ন নাছোড়বান্দা হয়ে লেগেছিল। খ্রুশ্চেভের ধারণা হল, তাঁর মার্কিন সফর সোভিয়েত ইউনিয়নকে এই সম্মান এনে দেবে, এমনকী আইজেনহাওয়ারের সঙ্গে তাঁর বৈঠক ব্যর্থ হলেও।"[২১]

এহেন খ্রুশ্চেভ, যিনি একই সঙ্গে পার্টির ফার্স্ট সেক্রেটারি এবং দেশের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন, তাঁকে হটিয়ে দিয়ে একদিন ক্ষমতায় এলেন লিওনিদ ব্রেজনেভ। খ্রুশ্চেভ—নয়া নীতির প্রবক্তা, স্তালিনীয় নীতির কড়া সমালোচক, সোভিয়েতকে 'সুপার পাওয়ার' হিসেবে উন্নীতকারী (!), নিরস্ত্রীকরণ নীতির একবগ্‌গা সমর্থককে সামান্য একজন পার্টি সদস্যতে পরিণত করে, একেবারে এককোণে সরিয়ে দিয়ে ক্ষমতায় এলেন ব্রেজনেভ। সেটা ১৯৬৪ সাল।

খ্রুশ্চেভের সবচেয়ে কাছের লোক, খ্রুশ্চেভ মন্ত্রিসভার বিদেশমন্ত্রী, পার্টির প্রভাবশালী সদস্য আন্দ্রেই গ্রোমিকো কিন্তু রয়ে গেলেন। কোসিগিন মন্ত্রিসভারও বিদেশমন্ত্রী হলেন

তিনিই। (আমাদের ইউনিভার্সিটির রুশ সাহিত্যের শিক্ষক স্মাতেন্‌কো বলতেন, "গ্রোমিকো ঠিক একটা গিরগিটি। স্তালিনের সঙ্গো ছিলেন, খ্রুশ্চেভের কাছের লোক, আবার ব্রেজনেভেরও ঘনিষ্ঠ। আন্দ্রোপভ, চেরনেনকো পেরিয়ে একেবারে গর্বাচভ অবধি টেনে দিলেন")।

শেভচেঙ্কো বলেছেন, "সোভিয়েত ব্যবস্থার একটি মৌলিক উপাদান হলেন গ্রোমিকো—এই ব্যবস্থার প্রতি তাঁর ভক্তি ছিল সম্পূর্ণ ও সীমাহীন। এক সাংবাদিক একবার গ্রোমিকোর ব্যক্তিগত জীবন সম্পর্কে কিছু তথ্য জানতে চান। গ্রোমিকো তাতে মন্তব্য করেন, 'মাই পার্সোনালিটি ডাজ নট ইন্টারেস্ট মি।" খ্রুশ্চেভ বলতেন, "গ্রোমিকোকে যদি বলি প্যান্ট খুলে এক খণ্ড বরফের উপর মাসখানেক বসে থাকো, তাহলে ও তা-ই করবে।"[৩২]

গ্রোমিকোর পুত্র ছিলেন আর্কাদি শেভচেঙ্কোর সহপাঠী। সেই সুবাদে গ্রোমিকোর সঙ্গো শেভচেঙ্কোর পরিচয়। গ্রোমিকোই তাঁকে বিদেশ মন্ত্রকে যোগ দিতে উৎসাহ দেন। শেভচেঙ্কো তাঁর বইয়ে গ্রোমিকো সম্পর্কে আরো লিখেছেন, "১৯০৯ সালে বেলোরাশিয়ার স্তারিয়ে গ্রোমিকি নামক একটি গ্রামের এক আধা-কৃষক, আধা-শ্রমিক পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন আন্দ্রেই আন্দ্রেইভিচ গ্রোমিকো। ৩১ সালে তিনি সিপিএসইউ-এর সদস্যপদ গ্রহণ করেন এবং ৩৯-এ বিদেশ মন্ত্রকের কাজে যোগ দেন। ৪৩-এ তিনি ওয়াশিংটনে সোভিয়েত রাষ্ট্রদূত হিসেবে যোগ দেন। তখন স্তালিনের আমল। নিজের কেরিয়ারের এই পর্বের কথা গ্রোমিকো খুব একটা বলতেন না। তবে একদিন কথা প্রসঙ্গো তিনি আমাকে বলেছিলেন স্তালিনের কথা। তখন গ্রোমিকো ওয়াশিংটনে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন। স্তালিন একদিন তাঁকে ডেকে পাঠালেন। উপদেশ দিলেন, আমেরিকায় গিয়ে ওখানকার চার্চে ধর্মোপদেশ শুনতে, এতে তাঁর (গ্রোমিকোর) ইংরেজির উন্নতি হবে। স্তালিনের নিজের শিক্ষা অর্জনে অর্থোডক্স চার্চ একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিল এবং তিনি জানতেন ধর্মযাজকদের শুদ্ধ-ভাষাজ্ঞান যে কোনো ভাষাশিক্ষার পক্ষে অত্যন্ত উপযোগী। গ্রোমিকো প্রথমে স্তালিনের এই আদেশ শুনে হকচকিয়ে গিয়েছিলেন। তিনি বুঝতে পারছিলেন না, সোভিয়েত ইউনিয়নের মতো একটি নাস্তিক রাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূত কী করে মার্কিন চার্চে নিয়মিত উপস্থিত থাকবেন। সাধারণ মানুষের মনে ও গণমাধ্যমে এই ঘটনা আলোড়ন সৃষ্টি করবে বলে তিনি আশঙ্কা করেছিলেন। এটিই ছিল স্তালিনের একমাত্র নির্দেশ যা গ্রোমিকো কোনোদিন পালন করেননি।"[৩৩]

স্তালিন থেকে শুরু করে গর্বাচভ পর্যন্ত সব নেতার অনুগত হয়ে টিকে ছিলেন গ্রোমিকো। এই সারিবদ্ধ নেতার মাঝে একজন ছিলেন ব্রেজনেভ। খ্রুশ্চেভ ছুটি কাটাতে গিয়েছিলেন। সে সময়েই তিনি ক্ষমতাচ্যুত হন। গ্রোমিকোকে নিয়ে রাজত্ব শুরু করলেন ব্রেজনেভ। শুরু হল সোভিয়েত সমাজতন্ত্রের 'বন্ধ দশা' (গবেষকরা এই বিশেষণেই ব্রেজনেভ-যুগকে চিহ্নিত করেন)।

৭৭ সালে রাষ্ট্রপুঞ্জের সেক্রেটারি জেনারেল কুর্ট ভাল্‌ডহাইম মস্কো সফরে গিয়েছিলেন। ব্রেজনেভের সঙ্গো একটি বৈঠকে মিলিত হন তিনি। সেই বৈঠকে শেভচেঙ্কোও উপস্থিত ছিলেন। বৈঠকের কথা বলতে গিয়ে ব্রেজনেভের প্রসঙ্গো তিনি লিখেছেন—

"৭১তম জন্মদিন আসন্ন। লিওনিদ ব্রেজনেভের বুকে তখন পেসমেকার, কানে 'হিয়ারিং এইড'। দেখে মনে হচ্ছিল, বয়স তাঁর সঙ্গো নিষ্ঠুর পরিহাসে ব্যস্ত। ঝকঝকে বিরাট একটা টেবিলের ওপাশ থেকে কিছুটা নড়বড়ে পায়ে উঠে দাঁড়িয়ে আমাদের অভিবাদন জানালেন মানুষটি—কমিউনিস্ট দুনিয়ার সর্বাপেক্ষা প্রভাবশালী রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব ব্রেজনেভ। হাত মেলানোর সময়ও তাঁর শরীরের দুর্বলতা টের পাওয়া যাচ্ছিল। কড়া ওষুধের জেরে চোখ দুটো ম্লান। আমাদের উলটোদিকে নিষ্প্রভভাবে বসেছিলেন ব্রেজনেভ। আগে থেকে তৈরি 'নোট' দেখে যান্ত্রিকভাবে 'সোভিয়েতের বিশ্বনীতি' সম্পর্কে বলছিলেন তিনি; অতিথিদের দিকে না তাকিয়ে, বেশিরভাগ সময় কাগজে ঘাড় গুঁজে। সেই ছকে বাঁধা বক্তব্য। ব্রেজনেভের ভাষণ কাউকে বিন্দুমাত্র অনুপ্রাণিত করতে পারল বলে মনে হয় না। তাঁকে দেখে একটা রোবট ছাড়া অন্য কিছু মনে হচ্ছিল না। এই বৈঠকের কয়েকদিন আগে গ্রোমিকোর সঙ্গো ভাল্ড্হাইমের একই বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়েছিল। 'সোভিয়েতের বিশ্বনীতি' প্রসঙ্গো গ্রোমিকো যা বলেছিলেন, ব্রেজনেভও তা-ই বললেন। নতুন কোনো কথা তিনি শোনাতে পারলেন না।

"সেই পরিচিত সোভিয়েত নীতিগুলি নিয়ে কথাবার্তা চলল। সেই নিরস্ত্রীকরণ, সেই মধ্যপ্রাচ্যের সমস্যার সমাধান, সেই ঔপনিবেশিকতার অবশিষ্ট বৈশিষ্ট্যাবলিকে সমূলে বিনাশ ইত্যাদি। তবে ব্রেজনেভ একটাই নতুন কথা বললেন—এই সমস্যাগুলি সমাধানে রাষ্ট্রপুঞ্জ কী ধরনের ভূমিকা পালন করতে পারে। ভাল্ড্হাইমও তাঁর সঙ্গো একমত হয়ে বললেন, রাষ্ট্রপুঞ্জ পরমাণু নিরস্ত্রীকরণের ক্ষেত্রে নিঃসন্দেহে আরো সক্রিয় হতে পারে। ভাল্ড্হাইমের মন্তব্যের রুশ অনুবাদ শুনলেন ব্রেজনেভ। হঠাৎ পাশে বসে থাকা গ্রোমিকোকে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, "পরমাণু নিরস্ত্রীকরণ চুক্তিটি কি বলবৎ হয়ে গেছে?" গ্রোমিকো শান্তভাবে উত্তর দিলেন, "সাত বছর আগে, অর্থাৎ ৭০ সাল থেকেই চুক্তিটি কায়েম হয়ে গিয়েছে।" ব্রেজনেভের অজ্ঞতা দেখে হতবাক হয়ে গেলাম। মনে মনে ভাবলাম, ভাগ্যিস ভালড্হাইম রুশ ভাষা জানেন না!

"অবাক হওয়ার আরো বাকি ছিল। ভাল্ড্হাইম ব্রেজনেভকে রাষ্ট্রপুঞ্জ সফরের জন্য আমন্ত্রণ জানালেন। সোভিয়েত নেতা তাঁর পার্শ্বচরদের প্রশ্ন করলেন, "আমি কি রাষ্ট্রপুঞ্জ সফরে যেতে পারি?" তাঁর সমস্বরে উত্তর দিলেন, "হ্যাঁ নিশ্চয়। তবে এ বছর নয়। কারণটা আপনি জানেন।" (সে বছর অক্টোবরে সোভিয়েত ইউনিয়নের নতুন সংবিধান প্রণয়নের কথা ছিল। এই উপলক্ষে ব্রেজনেভের উপস্থিতি ছিল অপরিহার্য) ব্রেজনেভ মাথা নেড়ে বিড়বিড় করে বললেন, "হ্যাঁ, এ বছর নয়, কিন্তু হয়তো সামনের বছর আমি রাষ্ট্রপুঞ্জ সফরে যেতে পারি।" বৈঠক শেষে, প্রথা অনুযায়ী, ভাল্ড্হাইম উঠে দাঁড়িয়ে ঘোষণা করলেন যে, তিনি তাঁর 'হোস্ট' (ব্রেজনেভ)-কে রাষ্ট্রপুঞ্জের শান্তি স্বর্ণপদক উপহার দিতে চান। পঞ্চাশ মিনিটব্যাপী ওই বৈঠকে ব্রেজনেভ কথাটা শোনামাত্র প্রথমবারের জন্য সজীব হয়ে উঠলেন। খুশিতে উজ্জ্বল, ঝলমলে একটা শিশুর মতো দেখাচ্ছিল তাঁকে। মেডেল, উপাধি, নানাবিধ সম্মানের প্রতি ব্রেজনেভের অন্তহীন দুর্বলতার প্রমাণ পেলাম আবার। এত ধরনের পদক তিনি সংগ্রহ করেছিলেন এবং এত বেশি পদক তিনি পরতেন

যে মস্কোর রসিকজনেরা বলত, ক্রেমলিনের শল্যচিকিৎসকরা ব্রেজনেভের বুকে অতিরিক্ত কয়েকটা পাঁজর লাগিয়ে দিয়েছেন যাতে পদকগুলি তিনি নিশ্চিন্তে পরতে পারেন।"[৯৪]

সেদিনের বৈঠক শেষে ক্রেমলিন থেকে বেরিয়ে আসার সময় শেভচেঙ্কোর মনে হয়েছিল হাসপাতালে কোনো মুমূর্ষু রোগীকে দেখে বাড়ি ফিরছেন তিনি। গত তেরো বছর ধরে এই অসুস্থ অশীতিপর নড়বড়ে লোকটা সিপিএসইউ-এর ফার্স্ট সেক্রেটারি! সোভিয়েত ইউনিয়নের কর্ণধার! শুধু সোভিয়েত দেশ কেন, ধরতে গেলে গোটা সমাজতান্ত্রিক দুনিয়ারই কর্ণধার!

অবাক শেভচেঙ্কো এর কারণ খোঁজার চেষ্টায় লিখেছেন—"সোভিয়েতের 'এলিট' শ্রেণিকে যে স্থায়িত্বের প্রতিশ্রুতি দিতে ব্রেজনেভ সক্ষম হয়েছিলেন তা-ই তাঁকে টিকিয়ে রেখেছিল। খ্রুশ্চেভের অনিশ্চিত ধরনধারণ এই 'এলিট'দের পছন্দসই ছিল না। কিন্তু 'দ্য টপ র‍্যাঙ্ক অব সোভিয়েট অফিসিয়ালডম স ব্রেজনেভ অ্যাজ আ ওয়েলকাম রিলিফ'। যে ব্যবস্থাকে খ্রুশ্চেভ নাড়া দিতে চেয়েছিলেন, ব্রেজনেভ সেই ব্যবস্থারই পৃষ্ঠপোষকতা করে (তৈলমর্দন সহযোগে) এবং নিজের আসন দৃঢ় করতে সক্ষম হন। পলিটব্যুরোতে ভারসাম্য বজায় রেখে চলার ক্ষেত্রে একজন মিডলম্যান-এর ভূমিকা পালনে তিনি রীতিমতো প্রতিভার পরিচয় দেন। পার্টির মধ্যে নিজস্ব লবি গড়ে তোলার জন্য নিজের ক্ষমতাকে কাজে লাগিয়ে নানা ধরনের সুযোগসুবিধাকে টোপ হিসেবে ব্যবহার করেন তিনি। ব্রেজনেভের আমলে দেশময় দুর্নীতি এক অবিশ্বাস্য চেহারা নেয়।

'ব্রেজনেভকে অনেকে সামরিক ক্ষমতা বিস্তার ও তৃতীয় বিশ্বে সোভিয়েত প্রভাব দৃঢ় করার পরামর্শ দিতেন। এদের কথা অক্ষরে অক্ষরে পালনের মতো বিচক্ষণতা ব্রেজনেভের ছিল। তাঁর অধীনে সোভিয়েত ইউনিয়ন অভূতপূর্ব অস্ত্রসম্ভারের মালিক হয়ে ওঠে। কিন্তু দেশের অর্থনীতি তখন বদ্ধদশাপ্রাপ্ত। সামরিক খাতে বিশাল খরচ সামাল দিতে গিয়ে হিমসিম অবস্থা।

'অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে ব্যর্থ হওয়া সত্ত্বেও ব্রেজনেভ ক্ষমতায় থেকে যান এবং ব্যক্তিগত কর্তৃত্বের বিস্তারও ঘটান। 'হি টু অ্যাকোয়ার্ড আ কাল্ট অব পার্সোনালিটি অ্যান্ড কমিটেড সাম স্টার্টলিং এক্সেসেস।' স্বজনপোষণের এক দৃষ্টান্ত সৃষ্টি করেন তিনি। ছেলে ইউরিকে তিনি ডেপুটি মিনিস্টার অব ফরেন ট্রেড পদে নিয়োগ করেন। জুনিয়র ব্রেজনেভ ছিলেন অতি সাধারণ মানের এঞ্জিনিয়র। সরকারি কাজে সুইডেনে গিয়ে তিনি অতিরিক্ত মদ্যপান করে কেলেঙ্কারিতে জড়িয়ে পড়েন। পার্টির কাজে উল্লেখযোগ্য কোনো অবদান ছাড়াই ৮১ সালে ইউরিকে সেন্ট্রাল কমিটির সদস্য হিসেবে নিযুক্ত করা হয়।

"আর লিওনিদ ব্রেজনেভের ঔদ্ধত্য এক সর্বকালীন রেকর্ড সৃষ্টি করে যখন তিনি সাহিত্যক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অবদানের জন্য নিজেকে লেনিন পুরস্কারে ভূষিত করেন। ('ইন রিকগনেশন অব হিজ গোস্ট রিটন মেমোয়ারস।') এছাড়া নিজেকে তিনি 'মার্শাল অব দ্য সোভিয়েট ইউনিয়ন' খেতাবে সম্মানিত করেন এবং 'অর্ডার অব ভিকট্রি' পদকটিও নিজের করে নেন। প্ল্যাটিনামের উপর হীরে চুনি পান্নাখচিত সর্বোচ্চ সম্মানবাহী এই পদক নির্দিষ্ট ছিল গুরুত্বপূর্ণ কোনো যুদ্ধে উল্লেখযোগ্য অবদানের জন্য নজিরসৃষ্টিকারী সেনাধ্যক্ষদের

জন্য। বহু যোগ্য প্রার্থীকে বঞ্চিত করে তিনি নিজের বুকের পদক-প্রদর্শনীতে এই 'অর্ডার অব ভিকট্রি'-কেও ঠাঁই দেন। তাঁর এই নির্লজ্জ আচরণ সামরিক বাহিনীতে ক্ষোভের সৃষ্টির করে।

"বয়স আর অসুখের যৌথ কারসাজিতে বিধ্বস্ত ব্রেজনেভ নিজের শাসনকালের শেষ পর্বে সপ্তাহে মাত্র কয়েক ঘন্টা কাজ করতে পারতেন। নানা রকমের ওষুধ আর আধুনিক সাজসরঞ্জামের সাহায্যে কোনোরকমে তাঁকে বাঁচিয়ে রাখা হয়েছিল। এহেন দুর্বল প্রায় প্রতিবন্ধী নেতাকে গদিতে বসিয়ে প্রকৃত শাসনক্ষমতা হস্তগত করে পলিটব্যুরোর মধ্যে গড়ে ওঠে একটা ছোটো গোষ্ঠী। ব্রেজনেভের পরে ক্ষমতা হাতানোর লোভে চেরনেন্‌কো ও আন্দ্রোপভ, উভয়েই সক্রিয় হয়ে ওঠেন। নিজেদের ঠিকমতো গুছিয়ে নেওয়ার জন্য পর্যাপ্ত সময় হাতে পেতে ব্রেজনেভকে তাঁরা পুতুলের মতো সর্বোচ্চ পদে বসিয়ে রাখেন।"[৩৫]

"মৃত্যুপথযাত্রী ব্রেজনেভ ক্রমশই চেরনেন্‌কোর উপর নির্ভরশীল হয়ে উঠতে থাকেন। এই নির্ভরশীলতা এমন পর্যায়ে পৌঁছায় যে সে সময় মস্কোতে একটা গল্প চালু হয়ে যায়—ব্রেজনেভ বেশ কিছুদিন আগেই মারা গিয়েছেন। কিন্তু চেরনেন্‌কো এখনও তাঁকে(ব্রেজনেভকে) এ সম্পর্কে কিছু বলেননি, তাই তিনি জানেন না।

"চেরনেন্‌কো এই সুযোগ পুরোপুরি কাজে লাগাতে চেয়েছিলেন। জেনারেল সেক্রেটারির চেয়ার দখলের জন্য তিনি আটঘাট বেঁধে নেমে পড়েন। তবে শেষরক্ষা হয়নি। ব্রেজনেভের মৃত্যুর পর ক্ষমতা দখল করেন ইউরি আন্দ্রোপভ, চেরনেন্‌কোর এক নম্বর প্রতিদ্বন্দ্বী।

"তীক্ষ্ণ বুদ্ধিসম্পন্ন ও প্রচণ্ড ধূর্ত ইউরি আন্দ্রোপভ বহুদিন কেজিবি প্রধানের দায়িত্বে ছিলেন। কেজিবি-প্রধান থাকাকালীন ভিন্নমত পোষণকারীদের তিনি কঠোর হাতে দমন করেন। কোনো অর্থেই তাঁকে প্রগতিশীল বা উদার বলা চলে না। তবে কেজিবি-র উদ্যোগে আন্দ্রোপভকে 'উদারপন্থী সংস্কারক' বলে প্রচার করা হল। পশ্চিমের অনেকে তা বিশ্বাসও করল। তিনি যখন সিপিএসইউ-এর জেনারেল সেক্রেটারি পদে নিযুক্ত হন, তখন তিনিই ছিলেন এই পদে নির্বাচিত সর্বাপেক্ষা বয়স্ক ব্যক্তি। আন্দ্রোপভ সামান্য সময়ের জন্য এই পদে ছিলেন এবং এর অধিকাংশটাই ছিলেন অসুস্থ অবস্থায়।"[৩৬]

আন্দ্রোপভের শাসনকাল সম্পর্কে শেভচেঙ্কো লিখেছেন, "হি (আন্দ্রোপভ) অ্যান্ড হিজ পলিটব্যুরো কোলিগস হ্যাড লস্ট টাচ উইথ দ্য রিয়ালিটি অব দ্য সোসাইটি দে ডাইরেক্টেড। আনউইলিং টু আন্ডারস্ট্যান্ড ইট, দে ওয়ার আনএবল টু ইন্সপায়ার ইট। দে কুড স্টিল জেনারেট ফিয়ার বাট নট সিমপ্যাথি, কমান্ড ওবিডিয়েন্স বাট নট এনথুসিয়াসম।"[৩৭]

৮৪-র ফেব্রুয়ারি। আন্দ্রোপভের মৃত্যুর পর পার্টি-প্রধান হিসেবে নিযুক্ত হলেন কনস্তানতিন উস্তিনোভিচ চেরনেন্‌কো। সোভিয়েত জীবনের সর্বক্ষেত্রে পার্টির কঠোর নিয়ন্ত্রণ কায়েম করার পক্ষপাতী ছিলেন তিনি। পার্টি এলিটদের একজন ছিলেন চেরনেন্‌কো। (সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রকৃত শাসকশ্রেণি ছিল এই পার্টি এলিটরাই।) পার্টির অন্দরমহলের সব খবরাখবর ছিল চেরনেন্‌কোর নখদর্পণে। শেভচেঙ্কোর বর্ণনানুসারে, "চেরনেন্‌কো

ছিলেন একজন 'প্রফেশনাল পার্টি অ্যাপারাট্চিক'। সেন্ট্রাল কমিটিকে প্রভাবিত বা চালিত করার ক্ষমতা তাঁর ছিল। লেনিন ও তাঁর পরবর্তী সোভিয়েত নেতাদের মধ্যে তিনিই ছিলেন একমাত্র, যাঁর কোনো সামরিক অভিজ্ঞতা ছিল না।"[১৮]

চেরনেন্কো প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে শেভচেঙ্কো আরো লিখেছেন, "হি ডাজ নট হ্যাভ এ ফাস্ট-রেট ইন্টেলেক্ট, বাট হি ইজ এ প্র্যাগমাটিক, বিজনেসলাইক ম্যান হু নোওজ হোয়াট হি ওয়ান্টস। হি ইজ ডিম্যান্ডিং, রুড, অথোরিটেরিয়ান, অ্যারোগ্যান্ট, অ্যান্ড পোজেসেস ইমেন্স সেল্ফ-কনফিডেন্স। হি ওয়াজ অলসো সো ডাল এ পাবলিক ফিগার দ্যাট, ইন মাই টাইম, দেয়ার ওয়ার নট ইভেন দ্য ইউজুয়াল অ্যানেকডটস অর জোকস অ্যাবাউট হিম অ্যামঙ্গ দ্য সোভিয়েট পপুলেশন।"[১৯]

সোভিয়েত 'এলিট' শ্রেণির একজন, শেভচেঙ্কো, তাঁর আত্মীয়জীবনীমূলক বইটিতে এই শ্রেণি যে বিশেষ সুযোগসুবিধা ভোগ করত, তার কথা সবিস্তারে জানিয়েছেন। সিপিএসইউ-এর জেনারেল সেক্রেটারি পদে যেই থাকুন না কেন, এলিটরা চিরকাল চূড়ান্ত ভোগী জীবনযাপন করেছে। নিজেদের স্বার্থে, গদি রক্ষার তাগিদেই, প্রত্যেক জেনারেল সেক্রেটারি এই এলিটদের আরো সুযোগসুবিধা ও সুখে ভরিয়ে তুলেছেন। খ্রুশ্চেভ এই কাজে যথেষ্ট দক্ষতার ছাপ রাখতে পারেননি। এলিটদের চটিয়ে দিয়েছিলেন তিনি। পরিণামে তাঁকে হটে যেতে হয়েছিল। হটতে বাধ্য করা হয়েছিল তাঁকে।

শেভচেঙ্কোর মতানুসারে—"সোভিয়েত ইউনিয়নের সাধারণ মরণশীল নাগরিকরা ছিল একদিকে। এলিটরা অন্যদিকে। সমাজের এলিট শ্রেণির সদস্যারা চূড়ান্ত ও ব্যাপক সুযোগসুবিধা ভোগ করত: বিরাট মাইনে, ভালো ফ্ল্যাট, বাগানবাড়ি, চালক সমেত সরকারি গাড়ি, ট্রেনে বিশেষ বগি, বিশেষ হাসপাতাল, রিসর্ট ও বিমানবন্দরে ভি আই পি-দের জন্য বরাদ্দ সর্বধরনের আরাম, সন্তানদের পড়াশোনার জন্য বিশেষ স্কুল, খাবারদাবার ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় সামগ্রীর জন্য আলাদা দোকান, যেখানে জিনিসপত্র শুধু উৎকর্ষ মানেরই ছিল না, দামও ছিল অর্ধেক। সাধারণের সঙ্গে এদের দূরত্ব ছিল অপরিসীম। নির্দিষ্ট এলাকায়, সাধারণের নাগালের বাইরে এরা বাস করত। সাধারণের সঙ্গে এদের মানসিক দূরত্ব ছিল চীনের প্রাচীরের মতো অলঙ্ঘ্য। রাষ্ট্রের মধ্যে যেন আরেক রাষ্ট্র গড়ে তুলেছিল এই শ্রেণি। বলা চলে, এদের সম্পর্কে যে কোনো তথ্য ছিল রাষ্ট্রীয় গোপন তথ্য (স্টেট সিক্রেট)-র সামিল। সোভিয়েত বা অন্য দেশের বাসিন্দারা এদের সম্পর্কে কিছু জানার অধিকারী ছিল না।"[২০]

পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে লড়াই করে যে দেশ গোটা বিশ্বের কাছে একটা দৃষ্টান্ত স্থাপন করল, সেই দেশেই কিনা ধীরে ধীরে, একেবারেই পুঁজিবাদী, বরং বলা ভালো, সামন্তপ্রভুদের মতো 'মনোভাব' আর 'আচরণ' সর্বস্ব একদল 'নেতা' ক্ষমতা বিস্তার করলেন।

সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে ধীরে ধীরে তৈরি হল একটা এলিট শ্রেণি। এই বাস্তব প্রেক্ষাপটেই ক্রেমলিনের গদির দখল নিলেন মিখাইল সের্গেইভিচ গর্বাচভ ৮৫-র মার্চে।

রবীন্দ্রনাথ থেকে অরওয়েল হয়ে শেভচেঙ্কোর রাশিয়া। বিপ্লবোত্তর রাশিয়ার ক্রমাবনতির ধারাবাহিক দৃশ্যপট। কবি দেখলেন 'জবর্দস্ত লোকের একনায়কত্ব'। অরওয়েল

দেখলেন সেই তাঁকেই 'বিগ ব্রাদার' হিসেবে। আর শেভচেঙ্কো, এক সোভিয়েত কূটনীতিক, দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষণা করলেন, 'আমি প্রতারিত। আমার মতো আরো অনেক সোভিয়েত নাগরিক প্রতারিত। সোভিয়েত শাসনপ্রণালি আমাদের প্রতারণা করেছে।'

তিনজনের তিনটি রচনার ধারাবাহিকতা এবং সাধারণ্যে চলতি ধারণার মধ্যে কোথায় মিল অমিল, তা নিয়ে বৃথা তর্কে যেতে চাই না। সোভিয়েতের আজকের দশা যে একটা ধারাবাহিকতার পরিণতি, এই অধ্যায়ে তাই-ই দেখানোর চেষ্টা করলাম মাত্র।

উল্লেখপঞ্জি

১. রাশিয়ার চিঠি, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলিকাতা, ভাদ্র ১৩৯৩:১৯০৮ শক ; পৃ ৯
২. ওই ; পৃ ১৬
৩. ওই ; পৃ ১১
৪. ওই ; পৃ ১৫৫
৫. ওই ; পৃ ১১
৬. ওই ; পৃ ১১-১২
৭. ওই ; পৃ ৯৪
৮. ওই ; পৃ ৯৫
৯. ওই ; পৃ ১১৫-১১৬
১০. ওই ; পৃ ১১৬-১১৭
১১. ওই ; পৃ ১১৮-১১৯
১২. ওই ; পৃ ১১৭
১৩. ওই ; পৃ ১২২
১৪. দ্য কালেক্টেড এসেজ, জার্নালিজম অ্যান্ড লেটারস অব জর্জ অরওয়েল, এল সেকার অ্যান্ড ওয়ারবার্গ ১৯৬৮ ; পৃ ৫০২ (চতুর্থ খণ্ড)
১৫. স্পিকিং অন লিটারেচার অ্যান্ড সোসাইটি, ট্রিলিং এল, অক্সফোর্ড ১৯৮০ ; পৃ ২৫৪
১৬. হোমেজ টু ক্যাটালোনিয়া, জর্জ অরওয়েল, লন্ডন, ১৯৬৮ ; পৃ ১০২
১৭. দ্য ম্যানেজারিয়াল রেভোলিউশনঃ হোয়াট ইজ হ্যাপেনিং ইন দ্য ওয়ার্ল্ড, বার্নহ্যাম জি ; বইটির সমালোচনা লিখতে গিয়ে অরওয়েল কথাগুলি লেখেন।
১৮. দ্য কালেক্টেড এসেজ, জর্জ অরওয়েল, পৃ ৪-৫ (প্রথম খণ্ড)
১৯. ওই ; পৃ ২২৯ (দ্বিতীয় খণ্ড)
২০. জর্জ অরওয়েলঃ আ লাইফ, ক্রিক বি, লন্ডন, ১৯৮০ ; পৃ ৫৮২
২১. ফাইভেল টি. উইনগেট, অরওয়েল অ্যান্ড দ্য জুইশ কোয়েশ্চেন, কমেন্টারি, সংখ্যা ১১, ফেব্রুয়ারি, ১৯৫১, পৃ ১৪২
২২. দ্য কালেক্টড এসেজ, জর্জ অরওয়েল, পৃ ৩৬৮ (দ্বিতীয় খণ্ড)
২৩. নাইনটিন এইটি ফোর, জর্জ অরওয়েল, লন্ডন, ১৯৫৫, পৃ ৭০
২৪. ওই ; পৃ ৫৬
২৫. ওই ; পৃ ৫৬
২৬. ওই ; পৃ ৫৭

২৭. ওই ; পৃ ৩১
২৮ ব্রেকিং উইথ মস্কো, আর্কাদি এন শেভচেঙ্কো, নিউইয়র্ক, ১৯৮৫ ; পৃ ৫
২৯ ওই ; পৃ ৪৪৫
৩০. ওই ; পৃ ১৮
৩১. ওই ; পৃ ১৯-২০
৩২. ওই ; পৃ ২০-২৩
৩৩. ওই ; পৃ ২৪, ২৫
৩৪. ওই ; পৃ ৭৯-৮০
৩৫. ওই ; পৃ ৮২, ৮৫, ৮৬, ৮৮-৯০
৩৬. ওই ; পৃ ১২৬
৩৭. ওই ; পৃ ১২৯-১৩০
৩৮. ওই ; পৃ ১৩১, ১৩২
৩৯. ওই ; পৃ ১৪১, ১৪২
৪০. ওই ; পৃ ১৬৬
৪১. ওই ; পৃ ১২০
৪২. ওই ; পৃ ১৯২
৪৩. ওই ; পৃ ১৯৪
৪৪. ওই ; পৃ ৪০৪-৪০৬
৪৫. ওই ; পৃ ৪০৬-৪০৮
৪৬. ওই ; পৃ ২৪২-২৪৩
৪৭. ওই ; পৃ ৪২৯
৪৮. ওই ; পৃ ২৪৩
৪৯. ওই ; পৃ ২৪১
৫০. ওই ; পৃ ২৩১

ধূসর মস্কো

গর্বাচভ একদিন সকালে একটা ফোন পেলেন—

—মিখাইল সের্গেইভিচ বলছেন?

—হুঁ।

—'দোব্রোয়ে উত্রা' (সুপ্রভাত)।

—বলুন।

—শেভারনাদ্‌ঝে বলছি। সাংঘাতিক কাণ্ড! সোভিয়েত ইউনিয়নে আর সোভিয়েত লোকজনকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না!

—'স্তো' (কী)?

—আপনি সব দরজা, জানলা খুলে দিয়েছেন। দেশের লোক পৃথিবীময় ছড়িয়ে পড়েছে।

—তাহলে এখানে কারা আছে?

—এরা অন্য দেশের লোক।

—ওরা এখানে কেন?

—ফাঁকা জায়গায় আরামে থাকবে বলে। খোলা মাঠ। আকাশ। খোলা বাজার!

—আপনি জলদি চলে আসুন। পলিটব্যুরোর মিটিং ডাকুন। সবাইকে খবর দিন।

—কমরেড, কেউ তো নেই। কাকে মিটিংয়ে ডাকবেন?

—আপনি একাই চলে আসুন। জলদি।

—আমিও নেই!

—'চিভো' (কর্কশভাবে 'কী'। এটা সাধারণত কথ্য ভাষাতেই ব্যবহার করেন রুশিরা)!

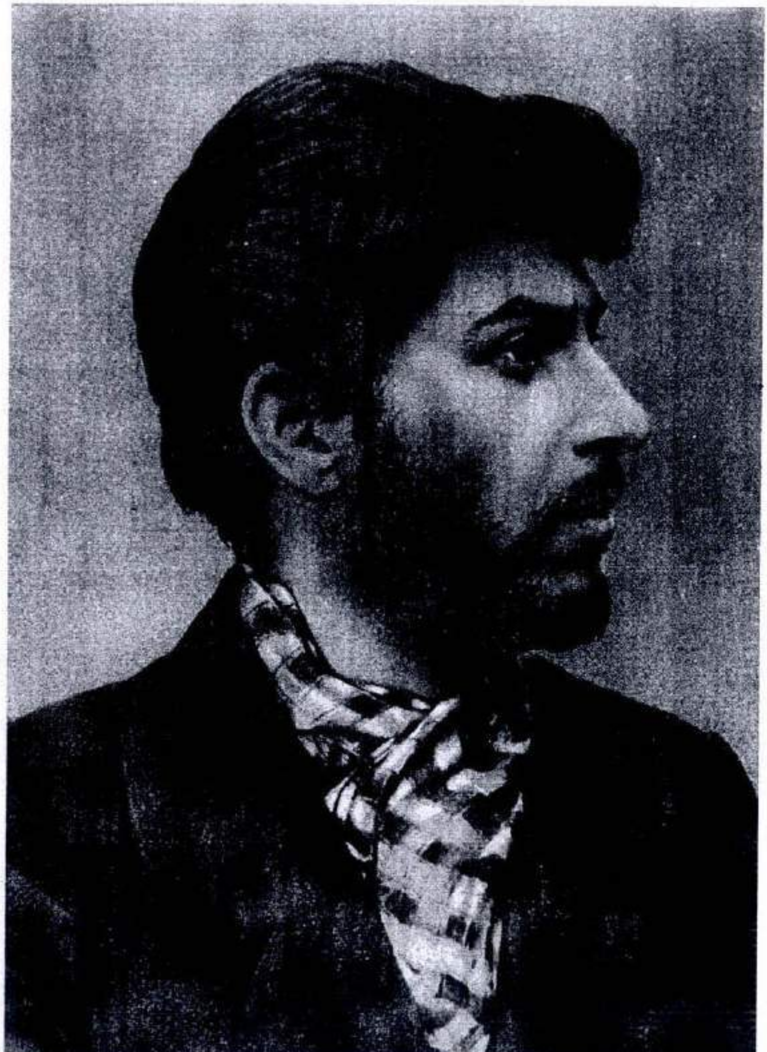
—হ্যাঁ, কমরেড। আমিও নেই। আমি এখন সুইডেন থেকে বলছি। আপনিই শুধু রয়ে গেছেন দেখলাম। একা।

গর্বাচভ ক্ষমতাসীন হওয়ার পর পেরিস্ত্রোইকা, গ্লাস্‌নস্ত নিয়ে যাবতীয় আলাপ আলোচনা, তর্কবিতর্ক, স্তালিনের ময়নাতদন্ত, খোলা অর্থনীতি নিয়ে আলোচনা যখন চূড়ান্ত বিন্দুতে পৌঁছেছে, সে সময় একদিন এন্দি আমায় বলল এই গল্পটা। মস্কোর রাস্তায় রাস্তায় তখন এধরনের অ্যানেকডট ঘুরে বেড়াচ্ছে। এন্দি নাকি মেট্রোতে এটা শুনেছিল।

সোভিয়েত সমাজতন্ত্র স্পষ্টতই একটা পরিণতির দিকে এগিয়ে যেতে শুরু করল। ১৯৩১-এ জন্ম, ৭১-এ সিপিএসইউ-এর কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য, ৮৫-তে সিপিএসইউ-এর জেনারেল সেক্রেটারি, ৯০-এ সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রেসিডেন্ট ভদ্রলোক, ৫৫-তে আইন নিয়ে মস্কো স্টেট ইউনিভার্সিটি থেকে পাশ করেছিলেন। এই হল গর্বাচভের সরলরৈখিক



স্তালিন



স্তালিন



সমাবর্তন উৎসব শেষ। ইউনিভার্সিটির দিনগুলোও শেষ



রেক্টর বিদায় জানালেন



স্তালিন



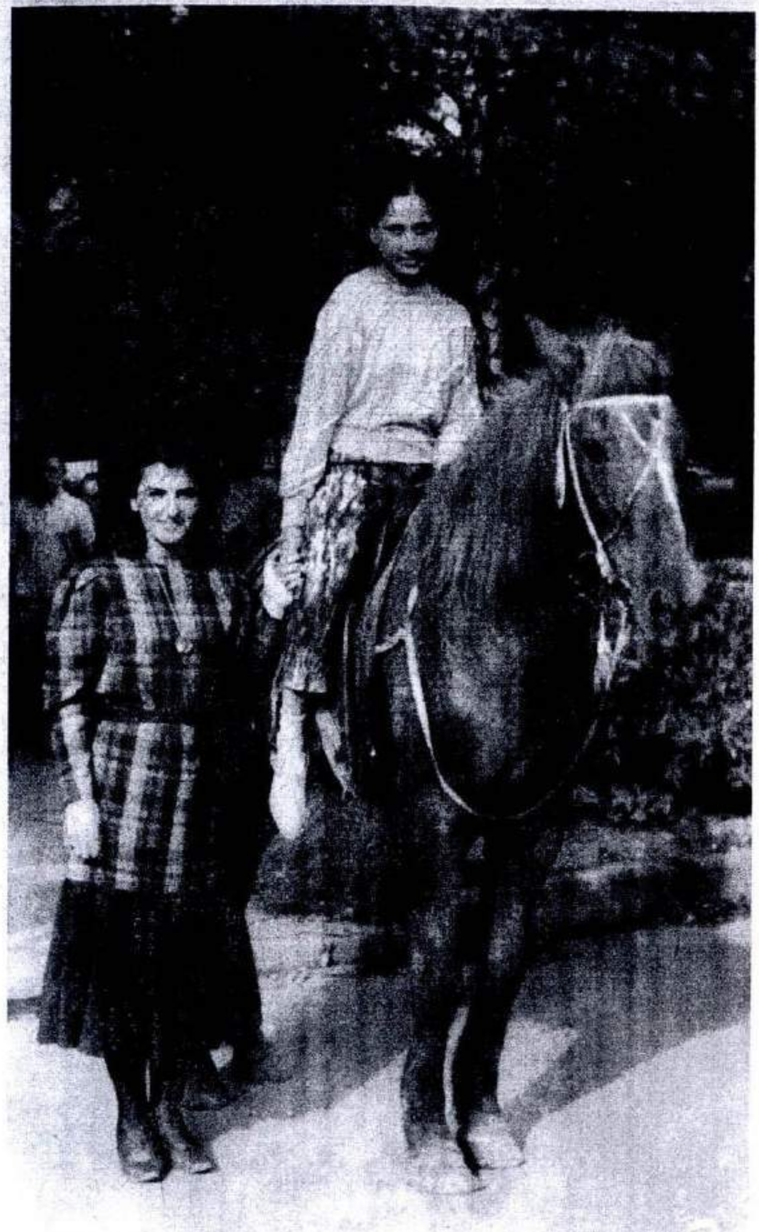
লেনিনের সঙ্গে



গোটা মস্কো শহরটা বাজার হয়ে গেল



মেট্রো স্টেশনে বাড়ির পোষা কুকুরটাকেও বিক্রি করতে নিয়ে এলেন ...... ডলার চাই, ডলার ....



ঘোড়ার পিঠে আমি। সঙ্গে নতুন বন্ধু এন্দি



ওরা আর আমরা

এক সন্ধিক্ষণে পৌঁছাল সোভিয়েত ইউনিয়ন। ক্রমেই দেখতে লাগলাম, বাপ-মা হীন একটা অনাথের মতো পাণ্ডুর, ধূসর হয়ে যাচ্ছে মস্কো। ৮৭-তে আমি মস্কো গিয়েছি। দু-বছরের মধ্যে সব কেমন উলটোপালটা হয়ে যেতে দেখলাম।

ধীরে ধীরে মস্কোর রংটা ছাই হয়ে যাচ্ছিল। লুমুম্বায় পড়তে আসা বিভিন্ন দেশের, আমার দেশের ছাত্ররা ব্যবসায়ী হয়ে উঠল। নারীমাংস, ভোদকা আর 'কালো ডলার' দখল করে নিল ছাত্রাবাসের প্রতিটি তল। প্রতিদিন অধিকাংশ ছেলের মধ্যে আলোচনা, কে কোন নতুন মেয়েকে কীভাবে ফুসলিয়ে বিছানায় নিয়ে গেছে। চারিদিকে অসভ্যতা। মস্কো যেন তখন বুক পেতে এই অসভ্যদের আশ্রয় দিয়েছে।

আমার ছিল দুটো পৃথিবী। বিশ্ববিদ্যালয়ের চত্বরটা আর বাইরের রাশিয়া। ক্রমশ একে অন্যের পরম বন্ধু হয়ে উঠল। একটা চূড়ান্ত নীতিহীনতা, একটা অতল গহ্বর সমাজটাকে চারদিক থেকে ঘিরে ফেলেছে। গর্বাচভ প্রেসিডেন্ট। স্তালিনের অনেক নিন্দে হয়েছে। মুক্ত, উদার সমাজনীতির স্রোতে ভেসে যাচ্ছে মস্কো। চারিদিকে প্রাণের অভাব, সবুজের অভাব, উষ্ণতার অভাব। আক্ষরিক অর্থেই একটা ধূসর ভাব চারিদিকে। আমাদের ইউনিভার্সিটির এক শিক্ষক ভাসিলি ইভানভ বলতেন, "মস্কোর বেশিরভাগ বাড়িঘর ছাইরঙের। বরফ ঢাকা লম্বা শীতকালের অধিকাংশ সকাল দুপুরও ছাইরঙা। দোকানে গিয়ে খুব উজ্জ্বল রঙের শার্ট বা সোয়েটার কিনতে ইচ্ছা করে আমার। কিন্তু খুঁজে পাই না। সেখানেও বেশিরভাগেরই রং ছাই। আর অদ্ভুত দ্যাখো, কিছুদিন থেকে মস্কোতে ছুঁচো, ইঁদুরের উপদ্রব খুব বেড়ে গিয়েছে। ওগুলোরও গায়ের রং সেই ছাই। চারপাশ থেকে একটা ধূসর আবরণ মস্কোকে আষ্টেপৃষ্ঠে ঘিরে ধরছে। পরিত্রাণ নেই। নিস্তার নেই। পালানোর কোনো রাস্তা নেই।"

মস্কো তখন প্রতিদিন পালটাচ্ছে। এই পালটানো, এই অদলবদল, কোনো নিয়মের ধার ধারছে না। কোনো ধারাবাহিকতা নেই। কোনো শৃঙ্খলা নেই। 'ইউনিফর্মিটি' নেই। একেবারে আমূল পালটে যাওয়ার আগে হয়তো এমনটাই হয়। চারিদিক থেকে ভাঙতে থাকে। তারপর ঝুপ করে একদিন তলিয়ে যায়। যেমন গিয়েছিল মুর্শিদাবাদের আখেরিগঞ্জ। ভাঙছিল। তারপর তলিয়ে গেল পদ্মায়। এখন লোকে বলে, আখেরিগঞ্জ নামে একটা ভূখণ্ড ছিল। যেমন ছিল, সোভিয়েত ইউনিয়ন।

এই ভাঙনের সময়টা আমি প্রত্যক্ষ করেছি। ধারাবাহিকতাহীন, বিক্ষিপ্তভাবে। তেমনই এখানে জড়ো করছি।

মস্কোতে খবরের কাগজে একদিন একটা অ্যানেকডট দেখেছিলাম। দুই বন্ধু। প্রথম দ্বিতীয়কে প্রশ্ন করছে, "আমেরিকার সঙ্গে রাশিয়ার মূল ফারাক কী বল তো?" দ্বিতীয় একে একে বলে চলেছে, "ভাষা আলাদা, আবহাওয়ার তফাত......" প্রথম মাথা নেড়ে বলেই চলেছে, "উহুঁ, হল না, হল না।" দ্বিতীয় শেষে হাল ছেড়ে দিল। মুচকি হেসে প্রথম বলল, "মূল ফারাক হল, আমেরিকায় কমিউনিস্ট আছে, রাশিয়ায় নেই।"

রুশ ভাষাতে একটা প্রবাদ আছে- 'ভ্ কাঝদোয় শুত্‌কে ইয়েস্ত দোল্‌ইয়া প্রাভ্‌দি' (সব

সত্যহ আছে। পৃথিবীর মানচিত্রের এক- ষষ্ঠাংশ জুড়ে যে লালরঙা সোভিয়েত ইউনিয়ন নামে দেশ ছিল, তার লাল রংটা গেল উবে। শুধু রং বদলই নয়, গোটা দেশটাই উধাও হয়ে গেল। যে বিশ্বাস, যে আদর্শকে ভিত্তি করে একাধিক সোভিয়েত প্রজন্ম বেড়ে উঠেছিল, তা উত্তরসূরিরা পরিত্যাগ করল, পুরোনো মোজার মতো। 'কমিউনিস্ট' বা 'কমরেড' শব্দগুলি রুশ ভাষায় গালাগালের সমার্থক হয়ে উঠল! সময় এমনই শক্তিমান!

এই সময়েরই কারসাজিতে কমিউনিস্ট সোভিয়েতের কিশোর-কিশোরীরা দিশা হারিয়ে ফেলল। আমাদের ইউনিভার্সিটির বিদেশি ছাত্রদের মুখে তখন প্রায়ই শুনতাম, মস্কোর সাবওয়ে আর মেট্রো স্টেশনগুলো দিন দিন বিপজ্জনক হয়ে উঠছে। ১৩-১৪ বছরের রুশ কিশোররা বিদেশি দেখলেই দলবেঁধে এগিয়ে আসে। প্রশ্ন করে, "দেশলাই আছে?" বিদেশিটি সম্মতিসূচক মাথা নেড়ে যতক্ষণ এ পকেট, ও পকেটে দেশলাই হাতড়ায়, ততক্ষণ ওই কিশোররা তীক্ষ্ণ চোখে তাকে পর্যবেক্ষণ করে। পার্টি কতটা শাঁসালো বোঝার চেষ্টা করে। তার উপর আশেপাশে লোকজন যদি কম থাকে, তাহলে আর চিন্তা নেই! ঝাঁপিয়ে পড়ে সব কেড়ে নিলেই হল। বিদেশি ঘড়ি, রুবল, ডলার, বিদেশি সিগারেট—একটু গায়ের জোর খাটালেই সব পকেটস্থ করে নেওয়া যায়। আশপাশের লোকেরা দেখলেও উটকো ঝামেলায় কে আর জড়াতে চায়! তাছাড়া রোজ ওই পথেই আসা যাওয়া করতে হবে। ছেলেগুলো দিনরাত ওখানেই ঘোরাঘুরি করছে। আজ যে প্রতিবাদ করবে কাল তাকেই ধরবে ওরা। তখন?

বিদেশি কোনো ভুক্তভোগী ছাত্রের মুখে এই বিবরণ শুনেছিল অনেকেই। শ্রোতাদেরই একজন কয়েকদিনের মধ্যেই একই প্রশ্নের মুখোমুখি হল। তেমনই একদল রুশ-কিশোর চারপাশ থেকে ঘিরে ধরল। সেই একই প্রশ্ন- 'দেশলাই আছে?" 'হ্যাঁ' বলাতে যা পরিণতি হয়েছিল, তা জানত এই বিদেশি ছাত্রটি। সেসব এড়াতে তাই সে বলল, "না, নেই।" পাশ কাটিয়ে এগিয়ে যেতে চাইল সে। পারল না। তিন-চারজন কিশোর ঝাঁপিয়ে পড়ল তার উপর। মাটিতে পড়ে গেল ছাত্রটি। লাথি, কিল, চড়, ঘুঁষি চলল অবিরাম। সে চেঁচাল। চেঁচিয়ে সাহায্য চাইল। শীতকালের রাত দশটার প্রায় ফাঁকা হয়ে আসা মেট্রো স্টেশন। কেউ এগিয়ে এল না। শক্তপোক্ত গড়নের রুশ কিশোরদের দলবদ্ধ আক্রমণে নেতিয়ে পড়ল বিদেশি যুবকটি। তার হাত থেকে ঘড়ি খুলে নিল ওরা। পকেট থেকে মানিব্যাগ বের করে নিল। শেষে দামি লেদার জ্যাকেটটাও গা থেকে খুলে নিল। অবসন্ন ছেলেটি কিছু করতে পারল না। বাধা দেওয়ার ক্ষমতা তার ছিল না। সর্বস্ব হাতিয়ে, 'হাতের সুখ' করে নিয়ে, জাত তুলে, বাপ-মা তুলে বিশ্রী সব গালাগাল দিতে দিতে ওরা চলে গেল। ঘন্টা দুয়েক পরে কোনোরকমে উঠে দাঁড়াল ছেলেটি। সারা গায়ে অসহ্য ব্যথা। মাইনাস কুড়ির নীল শীতে শুধু একটা সোয়েটার গায়ে কাঁপতে কাঁপতে শেষ বাসে চড়ে সে হস্টেলে পৌঁছল, কী করে সে নিজেই জানে না।

পরদিন অনেক বেলায় তার ঘুম ভাঙল। তখন ধুম জ্বরে প্রায় অচেতন সে। রুমমেট তাড়াতাড়ি ইউনিভার্সিটির পলিক্লিনিক থেকে ডাক্তার ডেকে আনল। ওষুধ আর অভয় দিয়ে

যাওয়ার সময় তিনি বললেন, "এমন বোকামি আর কখনো কোরো না। ১৩-১৪-র ওই ছেলেদের প্রাণে ভয়ডর বলে কিছু নেই। ওরা বেপরোয়া। ওরা আইনকে ভয় পায় না। শাস্তিকে ভয় পায় না। খুব সামান্য কারণে বা অকারণেই খুনও করে ফেলতে পারে ওরা। এরপর যদি কখনো ওদের পাল্লায় পড়ো, বেশি কথা না বলে, যা সঙ্গে থাকবে দিয়ে দিও। প্রাণটা অন্তত বাঁচবে তাহলে।"

ওষুধ আর সময়ের যৌথ ক্রিয়ায় ছাত্রটি ভালো হয়ে উঠল। রাতের দিকে সে আর বেরোত না। হস্টেলেই থাকত। একা থাকলেই সেই ডাক্তারের উপদেশ তার মনে পড়ত। শুধু বিদেশিরাই নয়, প্রাপ্তবয়স্ক রুশিরাও ওই ১৩-১৪ বছরের কিশোরদের ভয় পায়। অথচ কয়েক বছর আগেও এমনটা ছিল না।

৫-১৬ বছরের সোভিয়েত শিশু ও কিশোররা ছিল পাইওনিয়র অর্গানাইজেশনের সদস্য। গরমের আর শীতের ছুটিতে দলবেঁধে একসঙ্গে বেড়াতে যেত পাইওনিয়ররা। ক্যাম্পে বাস করত। নাচগান, নাটক করত সেখানে। সোভিয়েতের শিশু ও কিশোরদের জন্য 'পিয়ানেরস্কায়া প্রাভ্‌দা' নামে একটি সংবাদপত্র প্রকাশিত হত, সপ্তাহে তিনবার। শিশুকে ঠিকভাবে বড়ো করে তোলার জন্য মা-বাবার মতোই প্রতিবেশীরা, সমাজ, রাষ্ট্রও সক্রিয় থাকত। তৃতীয় শ্রেণির ওঁছা মার্কিনি ফিল্‌মের বখে যাওয়া কিশোর চরিত্রদের সঙ্গে সোভিয়েত কিশোরদের তখনও আলাপ হয়নি। সোভিয়েত ইউনিয়নের ভাবী নাগরিক হিসেবে একটা গর্ববোধ তাদের মধ্যে লালন করার শিক্ষা দেওয়া হত সেই শৈশব থেকেই।

তারপর একদিন পুনর্নির্মাণের গল্প শোনানো হল তাদের। শুধু তাদের নয়, তাদের বাবা-মা, মামা-মাসি, দিদিমা-দাদু-সকলকে। ভোগী জীবনের লোভ দেখানো হল। পুনর্নির্মাণের তোড়ে পুরোনো যা ছিল ভেঙে দেওয়া হল, জীর্ণ বলে উপহাস করল সকলে। অস্বীকার করল পুরোনো নীতি, আদর্শের প্রয়োজনীয়তাকে। সবই চলল উৎসাহীর দ্রুততায়। তবে একটা কথা সকলে ভুলে গেল। পুরোনোকে তো হটানো হল, তার জায়গায় নতুনকে বসানোর প্রতিশ্রুতিতে ; কিন্তু সেই নতুনকে গড়বে কে ? নতুনকে গড়ে তোলার আগেই পুরোনোকে যে সকলে ফেলে দিয়েছে! তৈরি হল এক মস্ত ফাঁক। শূন্যতা। ক্লাস নাইন, টেন-এ তখন কোনো ইতিহাস পড়ানো হত না। অক্টোবর বিপ্লবের কথা, সিপিএসইউ-এর বৃত্তান্ত—গত সত্তর বছর ধরে লেখা ইতিহাস, প্রচলিত ধারণা বা বিশ্বাস নিয়ে তখন প্রশ্ন উঠেছে। ইতিহাসের সত্যতা নিয়ে বড়োরা তখন সন্দিহান। ছোটোদের সেই 'ভুল' ইতিহাস পড়ানো চলবে না। অতএব স্কুলের শেষ ধাপে পাঠ্য ইতিহাস বইটিকেই বাতিল করে দেওয়া হল। 'সংশোধিত ইতিহাস' লেখার ফুরসত তখনও পাননি 'সত্যসন্ধানী'-র দল। স্কুল পড়ুয়ারা অবশ্য বড়োদের এই ছেলেমানুষিতে বেজায় খুশি। ইতিহাসের ওই খটোমটো সন তারিখ নিয়ে আর মাথা ঘামাতে হবে না।

প্রাপ্তবয়স্ক সোভিয়েত প্রজন্মই তখন বিভ্রান্ত। এই অবস্থায় উঠতি ছেলেমেয়েকে কী করে রাস্তা দেখাবেন তাঁরা।

সোভিয়েত কিশোররা যখন সাবওয়ে আর মেট্রো স্টেশনের অন্ধকার কোণে ঘাপটি

মেরে বসে থাকত, গায়ের জোর খাটিয়ে দু-দশ ডলার রোজগারের ধান্দায়, সোভিয়েত কিশোরীরা তখন বিদেশি ছাত্রদের হস্টেলে ঘুরে বেড়াত। কারণটা একই—ডলার রোজগার। তবে এক্ষেত্রে গায়ের জোর খাটিয়ে নয়, দেহের মোহে কাবু করে।

আর এইসব ছেলেমেয়ের মায়েরা তখন দোকানে দোকানে ঘুরে বেড়াতেন। সকাল থেকে রাত পর্যন্ত। কাজের ফাঁকে যখনই সময় পেতেন। এক দোকান থেকে আর এক দোকান, এক পাড়া থেকে অন্য পাড়া। মস্কোর বিশাল বিশাল দোকানের সার সার কাচের শোকেস তখন খাঁ খাঁ করছে। চিজ, মাখন, সসেজ, মাংস, রুটির বদলে শোকেসে তখন সাজানো থাকত প্লাস্টিকের ক্যারিবাগ। বিভ্রান্ত মস্কোবাসী বুঝে উঠতে পারত না, অত ব্যাগ নিয়ে কী হবে? কী দিয়ে ওই শূন্য ব্যাগ তারা ভরে তুলবে!

একে একে সমস্ত জিনিস দোকান থেকে তখন উধাও হয়ে যাচ্ছে। চিনি, দুধ, দুগ্ধজাত সামগ্রী, পাঁউরুটি, চাল, ময়দা, আলু, পেঁয়াজ, ডিম, মাংস, সাবান, জুতো, জামাকাপড়, বাসনপত্র—সবই তখন অমিল। দোকানে তখন নিত্যনতুন 'চমক'। দুধের সরবরাহ অনিয়মিত। মাংসের সাপ্লাই নেই। অন্যান্য প্রজাতন্ত্র থেকে খাবারদাবার পাঠিয়ে মস্কোর লোকেদের এতদিন নির্ভাবনায় রেখেছিল গোটা সোভিয়েত ইউনিয়ন। সেই বন্দোবস্ত ভেঙে পড়েছে। অন্য প্রজাতন্ত্রের বাসিন্দারা মস্কোবাসীকে খাইয়ে-পরিয়ে সুখে রাখতে আর রাজি নয়। সবাই শুধু নিজের কথা ভাবতে শুরু করেছে তখন। হঠাৎ এমন পরিস্থিতিতে পড়ে মস্কোর গৃহিণীরা তখন উদভ্রান্ত। সন্তানের মুখের সামনে দুবেলা খাবার ধরার জন্য, ঘন্টার পর ঘন্টা লাইনে দাঁড়িয়ে, যেখানে যা পাওয়া যায়, একটু একটু করে জড়ো করে চলেছেন তারা। পথচলতি কারোর বাজারের ব্যাগে ডিম দেখতে পেয়ে ব্যাকুল প্রশ্ন- "কোথায় পেলেন?" "ওই তো, দু-নম্বর মাগাজিন (দোকান)-এ"- বিজয়ীর হাসি মুখে ঝুলিয়ে ঝটপট উত্তর। মুহূর্তে ছুট দু-নম্বরের দিকে। সেখানে তখন আঁকাবাঁকা সর্পিল লাইন, দোকানের বাইরে রাস্তা পর্যন্ত বেরিয়ে গেছে। একেবারে শেষে দাঁড়িয়ে শুনলেন, মাথাপিছু দশটা ডিমের বেশি দিচ্ছে না। তা-ও কুলোবে কিনা সন্দেহ। আর খুব বেশি স্টকে নেই। তবু আশা ছাড়া যায় না। দেখাই যাক, যদি পাওয়া যায়।

মস্কোবাসীর জীবন তখন ছোটোখাটো 'আনন্দে' ভরপুর। ও পাড়ার দোকানে খুব ভালো সসেজ পেয়েছি আজ—কী আনন্দ! অফিস থেকে ফেরার পথে দোকানে ঢুকে হঠাৎ দেখি চিজ বিক্রি হচ্ছে—কী আনন্দ! ভালো মাংস কিনেছি—কী আনন্দ! দুটো মুরগি পেয়েছি, লাইনে প্রায় ঘন্টাদুয়েক দাঁড়াতে হয়েছে ঠিকই, তাও—কী আনন্দ! আনন্দ, আনন্দ, একেবারে আবিষ্কারের আনন্দ, গুপ্তধন খুঁজে পাওয়ার আনন্দ। রান্নার তেল মিলেছে প্রায় মাসখানেক পরে—কী আনন্দ! রাজ্য জয়ের আনন্দ কোথায় লাগে এর কাছে!

দশটা ডিম পাওয়ার আশায়, দু-নম্বর দোকানের লাইনের শেষের দিকে দাঁড়িয়ে আছেন সেই মহিলা। অফিস থেকে ফেরার পথে। লাইন এগোচ্ছে শামুকের গতিতে। এরই মাঝে ঝগড়াঝাটি, কথা কাটাকাটি। 'আপনি আবার কোথা থেকে এলেন?' 'মানে? ঘন্টাদেড়েক ধরে আপনার চোখের সামনে দাঁড়িয়ে আছি আর বলছেন, কোথা থেকে এলাম? চোখের

আপনাকে।' 'কী, জানোয়ার ? আমি জানোয়ার ? মেরে মুখ.....' এই সময় প্রচণ্ড জোরে সেলসগার্লের চিৎকার- 'এমন হট্টগোল করলে এক্ষুনি দোকান বন্ধ করে দেব। ডিম খাওয়া বেরিয়ে যাবে একেবারে। বলছি, এতজন দাঁড়াবেন না। ডিম আর নেই। তা-ও কে কার কথা শোনে! অন্য দোকানে যান না। দেখুন, কিছু হয়তো পেয়ে যাবেন সেখানে। শুধু শুধু সময় নষ্ট। যত্তো সব--।" ভয় পেয়ে গেল সকলে। দশটা ডিমের আশায় দাঁড়িয়ে থাকা সোভিয়েত নাগরিকরা। মুখ বন্ধ করে আবার অপেক্ষা।

সেলসগার্ল, দোকানের কর্মী, দোকানের ডিরেক্টর তখন দেবতুল্য। ওদের তুষ্ট রাখতেই হবে। ওদের হাতেই সব। লাইনের শেষের দিকে দাঁড়িয়ে থাকা, সারাদিন অফিস করে ক্লান্ত, অবসন্ন, আমাদের চেনা সেই মহিলা তখন নিচু গলায় গল্প করছেন তাঁর সামনে দাঁড়ানো এক যুবতীর সঙ্গো। যুবতীটি গর্ভবতী।

-এমন এক সময়ে আমরা বাস করছি যে, সন্তানকে পৃথিবীতে নিয়ে আসতে ভয় করে। তা-ও আপনার সাহস আছে বলতে হয়। এত বড়ো ঝুঁকি নিচ্ছেন। সাবাসি দিতে হয় আপনাকে।

-কী করব ? জীবন তো থেমে থাকে না। কবে দেশের হাল ফিরবে, কবে আবার আগের মতো দোকান ভরে উঠবে জিনিসে, সেই আশাতে বসে থাকলে কী চলে ?

-হ্যাঁ। তা ঠিক। তবে আপনার জায়গায় আমি হলে ভরসা পেতাম না।

-আপনার ছেলেমেয়ে নেই ?

-আছে। সেইজন্যই তো বলছি।

-কত বয়স তাদের ?

-একটাই ছেলে। এবার ষোলোতে পড়েছে। সারাদিন পর বাড়ি ফিরে ফ্রিজ খুলে যদি দ্যাখে খাবার নেই, ভীষণ খেপে যায়। সরাসরি আমাকে ধরে। বলে, 'কিছু নেই কেন ফ্রিজে ? সারাদিন কোথায় চরে বেড়াও ? খাবার জোগাড় করে রাখতে পারো না ?' ওর জন্যই তো লাইনে দাঁড়িয়েছি। ডিমটা পাওয়া গেলে কয়েকদিনের জন্য স্বস্তি।

-আপনি কিন্তু আমাকে ভয় পাইয়ে দিচ্ছেন।

-না, না, সে কি কথা! প্রার্থনা করি, যখন আপনার ছেলে ষোলোতে পড়বে, তখন যেন কোনোদিন আপনাকে এমন লাইনে দাঁড়িয়ে, ঘন্টার পর ঘন্টা সময় বরবাদ করে, খাবার জোগাড় করতে না হয়। এই হতাশা, এত কষ্টের মধ্যেও আমি আশা হারাইনি। আমি মনেপ্রাণে বিশ্বাস করি, আমাদের এই মনুষ্যেতর জীবনযাপনের মেয়াদ বেশিদিনের জন্য নয়।

আবার একটা সোরগোলে দুজনের কথাবার্তা থেমে গেল। এক 'বাবুশ্‌কা' (ঠাকুমা) তারস্বরে চেঁচাচ্ছেন। একটু পরে ব্যাপারটা বোঝা গেল। দু-জন আফ্রিকান ছাত্র প্রায় ষাটটা ডিম নিয়ে চলে যাচ্ছিল। লাইনে না দাঁড়িয়েই। ট্যাক্সি দাঁড় করিয়ে রেখে একেবারে দোকানের স্টোররুমে ঢুকে গিয়েছিল। পাঁচগুণ দাম দিয়ে সঙ্গো সঙ্গো ডিমগুলো নিয়ে বেরিয়ে এল দু-জন। দোকানের কর্মচারীদের সঙ্গো যে তাদের বিশেষ ঘনিষ্ঠতা, তা বলাই

লাইনে দাঁড়িয়ে আছেন আর শুনে চলেছেন সেলসর্গালরা প্রায়ই বলছে, ডিম কিন্তু ফুরিয়ে আসছে। তারপর চোখের সামনে পেছনের দরজা দিয়ে এই কারসাজি দেখে চুপ করে থাকতে পারেননি 'বাবুশকা'। বিদেশি ছেলেগুলোকে প্রথমে ভর্ৎসনা করলেন। তারা পাত্তাই দিল না। দাঁত বের করে হাসতে হাসতে, ডিমের প্যাকেট হাতে দোলাতে দোলাতে ট্যাক্সিতে গিয়ে বসল। হুস করে ট্যাক্সিটা বেরিয়ে গেল। বৃদ্ধার যত রাগ গিয়ে পড়ল দোকানের কর্মীদের উপর। "ছি, ছি, এত অসৎ তোমরা। আমার এতগুলো মানুষ কষ্ট করে লাইনে দাঁড়িয়ে আছি আর আমাদের চোখের সামনে এমন কাণ্ড করছ! তোমাদের জন্যই আজকে দেশের এই হাল।"

ষণ্ডামার্কা একজন সেলসম্যান বৃদ্ধার দিকে তেড়ে এল। চোখ পাকিয়ে বলল, "কী যা তা বকবক করছেন? বেশি আদর্শ দেখাতে আসবেন না। ওই আদর্শ ধুয়ে খান গিয়ে বসে। ডিম আপনি কী করে পান দেখছি।" বৃদ্ধাও খিঁচিয়ে উঠলেন, "চোখ রাঙিয়ে কথা বোলো না, ছোকরা। অত সহজে ঘাবড়ানোর মানুষ নই আমি। লাইনের সবাই চুপ করে আছে। কেউ একটা প্রতিবাদ করছে না। না করুক। এমন মেরুদণ্ডহীনে আজ দেশটা ভরে গেছে। দুটো ডিমের জন্য সবাই এত বড়ো অন্যায়টা মেনে নিচ্ছে! ছি, আমার ঘেন্না করছে। তোমরা যদি বিনা পয়সায় আমাকে ডিম দাও, তা-ও আমি নেব না। ছুঁড়ে দেব তোমাদের মুখের উপর। তোমাদের প্রজন্মের লোকেরা যত সহজে বিক্রি হয়ে যায়, আমরা তত সহজে হই না। এখন এই অথর্ব, অসহায় বয়সেও নয়। তোমাদের দেখলে আমার করুণা করতে ইচ্ছা হয়।"

চিৎকার করে কথাগুলো বলে দর্পিত পায়ে বৃদ্ধা লাইন থেকে বেরিয়ে গেলেন। দু-আড়াই ঘন্টা লাইনে দাঁড়িয়ে, কয়েকটা ডিম ব্যাগে পুরে, বিজয়ীর ভঙ্গিতে যারা এতক্ষণ দোকান থেকে বেরিয়ে যাচ্ছিল, তাদের উচ্ছ্বাস, বৃদ্ধার দৃঢ়তার তুলনায় বড়োই নিষ্প্রভ ঠেকছিল। আর লাইনে দাঁড়িয়ে থাকা মানুষগুলোকে দলা পাকানো কেন্নোর মতো মনে হচ্ছিল।

বিদেশি ছাত্রছাত্রীরা লাইনে দাঁড়াতে চাইত না। অনেকেই সহজ একটা রাস্তা খুঁজে নিয়েছিল। কয়েকটা দোকানের কিছু কর্মচারীকে হাত করে নিত তারা। কোনো জিনিস দোকানে আসার সঙ্গে সঙ্গে এই 'বিশেষ' ক্রেতাদের জন্য সেরাগুলো আলাদা করে রাখত ওই কর্মচারীরা। তিনগুণ, চারগুণ দামে তা বিক্রি করত বিদেশিদের। লাইনে না দাঁড়িয়ে, পিছনের দরজা দিয়ে ঢুকে মাল নিয়ে বেরিয়ে আসত ডলারওয়ালা বিদেশিরা। তাদের দরকার ছিল জিনিসপত্র, খাবারদাবার। আর নামমাত্র মাইনে পাওয়া দোকানের কর্মীদের দরকার ছিল প্রচুর রুবল।

সরেস মাল নিয়ে দোকানের স্টোররুম থেকে বেরিয়ে যাওয়ার সময় এরা লাইনে দাঁড়ানো রুশিদের দেখত। একটু হাড়ে ঠাসা মাংস, একটু চাল, ময়দা, দুধের জন্য কতক্ষণ হা-পিত্যেশ করে দাঁড়িয়ে আছে ওই বিবর্ণ, বিধ্বস্ত মানুষগুলো। দাঁত বের করে হেসে ঠাট্টা করত বিদেশিরা- "রুশিগুলোর জীবনের অর্ধেকটা এই লাইনে দাঁড়িয়েই কেটে যায়।"

বিদেশিদের এই চালাকি স্বাভাবিক কারণেই মস্কোবাসীর অসহ্য ঠেকত। ধারেকাছের সব বিদেশিই এইভাবে তাদের অসুবিধা করছে বলে বিশ্বাস করতে শুরু করল তারা। পকেটমোটা, সুবিধাভোগী বিদেশিদের কৃতকর্মের ফল ভোগ করতে হত ছা-পোষা বিদেশি ছাত্রছাত্রীকেও।

আমার বন্ধু করাচির মেয়ে অ্যানা আর আমি একদিন বাজার করে ফিরছি। সেই টানাটানির সময়। আমাদের হস্টেল পাড়ার দোকানে আলু পেঁয়াজ পাওয়া যাচ্ছিল না। অগত্যা বাসে চেপে পাঁচ-ছটা স্টপেজ পেরিয়ে একটা সবজির দোকানে কিছু পেলাম। আবার কবে কোথায় মিলবে এই ভেবে বেশি করে আলু পেঁয়াজ কিনলাম। লাইনে দাঁড়াতে হল অনেকক্ষণ। পা টনটন করছে। দুহাতে ভারী দুটো ব্যাগ, দুজনেরই। বেশ দেরি করে বাস এল। বসার জায়গা পেলাম না। ব্যাগ দুটো নামিয়ে রেখে কোনোরকমে দুজনে দাঁড়িয়েছি। তিনটে স্টপেজ পেরিয়ে গেল। অ্যানার ঠিক সামনের সিটটা খালি হল। ও তখনও ঠিক করে বসেনি, কোথা থেকে বছর পঁয়তাল্লিশের এক রুশি মহিলা ধেয়ে এলেন। খ্যাঁকখ্যাঁক করে বললেন, "আমরা সব গাধা নাকি? সারাদিন বোঝা বয়ে বেড়াব? আর তোমরা নিজেদের কী ভাবো? লাইনে না দাঁড়িয়ে জিনিস কিনবে! বাসে বসে যাবে! আমাদেরই দেশে থেকে আমাদের সঙ্গে এমন ব্যবহার করার সাহস পাও কোথা থেকে?" এমন আকস্মিক আক্রমণে অ্যানা আর আমি হতবাক হয়ে গেলাম। অ্যানা তাড়াতাড়ি নিজেকে সামলে নিয়ে প্রশ্ন করল--"আপনি বসতে চান? সেটা বললেই পারতেন। আপনি তো অনেকটা দূরে ছিলেন আর সিট খালি হল আমার সামনে। তা-ও বললে আমি আপনাকে বসতে দিতাম। অ্যানার কথা শেষ হওয়ার আগে ষন্ডামার্কা আর এক রুশ মহিলা বাজখাঁই গলাতে ধমকে উঠলেন, "কোন দেশের মানুষ তোমরা? শিক্ষাদীক্ষার বালাই নেই। বড়োদের মুখে মুখে কথা বল?" বাসের অন্যান্যরাও কটমট করে আমাদের দুজনের দিকে তাকিয়ে। তাড়াতাড়ি বাংলাতে (অ্যানা বাংলা জানে) বললাম, অ্যানা, আর কোনো কথা বলিস না। একদম চুপ করে থাক। হস্টেল এসে গেছে। শিগ্‌গির নেমে পড়।

আবার এমনও হত, পকেট মোটা না হয়েও অনেক বিদেশি ছাত্র মার খেত। নিজেদের কৃতকর্মের ফল হিসেবেই। এদের ভাবটা ছিল এমন যেন মস্কোয় থেকে রুশিদেরই ধন্য করে দিচ্ছে। এমনই একজন পাকিস্তানের ছাত্র ইমতিয়াজ। একদিন ভীষণ মার খেয়েছিল সে। দশাসই চেহারার এক রুশ যুবকের হাতে।

আমাদের ইউনিভার্সিটির ঠিক উলটোদিকে একটা দোকান ছিল। দুধ, পাঁউরুটি, সসেজ, মাছ, মাংস পাওয়া যেত। মস্কোর সব দোকানের মতো আমাদের দোকান থেকেও খাবারদাবার উবে গেল। তারই মাঝে একদিন দুপুরে দোকানে প্রচুর দুধ এল। ছাত্ররা খবর পেয়ে ছুটল। আশপাশের পাড়া থেকে ততক্ষণে প্রচুর মস্কোবাসীও এসে জড়ো হয়েছে। রবিবার বলে ভিড় বেশি। সেই ভিড়ে ইমতিয়াজও ছিল। লম্বা লাইনে না দাঁড়িয়ে সেলসগার্লের কাছে গিয়ে সে বলল 'বাড়িতে আমার ছোটো বাচ্চাকে রেখে এসেছি। লাইনে দাঁড়াতে পারব না। দুধের খুব দরকার। আমাকে বিনা লাইনে দু-প্যাকেট দিয়ে

দিন।" লাইনে দাঁড়ানো অনেকে চেঁচিয়ে উঠল, "আমাদের বাড়িতেও বাচ্চা আছে। আমরা তো লাইনে দাঁড়িয়েছি।" বেশ কিছুক্ষণ কথা কাটাকাটি, চেঁচামেচি চলল। ইমতিয়াজও ছাড়বে না, লাইনের লোকেরাও নাছোড়। প্রায় ঘন্টাখানেক দাঁড়িয়ে থাকল ইমতিয়াজ। শেষমেশ সেলসগার্ল তাকে ডেকে একটা দুধের প্যাকেট দিল। আরো একটা চাইল ইমতিয়াজ। পেল না। রাগ দেখিয়ে দুধের প্যাকেটটা দেওয়ালে ছুঁড়ে মারল সে। প্যাকেট ফেটে গোটা দোকানে দুধ ছড়িয়ে পড়ল। একই সঙ্গে, হিন্দি সিনেমার রাগী নায়কের কায়দায় গরম গরম ডায়লগও ছুঁড়ে চলল সে--"এমন দেশের কী বলতে দিয়েছে! সব ভেঙেচুরে শেষ করে দেব! জ্বালিয়ে দেব সব!" লাইনে দাঁড়িয়ে থাকা বিরাট চেহারার এক রুশ যুবক আর সহ্য করতে পারল না। তেড়ে এসে ইমতিয়াজের গলা টিপে ধরল। মাটিতে ফেলে তার বুকের উপর চেপে বসল। ইমতিয়াজের চোখ উলটে যাওয়ার জোগাড়। সকলে ছুটে এসে তাড়াতাড়ি দুজনকে ছাড়াল।

'সায়ুজ সোভিয়েত্স্কিখ সাৎসিয়ালিস্তিচেস্কিখ রিস্পুবলিক।' ইংরেজি অনুবাদে--ইউনিয়ন অব সোভিয়েট সোসালিস্ট রিপাবলিক্স। পৃথিবীর প্রথম সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র। সেই রাষ্ট্রের কোনো নাগরিক নিরক্ষর নয়—সর্বজনীন শিক্ষানীতির পূর্ণ বাস্তবায়ন। মেট্রোতে, এসকালেটরে, দোকানের লাইনে, সব জায়গায় তারা বইয়ে মুখ গুঁজে থাকে। ধৈর্যশীল, মার্জিত, শিক্ষিত এই সোভিয়েত নাগরিকরা আমার চোখের সামনে ধীরে ধীরে পালটে গেল। চারপাশের পরিস্থিতি তাদের পালটে যেতে বাধ্য করল। এক টুকরো মাংসের উপর দশ-বারোজন হামলে পড়ত। কুকুরের মতো টানাটানি করত। খাবারের লাইনে দাঁড়িয়ে ছাত্র-শিক্ষক ধাক্কাধাক্কি করত। কথা কাটাকাটি—শিক্ষক ছাত্রকে বলতেন, "লাইনে তো ছিলে না। এলে কোথা থেকে?" তখন তারা দুজনেই একটি ক্ষুধার্ত নগরীর দুই ক্ষুধার্ত বাসিন্দা। অন্য আর কোনো সম্পর্ক নেই তাদের মধ্যে। দোকানে চাল পাওয়া যাচ্ছে শুনে ক্লাস 'মিস' করে সেদিকে ছোটে ছাত্ররা। খিদে পেটে তারা পড়াশোনা করবে কী করে?

সোভিয়েত সমাজব্যবস্থায় মস্কোবাসীরা ছিল সুবিধাভোগী শ্রেণি। বিভিন্ন প্রজাতন্ত্র থেকে সেখানকার উৎপাদিত সামগ্রীর একটা বড়ো অংশ যেত রাজধানী মস্কোয়। পরিমাণগত বিচারে শুধু নয়, গুণগত মানেও সেসব ছিল সেরা। রাজধানী বলে কথা! দেশের মাথারা থাকেন সেখানে। তাদের শরীরটাকে তো রাখতে হবে!

মস্কোবাসীকে চা, ফল আর কনিয়াক খাওয়াত জর্জিয়া। ফল যেত মধ্য এশিয়া, মোলদাভিয়া আর ককেশাসের অন্যান্য উষ্ণ অঞ্চল থেকেও। জ্বালানি তেলের জোগান দিত আজারবাইজানের রাজধানী বাকু। প্রিবাল্টিক থেকে মাংস ও দুগ্ধজাত সামগ্রী পৌঁছাত মস্কোতে। এমনি করেই, খেয়ে পরে, রাজার হালে দিন কাটাচ্ছিল রাজধানী মস্কো। বাধ সাধল প্রজারা। প্রজাতন্ত্রগুলো একসময় মস্কোকে এই অতিরিক্ত সুযোগসুবিধা দেওয়া বন্ধ করল।

অসন্তোষ থাকলেও, রাগ থাকলেও, রাজধানীর বিরুদ্ধে একদিনে তো সোচ্চার হওয়া যায় না। তাই ইচ্ছার বিরুদ্ধেই রাজধানীতে উৎপাদিত সামগ্রী পাঠাতে বাধ্য থাকত প্রজাতন্ত্রগুলো। কিন্তু তাদের নিজেদেরই যখন সব গেল, তখন মস্কোও হল ধরাশায়ী।

সোভিয়েত ইউনিয়নে উৎপাদনের মাধ্যমেও প্রজাতন্ত্রগুলোকে বেঁধে রাখার একটা পরিকল্পিত ব্যবস্থা কায়েম ছিল। যেমন ধরুন, একটা টেলিভিশন সেট। আজারবাইজানে হয়তো সেটা বিক্রির জন্য বাক্সবন্দী হল। তার পিকচার টিউব তৈরি হয়েছে কোনো এক প্রজাতন্ত্রে, ধরা যাক, লাতভিয়ায়। তো তার ক্যাবিনেট তৈরি হয়েছে জর্জিয়ায়। অন্যান্য সার্কিট তৈরি হয়েছে ভিন্ন ভিন্ন প্রজাতন্ত্রে। এইভাবে আট-দশটা প্রজাতন্ত্র মিলে তৈরি করল একটা টেলিভিশন সেট। প্রথমদিকে সোভিয়েত সমাজতন্ত্র এই ব্যবস্থার জন্য বাহবা পেত। 'ইনভলভমেন্ট' কাকে বলে, সকলে মিলে আমরা এক, ওই টিভি সেটটার মতো, সোভিয়েত সমাজের মতো, তা মানুষজন দেখত, দেখানো হত।

পরে যখন মস্কোতে ডামাডোলের বাজার তখন শুনতাম বিভিন্ন প্রজাতন্ত্রের ছেলেমেয়েরা বলত, এটা আসলে একটা ছক। কোনো প্রজাতন্ত্রই যাতে স্বাবলম্বী হয়ে উঠতে না পারে, তার পাকাপাকি ব্যবস্থা করা। যাতে কোনো বেয়াদব আলাদা করে কোনো কিছু করে ফেলতে না পারে।

প্রজাতন্ত্রগুলো ধীরে ধীরে এই ব্যবস্থাকে অস্বীকার করতে শুরু করল। সামগ্রিকভাবে প্রজাতন্ত্র, এককভাবে ব্যক্তি—কেউই চালু ব্যবস্থাকে আর মেনে নিতে চাইছিল না।

একটা ক্যাবিনেটের মধ্যে যেমন ঠেসেঠুসে যন্ত্রাংশ ভরে টিভি তৈরি হল, তেমনই ঠেসেঠুসে মানুষগুলো আর প্রজাতন্ত্রগুলোকে 'সমাজতন্ত্রের' মোড়কে বন্দী রাখতে চাইছিলেন সোভিয়েতের কর্ণধাররা। কালের গতি সেসব ভেঙে দিল। লোকেরা 'ভয়হীন' হল। তার প্রভাব প্রথমেই পড়ল উৎপাদনের উপর। নিজের কাজটা কেউই আর ঠিকমতো করল না। সোভিয়েতের প্রায় সব প্রজাতন্ত্রেই এই অবস্থা দেখা দিল। একইসঙ্গে প্রজাতন্ত্রগুলোর মধ্যে মস্কো-বিদ্বেষ প্রকাশ পেল।

মস্কোতে দেখতাম, প্রায় সব খাবারের দোকানেই লম্বা লাইন। আমি বলছি ৮৭ সালের কথা। কিছুক্ষণ লাইনে দাঁড়ালে খাবার মিলত। ক্রমে লাইনে দাঁড়ানোর সময়টা বাড়তে লাগল। অর্থাৎ, লাইন দীর্ঘতর হতে লাগল। তখনও পর্যন্ত দোকানে দোকানে খাবার একেবারে অমিল হয়নি।

প্রথম ধাক্কা এল ৮৯-এ। আমাদের ইউনিভার্সিটি থেকে চিনি আর ভোদ্কার জন্য কুপন দেওয়া শুরু হল। এর আগেই অবশ্য সোভিয়েত ইউনিয়নে অন্য একটা ব্যবস্থা চালু ছিল। তা হল, একধরনের শহরভিত্তিক সুবিধাভোগের ব্যবস্থা। মস্কোসহ বিভিন্ন প্রজাতন্ত্রের শহরগুলির বাসিন্দাদের জন্য একধরনের 'পারমিট' চালু ছিল। যেমন, মস্কোবাসীর ছিল- 'মস্কোভস্কায়া প্রাপিস্কা', তারা সেই শহরের ফ্ল্যাট থেকে শুরু করে চাকরি, মুদি-মাল, সবেতেই অগ্রাধিকার পাবে।

কুপনও দেওয়া হল সেই 'প্রাপিসকা'-র ভিত্তিতেই। প্রকৃতপক্ষে এই সময় থেকেই মস্কোর দোকানগুলো ফাঁকা হতে শুরু করল। চিনি আর ভোদ্কার কুপনের বদলে প্রথমদিকে জিনিস পাওয়া যেত। পরে হাতে কুপন থাকলেও দোকানে আর জিনিস ছিল না। মস্কো এগিয়ে চলল এক ভয়ংকর পরিণতির দিকে। মস্কোবাসী তখন বলত, "আমাদের সবকিছুর অভাব, শুধু রুবল ছাড়া।"

আমাদের ইউনিভার্সিটির ছাত্র, ইউক্রেনের ছেলে আলেগ একদিন আমাকে বলল, "এখনও তো কিছুইনা। কয়েকদিন পরে অবস্থা আরো খারাপ হবে।" অবাক হয়ে প্রশ্ন করলাম, এর থেকে খারাপ আর কী হতে পারে? উত্তর পেলাম—"এখনও তো পাঁউরুটি, নুন পাচ্ছিস। কিছুদিন পর ওগুলোও আর পাবি না। স্রেফ উপোস করে মরতে হবে তখন। আসলে কী জানিস, যতদিন ওই মমিটা থাকবে ততদিন আমাদের মুক্তি নেই।" (রেড স্কোয়ার চত্বরে মসলিয়ামে রাখা লেনিনের মমির কথা বলেছিল আলেগ।)

কদিন পরের কথা। সকালবেলা নয় নম্বর ব্লকের পাশের রাস্তা দিয়ে ইউনিভার্সিটি যাচ্ছি। দেখলাম, একজন বৃদ্ধা আঁস্তাকুড়ের উপর উপুড় হয়ে কী যেন খুঁজছেন। ওটা ঠিক আঁস্তাকুড় নয়। ছাত্ররা জানলা দিয়ে এটা-ওটা ছুঁড়ে ফেলে, তা-ই জমা হয় ওখানে। বিদেশি ছাত্ররা বিদেশি জিনিসপত্রও মাঝেমাঝে আবর্জনা হিসেবে ফেলে দেয়। সেসব ভালো দামে বিক্রি হয়। তাই প্রায়ই রুশি বৃদ্ধ-বৃদ্ধারা ওখানে এসে খুঁজেপেতে দেখেন, যদি কিছু পাওয়া যায়। পেনশনের সামান্য কটা রুবলে তাদের চলে না, তাই এদিক-ওদিক খুঁটে খুঁটে একটু উপরি রোজগারের চেষ্টা। আমাদের হস্টেল পাড়ায় প্রায়ই এদের দেখি। সেরকমই একজন কেউ ভেবে পাশ কাটিয়ে চলে যাচ্ছিলাম। নিচু মুখে বৃদ্ধা ময়লা ঘাঁটছেন। পাশ থেকে মুখের আদলটা চেনা চেনা ঠেকছে। হঠাৎ বৃদ্ধা মুখ তুলে সোজাসুজি আমার দিকে তাকালেন। আমি এঁকে চিনি। আমাদের ইউনিভার্সিটিতে ইতিহাস পড়াতেন। আমরা অবশ্য উনার কাছে পড়িনি। তার আগেই উনি অবসরগ্রহণ করেছেন। তবে এই মুখটা আমার চেনা। ইউনিভার্সিটিতেই দেখেছি। লজ্জার হাসি হেসে কেমন সংকুচিত ভাবে তিনি মুখটা আবার নিচু করে নিলেন। আমি সমূলে কেঁপে উঠলাম। মাথার ভেতরটা দপদপ করতে শুরু করল। সেদিন আর ক্লাস করতে যেতে পারলাম না। হস্টেলে ফিরে গেলাম।

চারিদিকে বড়ো অস্থিরতা। শিক্ষকরা মন দিয়ে পড়াতে পারছেন না। সবসময় তাঁদের মাথায় ঘুরছে—'রুবল', 'ডলার', 'মাংস নেই বাড়িতে', 'আজ ডিম কিনতেই হবে', 'দুধ না পেলে বাচ্চাটার কী হবে।' ছাত্র মন দিয়ে পড়তে পারছে না। তার মাথায় ঘুরছে--'ডলার', 'রুবল', 'ডলারের রেট কত হল', 'মার্সিডিজ', 'সিঙ্গাপুর', 'লেনদেন', 'হিসাবনিকাশ'। এঞ্জিনিয়ার মন দিয়ে কাজ করতে পারছেন না। তাঁর মাথায় চিন্তা-- 'এত কম মাইনেতে চলবে কী করে', 'ডলার', 'দুধ', 'মাখন', 'মাংস', 'ময়দা'। ডাক্তার মন দিয়ে রোগী দেখতে পারছেন না। মাথায় ঘুরছে-- 'একবার বিদেশ যেতে পারলে অনেকগুলো ডলার', 'ফ্রিজটা খালি হয়ে আসছে', 'ডিম চাই', 'মাংস চাই' 'ছানা চাই', 'কতদিন ভালো ফল খাই না।' কেউ নিজের কাজ মন দিয়ে করতে পারছে না। সত্তর বছরেরও বেশি সময় ধরে সোভিয়েত নাগরিকরা নিজেদের সুখ-দুঃখ, আশা-আকাঙ্খা, স্বপ্ন, ভবিষ্যৎ নিয়ে চিন্তার যাবতীয় দায় উপরতলার 'ওনাদের' হাতে সঁপে দিয়ে নিশ্চিন্ত ছিল। আজ হঠাৎ বলা হচ্ছে, যে যার নিজের ভাবনা ভাবো। তোমার ভবিষ্যৎ তোমারই হাতে, তোমার একার হাতে। কেউ আর তোমার কোনো দায়িত্ব বহন করবে না। হঠাৎ যেন অনাথ হয়ে গেল সোভিয়েত নাগরিকরা। এই আকস্মিকতায় অস্থির হয়ে উঠল সকলে। একটা অবলম্বন

খুঁজে বেড়াতে লাগল।

গর্বাচভ ক্ষমতাসীন হওয়ার পর 'সুখোয় জাকোন' (শুকনো আইন) চালু করলেন। 'ডিউটি আওয়ারস'-এ কেউ মদ্যপ অবস্থায় থাকলে, কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা করা হল। তাছাড়া, ভোদকা ও অন্যান্য 'শক্ত পানীয়' বিক্রিও নিয়ন্ত্রিত করা হল। আগে যেমন সব জায়গায় ইচ্ছা করলেই অফুরন্ত বোতল কেনা যেত, গর্বাচভের আমলে তা রদ করা হল। সোভিয়েত নাগরিকদের পানাসক্তি তাদের কর্মক্ষমতা নষ্ট করে দিচ্ছে এবং সামগ্রিকভাবে দেশের শ্রমশক্তির পক্ষে ক্ষতিকারক হয়ে দাঁড়াচ্ছে। এই অবস্থার পরিবর্তনের জন্য গর্বাচভ 'সুখোয় জাকোন' কায়েম করলেন। অনেকেরই এই আইন মনঃপুত হল না। ভোদকাহীন জীবনধারণের কথা সমাজের একটা বড়ো অংশ চিন্তাও করতে পারত না।

মস্কো যাওয়ার আগে কলকাতায় একটা অ্যানেকডট শুনেছিলাম। রুশিদের ভোদকা খাওয়া নিয়ে। মস্কোতেও রুশি ছেলেদের মুখে সেই একই অ্যানেকডট শুনেছি। গল্পটা ছিল এইরকম—মদ্যপান-বিরোধী এক যুবক রাশিয়ার কোনো এক জায়গায় গ্রীষ্মের এক দুপুরে এক কাঠুরেকে দেখল। কাঠ কাটছে সে। খালি গা। মেদহীন, পেশিবহুল শরীর। অপূর্ব গড়ন। বয়স পঞ্চাশের উপর। যুবক তাকে জিজ্ঞেস করল, "কী করে এত বয়সেও এমন চেহারা রেখেছেন ? মদ খান না নিশ্চয় ?" কাঠুরে হেসে বলল, "আমায় আর কী দেখছেন ? ওদিকে যান, আমার বাবা কাঠ কাটছেন। দেখুন গিয়ে তাঁর স্বাস্থ্য।" যুবক গেল। আগের মতোই দৃশ্য। তবে এর বয়স ৭৫-৮০। যুবকের কৌতূহলী প্রশ্ন, "নিশ্চয় মদ খান না ?" এবং সেই যুবা-বৃদ্ধের স্বাস্থ্যের প্রশংসা। তারপর একইভাবে ওই বৃদ্ধও বলল, "আমায় আর কী দেখছেন ? ওদিকে যান আমার বাবা কাঠ কাটছেন। দেখুন গিয়ে তাঁর স্বাস্থ্য। যুবক গেল। এই কাঠুরের বয়স ১০৫। যুবক দেখল, সত্যিই এর স্বাস্থ্য আরো ভালো। উৎসাহিত হয়ে ফের প্রশ্ন, "নিশ্চয় মদ খান না ? এত বয়সেও এমন স্বাস্থ্যরহস্যের চাবিকাঠিটা কী ?" বৃদ্ধ এবার একগাল হেসে পাশে রাখা ঝোলা থেকে 'রুস্কায়া প্শিনিচ্নায়া ভোদ্কা (রাশিয়ান ভোদ্কা)-র একটা বোতল বার করল। যুবকের দিকে বোতলটা এগিয়ে দিয়ে বৃদ্ধ বলল, "এটাই আমায় সেই শক্তি জোগায়। আমার স্বাস্থ্যরহস্যের চাবিকাঠি।"

এহেন ভোদ্কাপ্রীতি রুশিদের রক্তের রেণুতে রেণুতে ছড়ানো। জীবনযাপন থেকে ভোদ্কা বাদ দেওয়ার কথা তারা ভাবতেও পারত না। এজন্য কোনো কিছুর সঙ্গে আপোস করা তাদের ধাতে সইল না।

অতএব একটা বিকল্প ব্যবস্থার কথা ভেবে বার করল তারা। বাড়িতে মদ তৈরি করতে শুরু করল। এজন্য দরকার ছিল প্রচুর চিনির। বাজারে চিনির আকাল দেখা দিল। তখনই মস্কোতে চালু হল চিনির কুপন। কিছুদিন পরে সেই কুপনের বদলেও চিনি পাওয়া যেত না। অগত্যা ভোদ্কার কুপনও চালু করতে হল।

রাজধানীতে ভোদ্কা সরবরাহে অপ্রতুলতা দেখা দিলেও অন্যান্য অনেক জায়গায় তা ছিল না। বিশেষত, খনি অঞ্চলে। ইউক্রেনের খনিশহরগুলিতে ভোদকাকে কেন্দ্র করে কোনোরকম অসন্তোষ সৃষ্টি হতে দেয়নি সোভিয়েত সরকার। সারাদিন খনিতে কাজ করে

মাটির উপরে উঠে আসার পর পানীয় বলতে ওই ভোদ্‌কা। চা বা অন্য কোনো 'নরম পানীয়' তখন অচল। খনি-শ্রমিকদের এই বাঁধাধরা ছকে কোনো ব্যাঘাত সৃষ্টি করার সাহস পায়নি গর্বাচভ-সরকারও। অন্য কোথাও (এমনকী, খোদ মস্কোতেও) ভোদ্‌কা-সমস্যা হলেও, খনি শহরগুলিতে তাই কখনো ভোদ্‌কার টানাটানি হয়নি। অনেক মস্কোবাসীর মুখেই এ কথা শুনেছি। মস্কোবাসী অবশ্য আরো একটা কথা বলত। দেশের পরিস্থিতি নিয়ে ভাবনাচিন্তা করার যথেষ্ট সময় শ্রমিকরা যেন না পায় ; সামগ্রিক উৎপাদন ব্যবস্থা তাহলে ভীষণভাবে মার খাবে। ওদের হাতে ভোদ্‌কার বোতল ধরিয়ে দাও। আর কিছু নিয়ে মাথা ঘামানোর সময় বা সুযোগ, কোনোটাই তাহলে পাবে না ওরা।

রুশ তথা সোভিয়েত রাজনীতিতে ভোদ্‌কা-কেন্দ্রিক যে কোনো সিদ্ধান্তের গুরুত্ব গ্লাস ঠোকাঠুকিতেই শেষ হত না। পেরিস্ত্রোইকা ও 'গর্বাচভীয় শাসনব্যবস্থার' সম্পূর্ণ ব্যর্থতার শিকড়বাকড়ের খোঁজ করতে গিয়ে অনেক বিশেষজ্ঞ তাঁর 'সুখোয় জাকোন' প্রবর্তনের কথা মনে করিয়ে দেন। রুশিদের হাত থেকে ভোদকার গ্লাস ছিনিয়ে নিয়ে কোনো রাজনীতিকই শেষপর্যন্ত টিকে থাকতে পারবেন না, সে তিনি যত দক্ষই হোন না কেন! বহু রুশির এ একেবারে মনের কথা।

তাছাড়া আরো একটা ভয়ানক ফলাফল এনে দিল এই 'সুখোয় জাকোন'। জাতীয় অর্থনীতিতে রাশিয়ার ভোদ্‌কা উৎপাদন শিল্প ছিল অতি গুরুত্বপূর্ণ একটি স্তম্ভের মতো। ভোদ্‌কা রপ্তানি করে প্রচুর বিদেশি মুদ্রাও অর্জন করত রাশিয়া। সেই জারেদের আমল থেকে এই ঐতিহ্য চালু ছিল। 'সুখোয় জাকোন' পুরো কাঠামোটাকে নষ্ট করে দিল। ভোদ্‌কা শিল্প ভীষণভাবে মার খেল। প্রচুর দক্ষ শ্রমিক বেকার হয়ে পড়লেন। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে 'শক্ত পানীয়ের' বাজারে একটা শূন্যতার সৃষ্টি হল। পরে এই শূন্যতা পূরণ করল সুচতুর আমেরিকা। রাশিয়ারই পণ্য, মার্কিনি মোড়কে—'স্মিরনফ'। নতুন মার্কিনি বোতলে পুরোনো রুশ ফর্মুলায় তৈরি মদ। পকেট ভরল মার্কিনিদের। রাশিয়া আরো দীন হয়ে পড়ল।

আমার বন্ধু আডিস আবাবার মেয়ে এথি একদিন আমায় বলেছিল, "খেয়াল করে দেখিস, সোভিয়েতদের সব ছুটি কোনো না কোনো ঐতিহাসিক ঘটনা উপলক্ষে। অক্টোবর বিপ্লবের ছুটি থেকে শুরু করে মে ডে-র ছুটি—প্রত্যেকটা এইরকমই।"

৯৩-এর আগস্টে কলকাতায় বেড়াতে এসেছিল ইউলিয়া, মস্কোর মেয়ে। যাওয়ার সময় আমাকে একটা ডাইরি উপহার দিয়েছিল সে, ৯৩-এরই। এমন 'ধার্মিক ডাইরি' আগে কখনো দেখিনি। ছোট্ট ডাইরিটার উপর চার্চের ছবি। প্রথম দুটো পাতা জুড়ে প্রাচীন রুশ হরফে ঈশ্বরবন্দনা। তার পরের পাতায় যিশুর রঙিন মুখ। পরের ৩০টি পৃষ্ঠায় প্রার্থনা—বাইবেলের অংশবিশেষ, সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত, সময়ভেদে, প্রার্থনাসংগীত। মাঝে সাদা পাতা। আবার শেষের কয়েকটি পাতায় প্রার্থনা লিখে রাখার জন্য নির্দিষ্ট জায়গা। একেবারে শেষ পৃষ্ঠায় একটি ছুটির তালিকা। '১৯৯৩ সালে চার্চঘোষিত ধর্মীয় উৎসবের তালিকা।' মোট ১৭টি ছুটি, অর্থোডক্স চার্চ অনুসারে। প্রথম ছুটি ক্রিসমাসের। অর্থোডক্স ক্যালেন্ডারে ক্রিসমাস ৭ জানুয়ারি। তারপর গুড ফ্রাইডে, 'পবিত্র আত্মার'

আবির্ভাব দিবস, 'পাক্রোভ্ প্রিসোয়েতোয় বাগারোদিৎসি', ইত্যাদি ইত্যাদি।

ডাইরিটা হাতে পেয়েই এথির কথা আমার মনে পড়ে গিয়েছিল। ক্যালেন্ডারে লাল কালির বড়োই অভাব দেখে এথি মন খারাপ করেছিল। সেটা আটের দশকের শেষের দিকের কথা। আমরা তখন মস্কোতে সদ্য গিয়েছি। সেই তখনই গোটা দেশটা খোলনলচে বদলানোর কাজে উঠেপড়ে লেগেছে। সেই তোড়ে ছুটির হিসাবও হল নতুন।

এর প্রস্তুতি শুরু হয়ে গিয়েছিল আমাদের চোখের সামনেই। সামগ্রিক একটা হতাশা, আদর্শহীনতা আর সর্বজনীন বিভ্রান্তি রুশ যুব প্রজন্মকে চার্চে নিয়ে গেল। যে চার্চ স্তালিনের আমলে বন্ধ হয়ে গিয়েছিল, পুনর্নির্মাণের ধাক্কায় তা আবার সক্রিয় হয়ে উঠল। সোনালি ঘণ্টা আবার বেজে উঠল। যুবক-যুবতীরা চার্চে গিয়ে বিয়ে করতে শুরু করল। সদ্যোজাত শিশুকে 'ব্যাপটাইজ' করে পবিত্র করে নিল। সত্তর বছরের অনভ্যাসে যে প্রার্থনাসংগীত, যে মন্ত্র তারা ভুলে গিয়েছিল, তা আবার নতুন করে মুখস্থ করল। ভবিষ্যৎ নিয়ে প্রচণ্ড অনিশ্চয়তা যখন তাদের দিশেহারা করে তুলেছে, তখন তারা ভরসা খুঁজতে এল চার্চের ধর্মযাজকের কাছে। একটা অবলম্বন, একটা ভরসাস্থল তখন তাদের খুব দরকার। পার্থিব নেতাদের উপর তাদের আর আস্থা নেই। তারা তখন অতিজাগতিক শক্তিকে ছুঁতে চাইছে। ঈশ্বর-পুত্রের হাতে নিজের ভবিষ্যৎ সঁপে দিতে তখন তারা ব্যাকুল।

এই সুযোগ কাজে লাগাতে ব্যস্ত হয়ে উঠল 'ইসকন' জাতীয় কিছু ধর্মীয় সংগঠন। মস্কোর অনেক মেট্রো স্টেশনে টিকি বাঁধা, ন্যাড়া মাথার সাহেব আর শাড়ি পরা মেম 'ভগবতগীতা', ধুপধুনো বিক্রি করতে শুরু করল। ইসকনের রথ চলল মস্কোর রাস্তায়।

এদিকে কলকাতায়, মেট্রো সিনেমার উলটোদিকে, সোনার ঝাঁটা দিয়ে রাস্তা ঝাঁট দিলেন কলকাতাস্থিত রাশিয়ান কনসুলেটের বড়োকর্তা ও তাঁর স্ত্রী। তাদের পিছন পিছন চলল ইসকনের রথ আর মার্কিনি উল্লাস। কয়েক হাত দূরে দাঁড়িয়ে লেনিনের মূর্তি সে দৃশ্য প্রত্যক্ষ করল। রুশি বড়োকর্তা ঝাঁটা রেখে হরিনাম সংকীর্তনের তালে তালে উদ্বাহু হলেন।

এইসব ডামাডোলের মধ্যে ৯১-এর জুনে অনুষ্ঠিত হল রাশিয়ার প্রথম প্রেসিডেন্সিয়াল ইলেকশন। ৫৭ শতাংশ ভোট পেয়ে প্রেসিডেন্ট পদে নির্বাচিত হলেন বরিস নিকোলায়িভিচ ইয়েলৎসিন।

আগস্টে ক্রিমিয়াতে, কৃষ্ণসাগরের তীরে ছুটি কাটাতে গেলেন সোভিয়েত প্রেসিডেন্ট গর্বাচভ।

মস্কোতে আমার অভ্যাস ছিল সকালবেলা ঘুম থেকে উঠেই টিভিটা চালিয়ে দেওয়া। সকালে '১২০ মিনিট' নামে একটি অনুষ্ঠান হত। 'ব্রেকফাস্ট শো' গোছের। গানবাজনাই থাকত বেশি।

দিনটা ছিল ৯১ সালের ১৯ আগস্ট। যথারীতি ঘুম থেকে উঠে টিভিটা চালিয়েছি। আমার রুমমেট ইথিওপিয়ার মিস্‌রাক ছুটিতে বাড়ি গিয়েছে। ঘরে আমি একা।

দেখানোর কথা 'স্তো দোয়াদ্‌সাৎ মিনুত' (১২০ মিনিট)। তার বদলে পরিচিত ঘোষকের থমথমে মুখ পরদায় ভেসে উঠল। একটা কাগজ দেখে অনর্গল পড়ে চলেছেন তিনি।

ততদিনে আমার রুশ ভাষায় দখল এসেছে। তবুও ঘোষকের একটা কথাও বুঝতে পারছিলাম না। তিনি পড়ছিলেন—"দেশে জরুরি অবস্থা ঘোষণা করা হয়েছে। গর্বাচভ একটু অসুস্থ হলেও দেশ সুরক্ষিত। আপনারা অযথা রাস্তায় বেরিয়ে জটলা করবেন না। কোনো প্ররোচনায় অংশ নেবেন না। কাউকে প্ররোচিত করবেন না। যা করা হচ্ছে, আপনাদের এবং দেশের মঙ্গলের জন্যই। দেশের এই সংকটজনক পরিস্থিতি এবং অর্থনৈতিক দুরবস্থায় জরুরি অবস্থা ঘোষণাটা ছিল অপরিহার্য। আপনাদের সক্রিয় সহযোগিতা..."

আমি ছুটলাম অ্যানার ঘরে। আমার পাশের ঘরটায় অ্যানা অফিস যাওয়ার জন্য তৈরি হচ্ছিল। এম. এ পাশ করে চাকরিতে সদ্য যোগ দিয়েছে ও। উত্তেজিত হয়ে বললাম, নিশ্চয় গর্বাচভ মারা গেছেন। ওরা তো সঙ্গে সঙ্গে বলে না। পরে ঘোষণা করে। 'অসুস্থ' মানে আর কী হতে পারে? অ্যানা কিছুই না বুঝে অবাক হয়ে প্রশ্ন করল, "কী বলছিস তুই? কিচ্ছু বুঝতে পারছি না।" ওর হাত ধরে টানতে টানতে আমার ঘরে নিয়ে এলাম। তখনও সেই একই ঘোষকের মুখ এবং কাগজ দেখে সেই একই কথা পড়ে যাওয়া।

অ্যানার অফিসটা ছিল মস্কোর একেবারে মধ্যিখানে। আমি ওকে বললাম, তুই আজ অফিস যাস না। যদি কিছু গোলমাল হয়। অ্যানা শুনল না। সবে 'জয়েন' করেছে। এখন কামাই করা যাবে না। তাই অফিস চলে গেল ও।

আমি একা ঘরে আরো কিছুক্ষণ সেই ক্লান্তিকর, না-বুঝতে পারা, কাগজ দেখে পড়ে যাওয়া ঘোষণা শুনলাম।

ঘণ্টাখানেক পর অ্যানার অফিসে একটা ফোন করলাম। ও যা বলল, তা এই রকম—"রাস্তায় ট্যাঙ্ক নেমেছে। আর্মির লোকের ছড়াছড়ি। চারিদিক থমথমে। পরিষ্কার করে কিছু বোঝা যাচ্ছে না। ভাইস প্রেসিডেন্ট ইনায়েভ ক্ষমতা দখল করেছেন।"

'ক্যু'! আমার সারা শরীরে একটা শিহরন খেলে গেল। অনেক ক্যু-এর গল্প শুনেছি। কিন্তু এই প্রথম আমি একটা ক্যু-এর মধ্যে আছি। এখানে বাড়ির শাসন নেই, নিষেধ নেই, বড়োদের মানা নেই। আমি একটা গোটা আস্ত 'ক্যু' দেখতে যাব।

বেরিয়ে পড়লাম। টিপটিপ করে বৃষ্টি পড়ছিল। হস্টেল থেকে মেট্রো স্টেশন যাওয়ার পথে বাস থেকে অস্বাভাবিক কিছু নজরে পড়ল না। তবে বাসে লোকজনের মুখ খুবই থমথমে। মেট্রোতেও তাই। অতিরিক্ত যা, তা হল একটা চূড়ান্ত নৈঃশব্দ্য। জোর গতিতে এগিয়ে যাওয়া রেলের শব্দটা একটা অস্থিরতা তৈরি করছিল। নামলাম 'প্রসপেক্ত মার্কসা' স্টেশনে। সুড়ঙ্গ থেকে উপরে উঠলাম।

চারিদিকে কেমন একটা ফাঁকা ভাব। রাস্তার উপরে সার সার ট্যাঙ্ক দাঁড়িয়ে আছে। সামরিক বাহিনীর ট্যাঙ্ক। পাশের সমস্ত দোকানের ঝাঁপ ফেলা। এগিয়ে চলেছি। মস্কো আজ বড়ো অন্যরকম। মস্কোর পরিচিত হন্তদন্ত চলার ছন্দ আজ কেটে গিয়েছে। সবাই কেমন ভয় ভয় চোখে তাকাচ্ছে। ফিসফিসে গলায় কথা বলছে।

হাঁটতে হাঁটতে পৌঁছালাম পুশকিনের মূর্তির কাছে। উলটোদিকে একটা জামাকাপড়ের

দোকান। খোলা। ভেতরে ঢুকলাম। দু-তিনজন ক্রেতা। দোকানের কর্মী জনাচারেক। কারোর মুখে কথা নেই। বাইরের থমথমে ভাবটা দোকানের কাচের দরজা ভেদ করে ভেতরেও ছড়িয়ে পড়েছে।

মিনিট দশেক দোকানে এটা-ওটা দেখে সময় কাটিয়ে বাইরে বেরোলাম। কোথায় যাওয়া যায় ভাবতে ভাবতে সামনের দিকে এগোচ্ছি। একটু এগিয়েই 'রাসিয়া'। মস্কোর অন্যতম বড়ো সিনেমা হল। ঘটনাটা পুরোপুরি বুঝতে হলে শহরের এই মাঝখানটাতে আমার অনেকটা সময় কাটানো দরকার। এলোমেলোভাবে রাস্তায় বেশিক্ষণ ঘোরা যাবে না। সিনেমার একটা টিকিট কাটলাম। শো শুরু হতে দেরি আছে। হলের সামনের পার্কটাতে গিয়ে দাঁড়ালাম। পার্কের পাশের রাস্তাটাতেও ট্যাঙ্ক দাঁড়িয়ে। সামনের ট্যাঙ্কে বসে বছর সতেরোর একটা ছেলে। ট্যাঙ্কটির চালক। বোধহয় সদ্য আর্মিতে যোগ দিয়েছে। বয়স্ক এক রুশি মহিলা পাঁউরুটি আর চা এনেছেন তার জন্য। মহিলা পাশেই থাকেন। ছোটো ছেলেটা সারাদিন ট্যাঙ্কে বসে আছে। ওর বুঝি খিদে পায় না! বারান্দা দিয়ে দেখে মহিলা আর সইতে পারেননি। খাবার হাতে নেমে এসেছেন।

হলে ঢুকলাম। সিনেমা হলের চিরাচরিত পরিবেশ আজ নেই। কেমন যেন মনে হচ্ছিল, আমার মতো সময় কাটাতেই প্রত্যেকে এখানে এসেছেন। সকলেরই জানা দরকার, বোঝা দরকার, দেশজুড়ে কী হচ্ছে। যতদূর মনে পড়ছে, ফরাসি কোনো ছবি দেখানো হচ্ছিল সেদিন। হালকা মেজাজের ছবি। তবে সেদিকে কারোর বড়ো একটা নজর ছিল বলে মনে হয় না। ঘণ্টা দুয়েক বিরতিহীন চলল সেই ছবি। আমি ভাবছিলাম, বাইরে রাস্তায় না জানি কত কাণ্ডই হয়ে যাচ্ছে। বাইরে বেরিয়ে সে-সব দেখা যাবে, ভাবতে ভাবতেই ছবিটা শেষ হল।

রাস্তায় সেই আগের মতোই ট্যাঙ্ক দাঁড়িয়ে। তবে সংখ্যায় একটু বেশি। এরা ভাইস প্রেসিডেন্ট ইনায়েভের বাহিনী।

'ক্যু' কথাটা শুনেই আমার মনের মধ্যে একটা ছবি ভেসে উঠেছিল। গোলাগুলি, সেনাতাণ্ডব, রক্ত ; টিভির পরদায় যেমন দেখা যায়। আজ সকালে হস্টেল থেকে বেরনোর সময় ভেবেছিলাম সেরকমই একটা কিছু দেখতে পাব। আমাদের হস্টেল পাড়াটা শহরের একেবারে দক্ষিণ-পশ্চিম প্রান্তে। ওখানে আসল ঘটনার আঁচটা পুরোপুরি না-ও পাওয়া যেতে পারে, তাই তড়িঘড়ি চলে এসেছি মস্কোর একেবারে মধ্যিখানে, কেন্দ্রবিন্দুতে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের উপর সোভিয়েত দেশেই তৈরি অনেক ছবি দেখেছি। সেই ছবিগুলোর মতো ভয়াবহ না হলেও, ওই ধরনেরই একটা কিছু নিজের চোখে দেখার আগ্রহে।

সিনেমা হল থেকে বেরলাম বিকেল পাঁচটা নাগাদ। মেট্রোর সুড়ঙ্গে ঢোকার মুখে ডানপাশে বেশ বড়োসড়ো একটা জটলা চোখে পড়ল। অফিস ফেরত মানুষের ভিড়। সবাই হুমড়ি খেয়ে কী যেন পড়ছে। কাছে এগোনোর চেষ্টা করেও ভিড়ের জন্য পারলাম না। দূর থেকেই দেখলাম, লিফলেট। ছোটো কালো হরফে কী সব লেখা। ভিড়ের আলোচনাও কিছু শোনা গেল না। কেউ কথা বলছে না। সবার বাড়ি ফেরার তাড়া। অন্যান্য দিন অফিস থেকে এ দোকান, ও দোকান ঘুরে দু-হাতে দুটো ব্যাগ ঝুলিয়ে বাড়ি

ফেরে মস্কোবাসী। আজ কারোর হাতে ব্যাগ নেই। ত্রস্ত পায়ে সবাই বাড়ি পৌঁছাতে ব্যস্ত। মস্কোয় আজ জরুরি অবস্থা। মস্কো আজ বড়ো অন্যরকম।

আমিও মেট্রোর সুড়ঙ্গে ঢুকে পড়লাম। হস্টেলে ফিরতে হবে। ঘরে পৌঁছে দেখলাম অ্যানা ততক্ষণে অফিস থেকে ফিরে এসেছে। আমাদের দু-জনের সারাদিনের অভিজ্ঞতা জড়ো করেও খুব একটা কিছু বুঝে উঠতে পারলাম না।

গরমের ছুটি বলে হস্টেল বেশ ফাঁকা। তা-ও রুশি আর বিদেশি মিলিয়ে পাঁচ-ছয় জন মেয়ে এল আমার ঘরে, টিভি দেখে গোটা ব্যাপারটা বোঝার জন্য সকলে অধীর। রাত ন-টায় সংবাদ শুরু হল। "সোভিয়েত প্রেসিডেন্ট গিনাদি ইভানোভিচ ইনায়েভ গতকাল একটি ডিক্রি জারি করেছেন। এতে বলা হয়েছে, অসুস্থতার কারণে মিখাইল সের্গেইভিচ গর্বাচভ সোভিয়েত প্রেসিডেন্ট পদের দায়িত্ব বহন করতে অপারগ। এই অবস্থায়, সোভিয়েত সংবিধানের ১২৭(৭) ধারা অনুসারে আজ, ১৯ আগস্ট ১৯৯১ থেকে সোভিয়েত প্রেসিডেন্ট হিসাবে দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন ইনায়েভ।

"সোভিয়েত জনজীবনের অত্যন্ত গুরুতপূর্ণ কিছু সমস্যার সমাধান, দেশের স্বাধীনতা রক্ষা ও বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তিগুলির সক্রিয়তা নষ্ট করা, দেশের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নতি, বিভ্রান্তি হটিয়ে সমাজজীবনে সংহতি ফিরিয়ে আনা, বর্তমান সংকটময় পরিস্থিতির অবসান, দেশজোড়া অশান্তি ও ভ্রাতৃহন্তারক গৃহযুদ্ধকালীন পরিবেশ থেকে দেশকে মুক্ত করা—এই উদ্দেশ্যগুলি যথাযথভাবে পূরণের জন্য সোভিয়েত ইউনিয়নে 'রাষ্ট্রীয় জরুরি অবস্থাকালীন কমিটি' ('গসুদার্স্তভেন্নি কমিতিয়েত পো চেরজভিচায়নামু পালাঝেনিয়ু'—'গে কে চে পে') গঠন করা হয়েছে। এই কমিটি ১নং আজ্ঞপ্তি মারফত ঘোষণা করেছে—সোভিয়েত ইউনিয়নের সকল প্রশাসনিক কাঠামো, প্রজাতন্ত্র ও স্বায়ত্তশাসিত এলাকা, শহর, গ্রামসহ যাবতীয় জনবসতিকে এতদ্বারা জানানো হচ্ছে যে, তারা যেন জরুরি অবস্থাকালীন শাসনব্যবস্থা কায়েম করে। সোভিয়েত আইন 'আইনসম্মত জরুরি অবস্থাকালীন শাসনপ্রণালি'-র ভিত্তিতে এই আজ্ঞপ্তি রূপায়িত করছে সোভিয়েত ইউনিয়নের 'রাষ্ট্রীয় জরুরী অবস্থাকালীন কমিটি'। যদি কেউ এই আদেশ অমান্য করে, তাদের বিরুদ্ধে বিশেষ ব্যবস্থা নেবে 'গে কে চে পে'।"

গম্ভীর মুখে সংবাদপাঠক 'গে কে চে পে'-র প্রথম আজ্ঞপ্তিটি পড়ে চলেছেন। আমরা শুনছি। খুব মন দিয়ে। কেউ কোনো কথা বলছে না। ততক্ষণে বেশ বোঝা যাচ্ছে, সোভিয়েত ইউনিয়নের ইতিহাসে আজকের দিনটি, ১৯.৮.৯১ চিহ্নিত হয়ে রয়ে যাবে। ইতিহাসের মোড় ঘুরবেই। ভালো বা মন্দ—কোনদিকে এখনই বোঝা না গেলেও আগের মতো আর চলবে না। একটা পরিবর্তন যে অনিবার্য, তা বোঝা যাচ্ছে। অ্যানা বা আমারই মতো ঘরের অন্যরাও যে সারাদিনে এই প্রথম আজকের ঘটনার স্পষ্ট ও সম্পূর্ণ একটা বিবরণ শুনছে, তা-ও বোঝা যাচ্ছে। সেই সুচ-পতন নৈঃশব্দ্যে সংবাদপাঠকের গমগমে কণ্ঠস্বর চারপাশে যেন ভারী হয়ে থমকে আছে। সংবাদ এগিয়ে চলল—

"অফিস অব পাবলিক প্রসিকিউটর, বিদেশমন্ত্রক, কেজিবি, প্রতিরক্ষামন্ত্রক, সোভিয়েত ইউনিয়নকে যথাযথভাবে রক্ষার জন্য পারস্পরিক বোঝাপড়ার ভিত্তিতে সক্রিয় হয়ে

উঠবে।

"১নং আজ্ঞপ্তিতে 'গে কে চে পে' মোট ১৬টি প্রস্তাব গ্রহণ করেছে। উপরোক্ত প্রস্তাবগুলি ছাড়াও এক সপ্তাহের মধ্যে সমাজজীবনে আইনশৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনা, নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের মূল্য নিয়ন্ত্রণ, বিশেষ করে শিশুদের ব্যবহার্য জিনিসের দাম অবিলম্বে কমানো, নাগরিকদের মাসিক বেতন ও পেনশনের হার বৃদ্ধি, দুর্ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্তদের ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা ইত্যাদি প্রস্তাবগুলিও গৃহীত হয়েছে।"

১নং আজ্ঞপ্তিটি পড়া শেষ করে সংবাদপাঠক সেই একই সুরে 'গে কে চে পে' কর্তৃক ঘোষিত ২নং আজ্ঞপ্তি পড়তে শুরু করলেন—

"সোভিয়েত ইউনিয়নে উদ্ভূত বিশেষ পরিস্থিতির কথা বিবেচনা করে দৈনিক ও সাময়িক পত্রপত্রিকা প্রকাশের ক্ষেত্রে কয়েকটি সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে।

'ত্রুদ' (শ্রম), 'রাবোচায়া গাজেতা' (শ্রমিকের কাগজ), 'ইজভেস্তিয়া' (সংবাদ, কংগ্রেস অব পিপলস ডেপুটিজ-এর মুখপত্র), 'প্রাভ্দা' (সত্য ; সিপিএসইউ-এর মুখপত্র), 'ক্রাস্নায়া জুয়েজ্দা' (লাল তারা), 'সোভিয়েতস্কায়া রাসিয়া' (সোভিয়েত রাশিয়া), 'মাস্কোভ্স্কায়া প্রাভদা' .(মস্কোর প্রাভদা), 'লেনিনস্কায়া জ্নামিয়া' (লেনিনীয় পতাকা), 'সেল্স্কায়া ঝিজ্ন্' (কৃষি জীবন)—এই দৈনিকগুলি ছাড়া বাকি অন্যান্য সংবাদপত্র ও পত্রিকা প্রকাশের উপর সাময়িক নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে 'গে কে চে পে'।

নতুন নির্দেশ না পাওয়া পর্যন্ত এই নিষেধাজ্ঞা বলবৎ থাকবে।"

"ওহ্, স্বোলচি' (আ, সোয়াইন্স্)!" আকসানার মুখ থেকে মন্তব্যটা হঠাৎ ছিটকে বেরোল। এতক্ষণ কারো মুখে কোনো কথা ছিল না। 'গে কে চে পে'-র ২নং আজ্ঞপ্তিটা শুনে আকসানার এই অভিব্যক্তি! সকলে ঘুরে তাকাল ওর দিকে। আমাদের এই পাঁচতলাতেই থাকে রুশি মেয়ে আকসানা। আমার থেকে দু-বছরের সিনিয়র। অ্যানার বন্ধু। সংবাদ প্রায় শেষের মুখে। আকসানা আবার বলতে শুরু করল, "২নং আজ্ঞপ্তিটা থেকেই ইনায়েভের মতলবটা পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে। 'গে কে চে পিস্ট'-রা ('গে কে চে পে'-র সদস্যরা) আবার আমাদের গলা টিপে ধরতে চাইছে। নাগরিকদের স্বাধীন মতামতকে শুরু থেকেই ভয় পাচ্ছে এরা। তার মানেই এদের কু-মতলব আছে। লক্ষ করে দেখ, সে-সব দৈনিকগুলোকে ওরা প্রকাশ করার অনুমতি দিয়েছে, যেগুলি সরাসরি সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন। একবার আমরা গ্লাসনস্তের স্বাদ পেয়েছি, তারপর আবার সেই বন্ধ বাক্সে আমাদের পুরে ফেলতে চায় এরা! তবে সহজে পারবে না।" নামিবিয়ার মেয়ে লিবার্টিনা বলল, "আজ সকালে মস্কোর অনেক দোকানে হঠাৎ প্রচুর মাংস আর ভোদ্‌কা এসে হাজির হয়েছিল। অনেকে এই ফাঁকে গাদা গাদা কিনেও নিয়েছে। ইউক্রেনের গালিনা এতক্ষণ গম্ভীর হয়ে বসেছিল। লিবার্টিনার কথা শুনে বলল, "ভোদ্‌কা আর মাংস খাইয়ে লোককে খুশি রাখতে চাইছে এরা। মস্কোবাসী অনেকদিন ভালোমন্দ কিছু খায়নি তো!"

এইসব কথাবার্তার মধ্যে খবর শেষ হল। টিভির ঘোষিকা জানালেন, কিছুক্ষণের মধ্যেই সোভিয়েত ইউনিয়নের (নতুন) কর্ণধারদের সঙ্গে সাংবাদিকদের বৈঠক সরাসরি

ভার কমা হবে।

আকসানা বেশ-অবাক-হওয়া সুরে বলে উঠল, "ব্যাপারটা তো ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। রাস্তায় এদিকে ট্যাঙ্ক নামিয়েছে, পত্রপত্রিকা বন্ধ করে দিচ্ছে, আবার প্রেস কনফারেন্সে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হচ্ছে। অদ্ভুত তো!"

গালিনা আগের মতোই গম্ভীর হয়ে বলল, "অদ্ভুতের কিছু নেই। পুরো ঘটনাটাকে গণতন্ত্রের ছাঁচে ফেলার চেষ্টাতেই ওরা প্রেস কনফারেন্স ডেকেছে। আরো একটা কথা ভুলিস না। গত কয়েক বছরে সোভিয়েত জনগণ কিন্তু অনেক পালটেছে। একদিকে সেই জনগণের আর অন্যদিকে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সমর্থন পাওয়ার আশাতেই ইনায়েভরা এমন সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।"

শুরু হল সাংবাদিক সম্মেলন। ডায়াসের উপর বসে আছেন ইনায়েভ, বাক্‌লানভ, পুগা, স্তারোদুরৎসেভ, তিজইয়াকভ। 'গে কে চে পে'-র পাঁচ সদস্য। তাঁদের মুখোমুখি সাংবাদিকরা। দু-তিনজন সাংবাদিক প্রথমেই প্রশ্ন করলেন—'গর্বাচভ এখন কোথায়' ইনায়েভের উত্তর—'বিশ্রাম ও চিকিৎসার জন্য গর্বাচভ এখন ক্রিমিয়াতে। গত কয়েক বছর অতিরিক্ত পরিশ্রমের ফলে তিনি খুব ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন এবং পুরোপুরি সুস্থ হয়ে উঠতে তাঁর কিছুটা সময় দরকার।' ইনায়েভ আরো বললেন, 'আশা করি, তিনি খুব শীঘ্রই সুস্থ হয়ে উঠবেন এবং ফিরে এসে নিজের দায়িত্ব আবার বুঝে নেবেন।'

এরপর একসঙ্গে দুটো প্রশ্ন—'দেশের অর্থনৈতিক অবস্থার পরিবর্তনের জন্য এই মুহূর্তে কি আপনাদের হাতে নির্দিষ্ট কোনো পরিকল্পনা আছে?' 'বাজার অর্থনীতিকে বাস্তবায়িত করতে যে-সব নীতি ইতিপূর্বে গৃহীত হয়েছে, সেগুলি কি বলবৎ থাকবে?' প্রথম প্রশ্নের উত্তর দিতে শুরু করলেন তিজইয়াকভ। "এখন সবাই জেনে গেছেন, পেরিস্ত্রোইকার কাছে যে ফলাফল আশা করা হয়েছিল, সে তা দিতে পারেনি। আজ আমাদের জাতীয় অর্থনীতির অবস্থা ভয়াবহ। উৎপাদন ব্যবস্থার মধ্যে পারস্পরিক যোগসূত্র এখন পুরোপুরি নষ্ট হয়ে গিয়েছে। আমরা এই অবস্থার উন্নতি করতে সচেষ্ট হব। বাজার অর্থনীতির দিকে এগোনোর পথও আমরা বন্ধ করব না। তবে এর আগে একটি সুস্পষ্ট পরিকল্পনা গ্রহণ করা দরকার।"

উত্তরটি শেষ করলেন ইনায়েভ। "ইতিমধ্যেই 'গে কে চে পে'-র সঙ্গে কয়েকটি প্রজাতন্ত্রের প্রধানের কথা হয়েছে। দেশকে এই সংকটময় পরিস্থিতি থেকে মুক্ত করার ক্ষেত্রে তাঁরা আমাদের সব ধরনের সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।"

'গে কে চে পে'-র নির্দিষ্ট পরিকল্পনা প্রসঙ্গে ইনায়েভ বললেন, "ফসল বাঁচানোর জন্য সবধরনের বন্দোবস্ত করা হবে। এর জন্য আশা করি আগামিকালই একটি প্রস্তাব গৃহীত হবে। তাছাড়া বাসগৃহ নির্মাণের উপর বিশেষ জোর দেওয়া হবে। সোভিয়েত নাগরিক ভদ্রভাবে মাথা গোঁজার ঠাঁই জোগাড় করার জন্য বছরের পর বছর অপেক্ষা করেন। বড়ো বড়ো শহরগুলিতে এই সমস্যা অত্যন্ত প্রকট। এই অসুবিধার কথা মাথায় রেখেই খুব অল্প সময়ের মধ্যে প্রচুর বাসগৃহ নির্মাণ করার পরিকল্পনা করা হয়েছে।

"আরো তিনটি বিষয়ের উপর বিশেষ নজর দেওয়া হবে। (ক) খাবারদাবারের যথাযথ

সরবরাহ, (খ) যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন, (গ) জ্বালানি সরবরাহ।

"আমাদের নির্দিষ্ট পরিকল্পনা আছে এবং সেই অনুযায়ী আমরা কাজ করব।"

এবার এক সাংবাদিকের সরাসরি প্রশ্ন—'এটা কি অভ্যুত্থান?' ডিক্রির বয়ান অনুসারে ইনায়েভের সেই বাঁধাধরা উত্তর—"আমরা সংবিধান-বিরোধী কোনো কাজ করিনি। সব সিদ্ধান্ত সোভিয়েত সংবিধানের উপর ভিত্তি করে নেওয়া হয়েছে।"

গর্বাচভ সম্পর্কে 'গে কে চে পে'-র মনোভাব প্রসঙ্গে প্রশ্ন করলেন এক সাংবাদিক। উত্তর এল—"গর্বাচভ সম্পর্কে 'গে কে চে পে' শ্রদ্ধাশীল। তাঁর গণতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গিই এই শ্রদ্ধার কারণ। এই যে আজ আমরা গণতান্ত্রিক পথের পথিক, এর পটভূমি রচনা করেছেন গর্বাচভ।"

আবার প্রশ্ন—গর্বাচভ ঠিক কতটা অসুস্থ? কী হয়েছে তাঁর? ইনায়েভ উত্তর দিলেন, 'গর্বাচভের স্বাস্থ্য সম্পর্কিত রিপোর্ট খুব শীঘ্রই প্রকাশ করা হবে।'

সাংবাদিক সম্মেলন চলল প্রায় মিনিট চল্লিশেক। সাংবাদিকদের চোখা চোখা ও সরাসরি প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে ইনায়েভ ও অন্যান্য 'গে কে চে পিস্ট'-রা কেমন যেন থতমত করছিলেন। ইনায়েভের তো হাত কাঁপছিল সমানে। দু-হাত একসঙ্গে।

উত্তেজিত আকসানা হইহই করে বলল, "নির্ঘাৎ এরা গর্বাচভকে শেষ করে দিয়েছে। দেখছিস না, কেমন ভয় পাচ্ছে!" গালিনা বলল, "শুনেছি ইনায়েভ অ্যালকোহোলিক। সেইজন্যও হাত কাঁপতে পারে।"

সেদিন বেশ রাত পর্যন্ত আমার ঘরে সোভিয়েত ইউনিয়নের ভবিষ্যৎ নিয়ে খুব গুরুগম্ভীর আলোচনা চলল। তাতে সোভিয়েত রাজনীতি কতটা প্রভাবিত হল জানি না, কিন্তু একটা ব্যাপার আমি ভীষণভাবে উপলব্ধি করলাম। 'গণমৈত্রী' বা 'বিশ্বভ্রাতৃত্ব'—এসব শব্দগুলো বোধহয় এরকম সময়েই তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে ওঠে। না হলে বিদেশিদের কীই-বা যায় আসে! হলফ করে বলতে পারি, সেদিন সোভিয়েত ইউনিয়নের ভবিষ্যৎ নিয়ে উৎকণ্ঠা আমাদেরও কিছু কম ছিল না। সেই মুহূর্তে যেন আমরাও ওদেশের নাগরিকদের সঙ্গে মিলেমিশে একাকার হয়ে গিয়েছিলাম। হয়তো কেউ কেউ ভেবেছিল ইনায়েভ ক্ষমতায় থাকলেই ভালো। কেউ চেয়েছিল সুস্থ গর্বাচভই ফিরে আসুন। ভিন্ন ভাবনা থাকলেও দুতরফই কিন্তু সোভিয়েত নিয়েই ভেবেছিল।

পরদিন খুব ভোরে উঠেই অ্যানা আর আমি ছুটলাম। হস্টেলের কাছেই কিয়স্কে কাগজ বিক্রি হয়। 'ইজভেস্তিয়া' কিনলাম। গোটা কাগজ জুড়ে গতকাল টিভিতে শোনা ইনায়েভের ডিক্রি, 'গে কে চে পে'-র আজ্ঞপ্তি, সাংবাদিক বৈঠকের বিবরণ ছড়ানো। প্রথম পাতায় বাঁদিকের কলাম জুড়ে সোভিয়েত জনসাধারণের প্রতি 'গে কে চে পে'-র আবেদন—

"দেশবাসীগণ!

সোভিয়েত ইউনিয়নের নাগরিকবৃন্দ!

দেশ ও দেশবাসীর অত্যন্ত সংকটময় মুহূর্তে আমরা আপনাদের শরণাপন্ন হয়েছি। আমাদের মহান জন্মভূমির উপর বিপদের কালো মেঘ ছেয়ে আছে। দেশ আজ মরণাপন্ন। মিখাইল সের্গেইভিচ গর্বাচভের উদ্যোগে যে সংস্কারমূলক রাজনীতির সূচনা হয়েছিল,

একাধিক কারণে তা আজ ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে। যদিও এই রাজনীতির মূল উদ্দেশ্য ছিল দেশের বহুমুখী বিকাশ ও সমাজজীবনের গণতন্ত্রীকরণ। সংস্কারমূলক এই রাজনীতি বাস্তবায়নের প্রথম ধাপে সর্বজনীন উৎসাহ ও আশার যে জোয়ার দেখা দিয়েছিল, তার জায়গা দখল করছে বর্তমানের হতাশা, অবিশ্বাস ও অস্থিরতা। সর্বস্তরের ক্ষমতা জনসাধারণের আস্থা হারিয়েছে। রাজনীতির এই ব্যর্থতার অনিবার্য পরিণতি প্রতিফলিত হয়েছে সমাজজীবনে। দেশের ভাগ্য ও ভালোমন্দ নিয়ে জনসাধারণের মনে এক অদ্ভুত ঔদাসীন্য দেখা দিয়েছে। প্রশাসনিক সংগঠনগুলিও আজ নিজেদের দায়িত্ব যথার্থভাবে বহন করার ক্ষেত্রে গাফিলতি করছে। এককথায়, দেশের অবস্থা এখন নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গিয়েছে।

* * *

"সোভিয়েত জনতার আত্মসম্মানবোধ ও গৌরবকে আবার তার আগের মর্যাদায় প্রতিষ্ঠা করা উচিত।

সোভিয়েত ইউনিয়নের 'জাতীয় জরুরি অবস্থাকালীন কমিটি' প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে যে আমাদের দেশকে এই সংকট থেকে উদ্ধার করবে। তাছাড়া কমিটি এই দায়িত্বও নিজের উপর ন্যস্ত করছে যাতে সমাজ ও রাষ্ট্রজীবনে অবিলম্বে শান্তিশৃঙ্খলা ফিরে আসে।

"গে কে চে পে আরো যা যা করতে দেশবাসীর কাছে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ, তা হল—সোভিয়েত ইউনিয়নের নানাপ্রান্তে যে রক্তক্ষয়ী বিচ্ছিন্নতাবাদী সংঘর্ষ দেশের সংহতি নষ্ট করছে তা অবিলম্বে রদ করা, সোভিয়েত জনসাধারণের হৃতগৌরব ফিরিয়ে দেওয়া, সমাজজীবনের গণতন্ত্রীকরণ, সোভিয়েত জীবনযাত্রার মান উন্নত করা, অর্থনৈতিক স্থিতাবস্থা, বাসস্থান ক্রান্ত সমস্যার সমাধান, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সোভিয়েত ইউনিয়নকে আবার গৌরবময় আসনে প্রতিষ্ঠিত করা ইত্যাদি।

* * *

"সোভিয়েত ইউনিয়নের সকল নাগরিককে আহ্বান জানাচ্ছি, তারা যেন মাতৃভূমির প্রতি নিজেদের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন হন এবং 'গে কে চে পে'-কে পূর্ণ সমর্থন জানান। দেশকে সংকটময় পরিস্থিতি থেকে মুক্ত করতে তাঁদের সমর্থন আমাদের প্রয়োজন।

"সামাজিক বা রাজনৈতিক কোনো সংগঠন, শ্রমিক সংগঠন বা নাগরিকদের কাছ থেকে গঠনমূলক কোনো প্রস্তাব পেলে গে কে চে পে তা কৃতজ্ঞতার সঙ্গো গ্রহণ করবে। এই প্রস্তাবগুলিকে দেশের প্রতি কর্তব্যের ফলশ্রুতি হিসেবে গণ্য করা হবে। আমাদের এই দেশে যুগ যুগ ধরে নানা জাতির লোক একসঙ্গো, পাশাপাশি বাস করেছে, একই পরিবারের সদস্য হিসেবে। তাদের এই সৌভ্রাতৃত্ব আবার দেশের সমৃদ্ধিকে সম্ভব করে তুলবে।

রাষ্ট্রীয় জরুরি অবস্থাকালীন কমিটি,
সোভিয়েত ইউনিয়ন।
১৮ আগস্ট ১৯৯১।"

অ্যানা অফিস গেল না। দিনভর খবরের কাগজটা নাড়াচাড়া করলাম দুজনে। টিভিতে অস্বস্তিকর ওই ঘোষকের মুখ এবং বার বার একই কথা। আগে কলকাতায় যেমন ভোটের সময় টিভি ও রেডিওতে বুলেটিন এবং বিশেষজ্ঞদের বিশ্লেষণের মাঝেমাঝে সত্যজিৎ রায়ের ছবি অথবা শম্ভু মিত্রের নাটক প্রচার করা হত ; দিনভর সেরকমই চলল মস্কোতেও—আমরা দেখলাম 'লেবেদিনোয়ে ওজেরা' (সোয়ান লেক), কিস্তিতে কিস্তিতে। মাঝে মাঝে দেশবাসীর উদ্দেশে গে কে চে পে-র 'বাণী' পাঠ করে শোনালেন ঘোষক-ঘোষিকারা।

দু-চারজন ছাত্রছাত্রী মাঝেমধ্যে এসে বলল, মস্কোর কোথাও কোথাও নাকি গোলমাল হয়েছে। তবে সঠিকভাবে কেউই কিছু জানে না, সবই এর-ওর মুখে শোনা। রাতের সংবাদেও কোনো গন্ডগোলের খবর জানা গেল না।

গর্বাচভকে নিয়ে সকলকেই বেশ উদ্বিগ্ন মনে হচ্ছিল। বেশিরভাগই বলছিল, "নিশ্চয় মেরে ফেলেছে।" তাঁর অসুস্থতার খবর কেউই বিশ্বাস করতে রাজি ছিল না।

একই রকমের সংশয় আর রহস্য নিয়ে পরের দিনটাও শুরু হল। মস্কোতে সেদিন জোর গুজব, গৃহযুদ্ধ আসন্ন। কট্টরপন্থী কমিউনিস্টদের সঙ্গে উদারপন্থীদের সংঘর্ষ অনিবার্য। উদারপন্থীরা এত সহজে পিছু হটবে না, কট্টরপন্থীদের ট্যাঙ্কের মোকাবিলা করবে তারা।

অ্যানার সাংসারিক বুদ্ধি বেশ পাকা ছিল। ও বলল, "এই ফাঁকে বাজার করে নিয়ে আসি চল। কখন কী ঘটে ঠিক নেই। যুদ্ধটুদ্ধ বেধে গেল শেষে না খেয়ে মরতে হবে।"

দুপুরবেলা দোকানে পৌঁছে দেখলাম অ্যানার মতো ভয় আরো অনেকেই পেয়েছে। ভীষণ ভিড়। লম্বা লাইনে আমরাও দাঁড়িয়ে পড়লাম। লাইনে দাঁড়িয়ে অনেকেই পকেট রেডিও কানে চেপে আছে। ক্রিকেটের মতোই এক উত্তেজক খেলা চলেছে ; কোন দিকে মোড় নেবে, জানার ব্যাকুলতায়। আমাদের সামনেই রেডিও কানে এক রুশ যুবক দাঁড়িয়ে। জিজ্ঞেস করে জানতে পারলাম, 'এখো মাস্কভি' (মস্কোর প্রতিধ্বনি) শুনছে। কয়েকজন সাংবাদিক মস্কোর 'বেলি দোম' (হোয়াইট হাউস) থেকে সরাসরি এই অনুষ্ঠান প্রচার করছেন। রাশিয়ার পার্লামেন্ট এই 'বেলি দোম'। যুবকের মুখে আরো শুনলাম, আসল ক্ষমতার লড়াই হচ্ছে এখন ওই 'বেলি দোম' সংলগ্ন চত্বরেই। রুশ প্রেসিডেন্ট ইয়েলৎসিন ও তাঁর মন্ত্রিসভার অনেক সদস্য আছেন 'বেলি দোম'-এর ভেতরে। আর 'বেলি দোম'-এর চারপাশ ঘিরে আছে বিদ্রোহীদের ট্যাঙ্ক ও অসংখ্য মস্কোবাসী। সাধারণ মানুষ বেরিয়ে এসেছে রাস্তায়। দেশটাকে নিয়ে কত্তারা যে খেলাই খেলুন না কেন, নিজের চোখে তা দেখতে চায় দেশের লোক।

দোকান থেকে ফেরার সময়ও দেখলাম, রাস্তায় অনেকে পকেট রেডিও কানে উদ্বিগ্ন মুখে হাঁটছে। সবারই মনে একটা 'কী হয়, কী হয়' ভাব।

বিকেলে সাড়ে পাঁচটা নাগাদ আকসানা হঠাৎ ঝড়ের বেগে কোথা থেকে যেন ছুটতে ছুটতে এল। হাঁফাতে হাঁফাতে বলল, "ফ্সিয়ো প্রাশ্‌লো, ইগ্রা কোন্‌চিলাস্। ইখ্ পাইমালি

(সব মিটে গেছে, খেলা শেষ। ওদের ধরে ফেলেছে।)।" কোথায়, কীভাবে ধরা পড়ল, শেষ মুহূর্তে খেলা কতটা জমে উঠেছিল—কিছুই জানে না আকসানা। একটু আগে ওর সহপাঠী এক রুশি ছেলের মুখে যতটা শুনেছে, ততটাই বলতে এসেছে। "সন্ধ্যাবেলা টিভি দেখতে আসব", অ্যানা আর আমার দিকে কথাগুলো ছুঁড়ে আকসানা আবার হন্তদন্ত হয়ে ছুট লাগাল অন্য বন্ধুদের ঘরে। সবাইকে খবরটা দিতে হবে।

রাত সাড়ে নটায় গর্বাচভকে দেখলাম, বিমানের সিঁড়ি দিয়ে নেমে আসছেন। একেবারে অন্য চেহারায়। সেই চিরাচরিত স্যুটেড-বুটেড গর্বাচভ নন, সাধারণ শার্ট আর একটা পাতলা জ্যাকেট পরা গর্বাচভকে বেশ ক্লান্ত মনে হচ্ছিল। যদিও মুখে হাসি। তাঁর পেছন পেছন স্ত্রী রাইসা নাতনিকে জড়িয়ে ধরে নামলেন। গর্বাচভ সপরিবারে ছুটি কাটাতে গিয়েছিলেন। একই বিমান থেকে রুশ ভাইস প্রেসিডেন্ট রুতস্কোয় ও রুশ প্রধানমন্ত্রী সিলায়েভও নামলেন। আমরা টিভি দেখছিলাম।

মস্কোর ভ্নুকোভা বিমানবন্দরে তখন সাংবাদিকের ছড়াছড়ি। অত্যন্ত কড়া নিরাপত্তায় গর্বাচভকে বিমানবন্দর থেকে নিয়ে যাওয়া হল। সাংবাদিকদের প্রবোধ দেওয়া হল, আজ নয়, গর্বাচভ শিগ্‌গিরই সাংবাদিক সম্মেলন ডাকবেন।

টিভির পরদায় গর্বাচভ-দৃশ্যের পর এল ক্যুয়ের বিস্তারিত ফলাফল। ততক্ষণে গর্বাচভকে দেখে জনগণ আশ্বস্ত। ওই একই ঘোষিকা কথার ঢং পালটে, মেকআপের রং পালটে বলতে লাগলেন, বিদ্রোহীদের ধরা পড়ার কাহিনি।

রাজধানীর আন্তর্দেশীয় বিমানবন্দর ভ্নুকোভার দিকে যাওয়ার পথে ধরা পড়েছেন 'গে কে চে পিস্ট'রা (গে কে চে পে-র সদস্যরা)।

আমাদের সমস্ত ইন্দ্রিয় তখন সজাগ। যাবতীয় মনোযোগ টিভির পরদায় কেন্দ্রীভূত। এবার শুরু হল আমার ঘরের 'বিশেষজ্ঞ'দের রাজনৈতিক ভাষ্যদান। ভাষ্যকার বলতে সেই অ্যানা, আকসানা, গালিনা, লিবার্টিনা, ইরা আর আমি—সেরিনা।

—ইনায়েভদের ফাঁসি দেওয়া উচিত। ওদের খামখেয়ালিপনার জন্যই তিনজন জলজ্যান্ত 'মস্‌ক্‌ভিচ' (মস্কোর বাসিন্দা)-কে অকালে প্রাণ দিতে হল।

—তা, 'ক্যু' বলে কথা আর লোক মরবে না ? তা-ও তো মোটে তিনজন। অন্যান্য দেশ হলে দেখতিস এই সংখ্যা তিনশো না হয়ে তিন হাজারও হতে পারত।

—সত্যি, আমাদের দেশের লোকগুলো কোনো কাজই ঠিক করে করতে পারে না। বিদ্রোহ করার ইচ্ছা হলে এমন করে করো, যাতে চারিদিক লন্ডভন্ড হয়ে যায়। তা না, বিদ্রোহও সেই 'পা-সাভিয়েত্‌স্কি' (সোভিয়েত-ধাঁচে) !

—ইয়েলৎসিন না থাকলে কী হত, ভাব তো একবার ! ইয়েলৎসিন-ফ্যাক্টরটাকে গুরুত্ব না দিয়েই 'পুটিস্ট' (বিদ্রোহী)-রা থেকে বড়ো ভুলটা করেছে। ইয়েলৎসিনই হচ্ছে সত্যিকারের 'রুস্‌কি মুঝিক্‌' (রুশ মরদ, সাধারণ কথ্যভাষায় ব্যবহৃত হয়)।

—কিন্তু তোরা ধরেই নিচ্ছিস কেন যে ইনায়েভরা ক্ষমতায় এলে সব খারাপই হত !

উলটোও তো হতে পারত!

—অ্যাই, তুই আবার ওদের সমর্থক নাকি? খবর দিলে এক্ষুণি কিন্তু অ্যারেস্ট করে নেবে।

—তবে ইনায়েভরা পারত না। প্রেস কনফারেন্সে ওই হাত কাঁপা দেখেই বুঝেছি। লোকটা সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়েই কাঁপছে, তার হাতে গোটা দেশের দায়িত্ব কখনো ছেড়ে দেওয়া যায়?

ইতিমধ্যে টিভির পরদায় হাজির হলেন ইয়েলৎসিন। রাশিয়ার রাজধানীতে বেশ কিছুদিন আগেই তিনি হাজির হয়েছেন। 'বেলি দোম'-এর সামনে একটা ট্যাঙ্কের মাথায় যন্ত্রাংশ বেয়ে বেয়ে উঠে পড়লেন ইয়েলৎসিন। শুরু হল তাঁর 'জাতীয়তাবাদী' ভাষণ। আজ সকালে ট্যাঙ্কের মাথায় চেপে ভাষণ দিয়েছেন তিনি।

এই 'বেলি দোম'। হোয়াইট হাউস। মস্কোর হোয়াইট হাউস। আমেরিকার কায়দায়, হোয়াইট হাউস। রাশিয়ার প্রশাসনিক সদর দপ্তর। ইয়েলৎসিনের গদিঘর। ফের সোভিয়েত ইউনিয়ন, নাকি টুকরো টুকরো অনেকগুলো দেশ? ইনায়েভ না ইয়েলৎসিন? এইসব প্রশ্নের নির্ধারক হয়ে উঠল 'বেলি দোম'। তারপর খুব দ্রুত ঘটে গেল কিছু ঘটনা।

'ক্যু' ব্যর্থ হয়েছে। গর্বাচভ সুস্থ শরীরে মস্কোতে ফিরে এসেছেন। ধৃত অভ্যুত্থানের নায়করা। কমিউনিস্ট বিদ্বেষের বিষ ছড়াতে শুরু করেছেন ইয়েলৎসিন। জাতীয়তাবাদী নেতা তখন জাতীয় হিরো। দেশের ত্রাণকর্তা। গর্বাচভ থেকে শুরু করে সকলেই তাই ভাবছেন তখন। যে বেলি দোমের কাছে অভ্যুত্থান-বিরোধীরা—নেতা, সাধারণ মস্কোবাসী, লেখক, শিল্পী, অভিনেতা দু-রাত তিনদিন কাটালেন, যে বেলি দোম ঘিরে রেখেছিল ইনায়েভ বাহিনীর ট্যাঙ্ক, এবার শুরু হল সেখানকার শুচি ফিরিয়ে আনার কাজ। পবিত্র হোয়াইট হাউস বলে কথা! সেখানে বসল সর্বধর্মপ্রার্থনাসভা। সেখানেও মূল 'পুরোহিত' ইয়েলৎসিন (বকলমে)। রাশিয়ার মঙ্গল তো তখন উপরওয়ালার হাতে!

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সেই ভয়াবহ সময়ে হিটলার যখন নিজেকে অজেয় মনে করতে শুরু করেছেন, তখন হাজার হাজার সোভিয়েত যুবক-যুবতীর রোখ আর জেদ তাঁর সেই দম্ভ গুঁড়িয়ে দিয়েছিল। নাৎসি জার্মানির অহঙ্কার ধুলোয় মিশিয়ে দিয়েছিল সেই সময়কার সোভিয়েত যুবপ্রজন্ম। দেশকে রক্ষা করতে গিয়ে নিজেকে বিসর্জন দিয়েছিল এদের অধিকাংশই। তবে কেউ কেউ ফিরেও এসেছিল। সোভিয়েতের এই বীর পুত্রকন্যাদের অনেককে আমি দেখেছি। সেই যুদ্ধ শেষ হয়ে যাওয়ার ৪৫-৪৬ বছর পরে। তখন তাঁরা বয়সের ভারে ঝুঁকে পড়েছেন। তা-ও তাদের জীর্ণ কোটের উপর সেই মহাযুদ্ধের স্মৃতিবাহী মেডেল আটকানো। কুঁচকে যাওয়া মুখের চামড়া আর নিষ্প্রভ হয়ে আসা চোখের জ্যোতি কোথায় হারিয়ে যেত, যদি একবার তাঁদের কাছে সেই বীরগাথা শোনার আগ্রহ প্রকাশ করত কেউ। কী উৎসাহ আর আনন্দভরে সেই ভয়ানক যুদ্ধের গল্প শোনাতেন তাঁরা। বড়ো ভালো লাগত সেই কথা শুনতে, তাঁদের ওই মহানন্দের শরিক

হতে। তবে এঁদের নাতিনাতনিরা দাদু-দিদিমার বীরত্ব নিয়ে যে সবসময় গর্বিত হত, এমনটা নয়। ভাবটা যেন —ও আর কী এমন! তোমরা তখন দেশের প্রতি নিজেদের কর্তব্য পালন করেছ মাত্র। আমাদের সময়ে যদি এমন পরিস্থিতির উদ্ভব হয়, আমরাও করে দেখিয়ে দেব। সেই কবে কী করেছ, তা নিয়ে এখনও এত বড়াই । ভালো লাগে না বাপু।

তা এই নাতি-নাতনিদেরও সুযোগ এল। ৯১-এর আগস্টে মস্কোর রাস্তায় ট্যাঙ্ক নামল। বিদেশি কোনো শাসকের নির্দেশে নয়, 'ঘরের শত্রু'-র আদেশেই। নাতি-নাতনিরা, তাদের বাবা, মা, কাকা, মামা, জ্যাঠা, মেসো, মাসি, পিসিরা গিয়ে জড়ো হল। 'বেলি দোম'-এর সামনে। দু-রাত, তিনদিন সমানে দাঁড়িয়ে থেকে তারা বেলি দোমকে ট্যাঙ্কের বেষ্টনী থেকে মুক্ত করল। কট্টরপন্থী কমিউনিস্টদের অভ্যুত্থান ব্যর্থ করল। তারপর মস্কোর রাস্তাঘাটে, ট্রামে-বাসে, মেট্রোতে, দোকানে যাকেই দেখা যায়, সে-ই বলে, "ওই ক-দিন তো নাওয়া-খাওয়া সব মাথায় উঠেছিল। বেলি দোমের সামনেই ছিলাম সারাক্ষণ।" সবাই তখন বেলি দোমের 'প্রহরী', 'গণতন্ত্রের প্রহরী' খেতাবে নিজেকে ভূষিত করতে ব্যস্ত। নেতারাও জনগণের এই বড়াইয়ে ইন্ধন জুগিয়ে গরম গরম ভাষণ দিচ্ছেন—"রাশিয়ার মানুষ প্রমাণ করে দিয়েছে, অন্যায়ের প্রতিরোধ তারা যে কোনো মূল্যে করতে প্রস্তুত। রাশিয়ার বীর সন্তানেরা গোটা সোভিয়েত ইউনিয়নকে এক মহাসংকটের হাত থেকে বাঁচিয়েছে।"

'বেলি দোম ফেনমিনন' তখন এমন এক পর্যায়ে পৌঁছে গেল যে একেকসময় মনে হত, বেলি দোমের 'প্রহরী'-দের জন্য ইয়েলৎসিন সরকার আবার বিশেষ ভাতার ব্যবস্থা করবে না তো!

নাতি-নাতনিরা যখন নিজের পিঠ নিজে চাপড়ানোতে ব্যস্ত, তখন এই দৃশ্য প্রত্যক্ষ করে দাদু-দিদিমারাও মুখে মাফলার আর স্কার্ফ চাপা দিয়ে হো হো হাসলেন। মনে মনে ভাবলেন, যাক ইনায়েভের দৌলতে তোদের কপালেও শিকে ছিঁড়ল। দেশকে 'ধ্বংসের' হাত থেকে রক্ষা করেছিস ভেবে বড়াই করে ঘুরে বেড়াতে পারছিস আজ!

২২ আগস্ট 'ইজভেস্তিয়া'-য় সোভিয়েত প্রেসিডেন্ট গর্বাচভের একটি ঘোষণা প্রকাশিত হল। তাতে বলা হল—"দেশের পরিস্থিতি সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণাধীন।"

সেদিনই (২২ আগস্ট) রাত্রে গর্বাচভ সোভিয়েত টেলিভিশনে জাতির উদ্দেশে ভাষণ দিলেন—

"অভ্যুত্থান ব্যর্থ হয়েছে। ...১৮ আগস্ট ওরা আমাকে শেষ প্রস্তাব (আলটিমেটাম) দিল— হয় পদত্যাগ করুন অথবা জরুরি অবস্থার ঘোষণাপত্রে সই করুন। আমি ওদের অপরাধী বলে চিহ্নিত করলাম। বললাম, এভাবে আপনারা কিছু করতে পারবেন না, কারণ জনগণ আপনাদের সঙ্গে নেই। শেষে গৃহযুদ্ধ বেধে যাবে। রক্তক্ষয় হবে। আর এজন্য সম্পূর্ণ দায়ি হবেন আপনারা।

"ওরা আমার উপর মানসিক চাপ সৃষ্টি করল। বাইরের পৃথিবীর সঙ্গে আমার

যোগাযোগ ছিন্ন করল। এইভাবে আমার মনোবল পুরোপুরি ভেঙে ফেলার চেষ্টা করল।

"এই একই কারণে সাংবাদিক সম্মেলনে ওরা ঘোষণা করল, প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব পালনে শারীরিকভাবে আমি আর সক্ষম নই। পুরো ৭২ ঘন্টা আমি জানতে পারিনি দেশে কী ঘটছে।

* * *

"অভ্যুত্থান ব্যর্থ। বিদ্রোহীদের কঠোর শাস্তি দেওয়া হবে। যারা অভ্যুত্থান ব্যর্থ করতে সাহায্য করেছেন, তাঁদের ধন্যবাদ। প্রথমেই রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ইয়েলৎসিনের অসাধারণ ভূমিকার কথা উল্লেখযোগ্য। তাছাড়া রুশ ভাইস প্রেসিডেন্ট রুত্স্কোয়, রুশ প্রধানমন্ত্রী সিলায়েভ, মস্কোবাসী লেনিনগ্রাদবাসীর ভূমিকাও উল্লেখের দাবি রাখে।

* * *

"যা ঘটেছে, প্রেসিডেন্ট হিসেবে তার দায়িত্ব আমি এড়াতে পারি না। আগে থেকেই আমার এমন কিছু করা উচিত ছিল, যাতে এ ধরনের ঘটনা কোনোদিন না ঘটতে পারে।

* * *

"এখন সব থেকে প্রথমে যা করা দরকার, তা হল, দেশকে 'শক' থেকে উদ্ধার করা।

"আমরা সকলেই খুব কঠিন সময় কাটিয়ে উঠেছি। এখন আমাদের এই তিক্ত অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা অর্জন করে আরো দৃঢ় ও সাহসী পদক্ষেপে সামনে এগিয়ে যেতে হবে। প্রিয় কমরেডগণ, আপনাদের সকলকে ধন্যবাদ। গত কয়েকদিন যারা গণতন্ত্রকে রক্ষা করেছেন তাঁদের কাছ থেকে প্রেসিডেন্ট হিসেবে সব থেকে মূল্যবান ও গুরুত্বপূর্ণ সমর্থন আমি পেয়েছি।

ধন্যবাদ"।

২৬ আগস্ট ইউক্রেন স্বাধীনতা ঘোষণা করল। সোভিয়েতের শস্যভাণ্ডার ইউক্রেন আর সোভিয়েতের রইল না।

ওই একই দিনে 'ইজভেস্তিয়া'-র প্রথম পাতায় বড়ো বড়ো হরফে ছাপা হল একটি বাক্য– 'গর্বাচভ প্রিজনায়োত সোয়ায়ি আশিব্কি' (গর্বাচভ নিজের ভুল স্বীকার করলেন)। খবরের মর্মার্থ হল, গর্বাচভ স্বীকার করেছেন যে, তাঁর রাষ্ট্রনীতিতে গলদ ছিল। পেরিস্ত্রোইকা, গ্লাসনস্তের প্রয়োগ যথাযথ হয়নি। প্রজাতন্ত্রগুলির মধ্যে সম্পর্ক আরো সুদৃঢ় করতে বিশেষ কিছু করা হয়নি, তা-ও মেনে নিলেন তিনি।

'ইজভেস্তিয়া'-র ওই সংখ্যায় পাঠকের সামনে একটি জটিল প্রশ্ন তুলে ধরা হল। প্রথম পাতার ডানদিকের দু কলাম জুড়ে প্রশ্ন, উত্তরহীন একটি প্রশ্ন–'সিপিএসইউ-এর কোনো জেনারেল সেক্রেটারি নেই। তবে এখন এই ধরনের কোনো দল কি আদৌ আছে?'

অভ্যুত্থানের পরে উদ্ভূত এমনই জটিল কিছু প্রশ্নের উত্তর খোঁজার আশায় ২ সেপ্টেম্বর

থেকে 'কংগ্রেস অব পিপল্‌স্ ডেপুটিজ'-এর বিশেষ বৈঠক ডাকা হল।

বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ, সিপিএসইউ-এর সেন্ট্রাল কমিটির প্রভাবশালী সদস্য, গর্বাচভের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ, 'কংগ্রেস অব পিপল্‌স্ ডেপুটিজ'-এর স্পিকার আনাতোলি লুকিয়ানভ পদত্যাগ করলেন। পদত্যাগপত্রে জোরের সঙ্গে ঘোষণা করলেন, অভ্যুত্থানের পরিকল্পনা তাঁর মস্তিষ্কপ্রসূত নয়। (তাঁর বিরুদ্ধে এমন একটা অভিযোগ ইতিমধ্যেই বাজার গরম করেছিল।)

'গে কে চে পিস্ট'-দের সঙ্গে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে জড়িত থাকার অভিযোগের তীর তখন লুকিয়ানভের মতোই আরো বহু প্রভাবশালীর দিকে তাক করা হচ্ছিল। একে একে শুরু হল সর্ষের মধ্যে ভূত খোঁজার পালা। এই তালিকা থেকে কেজিবি প্রধান ভ্লাদিমির ক্রুচকোভও বাদ গেলেন না। অভিযোগ, সাফাই গাওয়া, দোষ চাপান-উতোর—সোভিয়েত রাজনৈতিক মঞ্চে তখন জমজমাট নাটক।

তারপর—

তারপর লেনিনের রাশিয়ায় নিষিদ্ধ হল কমিউনিস্ট পার্টি। কমিউনিস্ট পার্টিকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করলেন রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ইয়েলৎসিন। জারের রাশিয়ায় যেমন নিষিদ্ধ ছিল কমিউনিস্ট পার্টি। ৯১-এ সেই একই সিদ্ধান্ত নিলেন বরিস নিকোলায়েভিচ ইয়েলৎসিন। এরপর দ্রুত উন্নতির শিখরে পৌঁছালেন ইয়েলৎসিন। একদম সরলরৈখিক সেই উত্থান।

বিশিষ্ট সোভিয়েত পদার্থবিদ সাখারভের বিধবা পত্নী ইলেনা গিয়েগিয়েভ্‌না বোন্নের অভ্যুত্থান প্রসঙ্গে নিজের বক্তব্য জানিয়ে ২৯ আগস্ট 'ইজভেস্তিয়া'-য় একটি দীর্ঘ নিবন্ধ লিখলেন। ইলেনা বোন্নেরও অভ্যুত্থানের দিনগুলিতে বেলি দোমের সামনে হাজির হয়েছিলেন। তিনি লিখলেন, "আমরা মিখাইল গর্বাচভকে সমর্থন করিনি, আমরা আইনকে সমর্থন করেছি।"

সমূলে বিনাশ হল 'ক্যু'। এটা যেন ইয়েলৎসিনের তৈরি করা কমিউনিস্ট-বিদ্বেষের আগুনে ঘৃতাহুতি দিল। প্রেসিডেন্ট পদে থেকেও গর্বাচভ ক্ষমতাহীন, প্রভাব প্রতিপত্তিহীন। মস্কোয় 'প্রেসিডেন্ট' বললেই সোভিয়েত প্রেসিডেন্ট—এমনটা আর ধরে নেওয়া যাবে না। ইয়েলৎসিন তখন রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট। জাতীয় রাজনীতির প্রকৃত নিয়ন্ত্রক।

অভ্যুত্থানের নায়করা—কট্টরপন্থী কমিউনিস্টরা তখন কারাগারে বন্দী। গর্বাচভ সমস্ত ক্ষমতা খুইয়ে ইয়েলৎসিনের হাতের পুতুল। গোটা সোভিয়েত ইউনিয়নে শুরু হয়েছে বিচ্ছিন্নতার লড়াই। জনজীবন অস্থির। রাশিয়ার প্রেসিডেন্টই তখন গোটা দেশ চালাচ্ছেন।

গর্বাচভ ক্রিমিয়াতে ৭২ ঘন্টার গৃহবন্দী দশা কাটিয়ে মস্কোতে ফিরে টিভি পরদায় দেখা দিয়ে আবেগকম্পিত কণ্ঠে বলেছিলেন, সোভিয়েত প্রেসিডেন্ট হিসেবে তাঁর সবচেয়ে বড়ো প্রাপ্তি হল জনগণের সমর্থন, যা তাঁর অবর্তমানে সোভিয়েতের গণতন্ত্রকে রক্ষা করেছে। গর্বাচভ সম্ভবত সেই স্মৃতি রোমন্থনেই ব্যস্ত ছিলেন। ইয়েলৎসিন তাঁকে কাগুজে

প্রেসিডেন্ট বানিয়ে রেখে রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলিতে হাত দিলেন।

৯১-র অক্টোবরে রাশিয়ার অর্থনীতির ক্ষেত্রে ব্যাপক পরিবর্তন সাধনের সিদ্ধান্ত নিলেন ইয়েলৎসিন। রাশিয়া তখনও সোভিয়েত ইউনিয়নের একটি প্রজাতন্ত্র। খাতায় কলমে পেরিস্ত্রোইকার প্রবক্তা তখনও সোভিয়েত প্রেসিডেন্ট। তাঁকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখিয়ে বাজারদর, ব্যক্তিগত মালিকানা এবং রুবলের বিনিময়যোগ্যতা নিয়ে বড়ো বড়ো সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেললেন ইয়েলৎসিন। মস্কোয় তখন এ ওর মুখ চাওয়াচাওয়ি করত। এ যেন দারিও ফো-র সেই নাটক—হচ্ছেটা কী?

রাশিয়ার রাজনীতিতে তখন রোজই কিছু না কিছু রদবদল ঘটছে। মূল্যহীন হয়ে যাওয়া রুবলকে একটা স্থিতি দেওয়ার জন্য ইয়েলৎসিন নানান ধরনের পরিকল্পনার কথা ঘোষণা করছেন। ভেঙে পড়া উৎপাদন ব্যবস্থাকে চাঙ্গা করতে ব্যক্তিগত মালিকানা প্রবর্তনের কথাও রুশিদের শোনালেন তিনি। এইসব অর্থনৈতিক সংস্কারের কাণ্ডারী হিসেবে অর্থনীতিবিদ ইগর গাইদার সহ আরো দুই রিফর্মিস্টকে ইয়েলৎসিন নিজের মন্ত্রিসভাভুক্ত করলেন। ওদিকে বিভিন্ন প্রজাতন্ত্রগুলির মধ্যে তখন চলছে রক্তারক্তি, মারামারি।

৯১ শেষ হয়ে এল। ডিসেম্বর মাস। নতুন বছর শুরু হতে আর দিন কয় বাকি। 'নোভাগোদ্‌নি প্রাজ্‌নিক' (নববর্ষের উৎসব)-এর প্রস্তুতি চলছে ঘটা করে। আচমকা বোমা বিস্ফোরণের মতো শোনা গেল একটা খবর। ইয়েলৎসিন সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙে দিয়েছেন। গর্বাচভ পদচ্যুত। রাশিয়া, ইউক্রেন ও বেলারুশ মিলে গঠিত হয়েছে 'কমনওয়েলথ অব ইন্ডিপেন্ডেন্ট স্টেটস'। রাত্রিবেলা টিভিতে এলেন গর্বাচভ। অনেকটা হেরে যাওয়া ফুটবল দলের অধিনায়কেরা যেমন বলেন, ওরা ভালো খেলেছে, জিতেছে, আমরা খারাপ খেলেছি, হেরেছি গোছের একটা বাণী দিয়ে ইয়েলৎসিনদের শুভেচ্ছা জানিয়ে বিদায় নিলেন।

হায়! কী কথা ছিল আর কী হল! নববর্ষের শুরুতে প্রত্যেক বছর সোভিয়েত প্রেসিডেন্ট সকলকে শুভেচ্ছা জানিয়ে জাতির উদ্দেশে ভাষণ দেন। ৩১ ডিসেম্বর যখন ঘড়িতে ঢং ঢং করে ঠিক রাত বারোটা বাজে, নতুন বছরের ১ জানুয়ারি শুরু হয়, তখন টেলিভিশনে প্রেসিডেন্ট পুরোনো বছরকে বিদায় জানান। নতুন বছরের শুভকামনা সকলকে ঘরে ঘরে পৌঁছে দেন। সোভিয়েত জনসাধারণ আগে থেকেই টেবিল ভরতি খাবারদাবার সাজিয়ে প্রস্তুত হয়ে বসে থাকে। ঘড়িতে বারোটা বাজে, আকাশে ফায়ার ওয়ার্কসের রঙিন মনোহর আলো ছড়িয়ে পড়ে আর টেলিভিশনে শুরু হয় প্রেসিডেন্টের ভাষণ। সাধারণ মানুষ শ্যাম্পেনের গ্লাস ঠোকাঠুকি করে পরস্পরকে শুভেচ্ছা জানিয়ে নতুন বছরকে স্বাগত জানায়। প্রতি বছর এমনটাই দেখে আসছি। এ বছরও তো এমনটাই হওয়ার কথা ছিল। হল না। ৯২ সাল এল অন্যভাবে।

৯১-এর শেষে, ৩১ ডিসেম্বরের আগেই সোভিয়েত প্রেসিডেন্ট দেখা দিলেন টিভির

পরদায়। নতুন বছরের শুভেচ্ছাবার্তা শোনাতে নয়, সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের সংবাদ জানাতে। ৭৪ বছর আগে এক মহাবিপ্লবের মধ্য দিয়ে পৃথিবীর মধ্যে সর্বপ্রথম এক সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের জন্ম হয়েছিল। গোটা দুনিয়ায় ছড়িয়ে থাকা লাখো মানুষের স্বপ্ন সফল হয়েছিল সেই রাষ্ট্রের জমিতে। এক মহতী আদর্শকে সামনে রেখে সেই রাষ্ট্রকে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন একাধিক সুযোগ্য নেতৃবৃন্দ। সেই রাষ্ট্র, সেই সোভিয়েত ইউনিয়ন আর থাকবে না—৯১-এর ডিসেম্বরে মিনিট পাঁচেকের এই টেলিভিশন ভাষণে ঘোষণা করলেন সোভিয়েত প্রেসিডেন্ট মিখাইল গর্বাচভ।

তবে এজন্য মস্কোবাসীর 'নোভাগোদ্‌নি প্রাজনিক' (নববর্ষের উৎসব) উদ্‌যাপনে কোনো ভাটা পড়েছিল বলে আমার একবারের জন্যও মনে হয়নি। নতুন রাশিয়ায়, 'মুক্ত' রাশিয়ায়, নতুন বছর পালিত হয়েছিল আরো উৎসাহে, আরো আনন্দে, আরো ভোদ্‌কায়, আরো শ্যাম্পেনে। মস্কোবাসী তখন 'স্বাধীন', কোনো নিয়মের নিগড়ে আর বাঁধা নয়। 'সায়ুজ সোভিয়েতস্কিখ সাৎসিয়ালিস্তিচেস্কিখ রিস্‌পুবলিক' (ইউনিয়ন অব সোভিয়েট সোস্যালিস্ট রিপাবলিকস) নামক 'আপদ'টা অবশেষে বিদায় নিয়েছে। নতুন রাশিয়া, নতুন জীবন, নতুন স্বপ্ন, নতুন আশা, আগের 'ভুল' শুধরে নিয়ে নতুন পথে চলা—রাশিয়ার সাধারণ মানুষের সামনে তখন নতুনের হাতছানি। পুরোনোকে নিয়ে মাথা ঘামানোর সময় কোথায় তখন ?

অতএব সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙে গেল। আমেরিকা বলল, আমাদের বহু বছরের প্রচেষ্টা সফল হয়েছে। গোটা দুনিয়ার উপর ইচ্ছামতো ছড়ি ঘোরাতে পারব এবার। শুধু তাই নয়, অনেকদিনের শত্রুকে হুকুমমতো চলতে বাধ্য করার সব ব্যবস্থাও ততদিনে পাকা করে ফেলেছে আমেরিকা। আর একাজে সব থেকে বড়ো সহায়ক হবে খোদ সেই শত্রুই—রাশিয়া।

নতুন রাশিয়ায় নতুন বছর। নতুন নতুন চমকে ভরপুর। অধিকাংশ জিনিসপত্রের উপর থেকে মূল্যনিয়ন্ত্রণের লাগাম তুলে নেওয়া হল। জিনিসপত্রের দাম একলাফে ৩০০ গুণ বেড়ে গেল। দোকান প্রায় শূন্য। সামান্য যা জিনিসপত্র পাওয়া যাচ্ছিল তা কেনার সামর্থ্য তখন অধিকাংশেরই নেই।

দেশের এমন ভয়াবহ পরিস্থিতিতে মার্কিন মুলুকে পাড়ি দিলেন ইয়েলৎসিন। ৯২-এর জুনে। অস্ত্র সংকোচন চুক্তিতে সই করার জন্য। প্রেসিডেন্ট বুশ ইয়েলৎসিনকে সাদরে অভ্যর্থনা জানালেন। মার্কিন দেশ থেকে ২৪ বিলিয়ন ডলার নিয়ে দেশে ফিরলেন রুশ প্রেসিডেন্ট 'ইন্টারন্যাশনাল এইড প্যাকেজ' হিসেবে।

ক্রেমলিনের কর্তারা তখন ভিক্ষার ঝুলি হাতে পৃথিবীর নানা প্রান্তে ছুটে বেড়াচ্ছেন। রাশিয়ার জন্য 'মানবিক সাহায্য' (হিউম্যানিটারিয়ান এইড) নিয়ে আসছেন। বুভুক্ষু মস্কো, অনেকদিন ভালোমন্দ না খেতে পাওয়া মস্কো। মস্কোর বড়ো বড়ো দোকানের ফাঁকা হয়ে যাওয়া তাকগুলো ভরে উঠল 'মানবিক সাহায্যের' নামে দেওয়া জিনিসপত্রে। মস্কোর

দোকানে দোকানে তখন বিদেশি মদের বোতল, বিদেশি সিগারেটের প্যাকেট, বিদেশি টিনফুড, বিদেশি পেপসি, কোকাকোলা। গোটা মস্কো শহরটা ছোঁ মেরে পোশাক কিনতে লাগল। এতদিনে পশ্চিমিদের মতো সাজগোজ করে একটু ভদ্রস্থ হওয়া যাবে! মস্কোর ফুটপাথগুলো ভরে উঠল কিয়স্কে। সেই কিয়স্কে রকমারি বিদেশি পণ্য। মস্কোবাসী সেসব কখনও চোখে দেখেনি। কেনার সাধ্য না থাকলেও দু-চোখ ভরে দেখেও সুখ, একটু ছুঁয়েও সুখ।

শুধু খাবারদাবার, জামাকাপড়ই নয়, পশ্চিম থেকে আসা সস্তা পণ্যে ও খেলো ডিটেকটিভ বইয়েও মস্কো ভরে গেল। রুশ চিরায়ত সাহিত্য বা আধুনিক রুশ সাহিত্যিকদের বই প্রায় উধাও হয়ে গেল বাজার থেকে। লোকজন তখন গোগ্রাসে পর্ণোগ্রাফি বা তৃতীয় শ্রেণির ডিটেকটিভ বই গিলছে। এতদিন নিষিদ্ধ হয়ে থাকা বইগুলো তাদের হাতে এসে পৌঁছাল। রাতারাতি রুশিতে অনুবাদও হয়ে গেল সেইসব বই। মেট্রোতে, ট্রামে, বাসে, এমনকী এস্কালেটরেও মস্কোবাসী তখন ঘাড় গুঁজে এইসব বই পড়ছে।

মস্কোর প্রেক্ষাগৃহগুলিতেও তখন অতি নিচুমানের মার্কিনি ছবির ছড়াছড়ি। রুবলের অভাবে রুশি পরিচালকরা হাত-পা গুটিয়ে বসে। সেইসব মার্কিনি ছবি দেখতে লাগল রুশ কিশোর-কিশোরী, যুবক-যুবতীরা। মস্কোর রাস্তায় ফিল্মি ধাঁচের ছিনতাই, মারপিট, ধর্ষণের সংখ্যা এরপর ধীরে ধীরে বাড়তে শুরু করল।

ক্রমশ পশ্চিমিরা মস্কোকে খাওয়ানো পরানোর দায়িত্ব নিতে শুরু করল। মস্কোর একেবারে মাঝখানে খোলা হল ম্যাকডোনাল্ডস্-এর খাবার দোকান। রুশিরা হুমড়ি খেয়ে পড়ল, 'বিগ ম্যাক', 'চিজ বার্গার'-এর উপর। ম্যাকডোনাল্ডসের দোকানে ঢোকার জন্য তখন বিশাল লাইন। সেই লাইনের ছবি তুলতে আসত সিএনএন, বিবিসি-র লোকেরা—দেখো, রাশিয়ার আজ কী দশা! মস্কোর লোকেরা ম্যাকডোনাল্ডসের দৌলতে তা-ও এতদিন খেয়েদেয়ে বাঁচার সুযোগ পাচ্ছে। ক্ষুধার্ত রাশিয়াকে একনজরে দেখার জন্য বিদেশি পর্যটকরাও তখন ম্যাকডোনাল্ডসের সামনে ক্যামেরা কাঁধে ঘুরে বেড়াত।

ইরিনা আর আমি এক বিকেলে গিয়েছি ম্যাকডোনাল্ডসে। যথারীতি লম্বা লাইন। বেশ কিছুক্ষণ দাঁড়ানোর পর টিপটিপে বৃষ্টি শুরু হল। তা-ও লাইন ছেড়ে কেউ গেল না। আমাদেরই মতো দাঁড়িয়ে থেকে গেল। পাশের রাস্তাটা দিয়ে এক মাতাল রুশি বুড়ো যাচ্ছিল। লাইনের কাছে এগিয়ে এসে বলল, "মূর্খের দল, বাড়ি গিয়ে পাঁউরুটি আর সসেজ কিনে খাও। ওই একই খাবার একটু কায়দা করে খাওয়ার জন্য বৃষ্টিতে ভিজে, লাইনে দাঁড়িয়ে এত কষ্ট পোয়ানোর মানেটা কী?"

ইরিনা আমাকে চুপিচুপি বলল, "মাতাল বলেই একথা বলছে। ঠিকঠাক থাকলে ও-ও দেখতিস লাইনে দাঁড়িয়ে পড়েছে।"

নতুন রাশিয়ার নতুন বাজার। খোলা বাজার। উদার বাজার। সেই বাজারে বিদেশি পণ্যের ছড়াছড়ি। নতুন গড়ে ওঠা বিক্রেতা শ্রেণি। ক্রেতারাও রুশ সমাজে নতুন-বিদেশি

জ্যাকেট, জিন্‌স, নর্থ স্টার জুতো, পকেট ভরতি মার্কিন ডলার। এই নতুনের ছড়াছড়িতে একটাই পুরোনো জিনিস রয়ে গেল। সেই পুরোনো রুবল। পুরোনো নামে, পুরোনো চেহারায়। লেনিনের মুখের ছবিওয়ালা পুরোনো রুবল। তবে ততদিনে সে আরো মূল্যহীন হয়ে পড়ছে। এক মার্কিনি ডলারের দাম বাড়তে বাড়তে গিয়ে ঠেকছে ১০০০— ১২০০— ১৫০০— ২০০০— ২৫০০— ৩০০০— ৪০০০ রুবল...

৮৭-তে যখন প্রথম মস্কো গিয়েছিলাম তখন কালোবাজারে এক মার্কিন ডলারের দাম ছিল ৪ রুবল। এক লিটার দুধের দাম ছিল তখন ৩৬ কোপেক, এক পাউন্ড ভালো পাঁউরুটি ২৫ কোপেক, ৬০ কোপেকে ক্যান্টিনে ভরপেট খাওয়া যেত, চিজের ৫০ গ্রামের প্যাকেট ১৫ কোপেক, মাখনের কেজি ৩ রুবল ৫০ কোপেক, বড়ো একটা মুরগির দাম ছিল ৩-৪ রুবল, গরুর মাংসের কেজি ছিল ৩ রুবল ৫০ কোপেক। বাস, ট্রাম, মেট্রো ভাড়া ৫ কোপেক। খাতা ৩ কোপেক। লিও তলস্তয়ের 'ভাইনা ই মির' (ওয়ার অ্যান্ড পিস)-এর ৪টি খণ্ডের দাম ছিল যথাক্রমে ৮০ কোপেক, ৮০ কোপেক, ৮৫ কোপেক, ৭৫ কোপেক। অর্থাৎ ৪ খণ্ডের মোট দাম ৩ রুবল ২০ কোপেক। চাইকোভস্কির 'লেবেদিনোয়ে ওজেরা' (সোয়েন লেক)-র তিনটি এল পি রেকর্ড নিয়ে পুরো সেটটার দাম ছিল ৭ রুবল ১৫ কোপেক। আমরা, বিদেশি ছাত্রছাত্রীরা তখন মাসে ৮০ রুবল স্টাইপেন্ড পেতাম। সেই রুবলে খুব ভালোভাবে খাওয়াদাওয়ার পরেও বই, রেকর্ড কেনা যেত। তারপরেও অনেকে ব্যাঙ্কে রুবল রাখত। ভারতীয় টাকার হিসেবে এক রুবলের দাম তখন ৩০ টাকা।

ইউনিভার্সিটির শিক্ষকরা তখন মাসে ১৫০-২০০ রুবল মাইনে পেতেন। সিনিয়র প্রফেসররা পেতেন ২৫০ রুবলের কাছাকাছি। বাস ড্রাইভাররা পেতেন কমপক্ষে ৫০০ রুবল। শ্রমিকদেরও মাসিক উপার্জন ছিল ৫০০-৬০০ রুবলের মতো। আমাদের ইউনিভার্সিটির ক্যান্টিনে টেবিল মুছতেন এক মহিলা। চড়া মেজাজের সেই মহিলা সবসময় গজগজ করতেন। কোনোদিন তাকে হাসতে দেখিনি। দামি ফারের কোট পরে, ক্যাটক্যাটে গোলাপি লিপস্টিক আর উগ্র মেক আপে মুখ ঢেকে তিনি ইউনিভার্সিটি আসতেন নিজস্ব গাড়িতে চেপে। ইউনিভার্সিটির ৯৯% শিক্ষক আসতেন ট্রাম, বাস, মেট্রোতে। বৌদ্ধিক শ্রমের তুলনায় কায়িক শ্রমের মর্যাদা দেওয়ার নীতি সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রায় সর্বত্র এইভাবে অনুসৃত হত।

এরপর দিন বদলাল। সোভিয়েত ইউনিয়ন আর রইল না। রুবল আর ডলারের মূল্যের মাঝে তখন হাজার সংখ্যা চলে এসেছে।

প্যাট্রিস লুমুম্বা ইউনিভার্সিটির আন্তর্জাতিক সাংবাদিকতা বিভাগের প্রবীণতম শিক্ষক ছিলেন প্রফেসর লাম্‌কো। দীর্ঘ ৩০ বছর তিনি 'মস্কো নিউজ' সংবাদপত্রের সম্পাদক ছিলেন। সেই স্তালিনের আমলে এই দায়িত্ব গ্রহণ করেন তিনি। এর আগে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে নাৎসি জার্মানির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিলেন। সেসময় কিছুদিন সামরিক বিমানও চালান। সাংবাদিক হিসেবে প্রায় সারা দুনিয়া ঘুরেছিলেন লাম্‌কো। কলকাতাতেও

এসেছিলেন। কলকাতায় তাঁকে কলাপাতায় রসগোল্লা খেতে দেওয়া হয়েছিল, এ গল্প তিনি আমাকে প্রায়ই শোনাতেন। নানা অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ তাঁর সাংবাদিক জীবনের গল্পও তিনি আমাদের বলতেন। সম্পাদকের দায়িত্ব থেকে অবসরগ্রহণের পর তিনি ইউনিভার্সিটিতে শিক্ষক হিসেবে যোগ দেন। সবসময় নিখুঁত স্যুট কোটে, নিপাট পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন প্রায় ৭৫ বছরের লাম্‌কো যাতায়াত করতেন বাসে, মেট্রোতে।

রুবলের দাম সে সময় প্রতি ঘণ্টাতে নেমে যাচ্ছে। 'মুদ্রাস্ফীতি' শব্দটা তখন রাশিয়ার শিশুরাও জেনে গিয়েছে। সেরকম সময়েই লাম্‌কো একদিন নিঃস্ব হয়ে গেলেন। তাঁর সারাজীবনের সঞ্চয় দশ হাজার রুবলের মূল্য একদিন হঠাৎ দু-ডলার হয়ে গেল। ভারতীয় টাকায় ৬০। সর্বস্বান্ত হয়ে গেলেন তিনি। মস্কোয় তখন এরকম লাম্‌কোদের সংখ্যা বাড়ছে।

শিক্ষক এবং সাধারণ চাকুরিজীবীদের অবস্থা হয়ে দাঁড়াল ভায়বহ। রুবলের দাম কমার সঙ্গো সঙ্গো কর্মীদের মাইনে যদিও বাড়ানো হল, কিন্তু বর্ধিত বেতন মুদ্রাস্ফীতির সঙ্গো তাল রেখে চলতে পারল না। এই অবস্থায় সব সাধারণ মরণশীল মানুষের মতো রুশ শিক্ষকরাও নিজেদের আর্থিক অবস্থান সম্পর্কে আতঙ্কিত হয়ে পড়লেন। স্ত্রী-পুত্র-পরিবারের ভরণপোষণের জন্য তাঁরাও রাস্তা খুঁজতে শুরু করলেন। অনেকে ব্যক্তিগত উদ্যোগে ছোটোখাটো ব্যবসা শুরু করলেন। পড়ানোর পাশাপাশি এসব নিয়েও চিন্তা করতে বাধ্য হলেন তাঁরা। ডলারওয়ালা অনেক ছাত্র শিক্ষকদের অসহায়তার সুযোগ নিল। ডলার দিয়ে নম্বর কিনল। ডলার দিয়ে হস্টেলে ভালো ঘর 'ম্যানেজ' করল। তবে সব শিক্ষক ডলারের ফাঁদে পা দেননি। সবাই এভাবে অসৎ হয়ে যায় না বলে পৃথিবীটা এখনও টিকে আছে। সেই আমাদের বাংলার প্যারাবোলা স্যাররা সব দেশেই আছেন।

৫০-৬০ বছর বয়স্ক রুশিরা তখন চিহ্নিত হলেন 'হারিয়ে-যাওয়া প্রজন্ম' হিসেবে। সমাজে তখন তাঁরা নিজেদের জায়গা খুঁজে বেড়াচ্ছেন, পাচ্ছেন না। অফিস কাছারিতে, কলকারখানায় বিনা নোটিশে কর্মী ছাঁটাই শুরু হয়ে গেল। অল্পবয়সীদের উপর এই কোপ পড়ত না। ঠেলে বার করে দেওয়া হতে লাগল প্রৌঢ় লোকগুলোকে, বয়স যাদের পঞ্চাশ বা যাটের কোঠায়। নতুন কোনো পেশা বেছে নিয়ে আবার নতুন করে শুরু করার মতো মনের জোরও এদের ছিল না। পৃথিবীর সব থেকে নিরুপায় আর দুঃস্থ তখন এরাই। একদিকে প্রচণ্ড হতাশা, অন্যদিকে সুলভ নেশাসামগ্রীর হাতছানি। অতএব দারিদ্র, ক্ষোভ আর আসক্তি পাল্লা দিয়ে বাড়তে শুরু করল। দক্ষ, অভিজ্ঞ, পেশাদার কর্মীরা তখন দেশের বা সমাজের আর কোনো কাজে লাগছে না। গোটা ফলপ্রসূ প্রজন্মই এভাবে অকেজো হয়ে হারিয়ে যেতে লাগল। যে নবীনেরা কাজে বহাল থাকল, তাদের উঁচু দরের কর্মী বলা যেত না। তাদের অভাব অভিজ্ঞতার। ফলে সামগ্রিকভাবে কাজের মানও দ্রুত নেমে যেতে থাকল।

ভারতের বেকার সমস্যা নিয়ে একবার কথা হচ্ছিল। ৮৮-র শেষের দিকে কোনো

এক সন্ধ্যাতে। আমরা কয়েকজন ভারতীয় ছাত্রছাত্রী আর ইউক্রেনের ছেলে আলেগ। চা খেতে খেতে নিজেদের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার কথা বলতে গিয়ে আমরা আলেগকে বললাম, "তোদের (সোভিয়েত ছেলেমেয়ের) কোনো চিন্তা নেই। পড়াশোনা শেষ হওয়া মাত্রই চাকরি পেয়ে যাস তোরা। পাকাপাকি ব্যবস্থা। কাউকে বেকার বসে থাকতে হয় না। আমাদের দেশেও যদি এমন হত!" আলেগ কেমন একটা শ্লেষের হাসি হেসে বলেছিল, "তোদের দেশেও বেকার সমস্যার খুব সহজ একটা সমাধান আছে। আমরা যেভাবে করেছি। ধর, একটা রাস্তা তৈরি করল ১০ জন শ্রমিক। এমনভাবে রাস্তাটা তৈরি করা হল যাতে ছ-মাস পরে আবার মেরামত করতে হয়। অথচ ভালোভাবে একবারে কাজটা করলে ২-৩ বছর নিশ্চিন্ত থাকা যেত। কিন্তু তাহলে একটা সমস্যা দেখা দিত। ওই ১০ জন শ্রমিককে বসিয়ে রাখতে হত। সরকার থেকেই তাই এমনভাবে পরিকল্পনা করা হয়, যাতে সকলের হাতে সারাবছর কাজ থাকে, তবে কাজের মান হয় খুব নিচু।"

সোভিয়েত সরকারকে সেদিন খুব গালাগালি করেছিল আলেগ। তবে তাকে এর থেকে হাজার গুণ বেশি ক্ষুব্ধ হতে দেখেছিলাম আরেকদিন। ৯২-এর মাঝামাঝি। হস্টেল থেকে বেরোনোর মুখে হঠাৎ আলেগের সঙ্গে দেখা। প্রায় বছর দু-য়েক পরে ওকে দেখলাম। ইতিমধ্যে ও পদার্থবিদ্যা নিয়ে বেশ ভালোভাবে আমাদের ইউনিভার্সিটি থেকেই পাশ করেছে। এখন কী করছিস তাহলে? আমার প্রশ্নটা শুনে ভীষণ খেপে গেল ও। বলল, "কিচ্ছু না। মেয়েদের ব্লকে এসেছি একটু খাবারের ধান্দায়। তুই কী ভেবেছিস? আমার জন্য সব চাকরি সাজিয়ে নিয়ে বসে আছে? একেকসময় মনে হয়, সব জ্বালিয়ে পুড়িয়ে শেষ করে দিই। পরমুহূর্তেই বুঝতে পারি, কিছুই করতে পারব না। এইভাবে কৃমির মতোই বেঁচে থাকব দিনের পর দিন।" সেই ভরদুপুরেও আলেগের কাছ থেকে ভক্‌ভক্ করে মদের গন্ধ বেরোচ্ছিল।

বছর আটেক আগে ইউক্রেনের একটা ছোট্ট গ্রাম থেকে কত আশা, কত স্বপ্ন নিয়ে মস্কোর পিপল্‌স্ ফ্রেন্ডশিপ ইউনিভার্সিটিতে পড়াশোনা করতে এসেছিল আলেগ। সেদিনের সেই শক্তসমর্থ এক সোভিয়েত যুবক আজ শুধু বুকভরা ঘৃণা নিয়ে বেঁচে আছে। সে এখন তার চারপাশের সমাজটাকে ঘেন্না করে, পরিবর্তনকে ঘেন্না করে, নিজেকে ঘেন্না করে, অনিশ্চিত ভবিষ্যৎকে ঘেন্না করে, মস্কোকে ঘেন্না করে, মস্কোর ভাগ্যবিধাতাদের ঘেন্না করে, ইউনিভার্সিটি থেকে পাওয়া নিজের সার্টিফিকেটগুলোকে ঘেন্না করে আর সব থেকে ঘেন্না করে ইউক্রেনের সেই ছোট্ট গ্রামটাকে, সব জায়গায় নিজেকে অবাঞ্ছিত মনে হওয়ার পর যেখানে সে নিজেকে খুঁজে পাওয়ার চেষ্টা করেছিল, পায়নি, সেই গ্রামটাকে।

সোভিয়েত ইউনিয়ন লন্ডভন্ড হয়ে যাওয়ার পর এমন কত শত তরুণ-তরুণী 'কৃমির মতো' বেঁচে থাকতে শিখল। 'সোভিয়েত শৈশব', 'সোভিয়েত কৈশোর' ও 'সোভিয়েত যৌবনের' কয়েক বছর কাটানোর পর হঠাৎ একদিন তারা দেখল, জীবনের আর এক নাম ভোগবাদ। ডলার-ভিসা-মার্সিডিজ-মার্টিন-সুন্দরী নারী-ফ্ল্যাট-সম্পত্তি-ব্যবসা-ফ্লাইট-আমেরিকা-

হবে। গতকাল তুমি সোভিয়েত ছিলে। গতকাল পর্যন্ত সেটাই ছিল তোমার পক্ষে সুবিধাজনক। গতকালও তুমি কমিউনিস্ট ছিলে, কারণ সেটাই ছিল সবথেকে লাভজনক। আজ তোমাকে 'অসোভিয়েত', 'অকমিউনিস্ট', 'অটোমোবিল' হতে হবে। কারণ? আমেরিকার নির্দেশ! ওরা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে, উন্নতি, সমৃদ্ধি আর ক্ষমতা যদি পকেটে ভরতে চাও, তাহলে সোভিয়েতকে ভোগে পাঠাও, কমিউনিজমকে আঁস্তাকুড়ে ফেলো, তারপর—তারপর আমরা (মার্কিনিরা) আছি!

মস্কো, কিয়েভ, মিনস্কের হাজার হাজার যুবক-যুবতী আমেরিকার নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করল। রাতারাতি ভোল পালটে গেল তাদের। আর আলেগের মতো ছেলেমেয়েরা শুধু দেখল। পুরোনো কোনো আদর্শের স্মৃতি বা কোনো পিছুটান যে তাদের নিষ্ক্রিয় করে রাখল, এমনটা ভাবলে ভুল হবে। আসলে গিরিগিটিকে তারা কোনোদিন ভালোভাবে খেয়াল করেনি, কোনো শিক্ষাও নেয়নি গিরগিটির কাছ থেকে।

এদের মতো ছেলেমেয়েরা নতুন রাশিয়াতে তখন উটকো লোক, অকেজো, বেকার। বেকার সমস্যা দিন দিন বাড়তে শুরু করল। একই সঙ্গে বাড়তে থাকল চুরি, ডাকাতি, ছিনতাই, লুঠ, খুন, ধর্ষণ।

ভূতপূর্ব সোভিয়েতের নাগরিকরা তখন সব থেকে কম পারিশ্রমিকের বিনিময়ে খাটতে রাজি। দুনিয়া জুড়ে ছড়িয়ে পড়ল সস্তা শ্রমিকের এই দল। পশ্চিমি দেশে ভাড়া করা গুন্ডা থেকে শুরু করে ঝাড়ুদার, রাঁধুনি, পরিচারিকা, ক্যাবারে ডান্সার, নাইট ক্লাবের 'স্ট্রিপার'—সব পদেই তখন রুশি ছেলেমেয়েদের খুব চাহিদা। নামমাত্র ডলারের বিনিময়ে তারা যে কোনো দেশে পাড়ি দিতে তখন প্রস্তুত।

ডলার আর সহজ জীবনের হাতছানিতে 'সোয়ান লেক'-এর হাঁসগুলোও একে একে উড়ে যেতে শুরু করল পশ্চিমি দেশগুলোর দিকে। পরিযায়ী পাখিদের মতো আবার ফেরার প্রতিশ্রুতি দিয়ে নয়, চলে যেতে শুরু করল চিরকালের জন্য, একেবারে।

রাশিয়া তার যোগ্য সন্তানদেরও আর ধরে রাখতে পারল না নিজের কাছে। সমাজের 'উটকো', 'অবাঞ্ছিত'দের মতো তারাও 'মা-রাশিয়া'কে ছেড়ে চড়ে যেতে লাগল। রাশিয়ার ইতিহাস যতবার মোড় ঘুরেছে ততবার তার শত শত সন্তান পাড়ি দিয়েছে অন্য মুলুকে। 'এমিগ্রেশন'-এর এই হুজুগ রাশিয়াতে তাই নতুন কিছু নয়।

মগজ, প্রতিভা, শ্রম বা নিছকই দেহ বিক্রির শর্তে রাজি হয়ে অনেকে চলে গেল ভিনদেশে। অনেকে আবার মস্কোটাকেই ভিনদেশী শহরে রূপান্তরিত করার জন্য উঠেপড়ে লেগে গেল। তবে সমাজের একটা বড়ো অংশ এই রদবদল থেকে দেশবদল—সম্পূর্ণ প্রক্রিয়ার বাইরে থাকল। মস্কোর মেট্রোর সুড়ঙ্গে, সাবওয়েতে এদের দেখা যেতে লাগল—ভিখারি হিসেবে। মস্কোতে তখন ভিখারির ছড়াছড়ি। অবসরপ্রাপ্ত অসহায় বৃদ্ধবৃদ্ধা যা পেনশন পান তাতে চলে না। সাহায্য করার মতোও কেউ নেই। ছেলেমেয়ে

বা আত্মীয়স্বজন থাকলেও তাদের নিজেদেরই চলে না, তারা আর সাহায্য করবে কী? আর কোনো পথ খোলা না পেয়ে তাই শেষে সুড়ঙ্গো বসে ভিক্ষা করতে হচ্ছে। অনেকে গির্জার সামনে গিয়েও জড়ো হলেন। পুণ্যের সন্ধানে আসা মানুষগুলো দু-চার রুবল দিয়ে যায়। একটা রুটি, একটু চা, খাবার কেনা হয়ে যায় তাতে।

শুধু পেনশনাররাই নন, সুড়ঙ্গো এসে জড়ো হলেন শিশু কোলে মা, অসুস্থ নাতিকে কাপড় জড়িয়ে পাশে শুইয়ে রেখে হাত পাতলেন দিদিমা। মস্কোর মাঝখানে, যেখানে থিয়েটার হলের ছড়াছড়ি, বাদ্যযন্ত্রীরা সেখানে বালালাইকা, চেলো, গিটার, বেহালা, স্যাক্সোফোন বাজিয়ে ভিক্ষা করতে শুরু করলেন। এককালে এঁদের যন্ত্রের মূর্ছনায় থিয়েটার হলে মোহাবিষ্টের মতো বসে থাকতেন দর্শকরা। নেপথ্যে এঁদের সুরসাধনা একেকটা শরীরী রূপ পেত। একদিন এঁরাও ছাঁটাই হলেন আর তারপর পথই একমাত্র আস্তানা। যন্ত্রগুলোকে ছাড়তে পারেননি তাই ওগুলোই আশ্রয়।

মস্কোর বিখ্যাত আরবাতে একটি শিশুকে দেখেছিলাম। আরবাতে রাস্তার উপরেই শিল্পীরা তাঁদের আঁকা ছবি, হাতে তৈরি কাঠের নানা স্যুভেনির বিক্রি করেন। ইট বাঁধানো আরবাতের লম্বা রাস্তায় কোনো গাড়ি চলে না। শুধু পায়ে হাঁটার পথ। বিদেশিরা মস্কোতে গেলে আরবাতে অতি অবশ্যই যান। সেই আরবাতে বছর ছয়েকের একটি বাচ্চা মেয়ে বেহালা বাজিয়ে ভিক্ষা চাইছিল। পাশে প্ল্যাকার্ডে রুশি আর ইংরেজিতে লেখা ছিল—'অনাথ আশ্রমের এই শিশুটি আপনার সাহায্যপ্রার্থী।'

কয়েক বছর আগেও অনাথ শিশুদের বড়ো করে তোলার দায়িত্ব ছিল রাষ্ট্রের উপর। সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রায় প্রতিটি বড়ো শহরে ছড়িয়ে থাকা 'দেত্‌স্কি দোম্' (শিশুভবন)-গুলিতে এই শিশুদের লালনপালন করত রাষ্ট্র। তারপর দিন পালটাল হাওয়ার গতিতে। সোভিয়েত ইউনিয়ন নামের রাষ্ট্রটাই আর রইল না। সোভিয়েত নিয়মকানুন, বন্দোবস্তও গায়েব হয়ে গেল। অনাথ আশ্রমগুলির জন্য যে সরকারি অনুদানের ব্যবস্থা ছিল, তা বন্ধ হল। আশ্রমের ওই হাজার হাজার অসহায় শিশুকে নিয়ে মহাভাবনায় পড়লেন সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ। পশ্চিমি দেশগুলো থেকে আসা 'মানবিক সাহায্যের' একটা অংশ এদের জন্যও বরাদ্দ হল। কিন্তু দাতা ও প্রাপকের মধ্যে থাকা এক শ্রেণির ফড়ের কারসাজিতে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সাহায্যের জিনিস ঠিক জায়গায় গিয়ে পৌঁছাত না। অগত্যা দিদিমণিদের নির্দেশে নিষ্পাপ শিশুরা বেহালা বাজিয়ে বা গান শুনিয়ে ভিক্ষা করতে শিখল। বাঁচতে তো হবে!

৯২-র এক দুপুরে আরবাতে ওই ম্লান শিশুটিকে দেখে এক মহিলার কথা মনে পড়ে গিয়েছিল। ৮৮-র মাঝামাঝি টিভিতে দেখেছিলাম মহিলাকে। মস্কোর বাসিন্দা। বছর চল্লিশের সেই মহিলা পুরোপুরি অ্যালকোহলিক। নটি সন্তানের জননী। একটি সন্তানও তার সঙ্গো থাকে না, কারণ প্রত্যেকটি সন্তানকে জন্ম দেওয়ার কয়েক ঘণ্টা পরেই সে অনাথ আশ্রমে দিয়ে দিয়েছে। সাংবাদিক প্রশ্ন করলেন, "তাহলে আপনি এতগুলো

নিষ্পাপ শিশুকে পৃথিবীতে এনেছেন কেন? কোন অধিকারে?" জড়ানো গলায় প্রচুর খিস্তি-খেউড় করে মহিলা উত্তর দিল, "সেটা আমার ব্যক্তিগত ব্যাপার। আমার কাজ বাচ্চার জন্ম দেওয়া আর রাষ্ট্রের কাজ তাদের বড়ো করে তোলা।" সোভিয়েত রাষ্ট্র এবং ব্যক্তির ভূমিকা খেয়াল করার মতো। দ্বান্দ্বিক সম্পর্ক নাকি বদহজম? অনুষ্ঠানের শেষে সাংবাদিক জানালেন, মহিলার নয় সন্তানের জনক ন-জন পুরুষ এবং সন্তানের প্রতি মহিলার দৃষ্টান্তহীন মনোভাবের শাস্তিস্বরূপ সরকার মহিলার 'রাদিতেল্‌স্কোয়ে প্রাভা' (অভিভাবকত্বের অধিকার) কেড়ে নিয়েছে।

সময়মতো সময়োপযোগী হয়ে উঠতে পারেন না যাঁরা, তাঁরা যেমন ভিখিরি হয়ে গেলেন, তেমনই আবার একদল রাস্তায় রাস্তায় বসে গেলেন হকার হয়ে। পণ্য? যার যা আছে। হ্যাঁ, তাই-ই। বাড়ির দু-চারটে পুরোনো বই, ইলেকট্রিক কেটলি, পুরোনো কাঠের আসবাবপত্র—একটা, দুটো, যাহোক। এক প্যাকেট বিস্কুট হাতে এক বৃদ্ধাকে সারাদিন দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছি। বিস্কুটের প্যাকেটটা বিক্রি হলে সেই রুবলে রুটি কিনে খাবেন। হয়তো বা কোনো ওষুধ তাঁর খুব দরকার বা এক প্যাকেট দুধ! পুরোনো এল পি বা ই পি রেকর্ড, হয়তো বাবা-মা-র আমল থেকে শখের ওই রেকর্ডগুলো বাড়িতে ছিল। ছেলে খিদের জ্বালায় সেই রেকর্ড সাজিয়ে নিয়ে বসেছে রাস্তায়।

স্ট্যাম্প অ্যালবাম হাতে এক রুশ কিশোর একদিন মস্কোর ইজমাইলোভ্‌স্কি পার্কে দাঁড়িয়েছিল। বিক্রি করতে চায়। বহু পুরোনো আর বিরল সব স্ট্যাম্প সেই অ্যালবামে। ছেলেটির জন্মের বহু আগে সেইসব স্ট্যাম্প প্রকাশিত হয়েছিল। দাম বলার সময় কিশোরের বিষণ্ণ চোখ দুটো দেখেছিলাম। তারপর সামান্য কটা রুবলের বিনিময়ে, কয়েক প্রজন্মের শখের সেই ফসল তার হাত থেকে সেদিন ছিনিয়ে নিতে পারিনি।

বড়ো বড়ো দোকানের সামনে, মেট্রো স্টেশনের কাছে এমন শত শত মস্কোবাসী লাইন করে দাঁড়িয়ে থাকত। বাড়ি থেকে যা পেত, যা বিক্রি করে দু-চার রুবল পাওয়া যেতে পারে, নিয়ে এসে বরফ, রোদ, বৃষ্টির মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকত। অনেকে আবার এক পাড়ার দোকান থেকে খাবারদাবার কিনে অন্য পাড়ায় সেটা বিক্রি করত, একটু বেশি দামে। সেই পাড়ায় হয়তো তখন সেই খাবারটা অমিল। দিশেহারা, অসহায় মানুষগুলো তখন বাঁচার একটা রাস্তা খুঁজে পেতে ব্যাকুল। যে ভাবেই হোক। মস্কো তখন বাজার হয়ে যাচ্ছে। সেই বাজার ছড়িয়ে পড়ছে গোটা শহর জুড়ে। মেট্রোর সুড়ঙ্গের ভেতরে, বাইরে, রাস্তায়—সব জায়গায় সেই বাজার। মস্কোবাসী ভাবল, একেই বুঝি খোলা বাজার, মুক্ত বাজার, উদার বাজার বলে!

অবস্থা এমন করেই চূড়ান্তে পৌঁছাল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের বীরত্ব-পদক বিকোতে লাগলেন বীরেরা। মূল্য? জীবন নয়। জীবন রাখতে কিছুটা রুটি দরকার। তার দাম ওঠে যাতে তা-ই।

৮৭-তে আমরা যখন সবে মস্কো গিয়েছি, এক সিনিয়র ভারতীয় ছাত্র একটা প্রশ্ন

করেছিল। "মস্কোর মূল তিনটে বৈশিষ্ট্য কী বলো তো?" আমরা, ক-দিনের চেনা মস্কোকে দেখে, চওড়া রাস্তা, সবুজ শহর, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, এসব বলাতে সে হেসে মাথা নেড়েছিল। বলেছিল, "এখানকার বাচ্চারা কখনো রাস্তাঘাটে চেঁচিয়ে কাঁদে না, গাড়ি কখনো হর্ন দেয় না আর রাস্তায় প্রভুহীন কুকুর ঘুরে বেড়ায় না।" আমরা অবাক হয়ে মিলিয়ে নিয়েছিলাম। সত্যিই তো! বাচ্চাদের পেট সবসময় ভরতি থাকে। শীতের মোকাবিলা করার মতো যথেষ্ট জামাকাপড় গায়ে থাকে। প্যারামবুলেটরে শুয়ে আরাম করে ঘুমিয়ে থাকে বা পিটপিট করে এদিক-ওদিক চায়। খামোখা কাঁদতে যাবে কেন? গাড়িও হর্ন দেয় না। গাড়ি চলে গাড়ির রাস্তায়। পথচারীরা হাঁটে অন্য রাস্তায়। সবাই ট্রাফিক নিয়ম মেনে চলে। অযথা হর্ন দিলে বরং জরিমানা গুনতে হয়। আর কুকুরই-বা কেন রাস্তায় ঘুরে বেড়াবে? মাইনাস কুড়ি-তিরিশের বরফে মালিকের হাতের চেন ধরে সকাল-বিকেল হাঁটতে বেরোয় সে। বাড়িতে তার গরম বিছানা, গরম খাবার ভরতি বাটি, সবই আছে।

সোভিয়েত জমানার শেষভাগে মস্কো পৌঁছেও এই ছবি আমরা দেখেছি। তারপর নতুন রাশিয়ায় সবই নতুন। রাস্তাঘাটে, দোকানে-বাচ্চাদের চ্যা ভ্যাঁ, চিল-চিৎকারে কান্না। খিদে পেয়েছে, তার ওপর বিদেশি সব ঝকমকে খেলনা দোকানে সাজানো, অথচ মা কিনে দিচ্ছে না। (রুশি বাচ্চারাও ততদিনে তাদের নিজেদের দেশে তৈরি পৃথিবীখ্যাত পুতুল, খেলনা সরিয়ে রেখে বারবি ডলের জন্য কেবলই বায়না করে।) গাড়িও হর্ন দেয় তখন। রাস্তার উপরেও বাজার বসে গেছে। লোকজন নিয়ম মানে না। ট্রাফিক আইন বলে কিছু আছে বলেই একেকসময় মনে হয় না। আর রাস্তায় বেওয়ারিশ কুকুরও ঘুরে বেড়াতে শুরু করল। মালিক নিজেই খেতে পাচ্ছে না, কুকুরকে খাওয়াবে কী! অবলা জীবটাকে তিলে তিলে মেরেও ফেলা যায় না। রাতের অন্ধকারে তাই একদিন চুপিচুপি রাস্তায় ছেড়ে দিয়ে এল। সামর্থ্য আছে, এমন কারোর চোখে পড়ে যায় যদি। দয়া করে যদি কেউ তুলে নিয়ে যায়। আমাদের হস্টেল পাড়ায় তখন প্রায়ই এমন মালিক-পরিত্যক্ত কুকুর চোখে পড়ত। মস্কোবাসী হয়তো ভাবত, বিদেশি ছাত্রছাত্রীর অনেক ডলার, অনেক খাবার। ওখানে ছেড়ে রেখে এলে কেউ তুলে নেবে। না খেতে পেয়ে মরবে না বেচারা।

অন্ধকারে, ঠান্ডা বরফে কুকুরগুলোকে ছেড়ে দিয়ে খানিক আর্থিক ভার লাঘবের চেষ্টা। কুকুরগুলো প্রভুহীন আর প্রভুরা তখন সম্বলহীন। কর্পদকহীন। তফাত শুধু এই—চারপেয়েরা রাস্তায় রাস্তায় ঘুরছে, দুপেয়েদের তখনও একটা আস্তানা আছে। এই তখন মস্কোর অবস্থা।

এদেরই পাশাপাশি গড়ে উঠল আর একটা শ্রেণি। ডামাডোলের বাজারে রাতারাতি তারা ফুলেফেঁপে উঠেছে। খোলাবাজারের দৌলতে তাদের কালো রুবল সাদা হয়ে গেল। তারপর সুযোগ বুঝে চোখের নিমেষে হল সবুজ মার্কিন ডলার। একেবারে সেই—ছিল বেড়াল হয়ে গেল রুমালের কায়দায়। প্রতি ঘণ্টায় তখন তারা বড়লোক, আরো বড়লোক

হয়ে উঠছে। মস্কোর রাস্তায় তখন বিদেশি গাড়ির ছড়াছড়ি। আমাদের ইউনিভার্সিটি চত্বরেও কত রকমের বিদেশি গাড়ি তখন! তাদের মালিক শুধু বিদেশি ছাত্ররাই নয়, রুশি পড়ুয়ারাও। ততদিনে তারাও ব্যবসায়ী হিসেবে নাম কিনেছে। আটের দশকের শেষভাগেও মস্কোর রাস্তায় সাদাসিধে পোশাকে সাধারণ যে সব রুশ যুবক-যুবতীকে দেখা যেত, তারা সব কোথায় হারিয়ে গেল। নতুন রাশিয়ার নতুন যুব প্রজন্ম তখন সাজগোজ, কায়দাকানুনে পশ্চিমিদের সঙ্গে পাল্লা দিতে ব্যস্ত।

শুধু সাজগোজেই নয়, মস্কো তখন ভোল পালটাতে এত ব্যস্ত যে, নিজেকে সঁপে দিল মাফিয়াদের হাতে। মস্কোয় পাকাপাকিভাবে প্রতিষ্ঠিত হল মাফিয়ারাজ। প্রকাশ্যে, খোলা রাস্তায়, দিনেদুপুরে লোক খুন হতে লাগল। খুব অল্প সময়ের মধ্যেই মস্কোর মাফিয়ারা নিজেদের পেশায় দক্ষ হয়ে উঠল। মস্কোবাসী তখন বলত, "ইটালির মাফিয়ারা এবার আমাদের 'দাদা'-দের কাছে ট্রেনিং নিতে আসবে।"

মস্কোর কিয়স্কে তখন রুশ পত্রপত্রিকার পাশাপাশি 'ওয়াশিংটন পোস্ট', 'টাইম', 'নিউজ উইক', 'দ্য গার্ডিয়ান', 'দ্য ইকোনমিস্ট' ইত্যাদি পশ্চিমি পত্রপত্রিকাও নিয়মিত বিক্রি হত। মস্কোর দুর্বিসহ জীবনযাত্রা, হতভাগ্য মস্কোবাসীর কথা ইত্যাদি বিষয়ে এইসব পত্রিকাগুলিতে প্রায়ই লেখা বেরোত। আরো থাকত, পশ্চিমি 'পণ্ডিত'দের অমোঘ সব সিদ্ধান্ত— "এত দুর্দশার জন্য দায়ী নিঃসন্দেহে কমিউনিজম। যে ভুল পথে সোভিয়েত ইউনিয়ন সত্তর বছরেরও বেশি সময় ধরে হেঁটেছে তার মাশুল আজও শুনছে সেখানকার মানুষ ইত্যাদি, ইত্যাদি।" রুশিরা সেসব পড়ত আর ভাবত, সত্যিই তো, আমাদের কথা কত চিন্তা করে ওরা। আমাদের দুঃখের কারণ কত সঠিকভাবে বিশ্লেষণ করতে পারে ওরা। আমরা এতদিন নিজেদের একেবারেই বুঝতে পারিনি। ওদের এমন বিশ্লেষণাত্মক আলোচনার কল্যাণে এতদিনে ঠিকঠাক নিজেদের চিনতে পারছি!

অথচ এই রুশিরাও ক-দিন আগে মার্কিনিদের জানার বহর নিয়ে কত হাসাহাসিই না করত! একটি সমীক্ষাতে দেখা গিয়েছিল, অধিকাংশ মার্কিনি মনে করে রাশিয়া আর সাইবেরিয়া সমার্থক। একই দেশের দুটি ভিন্ন নাম। রাশিয়া মানেই শ্বেতভালুকের দেশ। রাশিয়ার শহরে রাস্তাঘাটে দিনেদুপুরেও ভালুক ঘুরে বেড়ায় বলে তাদের বিশ্বাস। আর রুশিরা যেন গ্রহান্তরের জীব। বড়ো অদ্ভুত তাদের চালচলন, রকমসকম। সেই মার্কিনিরাই রাশিয়া সম্পর্কে একের পর এক তত্ত্ব উগরাতে শুরু করল। খোদ রুশিরা সেই তত্ত্ব গিলতে লাগল অবলীলায়।

পশ্চিমি ওই পত্রপত্রিকায় ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা মস্কো সংক্রান্ত বিভিন্ন লেখার মধ্যে একটা নিবন্ধের কথা আমার এখনও মনে আছে। 'নিউজউইক'-এর একটি সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল সেটি। শ-পাঁচেক শব্দের ছোটো লেখা। বিষয়—মস্কোয় কুকুরের মাংস বিক্রি হচ্ছে। প্রকাশ্যে। রুশিরা ক্ষুধার্ত। মাংস নেই। খাবার নেই। অগত্যা কুকুরের মাংস বিক্রি হচ্ছে এবং রুশিরা জেনেবুঝে সোৎসাহে তা কিনছে। নিবন্ধটির শেষে লেখক

লিখেছেন, "আমি নিজে কুকুরের মাংস কিনে খাইনি। তাই আপনাদের জানাতে পারলাম না কেমন খেতে।"

মস্কোর খোলাবাজারে তখন সত্যিই মাংস বিক্রি হত। তবে কোনো বাজারে কুকুরের মাংস বিক্রি হয়েছে আর লোকে তা হইহই করে কিনেছে, এমনটা আমি অন্তত শুনিনি। নিবন্ধে এই তথ্যটি পরিবেশনের উদ্দেশ্য ছিল গৌণ। মুখ্য উদ্দেশ্য (আমার পড়ে তা-ই মনে হয়েছিল)—'রুশিরা তো ঠিক মনুষ্যপদবাচ্য নয়। তারা কুকুরের মাংস খাবে, সেটা অত্যন্ত স্বাভাবিক। অন্যরকম হলেই আশ্চর্যের মনে হত। আমরা (মার্কিনিরা) এখন ওদের দিকে একটু নজর দিয়েছি। এতদিনে যদি ধীরে ধীরে ওদের একটু সভ্য করা যায়!'

আমার এমনটা মনে হলেও, রুশি ছেলে দিমা অবশ্য ব্যাপারটা খুব সহজভাবে নিয়েছিল। ম্যাগাজিনটা ওকে দেখালাম। নিবন্ধটা পড়ে দিমা বলল, "হতেই পারে। নাহলে আর লিখেছে কেন। এখন তো যার যা খুশি করছে। কুকুর আর কী এমন, কিছুদিন পর হয়তো দেখবি মানুষের মাংসই বিক্রি হচ্ছে।" এরপর দিমা মার্কিনি তথা পশ্চিমি প্রচার মাধ্যমগুলির কর্মকুশলতা, উন্নত প্রযুক্তি এবং ওদের সাংবাদিকের 'পারফেকশন'-এর প্রশস্তিতে পঞ্চমুখ হয়ে উঠল।

মস্কোতে বসে তখন বিবিসি আর সিএনএন-এর অনুষ্ঠান দেখা যেত। বিবিসি-র সংবাদ রুশ তর্জমাসহ সকালে আর সন্ধ্যাতে দেখানো হত। 'আস্‌তান্‌কিনো' (সোভিয়েত টেলিভিশন)-তেও ততদিনে খোলা হাওয়ার ঝাপটা লেগেছে। নামও পালটালো, তবে আংশিক। দ্বিতীয় চ্যানেলের নাম হল 'রাসিস্কোয়ে তেলেভিদেনিয়ে' (রাশিয়ান টেলিভিশন)। সিএনএন-এর অনুষ্ঠান দেখার জন্য বিশেষ অ্যান্টেনার দরকার হত। তবে বিবিসি-র 'ওয়ার্ল্ড সার্ভিস' ছিল সকলের জন্য, 'আস্‌তান্‌কিনো' থেকেই তা দেখানো হত। রুশিরা বিবিসি-র ক্যামেরা দিয়ে রাশিয়াকে, রাশিয়ার সমস্যাকে চেনার সুযোগ পেল।

বিবিসি-র খবরে একদিন এক বিশাল আঁস্তাকুড় দেখানো হল। মস্কো শহরের সব আবর্জনা সেখানে জড়ো করা হয়। আমাদের ধাপার মতো। সেই আঁস্তাকুড়ে খাবার খুঁটে বার করছেন জীর্ণ বেশে কয়েকজন রুশ বৃদ্ধবৃদ্ধা। শকুন আর কুকুর তাদের নতুন ভাগীদারদের মেনে নিতে পারছে না। মাঝেমধ্যে দু-দলে হুটোপাটিও লেগে যাচ্ছে। বিবিসি আরো জানাল, ওই বৃদ্ধবৃদ্ধারা মাসে সাকুল্যে ১৫ হাজার রুবল পেনশন পান। (৯৩-এর মাঝামাঝির মস্কোতে ডলার-রুবলের হিসেব অনুসারে ১২ মার্কিন ডলার। ভারতীয় টাকার অঙ্কে ৩৫০ টাকার কিছু বেশি।) ওতে মাস চালানো অসম্ভব। (শীতের দেশে বেঁচে থাকার খরচ গরম দেশের তুলনায় যে বেশি, তা বলাই বাহুল্য)। অতএব বৃদ্ধবৃদ্ধারা আঁস্তাকুড়ে এক টুকরো রুটি, ফেলে দেওয়া বাঁধাকপির পাতা, পচা আলুর টুকরো খুঁজে বেড়াচ্ছেন। মস্কোবাসী দেখল বিবিসি-র সেই রিপোর্টাজ। আমাদের এক প্রফেসর বললেন, সব বিবিসি-র কারসাজি। কয়েকজন দীনহীন বুড়োবুড়িকে অল্প ক-টা ডলার হাতে গুঁজে দিয়ে ওই আঁস্তাকুড়ের কাছে ছেড়ে দিয়েছে। তারপর নিজেদের পছন্দমতো, সুবিধামতো

ছবি তুলেছে।

বিদেশি গণমাধ্যমগুলি তখন পাল্লা দিয়ে সারা দুনিয়াকে রাশিয়ার দুর্গতি দেখাতে ব্যস্ত। সঙ্গে সঙ্গে এটাও তারা সবসময় দেখাতে চায়, রাশিয়ার বর্তমান অবস্থার জন্য তার সমাজতান্ত্রিক অতীতই দায়ী। বিদেশিদের সেই হাইটেক সক্রিয়তার পাশাপাশি রাশিয়ার নিজস্ব টিভিও একটা পথ খুঁজে বের করল। সে পথে তারা হাঁটতে শুরু করেছিল কিছুদিন আগে থেকেই। সেই ৮৯ সাল নাগাদ। টিভিতে চালু হল সাপ্তাহিক 'আরোগ্য অধিবেশন'। পরিচালনা করতেন এক স্বঘোষিত মনস্তত্ত্ববিদ। নাম—আনাতোলি কাশ্‌পিরোভ্‌স্কি। বছর পঁয়তাল্লিশের অতি সাধারণ চেহারার রুশ ভদ্রলোক। চুল খুব ছোটো করে ছাঁটা। চোখের দৃষ্টি অদ্ভুত স্থির, যেন 'অরণ্যদেব' কমিকসের সেই দানবাকার 'হিজ-জ-জ'-এর মতো। তাঁর সেই 'আরোগ্য অধিবেশনে' যোগ দেওয়ার জন্য টিভি স্টুডিওতে প্রায় শ-খানেক সাধারণ মানুষকে আমন্ত্রণ জানানো হত। এদের মধ্যে থাকতেন দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত অনেকে। অনেক ডাক্তার দেখিয়েছেন, বহু ওষুধ খেয়েছেন, কিছুতেই কিছু হচ্ছে না। সে বাতের ব্যথা থেকে শুরু করে যে কোনো ধরনের জটিল অসুখ হতে পারে। (তবে এইডস আক্রান্ত কোনো রোগী এই অধিবেশনে গিয়েছিলেন কিনা, আমার জানা নেই।) কাশ্‌পিরোভস্কি তাঁর অধিবেশনে এদের সারিয়ে তুলবেন। কোনো ওষুধ লাগবে না। মৃদু আবহসংগীত আর কাশ্‌পিরোভ্‌স্কির মোলায়েম বাক্য ওই রোগীদের সম্মোহিত করে দেবে। একেবারে 'গণ সম্মোহন'!

স্টুডিওর ফ্লোরে আমন্ত্রিত রোগীদের দিকে তাকিয়ে, সাপুড়ের মাথা নাড়িয়ে বাঁশি বাজানোর কায়দায়, দু-হাতে ঢেউ তোলার ভঙ্গি করে তাদের সম্মোহন করতেন ভদ্রলোক। এতে নাকি আমন্ত্রিতদের যাবতীয় রোগ সারবে। ক্যামেরা ঘুরে যেত। টিভির পরদা জুড়ে তখন কাশ্‌পিরোভ্‌স্কির ক্লোজ আপ। একই কায়দায় মাথা নাড়া। সেই মুহূর্তে যারা যারা টিভি দেখছেন, তারাও নাকি তাতে সম্মোহিত হয়ে পড়বেন। (টিভির ক্যামেরাম্যান ও অপারেটররা সম্মোহনের আওতার বাইরে থাকতেন কী করে, সেটা একটা রহস্য!) আরোগ্যের আশায় স্টুডিওতে হাজির সকলে সম্মোহিত হয়ে পড়তেন। কেমন যেন বুঁদ হওয়া ভাব। টিভি দর্শকরাও কেউ কেউ হতেন বলে শুনেছি, কাউকে চোখে দেখিনি। (সম্মোহিত হওয়ার জন্য হয়তো নির্দিষ্ট কিছু 'ক্রাইটেরিয়া' দরকার, যা আমার নিজের বা আমার পরিচিত কারোর ছিল না।) তো, সেই সম্মোহন পর্বের পরে স্টুডিওতে উপস্থিত সকলে আবার ধীরে ধীরে জেগে উঠতেন। জেগে উঠে দেখতেন তাদের সেই যন্ত্রণাদায়ক, নাছোড় অসুখগুলো সেরে গেছে। একেবারে সুস্থ হয়ে যেতেন তারা। বাতের ব্যথায় বেঁকে যাওয়া পায়ের মহিলা গটগট করে হেঁটে দেখাতেন, তিনি পুরোপুরি সুস্থ। চোখের দৃষ্টি ক্ষীণ হতে হতে প্রায় অন্ধ হয়ে আসা বৃদ্ধ সম্মোহন পর্বের পর চিৎকার করে বলতেন, "আমি আবার দেখতে পাচ্ছি। স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি সবকিছু।" কাশপিরোভ্‌স্কির দিকে আকুল হয়ে ছুটে যেতেন সকলে। বলতেন, "স্পাসিবা, স্পাসিবা"

(ধন্যবাদ, ধন্যবাদ)। সম্মোহক খুব নির্বিকার মুখ করে থাকতেন। যেন এ আর এমন কী! আরো কত ম্যাজিক আছে আমার ঝুলিতে!

রাশিয়াবাসী সোস্যালিজমের হাত থেকে রক্ষা পেতে এভাবেই ইভানজেলিজমকে ডেকে আনল। কাশ্‌পিরোভস্কির মতো একদিন রজনীশকেও দেখা গেল টিভির পরদায়। একই কায়দায় ভগবান, মুক্তি, সম্মোহন, ধ্যান ইত্যাদি বিষয়ে খানিকক্ষণ লেকচার ঝাড়লেন।

আসলে রুশিরা তখন পালাতে চায়। ভয়ংকর বাস্তব থেকে, অতল হতাশা আর বিভ্রান্তি থেকে পালাতে চায়। ঠিক এরকম সময়েই 'গণসম্মোহনের' ফর্মুলা নিয়ে আসরে নেমে পড়লেন 'ধার্মিক'রা। বাজিমাতও করলেন। খিদে পাওয়ার থেকে তো সম্মোহিত হওয়া ভালো।

"রুশিদের সমস্ত বিপর্যয়ের মূলে প্রথমত, কমিউনিস্টরা। দ্বিতীয়ত, গর্বাচভ। তৃতীয়ত, পশ্চিম-ঘেঁষা ইয়েলৎসিন। অতএব বাঁচার একমাত্র পথ অতীতের হৃতগৌরব ফিরিয়ে আনা। রুশ জাতিসত্তাকে আবার জাগিয়ে তোলা।" রাশিয়াকে এই 'বাণী' শোনালেন উগ্র জাতীয়তাবাদী লিবারেল ডেমোক্রাটিক পার্টির হঠাৎ-হয়ে-ওঠা নেতা ভ্লাদিমির ভোল্‌ফিভিচ ঝিরিনোভ্‌স্কি। এই ঝিরিনোভ্‌স্কি আবার কাশপিরোভ্‌স্কির চেলা। ঝিরিনোভ্‌স্কিকে ভাষণ দেওয়ার কৌশল শিখিয়েছেন কাশ্‌পিরোভ্‌স্কি। শিখিয়েছেন জনসাধারণকে মন্ত্রমুগ্ধ করার পদ্ধতি। সেই শিক্ষাকে সম্বল করে রুশ ভাবাবেগ ও অহমিকার সঙ্গে তাল মেলাতে শুরু করলেন ঝিরিনোভ্‌স্কি। 'মা রাশিয়া' ও তাঁর অবসাদগ্রস্ত সন্তানদের হঠাৎ জাগাতে 'রুশ মতাদর্শের' (রাশিয়ান আইডিয়া) কথা শোনালেন তিনি। বললেন, 'আধ্যাত্মিক একনায়কত্ব, রুশ অহমিকাবোধ এবং বিদেশি প্রভাবমুক্ত বৃহত্তর রুশ জাতিচেতনাই তাঁর কাঙ্ক্ষিত রুশ সাম্রাজ্যের আদর্শ। জার আমলের একনায়কতন্ত্রের গুণগান গাইতে শুরু করলেন তিনি। সদর্পে ঘোষণা করলেন, তাঁর আদর্শের নাম হিটলার।

চারিদিকে অস্থিরতা, অভাব, অশান্তি রুশ জনমানসে যে শূন্যতা সৃষ্টি করল তা পূরণ করার জন্য সকলেই তখন ব্যস্ত। যে যার মতো করে ভরতে চাইছে সেই ফাঁক। সব হারানো, নিঃস্ব রিক্ত মানুষগুলোকে উগ্র জাতীয়তাবাদী নেশাতে আসক্ত করাও তাই সহজ হল। সেই চেতনারও গোড়ার কথা—'তোমাদের আজকের দুরবস্থা, অভাবের জন্য দায়ী কিন্তু কমিউনিস্টরা। একথা কিছুতেই ভুলো না।'

মার্কস, লেনিন তখন অপসৃত। আর এক ফাঁক দিয়ে আসরে তখন আবির্ভূত আল্লা, ভগবান, যিশুরা। তাদের জন্য ক্ষেত্র প্রস্তুতের কাজ শুরু হয়েছিল বছর কয়েক আগেই।

১৯৮৮ সালের ৪ জুন মস্কোতে এক মহা আড়ম্বরপূর্ণ অনুষ্ঠান শুরু হল। উপলক্ষ—রাশিয়ার খ্রিস্টধর্ম গ্রহণের এক হাজার বছর পূর্তি। ৯৮৮ সালে কিয়েভের রাজা ভ্লাদিমির দ্‌নিপার নদীর তীরে জনসাধারণকে ব্যাপটাইজ করার নির্দেশ দেন। প্রাচীন 'রুস্‌' সাম্রাজ্যে এটি ছিল একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। পশ্চিমি স্লাভিক জাতিগুলি এর ফলে ঐক্যবদ্ধ হল। রুশি, ইউক্রেনিয় ও বেলারুশীয়দের পূর্বসূরি হচ্ছে এই পশ্চিমি স্লাভিকরা। এর এক হাজার বছর

পরে, ১৯৮৮-তে, মস্কোতে মহা ধুমধাম করে সেই ঘটনাটিকে স্মরণ করা হল। রাশিয়ান চার্চের এক হাজার বছর পূর্তি উপলক্ষে মেতে উঠল সমাজতান্ত্রিক (তখনও) রাশিয়া। অর্থাৎ, ধর্মাচারকে সরকারি স্বীকৃতি দেওয়া হল। স্বীকৃতি দিল খোদ সোভিয়েত সরকার।

সোভিয়েত প্রেসিডেন্ট গর্বাচভ সস্ত্রীক ভ্যাটিকানে গিয়ে পোপের সঙ্গে দেখা করলেন। সোভিয়েত ইউনিয়নে চার্চ তখন সক্রিয়। সোভিয়েত ভেঙে যাওয়ার পর চার্চের সেই সক্রিয়তা অব্যাহত থাকল, বরং আরো বাড়ল।

ভিড় বাড়ল মসজিদেও। মস্কোর 'প্রসপেক্ত মিরা'-তে একটি দোতলা মসজিদ আছে। একতলায় মহিলারা নামাজ পড়ে, দোতলায় পুরুষরা। ৯২-এর মাঝামাঝি এক দুপুরে নামাজের সময় সেখানে বেশ ভিড় দেখেছি। প্রার্থনাকারীদের মধ্যে নানা বয়সের লোকজন ছিল।

ইসকন-ও হইহই করে ব্যবসা শুরু করে দিল। গীতা, উপনিষদের রুশ অনুবাদ তখন রাস্তাঘাটে, মেট্রো স্টেশনের সুড়ঙ্গে বিক্রি হত। ৯২-এর গরমকালে ইসকন-ভক্ত পপগায়ক বয় জর্জের এক বিরাট সংগীতানুষ্ঠান হল। মস্কোর অলিম্পিক স্টেডিয়ামে। প্রায় ঘন্টা দুয়েক ধরে গেরুয়াধারীরা 'হরিনাম' জপ করল। তাদের সঙ্গে গলা মেলাল মস্কোর যুবক-যুবতীরা। তারপর মঞ্চে এলেন বয় জর্জ। মুণ্ডিত মস্তক। ক্যালেন্ডারে কৃষ্ণের যেমন ছবি দেখা যায়, মুখের চেহারা হুবহু সেরকম। তিনিও উপস্থিত সকলকে, 'হরে কৃষ্ণ হরে রাম' ধ্বনি তুলে, ভক্তিতে উদ্বেল করে তুললেন। তারপর শুরু হল গোটা স্টেডিয়াম জুড়ে উদ্দাম নৃত্য। মনে হচ্ছিল, গোটা মস্কো যেন সেদিন উন্মাদ হয়ে উঠেছে। গেরুয়া শাড়ি পরা শয়ে শয়ে রুশি যুবতী দু-হাত তুলে পাগলের মতো নাচছিল। রুশ যুবকরা হরিনামের তালে তালে সম্মোহিতের মতো দুলছিল। সেই হাজার হাজার মানুষের 'হরে কৃষ্ণ হরে রাম' ধ্বনিতে একেবারে ঢেকে গেল ইন্টারন্যাশনালের সুর। অনুষ্ঠান শেষে প্রসাদের ব্যবস্থাও ছিল। হস্টেলে ফেরার সময় মেট্রোতেও দেখলাম গেরুয়াধারী রুশি যুবক-যুবতীর ভিড়। কেউ আবার খালি পায়ে, ধুলো গায়ে। ভক্তির আতিশয্যে মস্কো যেন সেদিন অচেনা কোনো এক শহর।

তার কিছুদিন পরেই মস্কোর নানা জায়গায় পোস্টার পড়ল। পোস্টারে শাড়ি পরা, বড়ো টিপ কপালে, খোলাচুলের এক মহিলার ছবি। নিচে লেখা—'মা নির্মলা। সহজ যোগ।' যোগসাধনার মাধ্যমে মানসিক শান্তির রাস্তা বাতলানোর দায়িত্ব নিলেন মা নির্মলা।

রুশি তরুণ-তরুণীরা তখন যোগ, মেডিটেশন, ইসকন, চার্চ, মসজিদ, প্রার্থনা, ভক্তি, সিনাগগ, জ্যোতিষচর্চা, সম্মোহন—সব নিয়ে মত্ত হতে চায়।

মহম্মদ মহসীন খুবই দরিদ্র পরিবারে জন্মেছিলেন। খিদেতে আর পাঁচটা বাচ্চার মতো তিনিও কান্নাকাটি করতেন। মা উনুনে হাঁড়ি চপিয়ে দিতেন। তাতে শুধু জল ফুটত। সেই শব্দ শুনিয়ে মহসীনকে মা বলতেন, "বাছা ঘুমো, ওই ভাত ফুটছে। রান্না হয়ে গেলেই ডেকে খেতে দেব।" ভাত ফুটত না। ক্ষুধার্ত মহসীন ঘুমিয়ে পড়তেন। শুধু জলে ভাত হয় না। তাতে চাল চাই। যোগে, ভক্তিতে, ধ্যানে সম্মোহনে স্থিতি আসে না। তার জন্য

নীতি চাই। মানুষের দর্শন দরকার। ভাঙা সোভিয়েত মানুষের নীতি-দর্শন বলে কিছু ছিল না। অভুক্ত মন থিতু হয় না। বড়োজোর সম্মোহিত হতে পারে।

মস্কোতে দুর্গাপুজোও চালু হয়ে গেল। কলকাতা থেকে শোলার ঠাকুর, পুরুত, পুজোর যাবতীয় সামগ্রী নিয়ে যাওয়া হল। মস্কোর সব বাঙালি—ব্যবসায়ী, ছাত্রছাত্রী, দূতাবাসের কর্মীরা উদ্যোগী হলেন। ধুনুচি নাচ থেকে শুরু করে অষ্টমীর ভোগ রান্না, একসঙ্গো খাওয়াদাওয়া সবই হল। অন্য সব জায়গায় প্রবাসী বাঙালিরা পুজোর দিনগুলোতে যেমন 'গেট-টুগেদার' ধাঁচের অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন, সেইরকমই।

সোভিয়েত জমানায় সিপিএসইউ-এর জেনারেল সেক্রেটারি বা দেশের প্রেসিডেন্টের টেলিভিশনে ভাষণ দেওয়ার কথা থাকলে, বরাদ্দ সময়ে সবকটি চ্যানেলে ওই ভাষণ প্রচারিত হত। ওই সময়ে ভাষণের বদলে কারোর অন্য অনুষ্ঠান দেখার ইচ্ছা হলেও উপায় ছিল না। সেই ট্র্যাডিশন রয়ে গেল নতুন রাশিয়াতেও। তবে ভাষণের পরিবর্তে ধর্মীয় অনুষ্ঠান। যিশুর জন্মদিন বা গুড ফ্রাইডে উপলক্ষে টিভির সবকটি চ্যানেলে সারা সন্ধ্যা ধরে দেখানো হত বিভিন্ন চার্চের প্রার্থনাসভা। সংবাদে প্রেসিডেন্ট ইয়েলৎসিনের চার্চে গিয়ে মোমবাতি জ্বালিয়ে গদগদ মুখে প্রার্থনার দৃশ্য দেখানো হত।

অভিভাবকহীন, ছন্নছাড়া, উচ্ছৃঙ্খল আর অভাবী কোনো সংসারের যে হাল হয়, মস্কো দিন দিন সেরকম হয়ে যাচ্ছে তখন।

শীতকালে আগে নিয়ম করে রাস্তায় জমে থাকা বরফ পরিষ্কার করা হত। বরফ সাফাইয়ের বিশেষ গাড়ি তো ছিলই। তা ছাড়াও কিছু কর্মী বেলচা দিয়ে বরফ ভেঙে ভেঙে রাস্তার ধারে সরিয়ে রাখতেন। গাড়ি ও পথচারীদের চলার রাস্তা করে দিতেন। সে সব বন্ধ হল। বেলচা হাতে কর্মীরা কোথায় যেন উধাও হয়ে গেলেন। অনেকে বলল, গায়ে প্রচুর শক্তি থাকলে তবেই ওই কঠিন বরফ ভাঙা যায়। আগে ওরা খেতে পেত, শক্তিও ছিল। এখন দু-বেলার জায়গায় একবেলাও ঠিকমতো খাবার জোটে না। বেলচাটা শক্ত করে ধরার শক্তিই আর নেই ওদের। বরফ সাফাইয়ের গাড়ি কখনো-সখনো আসত। তবে নিয়মিত নয়। দীর্ঘ শীতকালে রাস্তাঘাট পিছল আর বিপজ্জনক হয়ে উঠল। বরফে পিছলে পড়ে হাত-পা ভাঙার খবর প্রায়ই তখন শুনতে পেতাম।

আমার বন্ধু, তানজানিয়ার মেয়ে ফাইকা তার কয়েকদিন আগেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে বেড়িয়ে এসেছে। বরফঢাকা পিছল রাস্তায় দুজনে ভয়ে ভয়ে হাত ধরাধরি করে ইউনিভার্সিটির দিকে চলেছি। ফাইকা বলল, "রুশিরা মার্লবোরো ঠোঁটে আর মার্কিনি কায়দাকানুন রপ্ত করে যতই ওদের মতো হতে চেষ্টা করুক না কেন, মূলেই ফারাক। আমেরিকায় পথ চলতে গিয়ে কারোর বাড়ির সামনে যদি কেউ পা পিছলে পড়ে যায়, তাহলে বাড়ির মালিকের শাস্তি হয়। নিজের বাড়ির সামনে জমে থাকা বরফ কেন ঠিকমতো পরিষ্কার করাননি তিনি, এই অপরাধে। হাত-পা ভাঙলে চিকিৎসার পুরো খরচ বহন করেন ওই বাড়ির মালিক। তাছাড়া ক্ষতিপূরণ দাবি করে মামলাও করা যায়।"

মস্কোর বাসস্ট্যান্ডের শেডগুলো ছিল কাচের। ছাদটা সিমেন্টের, তিনদিকে কাচের দেওয়াল। জনজীবনের অস্থিরতার ধাক্কা লাগল সেই দেওয়ালেও। প্রায় কোনো শেডেই আস্ত কাচের দেওয়াল আর রইল না। হয় ভাঙা কাচের টুকরো ছড়িয়েছিটিয়ে থাকত বাসস্ট্যান্ডের চারপাশে, নাহলে গোটা কাচটাই গায়েব হয়ে যেত। মাইনাস পনেরো কুড়ির শনশনে হিমেল হাওয়া সেই ফাঁকা বাসস্ট্যান্ডের চারপাশ থেকে হু হু করে একেবারে হাড়ে এসে বিঁধত। ততদিনে যানবাহন ব্যবস্থাও ভেঙে পড়েছে। জ্বালানির অভাবে বাসের সংখ্যা ভীষণ কমে গেল। ৩০-৪৫ মিনিট ওই কনকনে ঠান্ডার মধ্যে অপেক্ষা করার পর হয়তো বাস আসত। তবে তাতে এমন ভিড় হত যে, স্লাইডিং দরজা অনেক সময় বন্ধ হত না। সোভিয়েত জমানায় বাসের টিকিটের দাম ছিল ৫ কোপেক। আমার চোখের সামনেই তা বেড়ে প্রথমে ৫০ কোপেক থেকে পরে এক রুবলে গিয়ে দাঁড়াল। ২০ গুণ ভাড়া বাড়ল। কিন্তু ভিড় ও অনিয়মিত চলাচলের জন্য জন-যানবাহন (পাবলিক ট্রান্সপোর্ট)-গুলির অবস্থা তখন শোচনীয়।

মেট্রোরেলের সুবন্দোবস্ত ও দ্রুতগামিতা নিয়ে মস্কোবাসী রীতিমতো গর্ববোধ করত। সে গর্বও রইল না। প্রতি এক মিনিট অন্তর ট্রেন আসত। দেশের প্রতিটি ক্ষেত্রের মতো মেট্রোরেলের চলাচলের পথেও অব্যবস্থা স্পষ্ট হয়ে উঠল। এক মিনিটের জায়গায় ট্রেন আসতে একেক সময় পাঁচ মিনিটও দেরি হত। তাছাড়া সুড়ঙ্গের মাঝখানে যান্ত্রিক গোলযোগের কারণে হঠাৎ ট্রেন দাঁড়িয়ে পড়ত। যাত্রীদের পক্ষে সে এক দমবন্ধ করা অভিজ্ঞতা। এই যান্ত্রিক গোলযোগের ফলে একেক সময় ট্রেনের ভেতরের আলোও নিভে যেত।

রাশিয়া যেন তখন তার সন্তানদের সহনশীলতা আর ধৈর্যের পরীক্ষা নিচ্ছে।

রুশিদের সঙ্গে আমরা বিদেশি ছাত্রছাত্রীরাও তখন সেই পরীক্ষা দিয়ে চলেছি। এরই মাঝে ৯২-এর গরমের ছুটির মধ্যে এক ভয়ংকর কাণ্ড ঘটল। আমাদের ইউনিভার্সিটি পাড়াতেই। ইউনিভার্সিটির উলটোদিকে পোস্ট অফিসের লাগোয়া একটা ছোটো মাঠ ছিল। প্রত্যেক বছর গরমের সময় সেখানে বিয়ার বিক্রি হত। কয়েকটা কাঠের বেঞ্চও ছিল সেখানে।

সেদিনও বিকেলবেলা বেশ কয়েকজন ছাত্র ওই বেঞ্চে বসে বিয়ার খাচ্ছিল। একজন রুশি ছাত্র একটা বিরাট কুকুর নিয়ে এল সেসময়। পড়াশোনার সঙ্গে পুলিশে চাকরিও করত ছেলেটি। তখনও তার গায়ে উর্দি চাপানো ছিল। বেঞ্চের ধারে বসেছিল এক আফ্রিকান ছাত্র। কুকুরটা বারবার তার গায়ের উপর গিয়ে উঠছিল। সে সরাতে বলল কুকুরটাকে। মালিক গেল খেপে। দুজনের বচসা শুরু হল। হঠাৎ রুশি ছেলেটি খাপ থেকে রিভলবার টেনে বের করল। আফ্রিকান ছেলেটির গলায় ঠেকিয়ে ট্রিগার টিপে দিল। কেউ বুঝে ওঠার আগেই মাটিতে লুটিয়ে পড়ল ছেলেটি। যে ছেলেটা কিছুক্ষণ আগে বন্ধুদের সঙ্গে বসে হইহই করছিল, বিয়ার খাচ্ছিল, সে তখন প্রাণহীন। তার নিথর দেহটা পড়ে

আছে মাটিতে। হত এবং হত্যাকারী দুজনেই পিপলস্ ফ্রেন্ডশিপ ইউনিভার্সিটির ছাত্র।

মুহূর্তের মধ্যে হু-হু করে খবরটা ছড়িয়ে পড়ল। বিদেশি ছাত্রছাত্রীরা স্তম্ভিত হয়ে গেল। আমাদের নিরাপত্তার আজ তাহলে এই দশা! খোদ পুলিশের হাতে, যে আবার আমাদের ইউনিভার্সিটিরই ছাত্র, অকারণেই খুন হয়ে গেল নির্দোষ এক বিদেশি ছাত্র। বাইরে কোথাও নয়, একেবারে হস্টেল-পাড়াতেই! জানা গেল, নিহত ছাত্রটির স্ত্রী হাসপাতালে। অন্তঃসত্ত্বা সে।

এর কয়েক ঘন্টা পরে 'উলিৎসা মিক্‌লুখা মাক্‌লায়া' (আমাদের হস্টেল-পাড়ার রাস্তাটার নাম) জুড়ে বেরোল আফ্রিকার ছাত্রছাত্রীর বিক্ষোভ মিছিল। ক্রুদ্ধ, ক্ষুব্ধ সেই ছেলেমেয়ের মিছিলে যোগ দিল অন্যান্য বিদেশি ছাত্রছাত্রীও। ক্ষিপ্ত হয়ে তারা দোকানের কাচ ভাঙল, হস্টেলের দরজা ভাঙল, চলন্ত বাসে ইট ছুঁড়ল। তাদের সামাল দেওয়ার জন্য কয়েক ট্রাক ভরতি পুলিশ নামানো হল। জলকামান ব্যবহার করা হল। কয়েকজনকে গ্রেপ্তারও করা হল। গোটা 'মিক্‌লুখা মাক্‌লায়া' সেদিন ফুঁসছিল। আমাদের ইউনিভার্সিটি চত্বরে 'গণমৈত্রী' শব্দটা সেদিন সবথেকে বড়ো উপহাস বলে মনে হচ্ছিল।

এই ঘটনা বিদেশি ছাত্রছাত্রীকে বিরাট ধাক্কা ছিল। তাদের নিরাপত্তার অভাবটা হঠাৎ যেন তীব্র হয়ে উঠল। অনেক প্রতিষ্ঠিত বিদেশি ব্যবসাদার ছাত্র মস্কো থেকে পাততাড়ি গুটাল। ডলার, ফ্ল্যাট, গাড়ি নিয়ে কী হবে, যদি প্রাণটা যে কোনো মুহূর্তে, একেবারে অকারণে হারাতে হয়!

সেই বিষণ্ণ দিনগুলোর একদিন বাসের জানলা দিয়ে একটা দেওয়াল লিখন চোখে পড়ল। আমাদের হস্টেল থেকে সবথেকে কাছের মেট্রো স্টেশন 'ইয়ুগো-জাপাদনায়া' যাওয়ার পথে। বড়ো বড়ো কালো হরফে বুরুশিতে লেখা—'দালোয় সাৎসিয়ালিজম, সাৎসিয়ালিজম—এতা আদ্‌না ফর্মা ফাশিজ্‌মা' (সমাজতন্ত্র নিপাত যাক, সমাজতন্ত্র—এটা ফ্যাসিবাদের একটি রূপ)। এর আগে মস্কোতে এধরনের দেওয়াল লিখন কখনো চোখে পড়েনি। এমনকী সমাজতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রী সোভিয়েতকে সরকারিভাবে নাকচ করার সময়েও নয়। এতদিন পরে হঠাৎ আবার দেওয়ালে লিখে কেন সোচ্চারে সমাজতন্ত্রকে বিদায় জানানোর চেষ্টা? তাহলে কি 'সরকারি বিদায়পর্ব' যথেষ্ট নয়?

ওই দেওয়াল লিখনের লেখকের মতোই, সমাজতন্ত্রী তথা কমিউনিস্টদের ফের নড়েচড়ে বসার খবর পেল রাশিয়ার সরকারও। যে সরকারের কর্তা ইয়েলৎসিন তার কিছুদিন আগেই রাশিয়াতে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছেন কমিউনিস্ট পার্টিকে। সেই নিষিদ্ধ পার্টির নাছোড় কিছু সদস্য মে দিবস বা নভেম্বর বিপ্লবের বর্ষপূর্তি উপলক্ষে বেরিয়ে পড়লেন পথে। তাঁদের অধিকাংশেরই জন্ম স্তালিনের জমানার প্রথমভাগে। কোনো লাভের আশায় বা স্বার্থসিদ্ধির জন্য তাঁরা সিপিএসইউ-এর সদস্যপদ গ্রহণ করেননি। কমিউনিজম ছিল তাঁদের বিশ্বাস, স্বপ্ন, জীবনযাপনের অঙ্গ। একের জায়গায় দশজন ইয়েলৎসিনের কোনো হুমকি তাঁদের সেই বিশ্বাসকে কেড়ে নিতে পারেনি। লেনিনের, স্তালিনের

ছবিওয়ালা প্ল্যাকার্ড হাতে দৃঢ় পায়ে শোভাযাত্রা করে তাঁরা এগিয়ে গেছেন রেড স্কোয়ারের দিকে, ১ মে বা ৭ নভেম্বর, যেমন যেতেন আগে, বরাবর, ঠিক তেমনই।

৯৩-এর মে দিবসেও তাঁরা পথে নামলেন। মস্কোর বুক বরাবর চলে যাওয়া চওড়া 'লেনিনস্কি প্রসপেক্ত' (লেনিন সরণি) ধরে সেই মিছিল এগিয়ে চলল, 'অক্‌তিয়াবর্‌স্কায়া প্লোসাদ্' (অক্টোবর স্কোয়ার)-এর দিকে। ইয়েলৎসিন-সরকার ভয় পেল। মানুষগুলোর দৃঢ়তা আর সাহস সেই ভীতিকে বাড়িয়ে তুলল। নামল পুলিশ বাহিনী। সংঘর্ষ, লাঠিচার্জ। সরকারি হিসেবে—মৃতের সংখ্যা এক ; মৃতের পরিচয়—'নির্দোষ' এক পুলিশকর্মী।

মে মাস। মে দিন। সবই এখন ইতিহাস। সোভিয়েত ইউনিয়ন আর নেই। সোভিয়েতের পনেরো টুকরোর এক টুকরো রাশিয়া। রাশিয়ার একটি শহর মস্কো। শুধুই মস্কো। সমাজতন্ত্রহীন মস্কো। লেনিনহীন মস্কো। মার্কসবাদ বাদ পড়া মস্কো। গানহীন মস্কো। এবার আমায় চলে যেতে হবে। দিন ফুরিয়ে এল। আমার পড়ার পালা শেষ। ৬ বছর শেষ হল। জুলাইয়ে চলে যেতে হবে।

এসেছিলাম একটা দেশে। একটা গোটা দেশে। গণমৈত্রী বিশ্ববিদ্যালয়ে। লুমুম্বার নামে। প্যাট্রিস লুমুম্বা পিপল্‌স্ ফ্রেন্ডশিপ ইউনিভার্সিটি। ছ-টা বছর কেটে গেল। আমি রুশ ভাষা শিখলাম। আন্তর্জাতিক সাংবাদিকতা বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি পেলাম। 'উইমেনস রোল ইন দ্য ইউ এস প্রি-ইলেকশন ক্যাম্পেইন ১৯৯২ অ্যান্ড ইটস রিফ্লেকশন ইন দ্য অ্যামেরিকান প্রেস'—বিষয়ে ডিপ্লোমা থিসিস লিখে প্রশংসিত হলাম। থিসিসটি ইউনিভার্সিটির প্রকাশনা বিভাগ থেকে পুস্তিকাকারে প্রকাশিত হল। মস্কো রেডিওতে কাজও করলাম। ১১০টা দেশের ছেলেমেয়ের সঙ্গে একই হস্টেলে কাটালাম কতকগুলো বছর—সবই হল। ২০-র সেরিনা ২৬-এ পড়ল। অনেক কিছু শিখলাম। দেখলাম। বুঝলাম। সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙে গেল। রুশদেশের কমরেড লেনিন মমি হয়ে শুয়ে দেখলেন, কমিউনিজম নিষিদ্ধ হল। স্তালিন দেখলেন, হিটলারকে হারিয়ে পাওয়া মেডেলগুলো রাস্তায় বিকোচ্ছে বীরেরা। কোনো সুদূর থেকে মার্কসও হয়তো দেখলেন, তাঁর তত্ত্ব অচল হল। বাতিল হল।

মার্কসের নামে রাস্তাগুলোর নাম বদল হল। নতুন নাম পেল সেসব রাস্তা। মেট্রো স্টেশনের নাম ছিল 'প্রসপেক্ত মার্কসা'। বাংলা তর্জমায় 'মার্কস সরণি'। সে নাম পালটে নতুন নাম হল 'আখোত্‌নি রিয়াদ', অর্থাৎ 'শিকারভূমি'। মেট্রো চালু হওয়ার আগে, পুরোনো মস্কোতে জায়গাটা এই নামেই পরিচিত ছিল।

রাশিয়ায় তখন পালটানোর পালা। আমিও যেন পালটে গেছি। সেই ছোট্ট আমি, 'বুড়ির চুল' খাওয়ার বায়না করতাম শুধু, সেই একদিন একা চলে এলাম মস্কোতে, ৬ বছর থেকেও গেলাম। পালটেও গেলাম। কিছুই যেন ঠিক থাকে না। মানুষজনও মেনে নেয়। যেন মেনে নিতেই হয়।

সেই যে যুবক যুদ্ধে গেল, প্রেমিকাকে রেখে গেল, সেই সমাজতন্ত্রের দিনে। ফিরে

আবার মেনেও তো নিল। বড়োজোর আলেগ গাজ্মানভ একটা গান গাইলেন—পুতানা, পুতানা, পুতানা। তারপর...

সব যেন এভাবেই চলে। সবাই সবকিছু মেনে নেয়। ওই যুবককেও যুদ্ধে যেতে হত। তার প্রেমিকারও যেন 'পুতানা' হওয়া ছাড়া অন্য কিছু করার ছিল না।

সব তালগোল পাকিয়ে যায়। এই রাশিয়াতেই রবীন্দ্রনাথ এসেছিলেন শুধুমাত্র এই একটি কথা বলার জন্য—"রাশিয়ায় এসেছি—না এলে এ জন্মের তীর্থদর্শন অত্যন্ত অসমাপ্ত থাকত।"

তীর্থ! তীর্থই বটে! লেনিনের দেশ তীর্থ না হলে এ শব্দের অর্থ থাকে না। অনেক আশা নিয়ে আমিও এই তীর্থেই এসেছিলাম। মস্কোর নীল লাল সবুজ, সবকিছুকে নিজের করে নিয়েছিলাম। ফিরে আমাকে আসতেই হত। কিন্তু তা যে খোবলানো, ক্ষতবিক্ষত মস্কো থেকে, তা কোনোদিন কি ভেবেছিলাম!

মুহূর্তে মুহূর্তে পালটাচ্ছে তখন রাশিয়া। চেনাজানা পথঘাট, স্টেশন, বাজার এক সূর্যাস্তের সঙ্গেই নাম পালটে ফেলছে। বাসে, মেট্রোতে তবুও ভুল করে কেউ কেউ হয়তো পুরোনো নামটা বলে ফেলছে। এতদিনের অভ্যেস, এতদিনের পরিচিতি, এত তাড়াতাড়ি ঝেড়ে ফেলা যায়! বলেই তারা চারপাশে সতর্ক দৃষ্টিতে দেখে নিচ্ছে, যেন কেউ শুনলে বিপদ! এ কোন রাশিয়া! মে জুন চলে গেল এভাবেই। জুলাইয়ে আমার ঘরে ফেরার পালা।

যে ইউনিভার্সিটিতে পড়তে গিয়েছিলাম, তার নামটাও পালটাল। প্যাট্রিস লুমুম্বাকে কেটে বাদ দেওয়া হল। বাতিল হলেন তিনি নতুন রাশিয়ায়। নতুন নাম হল—'রাশিয়ান পিপল্স্ ফ্রেন্ডশিপ ইউনিভার্সিটি। ফ্রেন্ডশিপ! ফ্রেন্ডশিপই বটে! বিশ্ববিদ্যার অঙ্গনে বিশ্বদর্শন। মৈত্রী। গণমৈত্রী। হায়!

একদিন দেখলাম, আফ্রিকার ছেলেরা খুব ক্ষুব্ধ হল। লুমুম্বার নাম বাদ দেওয়ায় তারা ক্ষোভ প্রকাশ করল। তারপর থেকেও গেল। মেনেও নিল।

আমি চলে আসব কলকাতায়। বাসভূমিতে। মস্কো এখন বধ্যভূমি। আমার প্রাণের টান হারিয়ে গেছে।

বিদায় ইউনিভার্সিটি। বিদায় অধ্যাপক, অধ্যাপিকা আর আমার প্রাণের বন্ধুরা। বিদায় আমার হস্টেলের ঘর, পশ্চিমের জানলা আর বইয়ের র‍্যাক। বিদায় ঘরের ছাদে আমার কল্পনায় আঁকা পক্ষীরাজ। বিদায় মস্কো—

ইউনিভার্সিটির চত্বরে দাঁড়িয়ে এই কথাগুলো বলেছিলাম। গলার কাছে কী যেন একটা আটকে ছিল। ঝিরঝির করে বৃষ্টি পড়ছিল। আমার সঙ্গে ছিল ইরা। ও আমায় তুলে দিতে যাবে। বাইরে গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। ফাইকা আর ইরিনা ঘর থেকে বেরোয়নি। আগের দিন থেকেই কাঁদছিল। আমিও কাঁদছি। কাঁদছি তোমার জন্য মস্কো। গাড়িতে ওঠার

আগে শেষবারের মতো একবার দেখতে গেলাম ইউনিভার্সিটিকে।

আগে বাঁদিকের ওই দেওয়ালটায় রুশ ভাষাতে লেখা ছিল—

উনিভার্সিতেত
দ্রুঝবি
নারোদভ
ইমিনি
পাত্রিসা
লুমুম্বি

অর্থাৎ—প্যাট্রিস লুমুম্বা পিপল্‌স্ ফ্রেন্ডশিপ ইউনিভার্সিটি।

নতুন রাশিয়ায় নাম পালটানোর পর দেওয়ালের ওখানটা খোবলানো। শেষের তিনটে লাইন উপড়ে ফেলা হয়েছে। নতুন নামের নতুন শব্দ 'রাসিস্‌কি' (রাশিয়ান) এখনও মাথার উপর বসানো হয়নি। নিচের লাইনগুলো তুলে নেওয়ার ফলে দেওয়ালে একটা ক্ষত সৃষ্টি হয়েছে। অক্ষরগুলো না থাকলেও দাগগুলো দেখে বোঝা যায়, ওখানেই ছিল প্যাট্রিস লুমুম্বার নাম। ইয়েলৎসিনের কীর্তি। গোটা রাশিয়া থেকেই তিনি লেনিনের নাম খুবলে নিতে চান। কমিউনিস্টদের নাম উপড়ে ফেলতে চান।

আমি গাড়িতে উঠলাম। ইরা সঙ্গে। গাড়ির চালক লুকিং গ্লাসে দেখছেন আমরা দুজন কাঁদছি। হেসে বললেন—"চিভো তাক্ গ্রুস্তনা ? অ্যাপাত্ প্রিয়েদিশ।" (এত মন খারাপ কেন ? আবার এসো)। আমরা দুজনেই নিরুত্তর। গাড়ি চলল।

আবার আসব। আসব ? এই ছন্নছাড়া মস্কো ভালো লাগে না। ব্রেখটের একটা কবিতা আমার খুব ভালো লাগত। কলকাতায় কিনেছিলাম বইটা। এয়ারপোর্ট লম্বা রাস্তা। ইরাকে বললাম, শোন একটা কবিতা শোনাই। চোখ মুছে ইরা আমার দিকে তাকাল। আমি গলা ঝেড়ে কবিতাটা বলার প্রস্তুতি নিলাম। সেই মুহূর্তে আমি যেন বিশ্বের সব থেকে আবেগপ্রবণ একজন মানুষ।

ইরা বলল, "বল। দ্যাখ, বৃষ্টি পড়ছে। তুই চলে যাচ্ছিস তাই মস্কো বিষণ্ণ। বল, যা বলবি শুনব।"

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময়
সান্ কার্লোতে, ইতালির এক জেলের খুপরিতে—
যেখানে বন্দী সব জওয়ান, মাতাল আর চোরদের
রাখা হত একসঙ্গে
কবে এক সমাজবাদী জওয়ান
একটা কপিং-পেনসিল দিয়ে
দেয়ালে আঁচড় কেটে লিখেছিল :
লেনিন দীর্ঘজীবী হোন।
ওপরের সেই ঘুপচি খুপরির মধ্য

দেখা যায় কি যায় না,
কিন্তু বিরাট বিরাট অক্ষরে সেই লেখা।
জেলসাহেবেরা যখন তা দেখল, ওরা পাঠিয়ে দিল
এক রং-মিস্তিরি,
এক বালতি চুন এনে
ছোট একটা কুচি দিয়ে চুনকাম করে দিল সেই
ভয়-দেখানো লেখা।
কিন্তু ও তো চুনকাম করেছিল শুধু অক্ষরগুলো
তাই খুপরির মাথায় এখন দাঁড়িয়ে রইল চুন দিয়ে লেখা :
লেনিন দীর্ঘজীবী হোন।
তখন এল আরেকজন রং-মিস্তিরি—
মোটা বুরুশ দিয়ে
গোটা দেয়ালটা দিল রং করে,
এমনভাবে যে অনেক ঘন্টা ধরে আর
লেখা দেখাই গেল না।
কিন্তু সকালবেলা
চুন যখন শুকিয়ে গেল, বেরিয়ে এল আবার :
লেনিন দীর্ঘজীবী হোন।
তখন জেলসাহেবরা পাঠাল এক খোদাইকারকে
ছুরি দিয়ে তুলে ফেলবে লেখা!
অক্ষরের পর অক্ষর সে চেঁছে তুলল
এক ঘন্টা বসে।
যখন তার কাজ শেষ হল, খুপরির ওপর থেকে
চেয়ে রইল রংছুট
কিন্তু গভীর হয়ে কুঁদে-ওঠা—সেই লেখা :
লেনিন দীর্ঘজীবী হোন।
এখন তবে উড়িয়ে দাও গোটা দেওয়ালটা,
জওয়ানটি বলে উঠল।*

---

* অনুবাদ : শ্রীলেখা চট্টোপাধ্যায়। 'ব্রেষট-এর কবিতা' ধনঞ্জয় দাশ সম্পাদিত, পরিবেশক : মনীষা গ্রন্থালয় প্রাইভেট লি. ১৯৮১ ; পৃ ৫৬-৫৭